www.Murchona.com

চাপরাস/বুদ্ধদেব গুহ

চাপরাশ যে বহন করে সে-ই চাপরাশি। পেতলের তকমা বুকে লাগানো অনেক চাপরাশিকে আমাদের চারপাশে দেখতে পাই। রাজ্যপালের, জজসাহেবের অথবা মালিকের চাপরাশি। কিন্তু এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব গুহ এযাবৎ অচেনা এমন অনেক চাপরাশির প্রসঙ্গ এনেছেন যাঁরা শুধুমাত্র ঈশ্বরেরই চাপরাশ বহন করছে। কী সে চাপরাশ ? এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় তারই আলেখ্য।

এই উপন্যাস যখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল তখন বহু বুদ্ধিজীবী ও মৌলবাদী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, কোপ মারার হুমকি দিতেও ছাড়েননি। অথচ এই উপন্যাসে 'ধর্ম', 'ঈশ্বর' ও অন্যান্য অনেক বিষয় নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। অন্যতর আলোর দিশারী। 'চাপরাশ'-এর বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর, কোথাও কোথাও স্পর্শকাতর এবং তর্কে-বিতর্কে বিপজ্জনক। তবু এক মর্মস্পর্শী, বেগবান গল্পের মাধ্যমে লেখক এই আখ্যানকে কালোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। আখ্যানের কল্পিত জগৎ থেকে উঠে এসে চারণ নামের মানুষটি আমাদের প্রচলিত ধ্যানধারণাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে সে। ঈশ্বরবিশ্বাস যে মূর্খামি নয়, ধর্মবিশ্বাস যে গর্হিত অপরাধ নয় তা সে নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে।

চারণের গভীর উপলব্ধি এই রকম : 'জিষ্ণু মহারাজ একদিন 'চাপরাশ'-এর কথা বলেছিলেন। মনে আছে চারণের। একজন চাপরাশিই শুধু জানে চাপরাশ বইবার আনন্দ। সেই চাপরাশ ঈশ্বরেরই হোক কি কোনও নারীর। অথবা কোনও গভীর বিশ্বাসের।' যাঁরা ধর্ম মানেন না, ঈশ্বর মানেন না কিংবা যাঁরা মানেন অত্যন্ত অন্ধভাবে—এই দুপক্ষের সামনেই স্পষ্টবাক্, সাহসী এবং সত্যসন্ধ লেখক মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে জীবনের সত্যকে তুলে ধরেছেন। বুদ্ধদেব গুহকে যাঁরা শুধুই 'প্রেম' ও 'জঙ্গল'-এর চাপরাশি বলে জানেন তাঁদের কাছে 'চাপরাশ' এক পরম বিস্ময়ের বাহক হয়ে থাকবে।

এই বিশাল ও গভীর উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যে এক বিশিষ্ট সংযোজন।

নবী চৌধুরী,
অনুজপ্রতিমেষু

চাপরাশ প্রসঙ্গে কটি কথা

ইন্ডানা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান হরিশংকর জালান এবং এস. জি. এস. ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল চিফ এগজিকিউটিভ ড. নরেশ বেদি একাধিকবার আমাকে গাড়োয়াল ও কুমায়ুঁ হিমালয়ের দেবভূমিতে যাবার সুযোগ না করে দিলে 'চাপরাশ' কখনওই লেখা হত না। তাই তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

দে'জ পাবলিশিং-এর সুধাংশুশেখর দে আমাকে অগণ্য বইয়ের জোগান না দিলেও এই বই লেখা যেত না। অ্যাডভোকেট নবী চৌধুরী আমাকে উৎসাহ দেওয়া ছাড়াও একটা ইংরেজি বই দিয়েছিলেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, তার নাম "In Quest of Infinity". কবিরাজ এ. সি. রায়-এর লেখা। আমার জাপানি বন্ধু হাজিমিসো, তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মের ওপরে Robert A. Thuruman-এর লেখা Essential Tibetan Buddhism বইটি উপহার দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। সুধাংশু দে বেদ, উপনিষদ, মনুসংহিতা, কোরাণ এবং নানা সাধকসাধিকার সম্বন্ধে অসংখ্য বইয়ের জোগান দিয়েছিলেন বিন্দুমাত্র বিরক্তি না প্রকাশ করে। তাঁর কার্তিকবাবু সেইসব বই সাইকেলে করে রাতের বেলা পৌঁছে দিয়েছেন দিনের পর দিন। সে কারণে তাঁদের কাছেও অশেষ কৃতজ্ঞ আমি। আমার অফিসের হরেন সুর প্রায় প্রতিদিনই 'প্রতিদিন' অফিসে কমল চৌধুরীর কাছে 'চাপরাশ'-এর কপি ও সংশোধিত পুল দেওয়া-নেওয়া করেছেন। আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

'প্রতিদিন' এবং 'Asian Age'-এর অকালে চলে-যাওয়া সার্কুলেশান ম্যানেজার মদন মিত্র এবং কমল চৌধুরীর নাছোড়-বান্দা পীড়াপীড়ি না থাকলে এই উপন্যাস আরম্ভই করতে পারতাম না। আমি compulsive লেখক নই impulsive লেখক। লেখার মতন কোনও কিছু না জমে উঠলে লিখতে পারি না। বেশি তো লিখিই না। এ কথা আমার পাঠক-পাঠিকারা জানেন।

এই দীর্ঘ আঠারো মাস ধরে এই উপন্যাস সংবাদ 'প্রতিদিন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল যখন তখন প্রতিটি কিস্তি পড়ে তাদের মতামত প্রতি সপ্তাহে আমাকে জানিয়ে এই কঠিন এবং কখনও কখনও ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কাজে আমাকে নিয়োজিত রাখার জন্যে, প্রতিনিয়ত দীপিত করার জন্যে, বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, লিপিলেখা মুখোপাধ্যায়, মুক্তি ও হীরক মুখোপাধ্যায়, মধুমিতা সেন, সুশান্ত ভট্টাচার্য, ড. কৌশিক লাহিড়ী এবং সুজাতা লাহিড়ীর কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বড় ধারাবাহিক লেখা লিখতে লিখতে মাঝে মাঝেই সমুদ্রে হাল-ভাঙা নাবিকের মতন অবস্থা হয় সব লেখকেরই। সেই সময়ে এমন একনিষ্ঠ এবং সৎ পাঠকেরাই, যাঁরা চাটুকার নন, ধ্রুবতারা হয়ে লেখকের মনের আকাশে বিরাজ করেন।

'প্রতিদিন'-এর ডি. টি. পি. ডিপার্টমেন্টের উমাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় আমার অত্যন্ত বাজে হাতের লেখা কপি কম্পোজ করে এবং পুলের সংশোধনের নির্দেশও নির্ভুলভাবে পালন করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। 'প্রতিদিন'-এর কমল চৌধুরী আমার 'কুখ্যাত' মেজাজ অনবরত হাসিমুখে প্রতিদিনই সহ্য করে গেছেন বলেও তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আনন্দ পাবলিশার্স-এর ডি. টি. পি.-র সমীর চৌধুরী এবং রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ও খুব যত্ন ও ধৈর্যর সঙ্গে এ বই কম্পোজ ও মেক-আপ করেছেন। সে জন্যেও তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বড় টাইপে, রয়্যাল সাইজে নয়নলোভন করে ছেপেছেন এ বই আনন্দ পাবলিশার্স-এর বাদল বসু। বইটি বেশ বড়। সাম্প্রতিক অতীত থেকে কাগজ, ছাপা এবং আনুষঙ্গিক খরচ অনেক বেড়ে

যাওয়াতে বইয়ের দাম অনেকই হয়ে গেল। প্রকাশকের হয়ে আমি ক্ষমা প্রার্থী। আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা নিজগুণে প্রকাশককে মার্জনা করবেন।

অনুজপ্রতিম প্রচ্ছদ-শিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়কেও অশেষ ধন্যবাদ।

বিনত,

পোস্ট বক্স নং ১০২৭২
কলকাতা-৭০০০১৯

বুদ্ধদেব গুহ

ঠিক চারদিন আগে কোজাগরী পূর্ণিমা গেছে। আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী। হৃষীকেশ এর ত্রিবেণী ঘাটে যে মস্ত চাতালটি আছে একটি প্রকাণ্ড পিপ্পল গাছের তলার মন্দিরের সামনে, ঘাটে নামার পথের ডানদিকে, সেই চাতালেরই ওপরে দুপা মুড়ে বসে চারণ চট্টোপাধ্যায় নদীর দিকে তাকিয়েছিল।

সন্ধে তখনও হয়নি। তবে, হবো হবো।

আজ কোনও একটা ব্যাপার আছে এখানে। সেটা নবাগন্তুক চারণ চাটুজ্যে বুঝতে পারছে কিন্তু কী ব্যাপার তা বুঝতে পারছে না। জিগ্যেস করবে যে, এমন কেউও নেই এখানে পরিচিত। আসলে এই পৃথিবীতে, এই জীবনে, অপরিচিতরাই যে প্রকৃত পরিচিত এবং পরিচিতরাই যে অপরিচিত এই সত্য সম্বন্ধে চারণের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়নি।

সন্ধে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে সুসজ্জিতা, সালঙ্কারা, সুগন্ধি, বিভিন্নবয়সী, কলহাস্যময়ী নারীদের ঘাটের দিকে নেমে যেতে দেখা গেল। যাওয়ার পথে ওই চাতালে পৌঁছনোর আগে বাঁদিকে ও ডানদিকে যে অগণ্য দোকান আছে, সেইসব দোকান থেকে ফুল ও কী একটি গাছের পাতার দোনার মধ্যে বসানো জ্বলন্ত ধূপকাঠি এবং মাটির প্রদীপ নিয়ে তবেই এগোচ্ছিলেন প্রত্যেকে। একা-একা বা দলে-বলে, নদীর ঘাটের দিকে।

নারীদের মধ্যে বৃদ্ধা একজনও ছিলেন না। লক্ষ করল চারণ। দীপাবলীর আগেই কেন এই দীপাবলী চারণ তা না বুঝতে পারলেও সেই সুন্দর দৃশ্যের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল। আনন্দে মন ভরে যাচ্ছে তার অথচ এই আনন্দে তার নিজের কোনওই ভাগ থাকার কথা ছিল না। নেইও। এ আনন্দ সম্পূর্ণই নৈর্ব্যক্তিক। চারণ বুঝতে পারছিল যে, দুঃখেরই মতো আনন্দও বড় ছোঁয়াচে। নানারকম অনপসরণীয় দুঃখের ভারে, অকৃতজ্ঞতা, তঞ্চকতা, নীচ মগ্ন স্বার্থপরতার আঘাতে আঘাতে সে ভারাক্রান্ত। অথচ এই মুহূর্তে ওর আনন্দের কোনও শেষ নেই।

নারীরা কেউই একা আসেননি। প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁদের ভালবাসার পুরুষেরাও আছেন। ওড়াউড়ি-করা জোড়া-জোড়া পাখিদের ভালবাসারই মতন এই নারী আর পুরুষদের স্ফুট ও অস্ফুট ভালবাসা, চুড়ির রিনঠিনে, চোখের চকিত ইঙ্গিতে, শাড়ির খসখসানিতে গোচর ও অনুভূত হচ্ছে চারণের।

গাড়োয়াল হিমালয়ে সন্ধে নেমেছে। কিন্তু তখনও রাত নামেনি। তবে প্রায়ান্ধকার। লছমন ঝুলা, রাম ঝুলার নীচ দিয়ে বেগে প্রবাহিত প্রাণদায়িনী পুণ্যতোয়া গঙ্গা এই হৃষীকেশে পৌঁছতেই সমতলে ছড়িয়ে গেছে। আর সেই দ্রুত ধাবমানা নদী, নারীদের যতন-ভরা আঙুলে ভাসিয়ে-দেওয়া অগণ্য প্রদীপ বুকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে হরিদ্বারের দিকে। হেলতে দুলতে, কাঁপতে কাঁপতে চলেছে দ্রুত বেগে ভাসমান প্রদীপগুলি। কোনও প্রদীপ ডুবে যাচ্ছে স্রোতে কিছুটা গিয়েই। ডুবে যাচ্ছে যার প্রদীপ, সেই নারী মনমরা হয়ে আবারও নতুন প্রদীপ আনতে উঠে আসছেন ঘাট ছেড়ে। নগাধিরাজ হিমালয়ের পাদদেশের সমতলে কৃষ্ণা রাতের, নিঃশব্দে কিন্তু অতি দ্রুত ধাবমানা গঙ্গার এই গতিমান আলোকসজ্জাতে, মুগ্ধ, স্তব্ধ হয়ে গেছে চারণ চাটুজ্যে।

www.Murchona.com
suman_ahm@yahoo.com

ওই নারীদের এবং নদীর দিকে চেয়ে চারণ ভাবছিল, সুখ অথবা দুঃখও কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা হস্তান্তর-অযোগ্য অনুভূতি নয়। সুখ যে নেয়, সুখ তারই হয়। দুখও যে নেয়, দুখও তার ঘরে গিয়েই ওঠে। হয়তো সে কারণেই নিজস্ব কারণে যে সুখি হতে পারেনি জীবনে, সে অতি সহজেই সুখি হয়ে ওঠে পরস্ব কারণে। দুঃখ ধারণ করার মতন আধার বা আত্মা যার নেই সে সেই দুঃখকে অতি সহজেই অন্যের ঘাড়ে চালান করে দেয়। সংসারে এমন মানুষের সংখ্যাই বেশি। যার আত্মা ভাল নয়, তার দুঃখবোধই নেই। যার দুঃখবোধ আছে, পৃথিবীর তাবৎ দুঃখ তাকেই চুম্বকের মতন নিয়ত আকর্ষণ করে। নিজের দুঃখ তো বটেই, পরের দুঃখও।

চারণের পাশেই ছিপছিপে এক সন্ন্যাসী জোড়াসনে বসে ছিলেন ত্রিবেণী ঘাটের দিকে চেয়ে।

কে সন্ন্যাসী আর কে নন তা পোশাক দেখে যতখানি না বোঝা যায় তার চেয়ে অনেকই বেশি বোঝা যায় তাঁর মুখের ভাব দেখে। 'ভেক' ধরলেই কেউ শুধুমাত্র ভেকের জোরেই সন্ন্যাসী হয়ে ওঠেন না। আবার কেউ পোশাকে পুরোপুরি গৃহী হলেও তার মুখের ভাবে তিনি অন্যের কাছে ধরা পড়ে যান যে, তিনি সন্ন্যাসী। অবশ্য যাঁদের দেখার চোখ আছে তাঁদেরই চোখে।

চারণ কিন্তু মানুষটিকে দেখেই বুঝেছিল যে, তিনি সন্ন্যাসী।

একটুক্ষণ পরেই সেই শীর্ণকায় সন্ন্যাসী উলটোদিকে ঘুরে মন্দিরের দিকে মুখ করে বসলেন। তারপর ঝুলি থেকে একটি মলিন চটি বই বের করে দুহাতের পাতা দিয়ে সামনে মেলে ধরে, নিজের মনে মন্দিরের মধ্যের আলোকোজ্জ্বল মূর্তির উদ্দেশ্যে ভজন ধরলেন।

গান শুরু হতেই চারণ চমকে উঠে নিজেও ঘুরে বসল।

ঘুরে বসল একাধিক কারণে। প্রথমত সন্ন্যাসীর গলা সুরঋদ্ধ। দ্বিতীয়ত, গভীর ভাব-সমৃদ্ধ। ইদানীং কলকাতা শহরে মশারই মতন গায়কের সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিনের দৈনিকপত্রে পাতা-জোড়া ক্যাসেটের বিজ্ঞাপনই তার প্রমাণ। আজকাল গান শোনার মানুষেরই বড় অভাব। তাছাড়া, কবিতা লিখলেই বা তা পত্রপত্রিকাতে ছাপা হলেই বা নিজের পয়সা খরচ করে বই ছাপালেই যেমন কেউ শুধুমাত্র সেই দাবিতেই কবি হয়ে ওঠেন না, সভাতে বা অনুষ্ঠানে গান গাইলেই বা ক্যাসেট বের করলেই কেউ IPSO-FACTO গায়ক হয়ে ওঠেন না। 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবিরই' মতন সকলেই অবশ্যই গায়ক নন। শুধু কেউ কেউই গায়ক। চারণ নিজে গায়ক নয়। সুর আছে তার কানে, গলায় না থাকলেও। সুর-বেসুরের তফাৎ বোঝে বলেই ইদানীং কারও গান শুনতে খুবই ভীত হয়। যে-গায়কের গলাতে সুর নেই, অথবা সুর কম লাগে, তার গান শুনতে বড়ই কষ্ট হয়। চারণকে তেমন গান, আনন্দ না দিয়ে যন্ত্রণাই দেয়।

এই যন্ত্রণার কথা সুরজ্ঞানরহিত মানুষদের বোঝাবুঝির বাইরে।

সন্ন্যাসী, ভজনের মুখটি পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই চারণ ঘুরে বসে সেই গানে আচ্ছন্ন হল। বাণীটি চেনা চেনা লাগল খুব। তারপরই মনে পড়ে গেল যে, এই গানটি ওর শোনা। বহুদিন আগে আলমোড়াতে এক অন্ধ গায়কের গলাতে ওই গানটি শুনেছিল। বহু দূরের কোনও বরফাচ্ছাদিত দেশের পরিযায়ী পাখির মতন গানটি এসে চারণের মনের ছোট্ট জলাতে ডানা ছড়িয়ে, জল নাড়িয়ে জল-ছড়া দিয়ে এসে বসল।

আস্থাই এর মুখ : "খোঁজে খোঁজে তুমহে কানহাইয়া মুঝে নয়না ধারে।"

অন্ধ বলেই হয়তো আলমোড়ার সেই গায়কের গলায় সুরসিক্ত এক আকুতি ছিল। অন্ধ বলেই তাঁর দেবতাকে চোখ দিয়ে দেখার তীব্র তাগিদ ছিল। অন্তরের অন্তস্তল থেকে সেই গানটি উঠেছিল বলেই এত দীর্ঘকাল পরেও গানটিকে এবং গায়ক সজ্জনবাবুকে ভুলতে পারেনি চারণ। হৃষীকেশের এই কৃষ্ণা চতুর্দশীতে এই অচেনা অল্পবয়সী সন্ন্যাসীর ভজনের মধ্যে দিয়ে বহু বছর আগের আলমোড়ার মে মাসের অমাবস্যার রাতের কথা এবং সেই গায়কের কথা যেন নিমেষের মধ্যে উড়ে এল। তবে সজ্জনবাবুর গানের সঙ্গে জোড়া তানপুরা ছিল, হারমনিয়ম, তবলা। এবং ঘরের মধ্যে হয়েছিল সে গান। যাঁরা গান সম্বন্ধে কিছুমাত্রও জানেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে, কোনওরকম অনুষঙ্গ ছাড়া খালি গলাতে চারদিক খোলা জায়গাতে বসে সুরে গান গাওয়া এবং সেই গান অন্যের

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

কানে এবং মরমেও পৌঁছনো বড় সোজা কথা নয়। এই সন্ন্যাসী সেই প্রায় অসাধ্য কর্মটিই করছিলেন।

গান শেষ হলে চারণ বলল, বড় সুন্দর গান আপনি। ভারী ভাল লাগল।

সন্ন্যাসী চারণের দিকে চেয়ে রইলেন চুপ করে। কথা বললেন না কোনও।

তারপর বললেন, গান কি গায়কের ? গান চিরদিনই শ্রোতার। তাছাড়া গানের আমি কি জানি ! গান জানেন আমার গুরু।

আপনার গুরু ? তিনি কে ?

ওই যে।

বলেই, সন্ন্যাসী তাঁর বাঁদিকে আঙুল তুলে দেখালেন। চারণ, সন্ন্যাসীর তর্জনী নির্দেশ অনুসরণ করে দেখল যে, চাতালের ডানদিকের (মন্দিরের দিকে পেছন ফিরে বসলে যে দিক ডানদিকে, সেই দিকে) একেবারে শেষ প্রান্তে দু-তিনটি অসমান বাঁশের কঞ্চির উপরে বিছানো, একসময়ে সাদা ছিল কিন্তু এখন কালো হয়ে-যাওয়া প্লাস্টিকের চাদরের নীচে, কালো, শীর্ণ, দীর্ঘাঙ্গি একজন মানুষ গেরুয়া লুঙ্গি আর হাতওয়ালা গেঞ্জি পরে, চোখ বুঁজে নিজের মনে, তাঁর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে অ্যালুমিনিয়ামের একটি দুধের পাত্রর উপর তাল দিতে দিতে পুরোপুরি আত্মস্থ হয়ে গান গাইছেন। তাঁর বাঁ হাতের কব্জিতে একটা সস্তা হাতঘড়ি।

সন্ন্যাসী বললেন, যাবেন নাকি গুরুর কাছে ?

চারণ মাথা নাড়ল। নেতিবাচক।

যাবেন না ?

না।

চারণের কানে গুরু শব্দটাই অসহ্য ঠেকে। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির ভক্ত ও। গুরুবাদে বিশ্বাস নেই, মন্ত্রে-তন্ত্রে ভক্তি নেই, দীক্ষা-টিক্ষাতেও আদৌ নয়। তবে একথাও ঠিক যে, যাঁদের আছে, তাঁদের প্রতি কোনও বিরূপতাও নেই।

তারপর ভাবল, সন্ন্যাসীর কি কোনও ধান্দা আছে ? নাহলে সদ্য-পরিচিত তাকে নিয়ে গিয়ে তার গুরুর কাছে ভিড়িয়ে দেওয়ার মতলব কেন ?

তারপর ও আবার ঘুরে বসল ত্রিবেণী ঘাটের দিকে মুখ করে। সন্ন্যাসীও তাই করলেন।

চারণ জিজ্ঞাসা করল সন্ন্যাসীকে, আজ কি কোনও উৎসব এখানে ? কোনও ব্রত-ট্রত ? এত মেয়েরা সব বিয়ের সাজে সেজে বেনারসি-টেনারসি পরে, গা-ভরা গয়না পরে প্রদীপ ভাসাচ্ছেন কেন নদীর জলে ? আজকে এখানকার পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছে যেন দশেরার দিনে বসে আছি কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে। সেখানেও মেয়েদের অমন করেই প্রদীপ ভাসাতে দেখেছিলাম উত্তরবাহিনী গঙ্গাতে।

হুঁ।

সন্ন্যাসী বললেন।

তারপর বললেন, আমি দশাশ্বমেধ ঘাটেও ছিলাম দুবছর। দশেরার দিনে প্রদীপ ছেলেরাও ভাসায়। সেই জল-প্রদীপ উৎসর্গ করা হয় পূর্বপুরুষদের প্রতি। তর্পণের এক রকম আর কী।

তাই ?

হুঁ।

তা আজ এখানে কিসের উৎসব তা তো বললেন না।

সন্ন্যাসী বললেন, আজ "কড়োয়া চওথ।"

সেটা কি ?

বিবাহিত মেয়েরা, "কড়োয়া চওথ" মানে, কোজাগরী পূর্ণিমার পরের কৃষ্ণা চতুর্থীতে স্বামীদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাতে সন্ধেতে এমনি করেই জলে প্রদীপ ভাসায়। হিন্দু ও জৈন মেয়েরাও এদিন সারাদিন উপোস করে থাকেন, বিবাহিত মেয়েরা। প্রদীপ ভাসানোর পরে তারপরই বাড়িতে গিয়ে

খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-আহ্লাদ।

চারণ জিগ্যেস করল, যে-গাছের পাতাতে দোনা বানানো হয়েছে সেগুলো কোন গাছের পাতা? আমি তালগাছ চিনি। তাল নয়। শাল পাতাও তো নয়। ওই পাতাগুলো কোন গাছের?

শাল তো এই পার্বত্য অঞ্চলে হয়ও না। মহুলানও হয় না। সন্ন্যাসী বললেন।

মহুলানটা কি জিনিস?

এক রকমের গাছ। সেই গাছের পাতা ব্যবহৃত হয় দক্ষিণ ভারতের সব মন্দিরে। তবে সে গাছ হয় ভারতের অনেক জায়গাতেই।

তাড় মানে? তাল গাছ?

সন্ন্যাসী হেসে উঠে বললেন, না, না। তাড়। তাল আমি চিনি। কালিঘাটেও ছিলাম কিছুদিন যে! হিমালয়ে জন্মায় এই তাড় গাছ। দেখাব এখন আপনাকে একদিন।

বলেই বলল, আছেন কদিন?

চারণ বললেন, ঠিক করিনি।

বাঃ।

সন্ন্যাসী বললেন।

বাঃ কেন?

আপনিও সন্ত দেখছি। ক্যালেন্ডার দেখে আসা, ক্যালেন্ডার দেখে যাওয়া, ক্যালেন্ডার দেখে হাসা, ক্যালেন্ডার দেখে কাঁদা, ঘড়ি ধরে দিন শুরু করা এবং শেষ করা এর মধ্যে একটা চাকরি-চাকরি গন্ধ নেই কি? এ বড় কঠিন চাকরি! অন্য যে কোনও চাকরিই ছাড়া খুবই সহজ কিন্তু এই ক্যালেন্ডারের চাকরি, ঘড়ির চাকরি ছাড়া ভারী কঠিন। ভারী কঠিন!

তাই?

অন্যমনস্ক গলাতে বলল চারণ।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনাকে দেখে বয়স তো বেশি বলে মনে হচ্ছে না। আপনি সন্ন্যাস নিলেন কেন?

সন্ন্যাসী হাসলেন।

বললেন, সন্ন্যাস কি কেউ ইচ্ছে করলেই নিতে পারে? শুধু গেরুয়া পরলেই কি সন্ন্যাস নেওয়া সম্পূর্ণ হয়?

তারপর কিছুক্ষণ ত্রিবেণী ঘাটের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তবে একথাও ঠিক যে, নেওয়ার চেষ্টাতেই আছি গত পঁচিশ বছর ধরে। সন্ন্যাস ব্যাপারটা যে ঠিক কি?— তা আজও বুঝে উঠতে পারলাম না।

চারণ একটু অবাকই হল। তারপরই ঘাটের দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে। বড় নয়নলোভন দৃশ্য। কত রঙের শাড়ি পরা কত বিভিন্ন বয়সী নারীরা ঘাটে যাচ্ছেন। ঘাটের মস্ত বাঁধানো চাতাল পেরিয়ে আবার ফিরে আসছেন। চোখের পক্ষে এও একধরনের Movable Feast. স্রোতের পর স্রোত। কত মানুষের গলার স্বর। বেশিই মেয়েদের। চাতালের একদিকে একটি মন্দির। সেখানে লাউডস্পিকারে মন্ত্রোচ্চারণ হচ্ছে। ভজন হচ্ছে। আর অন্যদিকে সাদা পাথরের মূর্তি। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের দৃশ্য। ঘাটের তিনদিক থেকে সরু পথ এসে পৌঁছেছে চাতালে। আবার অনেক পথ নেমে এসেছে পাহাড়ের গায়ের নানা ধরমশালা এবং আশ্রম থেকেও। অনেকখানি এলাকা জুড়ে দেখবার মতন ঘাট বটে। সিঁড়ির পরে সিঁড়ি নেমে গেছে।

সন্ন্যাসী, চারণকে মুগ্ধচোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে স্বগতোক্তি করলেন, বর্ষাকালে অধিকাংশ সিঁড়িই ডুবে যায়।

ওই চাতালে বসে থাকতে থাকতে ভারী এক ঘোর লাগছিল চারণের। চারদিকে এত ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ। ভরাট গলার মন্ত্রোচ্চারণ। ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধ, মন্দিরের ঘণ্টার নানা পর্দার ধাতব ধ্বনি, ভজনের শুদ্ধ ধ্বনি, হংসধ্বনিরই মতন, ওর মনকে আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

হঠাৎই সন্ন্যাসীর প্রশ্নে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল চারণের।

উনি বললেন, উঠেছেন কোথায় ?

ওর ইচ্ছে করল, মিথ্যে বলে। কারণ, এই চাতালে, জোড়াসনে বসে-থাকা সাধুর পাশে নিজেও পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বসে যে মানসিক "তল"এ এতক্ষণ বিরাজ করছিল ও, হোটেলের নাম বলার সঙ্গে সঙ্গেই, চারণ জানে যে, এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর মানসিক তল-এর তফাৎ হয়ে যাবে।

চারণ ভাবল, যে মিথ্যে কথা বলে। কিন্তু পর মুহূর্তেই ঠিক করল যে না, মিথ্যে বলবে না।

সন্ন্যাসী তারই মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

বলল, মন্দাকিনী হোটেল।

সেটা কোথায় ?

অবাক হল চারণ। আশ্বস্তও। ভাবল এই জন্যেই ওই তরুণ, তার প্রায় সমবয়সী এই মানুষটি সন্ন্যাসী হতে পেরেছেন।

হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশে আসতে হলে 'মন্দাকিনী হোটেল' পথেই পড়ে। বাঁদিকে। তিনতারা হোটেল। হৃষীকেশে আর একটি মাত্র তিনতারা হোটেল আছে, দেরাদুনের পথে। সন্ন্যাসী যদি প্রকৃত সন্ন্যাসী না হতেন তবে হোটেলের নাম শুনেই লোভে চোখ দুটি চকচক করে উঠত হয়তো। কিন্তু হৃষীকেশের বাসিন্দা হয়েও মন্দকিনী হোটেলের নাম-না-শোনা সন্ন্যাসী তাঁর থলেতে হাত ঢুকিয়ে নির্লিপ্ত মনে একটি বিড়ি বের করলেন। তারপর দেশলাই দিয়ে ধরালেন সেটা। চারণের দিকে ভাল করে চাইলেন। হয়তো ভাবলেন, চারণ ধূমপান করলেও নিশ্চয়ই ভাল সিগারেট খায়। তাকে বিড়ি অফার করাটা ভব্যতা হবে না। সুতরাং তা থেকে নিরত থেকে, নিজের বিড়িতে সুখটান লাগালেন একটা।

আপনি ভারতের কোন প্রদেশের মানুষ ?

চারণ জিগ্যেস করল।

করেই, মনে পড়ল সন্ন্যাসীদের পূর্বাশ্রমের কথা জিগ্যেস করতে নেই।

কিন্তু সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন। বললেন, মহারাষ্ট্রের। পুনের কাছের।

বলেই বললেন, সন্ত তুকারামের নাম শুনেছেন ?

নাঃ।

চারণ বলল।

বলেই মনে মনে বলল, কোনও সন্ত-ফন্ত-রই নাম শোনেনি সে। চারণের পরলোকগতা মায়ের খুবই ইচ্ছে ছিল যে, এইসব জায়গাতে আসেন তীর্থদর্শনে। কিন্তু তখনও চারণ নিজের পায়ে দাঁড়ায়নি। বাবাও গত হয়েছেন আগেই। ওর সামর্থ্য ছিল না যে মাকে নিয়ে আসে। তখন মাকে আনতে পারেনি। এখন মা নেই। ও একাই এসেছে। ধর্ম-টর্ম মানে না ও। দেব-দেবতা মানে না। গুরু মানে না। কলেজের ছাত্র থাকাকালীন বাম-ঘেঁষা রাজনীতিও করেছিল। তাই ধর্ম, ধর্মস্থান, দেব-দেবী ইত্যাদি সম্বন্ধে জন্মে-যাওয়া এক গভীর অসূয়াও এইসব তীর্থস্থানে মাকে না-নিয়ে আসার হয়তো একটি কারণ ছিল।

তারপরে কী মনে করে বলল, কে তিনি ? সন্ত তুকারাম ?

সন্ন্যাসী বললেন, সন্ত তুকারামও মারাঠি ছিলেন। মহারাষ্ট্রেরই মানুষ।

তাই ? আপনি কি তাঁর চেলা ?

না, না। নাম শুনেছি। তাঁর সম্বন্ধে শুনেছি, পড়েছি। ওঁকে কি আর চোখে দেখেছি কখনও ? কত শতাব্দী আগের কথা।

আপনি কি তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়েই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন ?

সন্ন্যাসী হেসে ফেললেন চারণের কথা শুনে।

বললেন, আবারও বলছেন সন্ন্যাসের কথা। আগেই বলেছি, সন্ন্যাস আমি নিতে পারিনি এখনও। এখানে অনেক পকেটমার, নেশাখোর, চোর-বদমাশও আছে। আমিই যদি সন্ন্যাসী হতে পারতাম

তাহলে তারা দোষ করল কি ?

তাহলে ?

তাহলে কি ?

বলেই, কটুগন্ধ বিড়িতে কষে এক টান লাগালেন সন্ন্যাসী ।

গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল চারণের ।

বলল, তাহলে সংসার ছাড়লেন কেন ?

আমার মা আর বাবা তিন মাসের ব্যবধানে হঠাৎই মারা গেলেন । একেবারেই হঠাৎ ।

অ্যাকসিডেন্টে ?

না, না । এমনি অসুখেই । তবে অ্যাকসিডেন্টেরই মতন । কোনও ভারী অসুখও নয়, কোনও মারীতেও না, অতি সামান্য জ্বর হয়েছিল । দুজনেরই । কদিন আগে আর পরে । কিন্তু ডাক্তার দেখানোর আগেই গেলেন ।

এই অবধি বলেই সন্ন্যাসী আবার উদাস হয়ে নদীর দিকে তাকালেন । বিড়িটা শেষ করলেন আস্তে আস্তে ।

তারপর বললেন, মায়ের মৃত্যুর সময়ে বাবা তো বটেই, আমিও পাশেই ছিলাম । সন্ধে রাত্তিরে গেলেন মা । যাবার আগে মায়ের মুখচোখে কেমন আতঙ্কের ছাপ দেখলাম । দারুণ আতঙ্ক । আঙুল দিয়ে খোলা জানালার দিকে দেখালেন বারবার । যেন কারওকে বা একাধিক মানুষকে বা জন্তুকে দেখতে পাচ্ছেন । মানুষ বা জন্তু, যে বা যাদেরই মা দেখতে পেয়ে থাকুন না কেন, তাদের দেখে উনি ভীষণই ভয় পেয়ে গেছিলেন ।

তাই ?

অবাক হয়ে চারণ বলল ।

তারও মনে পড়ে গেল তার বাবার মৃত্যুর কথা । চারণও তার বাবার মৃত্যুর ক্ষণে তাঁর মুখেও দারুণ এক আতঙ্কের ছাপ লক্ষ করেছিল !

একেবারে ভুলেই গেছিল ব্যাপারটা ।

মায়ের মৃত্যুর সময়ে অফিসের কাজে সে কলকাতার বাইরে ছিল । মায়ের মুখেও আতঙ্ক ফুটেছিল কিনা বলতে পারবে না মৃত্যুর ক্ষণে । এত বছর পরে আজ সন্ন্যাসী এ প্রসঙ্গ তোলাতেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার বাবার মৃত্যুর কথা । আগে কিন্তু এ নিয়ে তেমন করে ভাবেওনি কখনও ।

তারপর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন ।

আর গান গাইবেন না ?

নাঃ । আজ আর নয় । রোজই যে গান গাই এমনও নয় । যেদিন ইচ্ছে করে, সেদিন গাই ।

ঠাকুরকে শোনাতে ?

না, তাও নয় । তবে যে যাই করুক না কেন সব কাজেরই যেমন একটা উদ্দেশ্য থাকে, তেমন বিধেয়ও থাকে । ওই দিকে মুখ করে গাওয়াটাই বিধেয়, তাই ।

সংসার কেন ছাড়লেন তা কিন্তু বললেন না এখনও ।

চারণ বলল ।

সন্ন্যাসী হাসলেন । ওঁর হাসিটা ভারী মিষ্টি । দুটি গজদন্ত আছে সন্ন্যাসীর । হাসলে, সুন্দর দেখায়, কৃশ, তামাটে সন্ন্যাসীকে । বয়সই বা কত হবে ? বড় জোর চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ । চারণের চেয়েও ছোট ।

সন্ন্যাসী বললেন, আপনি তো খুব হড়বড়িয়া মানুষ ।

তারপর আবারও ঘাটের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, সংসার ছিলই আর কোথায় ? সংসার তো ছিল, বাবা আর মাকেই নিয়ে । মা-বাবাই চলে গেলেন । তখন আমার বয়স মাত্র সতেরো । অত অল্প সময়ের ব্যবধানে, মানে, মাত্র দুমাসের ব্যবধানে, দুজনেই চলে যাওয়াতে বড় অসহায় তো হয়ে গেলামই, তাছাড়া আমার মনে নানা প্রশ্ন জাগল, যা ওই বয়সী কোনও ছেলের মনে জাগার কথা ছিল

না কোনও। কিন্তু জেগেছিল।

কী প্রশ্ন ? মানে কীরকম প্রশ্ন ?

ওই ! জীবন কি ? জীবন কেন ? মৃত্যুই বা কি ? মৃত্যুর পরে কি অন্য কোনও জীবন ....তাই ভাবলাম, বেশ কিছু সময় হাতে থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়ি ঘর ছেড়ে দুনিয়া দেখতে। ভাবলাম, নানা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াব, জিগ্যেস করব নানা সাধু-সন্তদের, ভাবব, প্রয়োজনে সাধনা করব। জেনে নেব, মা-বাবা কোথায় গেলেন ? যাওয়ার সময়ে অমন ভয়ই বা কেন পেলেন ? মৃত্যুর পরেও জীবন আছে কি না, এইসব নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজব। আমার নিজের জীবনওতো অনন্তকালের নয় !

কত বছর হল ঘর ছেড়েছেন ?

চারণ জিগ্যেস করল।

আঠারো বছর।

জানলেন কিছু ? মানে, আপনার সব প্রশ্নের জবাব কি পেলেন ?

নাঃ। কোনও প্রশ্নের জবাবই পাইনি। জবাব পাইনি যে তা নয়, সে সব জবাব মনঃপূত হয়নি। হতাশ ঠিক নয়, তবে উদাসীন গলায় বললেন সন্ন্যাসী।

তবে ? উত্তর নাই যদি পেয়ে থাকেন তো এখন ঘরে ফেরার বাধা কোথায় ?

নাঃ।

কী নাঃ।

ঘরে আর ফিরব না। ঘরকে তেমন করে ছেড়ে এলে ঘর আর ফেরত নেয় না কারওকেই। তাছাড়া, ঘর বলতে তো ছিলও না কিছু আমার। মানে, ভালবেসে থাকার মতন কিছু ছিল না। শুনেছি আমার সম্পত্তি কাকারা জবরদখল করে নিয়েছিলেন আমি চলে আসার পরেই। আমার এক মামা থাকতেন নাসিক-এ। তিনি চেয়েছিলেন আমার বিয়ে দিয়ে আমাকে সংসারী করতে। জমিজমা কম ছিল না। কিন্তু আমিই পালিয়ে এসেছিলাম।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, জমিজমা, ঘর-বাড়ি যদি থাকতও তবেও ফিরে গিয়ে সেখানে তিষ্ঠোতে পারতাম না। এই আকাশ, বাতাস, এই পাহাড়, নদী, এই শ্মশান এইসব ধর্মস্থানে সারা ভারতের সারা পৃথিবীর সাধু-সন্ত, সন্ন্যাসীদের ভিড়। এদের ছেড়ে যেতে পারব না আর। কত কী জানার বাকি আছে। জানা তো কিছুই হয়নি। এঁরা কেন পড়ে আছেন বিভিন্ন তীর্থস্থানে ? কিসের খোঁজে ? কিছু কি পেয়েছেন এঁরা ? নাকি এঁরাও আমারই মতন তালাশেই আছেন এখনও ? কে জানে ! হয়তো এঁরাও কিছু পাননি। এঁরাও হয়তো নেশারই ঘোরে, গাঁজা-আফিঙের-ভাঙের নেশা, এই খোলামেলা জায়গার নেশা, এই ক্যালেন্ডার আর ঘড়ির দাসত্ব থেকে মুক্তির নেশাতে মজেছেন। আমারই মতন। সারা জীবনেরই মতন ফেঁসে গেছেন হয়তো।

ফেঁসে গেছেন কেন বলছেন ? বলুন, উৎরে গেছেন। চারণ বলল।

তারপর মনে মনে বলল, আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকেরা বলেন 'উত্তরণ'।

তারপর বলল, ফেঁসে গেছেন, গেঁথে রয়েছেন তাঁরাই, যাঁরা সংসারে আছেন। আপনার ভাষাতে ক্যালেন্ডার আর ঘড়ির দাসত্ব-করা জীবেরা। টাকা, ব্যবসা, বাণিজ্য, জাগতিক সব প্রাপ্তির পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন অবিরত তাঁরাই।

সন্ন্যাসী হঠাৎই প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললেন, আপনি কি করেন ?

কিছু করি না। মানে, করব না আর এখন।

কি করতেন ?

বাঙালি হয়ে জন্মেছি, আর কী করব ? চাকরি। তবে আমি যা করি তাকে চাকরি ঠিক বলা যায় না। কারণ আমার অনেক মালিক, একজন নয়।

তাই ? সংসার করেননি ?

করব করব করেছিলাম, কিন্তু করা হয়নি।

তাজ্জব কী বাত।

বলেই, সন্ন্যাসী আবারও আসলেন। গজদন্ত দেখা গেল আবারও।

তারপরে গানের বইটির ধুলো ঝেড়ে কাঁধের ঝোলাতে ভরে ফেলে বললেন, এবারে...

চারণ ভাবল এবারে টাকা চাইবেন নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী, এতক্ষণ তার সঙ্গে গল্প করার খেসারত হিসেবে। কিন্তু নাঃ। চারণ চাটুজ্যেকে অবাক করে দিয়ে তার মুখনিঃসৃত বাক্যকে সম্পূর্ণ করলেন উনি, এবারে আমি কালিকমলি বাবার আশ্রমে যাব।

কি করতে ?

চারণ শুধোল।

খেতে।

কি খাবেন কালিকমলি বাবার আশ্রমে ?

যা দেবে।

কি দেয় ?

রুটি, তরকারি। কখনও ডালও।

তাতেই হয়ে যায় ? আর কিছু ?

হয়ে যায়। পেটের খিদেকে সব সময়েই জাগিয়ে রাখা উচিত প্রত্যেকেরই। উপোস থাকতে পারলেই সবচেয়ে ভাল হয়। তখন মাথাটা দারুণ সাফ হয়ে যায়। 'আগুন পোড়ায় শরীরকে আর চিন্তা পোড়ায় মনকে'। কাশীর শ্মশানে এক তান্ত্রিক আমাকে বলেছিলেন কথাটা। ভারী মনে ধরেছিল।

একেবারে উপোস ? উপোস করে থাকেন নাকি ?

হ্যাঁ। তবে, মাঝেমধ্যে খাই। আমি তো আর উচ্চমার্গে উঠতে পারিনি। আমার গুরু, যাঁকে দেখালাম, তিনি অনেকসময় পনেরোদিন বা একমাস না খেয়েও থাকেন। বকা-ঝকা করে খাওয়াতে হয়। গুরু বলেন, খেয়ে নষ্ট করার মতন সময় তাঁর নেই। বলেই, হাসলেন সন্ন্যাসী।

তারপর বললেন......এ দেশের যারা মালিক, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তারা দেশটাকে ডোবাল খাইখাই করে আর বেশি খেয়েই। এই দেশটার নাম ভারতবর্ষ বাবু। এখানে যে কত আশ্চর্য সব মানুষ, ভাবনা-চিন্তা আছে, কত সাধু, সন্ত, তান্ত্রিক, সফী, সৈয়দ, পীর আছেন, তার খোঁজ এখন গ্রামের মানুষেরাই রাখে না, তা আপনার মতো শহুরে মানুষের দোষ কি ? এখন টিভি দেখলেই সব জানা যায়। জানার বাকি আর কি থাকে বলুন ? অন্তত আপনারা তাই ভাবেন। বড় অভাগা দেশ তো। হতভাগা মানুষদের দেশ।

বলেই, পা বাড়াবার আগে বললেন, আপনার নাম কি ?

চারণ চ্যাটার্জি।

তারপর চারণ জিগ্যেস করল, আপনার নাম, সাধুজি ?

পূর্বাশ্রমের নাম তো নিজেই প্রায় ভুলে গেছি। আমার নাম ভীমগিরি আর আমার গুরুর নাম ধিয়ানগিরি। উনিই আমার নাম রেখেছেন ভীমগিরি।

ভীমগিরি, কালিকমলি বাবার আশ্রমের দিকে যাবার আগেই চারণ বলল, আপনি রাতে শোবেন কোথায় ?

কেন ? এই চাতালে।

বলেন কি ? এই চাতালে ? এখনই যা ঠাণ্ডা !

হাঃ। গুরুজির সেবা করব ফিরে এসে। তাঁকে গাঁজা সেজে দেব। তারপর ত্রিবেণী ঘাট যখন নিশ্চুপ হয়ে যাবে, গভীর রাতে শুধু নদীর স্রোতের শব্দ আর হাওয়ার শব্দ বাজবে আর ছমছমে

অন্ধকার, তখন মধ্যরাতে গুরুজি গান গাইবেন। আহা কী গান!

শেষ রাতে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠবে আমার গুরুজির গান শোনার জন্যে।

তারপর?

এমন সময়ে একটি মেয়ে সন্ন্যাসীর দিকে ঘাটের দিক থেকে এসে সামনে দাঁড়াল। তার পরনে একটি ছাই-রঙা সিনথেটিক শাড়ি, গায়ে সাদা ব্লাউজ। পিঠের উপরে ছড়ানো বেণীর চুলে নীল-রঙা কোনও ফুল গুঁজেছে। চেহারাটা একটু মোটার দিকেই। সুগন্ধ বেরুচ্ছে তার গা থেকে। যদিও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। নাকের খাড়াই-এর উপরেও ঘামের ছোট ছোট বিন্দুর সারি। নাক চিবুক দেখে মনে হয় কোনও শিল্পী যেন কালো পাথরে ছেনি-বাটালি দিয়ে তাকে গড়েছেন।

হাসি হাসি মুখে সেই কৃষ্ণা মেয়েটি এসে ভীমগিরির কাছে দাঁড়াতেই ভীমগিরি বললেন, কি খবর? মাদ্রী? আসনি কেন দুদিন?

জ্বরে পড়েছিলাম যে!

ভাল আছ তো এখন?

হ্যাঁ। আপনি ভাল আছেন?

আমি তো সব সময়ে ভালই থাকি। শুধু অম্বলই ভোগায়।

মেয়েটি হেসে বলল, এই এক বালাই বটে! ভোগী কী যোগী কারওই রেহাই নেই এর হাত থেকে।

ভীমগিরি হেসে বললেন, যা বলেছ!

মেয়েটি এবং ভীমগিরির কথোপকথন কিন্তু পরিষ্কার বাংলাতেই হচ্ছিল। ভীমগিরিকেও এমন চমৎকার বাংলা বলতে শুনে অবাক হয়ে গেল চারণ।

যাই।

বলল মেয়েটি।

এসো, রোজ এসো। তোমাকে না দেখলে ভজনে মন বসাতে পারি না। গানের সময়ে এসো।

আসব। বলেই, সেই কৃষ্ণা সিঁড়ি বেয়ে নেমে ঘাটের চাতাল পেরিয়ে প্রথমে প্রায়ান্ধকারে তারপর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সম্ভবত পাহাড়ের উপরের কোনও আশ্রমে চলে গেল সে।

মাদ্রী! ভারী সুন্দর নাম তো। কী মানে, কে জানে? মানে কি আছে কোনও? সব নামের তো মানে হয় না! ভাবল চারণ।

ভীমগিরি বললেন, এবারে সত্যি সত্যিই যাই।

চারণ আশ্চর্য এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে চলে-যাওয়া ভীমগিরির দিকে চেয়ে রইল।

অনেক কথা জানবার ছিল চারণের তাঁর কাছে।

এই মেয়েটি কে? ভীমগিরি এবং তাঁর গুরু ধিয়ানগিরির সঙ্গে কি সম্পর্ক তার? বাঙালি তো মেয়েটি বটেই কিন্তু বাড়ি তার কোথায় ছিল? কি করে সে হৃষীকেশে? কিছুই জানা হল না!

বড় ভাল লেগে গেল এই সন্ন্যাসীকে, তার কথাবার্তা এবং সবচেয়ে বড় কথা, তার সম্ভ্রান্ততাকেও।

দেরাদুন থেকে হৃষীকেশে এসে আজ পৌঁছেই এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপিত হওয়াটা ওর কাছে মস্ত বড় এক প্রাপ্তি বলে মনে হল। কোনও ফেরেরবাজ মানুষ, দুনম্বরী সাধুর সঙ্গেও তো দেখা হতে পারত। দুনম্বরী নেতা, দুনম্বরী সাহিত্যিক, হাকিম, উকিলে দেশ ছেয়ে গেছে। এই প্রেক্ষিতে এই একনম্বরী ভীমগিরি-প্রাপ্তি অবশ্যই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আত্মানুসন্ধানে প্রায় নিরুদ্দেশে ঘর-ছাড়া চারণের মনে হচ্ছিল এই 'কাড়োয়া চওথ'-এর সন্ধেতে এই সন্ন্যাসীর দর্শন লাভের ঘটনাটির গূঢ় তাৎপর্য আছে।

হোটেলে পৌঁছে ডাইনিং রুমের দিকেই যাচ্ছিল। তারপর ভাবল, চান করবে। গিজার তো আছেই বাথরুমে।

দুপুরে এসে পৌঁছনো অবধিই দেখছে লিফটটা একটু গোলমাল করে। কারণ, কয়েক বছর আগে

গাড়োয়াল হিমালয়ের ভূমিকম্পতে এই তিনতারা হোটেল বাড়িতেও সামান্য ফাটল ধরেছিল। তাতেই লিফটটার অ্যালাইনমেন্ট নষ্ট হয়ে গেছে। ভূমিকম্পর বাড় হয়েছিল এখান থেকে বহুদূরে যোশীমঠে কিন্তু জের এখানেও পৌঁছেছিল এসে। এখানেও তার আঁচড় লেগেছিল। এখানে ভূমিকম্প হলে কী হতে পারে তা কলকাতাতে বসে অনুমান করাও শক্ত। এই নগাধিরাজের পাদদেশে দাঁড়িয়ে ভূমিকম্পের কথা ভাবলেও বুকে কাঁপুনি ধরে।

ঘরে গিয়ে চারণ ভাল করে চান করল। ভাবল, রুম-সার্ভিসে বলে রাতের খাবার আনিয়ে নেবে ঘরে। চান সারবার পরেই হঠাৎ ওর মনে হল যে, স্মরণেই আসে না সুস্থ অবস্থাতে ও জীবনে একদিনও স্বেচ্ছাতে একবেলাও অভুক্ত থেকেছে বলে।

সন্ন্যাসীর উপোস থাকার কথাটা তার মনে আলোড়ন তুলেছিল। চান সেরে, জামা-কাপড় বদল করে ও শুয়ে পড়ল। বাসে এসেছিল দেরাদুন থেকে। বাসে চড়ারও অভ্যেস চলে গেছে বেশ কয়েক বছর। তবু বাসে আসতে কষ্ট কিছুই হয়নি। বরং নানা মানুষের নানা কথা, কনডাক্টরের রসিকতা, এসব শুনতে শুনতে আসতে ভালই লেগেছিল। তবে দিল্লি থেকে দেরাদুন, মক্কেলের মার্সিডিস গাড়িতে এসেছিল। কয়েক বছর হল এমনই হয়েছে যে, তার জীবনটাই স্বাভাবিক আলো হাওয়ার সঙ্গে যেন সম্পর্ক-বিবর্জিত হয়ে গেছিল। অতটুকু পথ বাসে আসতে বেশ লেগেছিল। হরিদ্বার থেকে গা-জোয়ারি করেই বাসে এসেছিল, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে।

রুম-বেয়ারা এসে খোঁজ নিয়ে গেল, খাবারের অর্ডার দেবে বা দিয়েছে কি না টেলিফোনে, না সেই নিয়ে যাবে ?

চারণ বলল, খাবে না কিছু।

তবিয়ৎ খারাপ হ্যায় ক্যা সাব ?

নেহি। অ্যাইসেহি।

গুডনাইট সাব। বেড-টি কি বারেমে ইন্টারকমমে রুম-সার্ভিসসে বোল দিজিয়ে গা।

বেয়ারা চলে গেলে, ঘরের লাগোয়া বারান্দাতে এসে একবার দাঁড়াল চারণ। তীব্র বেগে বয়ে চলেছে গঙ্গা, হৃষীকেশ এর কাছে একটি ছোট ড্যাম হয়েছে। নদীর উপরে। তারই উজ্জ্বল নীলাভ-সবুজ আলো দেখা যাচ্ছে। ঘাটের দিকে যাওয়ার আগে মন্দাকিনী হোটেলের ম্যানেজার বলছিলেন যে, ওই ড্যামের উপরের রাস্তা পেরিয়েই বাঁদিক দিয়ে নদীর গা-বরাবর এলে রাজাজি ন্যাশনাল পার্ক-এর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অনেকখানি উঠে নীলকণ্ঠদেবের মন্দির। নীলকণ্ঠদেবের মন্দিরে অবশ্য রামঝুলার হ্যাঙ্গিং ব্রিজ-এ গঙ্গা পেরিয়ে পাকদণ্ডী দিয়েও যাওয়া যায়। তবে চার ঘণ্টার পথ। চড়াইও খুব। নির্জন বলে জন্তু-জানোয়ারের ভয়ও আছে।

ও যে মন্দির দেখতে আসেনি। ও যে এসেছে মনকে শান্ত করতে, নিজের মনের মধ্যে যদি কোনও বিশ্বাসের মন্দির অনাবিষ্কৃত থেকে থাকে, তাকেই আবিষ্কার করতে। কিছু স্বার্থহীন মানুষ, কিছু ধান্ধাবিহীন মানুষের সঙ্গে মিশে, সাধারণভাবেই সব মানুষের উপরে যে বিশ্বাস ও প্রায় হারিয়েই ফেলতে বসেছিল, সেই বিশ্বাসকে ফেরাতে পারা যায় কি না, তারই সমীক্ষা করতে বেরিয়েছে যে ও। প্রায় নিরুদ্দেশই হয়ে গেছে বলতে গেলে চারণ। ইচ্ছে করেই থ্রি-টায়ারে এসেছে, নন-এসি। যদি কেউ খোঁজ করতে চায়ও তবে সকলেই বিভিন্ন এয়ারলাইন্স-এর প্যাসেঞ্জার লিস্ট এবং বিভিন্ন ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস এ সি-র প্যাসেঞ্জার লিস্টই চেক করবে। কারও মাথাতেই আসবে না যে, চারণ নন-এসি থ্রি-টায়ার ট্রেনে করে কোথাও যেতে পারে। দাড়ি-গোঁফও কামায়নি। কালই এই হোটেলটা থেকেও চেক-আউট করতে হবে। এখানেই দু-তিন জোড়া সাদা খদ্দরের পাজামা-পাজামা বানিয়ে নেবে। তা নইলে এই ভীমগিরি নামক সন্ন্যাসীদের মতন মানুষদের "সমতলে" নামা অথবা ওঠা হবে না।

কাকে "নামা" বলে আর কাকে "ওঠা" বলে, তা কে জানে। চারণ অন্তত জানে না। ওঁদের সমতলে না পৌঁছুতে পারলে....

হোটেলের তিনতলার বারান্দাতে দাঁড়িয়ে অনতিদূর দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অতি দ্রুত বয়ে-যাওয়া খরস্রোতা গঙ্গার স্রোতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওপারের গভীর জঙ্গল, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে অন্ধকারতর দেখাচ্ছে। ওই জঙ্গলও রাজাজি ন্যাশনাল পার্কেরই অন্তর্ভুক্ত ? চাঁদ সবে উঠেছে, পুবাকাশে। তখনও ছোট। সেই প্রায়ান্ধকারে নদী আর জঙ্গল আর জঙ্গলের পা থেকে উঠে যাওয়া মেঘের শ্রোণিভারের মতন পর্বতশ্রেণী উঠে গেছে পরতের পর পরত। চারদিকে, এই রাতে, বড় রহস্য। পর্বতে কখনই ওঠেনি চারণ আগে। এখন ওঠার সময়ও নয়। আর কিছুদিনের মধ্যেই কেদারনাথ বদ্রীনাথের মন্দির অগম্য হয়ে যাবে। তাছাড়া মন্দিরে যাওয়ার জন্যে কোনও উদগ্র বাসনাও নেই, অগণ্য, অন্ধ-ভক্তি লালন-করা অথবা হুজুগে-মাতা ক্যাপসুল—পূণ্য প্রত্যাশী তীর্থযাত্রীদের মতন। তবে ওর জীবনে কোনও কাজই সময়ে করেনি ও। তাই অসময়েই পর্বতে উঠতে কোনও মানা, নেই মনের দিক দিয়ে। তবে উঠলে, ভ্রমণার্থী হিসেবেই উঠবে। মন্দিরে গির্জাতে মসজিদে তার কোনওই ঔৎসুক্য নেই। প্যারিসে গিয়েও নৎরদামের ভিতরে ঢোকেনি।

চারণ ভাবছিল যে, তার জীবনে এমন মুক্তি এবং আনন্দও কখনওই আগে বোধ করেনি। জীবিকা থেকে মুক্তি, জীবিকার সমস্তরকম যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, মিথ্যা সমাজ, মিথ্যা আত্মীয়তা থেকে মুক্তি, এমনকি নিজেকে অক্টোপাসের মতো বহুবাহু দিয়ে বেঁধে রাখা নিজের বহুরকম নিজস্ব সত্তার আভ্যন্তরীণ বন্ধন থেকেও মুক্তি।

একজন মানুষের মধ্যে যে একাধিক মানুষ বাস করে, এই কথা 'মাধুকরী' নামের একটি বাংলা উপন্যাসে প্রথমবার পড়ে চারণ চমকে উঠেছিল। কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করেনি।

যে কোনও তত্ত্বই জানা এক কথা আর তা জীবনে প্রয়োগ করা অন্য কথা। অধীত আর ফলিত বিদ্যাতে যেমন তফাৎ হয় আর কী ! অধ্যয়ন অনেকই বিষয়ে, অনেকেই করেন কিন্তু সেই অধীত বিদ্যা এবং জ্ঞানকে হৃদয় দিয়ে ছুঁয়ে সেই বিদ্যা এবং জ্ঞানে নিজেকে মঞ্জরিত করে তোলা সম্পূর্ণই অন্য ব্যাপার। ফুলের বাগানে গিয়ে বসে বাগানের শোভা দর্শন করা আর নিজের বুকের মধ্যে সেই ফুল ফোটানো যেমন সম্পূর্ণই ভিন্ন ব্যাপার।

সামনের নদী আর বন আর পাহাড়ের দিকে চেয়ে চারণ ভাবছিল, রাজাজি অভয়ারণ্যে যাবে একবার। সে বন বা বন্যপ্রাণী বিশারদ নয়। হবার কোনও সুযোগ অথবা ঔৎসুক্যও হয়নি। মনের বন ছাড়া অন্য কোনও বনেই ও যায়নি বিশেষ। মনে বিচরণ করলেও, মনের অলিগলির খোঁজ রাখেনি তেমন করে। তাই বনের অলিগলির খোঁজের তো কথাই ওঠে না।

চারণ নাম ভাঁড়িয়ে উঠেছে এই হোটেলে। ও চোর-ডাকাতও নয় বা সাধু-সন্তও নয়। সৌভাগ্যবশত ইদানীংকালের কোনও জননেতা বা চিত্রাভিনেতা বা সাহিত্যিক বা গায়কও নয়। দূরদর্শনের দয়া বা অভিশাপে যাঁদের একে-অন্যের মধ্যে তেমন তফাৎ আর অবশিষ্ট নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, সাধারণের কাছে তার কোনও পরিচিতিই নেই। অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা যেমন নেই কারওই তার সম্বন্ধে, কোনও উচ্ছ্বাসও নেই।

বাঁচা গেছে। কলকাতা থেকে পালিয়ে, জীবিকা থেকে পালিয়ে, নিজের মধ্যের এককালীন প্রিয় অধিকাংশ সত্তা থেকে নিজেকে নিষ্ঠুরভাবে ছিনতাই করে নিয়ে আসতে পেরে সত্যিই বড় আনন্দ বোধ করছে চারণ।

ও ভাবছিল যে, এখানে এসে পৌঁছনো অবধি ও নিজের ভেতরটা ভাবনাতে ভাবনাতে এত ফেনিল করে তুলছে কেন ! তারপরই ব্যাখ্যা হিসেবে নিজেই নিজেকে বলল যে, জীবিকা, জীবন, সংসার, এই সমস্তও যে সততই ফেনিল। নিরন্তর ফেনা আর বুদ্বুদেরই স্বগতোক্তি সেখানে। সমুদ্রের নির্জন বেলাভূমির ফেনারই মতন। জীবিকা, জীবন, সংসার, সমাজের আবর্তে দলিত, পিষ্ট, মথিত যে ফেনা, তা থেকে সরে আসার কারণ বা স্বরূপ ঠিকমতো বোঝাতে গেলেও তো তা এক কথাতে বোঝানো যায় না। নিজেকেই বোঝানো যায় না ! তার, পরকে !

এর মধ্যেই এখানে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। ত্রিবেণী ঘাটে যখন বসে ছিল তখনই সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গে নদীরেখা ধরে হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু হয়েছিল। তিনতলার বারান্দাতে

দাঁড়িয়েও বেশ ঠাণ্ডা লাগছে।

হৃষীকেশে পৌঁছেই মনটা যেন কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে চারণের। একেই কি স্থানমাহাত্ম্য বলে ? নিজেই যেন নিজের আয়না হয়ে গেছে। ও ভাবছিল, যে, মানুষ-মানুষীর বাড়িতে প্রতি ঘরে ঘরে যত অসাবাব থাকে সেই তুলনাতে আয়নার সংখ্যা অতি কম। অথচ আয়নার মতন প্রয়োজনীয় আসবাব মানুষ আর অন্য কিছুই আবিষ্কার করেনি। অন্য সব আসবাবেরই বিকল্প অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু আয়নার কোনও বিকল্প নেই। অন্তত ঘরের মধ্যে নেই। আয়নার সামনে মূর্খ সংসারী মানুষেরা যখন দাঁড়ায়ও তখনও তারা প্রত্যেকেই তাদের বাহ্যিক রূপটিকেই দেখে। শুধুমাত্র শারীরিক রূপই। চোখের কাজল বা সুর্মা, কপালের টিপ, গোঁফের বা জুলপির ছাঁট, ঠোঁটের লিপস্টিক, দাড়ি-কামানো নিখুঁত হল কি না। এই সবই। কিন্তু তাদের মনকে কি দেখে কখনও ? মানুষের মন কি দেখা যায় কোনও আয়নাতেই ? অবশ্য, দেখতে হয়তো কেউ চায়ও না।

এখানে আসার পরে এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেন চারণের বুকের মধ্যে অগণ্য আয়নাগুলো সব নড়েচড়ে বসেছে। আশ্চর্য ! এতগুলো বছর যে ওরা কোথায় ছিল।

অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভেঙে গেল।

যখন নিয়মিত গলফ খেলতে যেত কলকাতার টালিগঞ্জ গলফ ক্লাবে, তখন যেমন ভাঙত।

গত রাতে কিছুই খায়নি বলে শরীরটা খুবই হালকা লাগছিল।

রুম-সার্ভিসে চা আর টোস্ট আনতে বলে দিয়ে, ও মুখ ধুয়ে বারান্দাতে এসে দাঁড়াল। পূবের আকাশ তখনও স্পষ্ট হয়নি। হবে, আধঘণ্টার মধ্যেই।

ত্রিবেণী ঘাট যেন ওকে হাতছানি দিচ্ছিল। কী এক অদৃশ্য টান বোধ করছিল ও। যেন কতদিনের পরিচিত এবং প্রিয় জায়গা।

অনেকগুলি 'হোল' খেলবার পরে টলি-ক্লাবের চারদিক-খোলা খড়ের ঘরে বসে ছুটির দিনে বিয়ার খেতে খেতে আড্ডা মারবার নেশার মতন এক নেশাতে আচ্ছন্ন করেছে যেন তাকে ত্রিবেণী ঘাট। আশ্চর্য কাণ্ড !

চা আসতেই দুটি টোস্ট দিয়ে চা খেয়ে ও তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কেডস-টেডস বা গলফ শু এসব কিছুই তো আনেনি। এ তো আসা নয়, পালানো। পালাবার সময়ে তো সকলেই একবস্ত্রেই বেরিয়ে পড়ে। কাবলি-জুতো পরে তাড়াতাড়ি হাঁটাও যায় না। শালটা গায়ে জড়িয়ে নিল ও। একটা টুপিও কিনতে হবে। এই বয়সেই মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে। বাবারও টাক পড়ে গেছিল পঁয়ত্রিশে। আর সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা লাগে মাথাতেই। আর পায়েও। অথচ কাবলির সঙ্গে মোজা পরলে পা জুতোর মধ্যে ক্রমাগত পিছলে যেতে থাকে, হাঁটা যায় না। তাই পায়েও ঠাণ্ডা লাগছে। ট্রাউজার না পরাতে হাঁটুতেও শীত করছে।

ঘাটে পৌঁছে দেখল, সূর্য তখনও ওঠেনি। কিন্তু সেই চাতালে রাত-কাটানো সব মানুষই প্রায় উঠে পড়েছেন ততক্ষণে। এক-দুজন অবশ্য তখনও ঘুমুচ্ছেন। বোধহয় রাতে দেরিতে শোওয়ার জন্যে অথবা বেশি গঞ্জিকা সেবনের জন্যে। ভীমগিরিকে দেখতে পেল না এদিক-ওদিক তাকিয়ে। তবে তার গুরুকে দেখল। তিনি যোগাসনে, একেবারে স্থির হয়ে চুপ করে বসে ছিলেন। দূর থেকে দেখে মনে হল তাঁর চারপাশের, পৃথিবী যেন মুছে গেছে তাঁর চোখ থেকে। সব কিছুই নড়ছে। কিন্তু তিনি অনড়।

গুরুর সঙ্গে তো চারণের আলাপ হয়নি, নামও জানে না। তাছাড়া কোনও দেব, দ্বিজ এবং গুরুতে তার ভক্তি নেই। তাই সে ঘাটের দিকে নেমে চলল সিঁড়ি বেয়ে। কয়েকটি সিঁড়ি নেমেই মস্ত বাঁধানো চাতালে এসে পড়ল। এত বড় চাতাল যে পাঁচ-ছ হাজার মানুষ আঁটে সেখানে একসঙ্গে। সূর্যদেব সবে উঠছেন পূবের আকাশ লাল করে। বহু মানুষ, নারী পুরুষ, তার মধ্যে সাধুসন্ত যেমন আছেন, গৃহী এবং অন্য পেশারও নানা মানুষ আছেন, যেমন দোকানি, হালুইকর ইত্যাদি, মনে হল চারণের। ওই সকালে সূর্যোদয়ের আগেই ওই ঠাণ্ডা জলে কী করে চান করছেন তাঁরা কে জানে! গলার শালটাকে দিয়ে ভাল করে গলা এবং কান ঢেকে সে নদীর আরও কাছে এগিয়ে গেল এবং চাতালের পরের অগণ্য সিঁড়ি ভেঙে নেমে যেতেই যেন মনে হল ভীমগিরিকে দেখতে পেল। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে পুবে চেয়ে আছেন জোড়-করে দাঁড়িয়ে।

আরও এগিয়ে যেতেই সঠিক ভাবে চিনতে পারল তাঁকে। ভীমগিরিও চিনতে পারলেন চারণকে। তবে কথা বললেন না কোনও। উনি সূর্যমন্ত্র স্তব করতে লাগলেন।

"নমো মিত্রায় ভাবনবে মৃত্যোর্মা পাহি
প্রাজিষ্ণবে বিশ্বহেতবে নমঃ।
সূর্যাদ্ভবন্তি ভূতানি সূর্যেনপালিতানি তু
সূর্যে লগং প্রাপ্নুবন্তি যঃ সূর্যঃ সোহহমেব চ।
চক্ষুর্ণো দেবঃ সবিতা চক্ষুর্ণ উত পর্বতঃ।
চক্ষুর্ধাতা দধাতু নঃ।"

স্তব করেই চলতে লাগলেন ভীমগিরি মহারাজ।

চারণের মনে পড়ে গেল দাদু, মানে ওর মায়ের বাবা এই স্তব করতেন রোজ সূর্যোদয়ের সময়ে। উত্তরপাড়ার মামাবাড়িতে যখনই যেত চারণ ছেলেবেলাতে তখনই দাদু তাঁকে অন্ধকার থাকতে বিছানা ছাড়িয়ে গঙ্গাস্নানে নিয়ে যেতেন। ওই স্তব উনি শিখিয়েও ছিলেন চারণকে। চারণ যখন ক্লাস এইট-এ পড়ে তখন দাদু সজ্ঞানে মারা যান। কে জানে! মৃত্যুর সময়ে তাঁর মুখেও কোনও ভয়ের চিহ্ন ছিল কি না? না কি, সব সময়ে যে গভীর প্রশান্তি তাঁর মুখমণ্ডলে শোভা পেত সেই প্রশান্তি নিয়েই চলে গেছিলেন তিনি যাবার সময়ে?

মৃত্যুর সময়ে যে ভয় ফুটে ওঠে অনেক মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে এই কথাটা তো সন্নিসী ভীমগিরির মুখে না শুনলে তার এমন করে খেয়ালও হত না।

ভীমগিরি দ্বিতীয় শ্লোক শেষ করে তৃতীয় শ্লোকে পৌঁছে গেছিলেন ততক্ষণে। ওই খরস্রোতা জলে ভেসে যাবারই কথা ছিল কিন্তু হালকা-পলকা ভীমগিরি কী করে যে দাঁড়িয়ে ছিলেন কে জানে! তারও বোধহয় কোনও ঐশ্বরিক-ক্রিয়াকাণ্ড থাকবে। চারণ হলে তো নামা মাত্রই ভেসে যেত।

সূর্যমন্ত্রর মানে, তার দাদুই তাকে শিখিয়েছিলেন। এখন একেবারেই ভুলে গেছে। স্তব তো মনে নেই-ই। অথচ ভীমগিরি আবৃত্তি করাতে স্তবের মানে তো অবশ্যই, মন্ত্রও যেন মনে ফিরে এল।

দাদু তাঁর সুললিত ভরাট গলাতে আবৃত্তি করতেন। নৌকো বেয়ে যেত মাঝনদী দিয়ে মাঝিরা। লাল টকটকে থালার মতন সূর্যটা উঠত পুবাকাশে। শিশুকালের সেই স্মৃতির সঙ্গে চারণের সমস্ত ছেলেবেলাটাই যেন উঠে এল। উত্তরপাড়ার মামাবাড়িতে স্কুলের ছুটির সময়ে কাটানো দিনগুলি, দিদিমা, মেজমামীমা, ছোটমামীমা, মামাতো ভাইবোনেরা সবাই...। মস্ত মস্ত নিমগাছ আর বেলগাছ দুটোর কথাও, গঙ্গার ধারের বাগানে।

মামাবাড়ির দ্বারোয়ান রামখেলাওন পাঁড়ে বলত, জানো খোকাবাবু, ওই গাছে ভূত আসসে। শিংওয়ালা ভূত। সন্ধের পরে তাই বেলগাছের দিকে আদৌ যেত না ও। পরে জেনেছিল যে, সন্ধের পরে ওই বেলগাছতলাতেই খাটিয়া পেতে ভাঙ সেবন করত রামখেলাওন, তাই ওই ভূতের পত্তন!

মনে পড়ে গেল চারণের সূর্যমন্ত্রের মানে: "মিত্রকে নমস্কার, ভানুকে নমস্কার; তুমি আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর মার্কণ্ড।

প্রকাশশীল বিশ্বের কারণকে নমস্কার। জীবগণ সূর্য থেকে উৎপন্ন হয়, সূর্যের দ্বারা পালিত হয়, আবার সূর্যেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

যিনি সূর্য, তিনিই আমি।

সবিতা তেজস্বরূপ বলেই তিনি আমাদের চোখ। তিনি কালস্বরূপ বলেও আমাদের চোখ।

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আমাদের চোখ দান করুন।"

দাদু ঠিক এই ভাষাতেই বলতেন কিনা মনে নেই কিন্তু মানেটা প্রথম দুটি স্তবের মোটামুটি ওইরকমই ছিল। সন্নিসী ভীমগিরি প্রথম দুটি স্তব উচ্চারণ করতেই চারণ সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘাটের চাতালে এসে দাঁড়াল। এত মানুষ খালি গায়ে এবং মেয়েরা ভেজা শাড়ি জড়িয়ে চান করছেন তাই নিজে শাল চড়িয়ে জুতো পায়ে তাঁদের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে অস্বস্তি লাগছিল। অসভ্যতার চরম হচ্ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো অন্য শ্লোকগুলি এবং মানেও মনে পড়ে যেত।

চারণ ভাবছিল, সংস্কৃত ভাষাটা, যে-ভাষার সঙ্গে হিন্দুদের যাবতীয় ধর্ম-কর্ম-বিয়ে এবং শ্রাদ্ধ জড়িত, সে ভাষাটাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কেমন নষ্ট হয়ে গেল। এক জগাখিচুড়ি সরকারি হিন্দি এবং তারও পরে আরও জগাখিচুড়ি বলিউড এর হিন্দি এসে সব কিছুকেই গ্রাস করে ফেলল। টোল উঠে গেল, উঠে গেল চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত-চর্চাও উঠে গেল। শিকড়হীন হয়ে গেল একটি জাতি, একটি ধর্ম। অথচ একজনও তার প্রতিবাদ করল না। আশ্চর্য।

ভীমগিরি জল থেকে উঠে এসে বলল আপনি চা খান তো ?

খাই।

ভিজে কাপড়ে ওই কনকনে হাওয়াতে সন্ন্যাসীকে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চারণের শাল গায়ে দিয়েও যেন শীত করতে লাগল।

তবে, চলুন, চা খাই গিয়ে।

ধুতিটা ছাড়বেন না ? মানে, বদলাবেন না ?

আর ধুতি থাকলে তবেই না বদলাব ? শুকিয়ে যাবে রোদ উঠলেই। রোদ তো উঠেই গেছে। বাহুল্যই আসক্তির জন্ম দেয়। দুটো ধুতি থাকলেই চারটের ইচ্ছে জন্মায়।

একই ধুতি পরে থাকলে নোংরা হয়ে গন্ধ হয়ে যাবে যে!

কাল সন্ধের সময়ে তো আমার পাশে অনেকক্ষণ বসেছিলেন। কোনও দুর্গন্ধ কি পেয়েছিলেন ?

না। বরং মিষ্টি মিষ্টি কী এক গন্ধ পেয়েছিলাম। অগুরু-টগুরু মাখেন না কি ?

আমি কিছুই মাখি না। যিনি দেহ দিয়েছেন তিনিই নিজে হাতে মাখিয়ে দেন। অদৃশ্য হাতে।

চারণ জোরে বলে উঠল, বাজে কথা।

ভীমগিরিও জোরে হেসে উঠলেন।

বললেন, আমিও জানি বাজে কথা। কিন্তু বাজে কথাও জোরের সঙ্গে বলতে পারলে কেমন সত্যি কথা বলে মনে হয়। হয় না ?

চারণ বলল, চায়ের পয়সা আমি দেব কিন্তু।

দেবেন। আপনারটা আপনি দেবেন। আমাকে দোকানি সকালের এক ভাঁড় চা বিনি পয়সাতেই খাওয়ায়। আমি খেয়ে, গুরুর জন্যে নিয়ে যাব। তাঁরটারও পয়সা নেয় না।

কেন ?

গুরুর কাছে কত ভক্ত আসে। দিশি বিদেশি। তারা কত কিছু খায় এই সব দোকান থেকে কিনে। জানি না, সে জন্যেও দিতে পারে আবার ভালবেসে বা ভক্তিতেও দিতে পারে। কেউ কোনও ভাল কাজ করলে, বা কোনও দান দিলে সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভাল কাজের বা দানের পেছনের উদ্দেশ্য খুঁজতে যাওয়াটা সংসারীদের ধর্ম। আমরা যা পাচ্ছি, তাতেই খুশি। ভগবানের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। দানকে দানের মহিমামণ্ডিত করেই আমরা দেখি। দাতা কেন দান করলেন সে সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করতে বসে নিজেদের মনকে আমরা আবিল করি না। মন যদি আবিল হয়, তবে ঈশ্বর-চিন্তা করব কী করে!

চারণ ছেলেমানুষের মতন বলল, জানেন, কাল রাতে আমি উপোস ছিলাম।

ভীমগিরি হালুইকরের দোকানের সামনে চায়ের অপেক্ষাতে দাঁড়িয়ে হো হো করে জোরে হেসে উঠলেন।

চারণের খুব ভাল লাগল হাসিটা। এর আগেও লেগেছিল। একেই বোধহয় বলে প্রাণখোলা হাসি। এমন হাসি আজকাল শোনা যায় না বেশি।

হাসি থামলে ভীমগিরি বললেন, তাহলে তো হাফ-সন্ন্যাসী হয়েই গেছেন।

চারণ লজ্জা পেল।

বলল, আমি তো সন্ন্যাসী হতে আসিনি এখানে।

কী করতে এসেছেন তা আমি জানি। আমার গুরুও জানেন।

গুরু ? গুরু কি করে জানলেন ?

তা তো বলতে পারব না। কাল রাতে আমি যখন কালিকমলি বাবার আশ্রম থেকে খেয়েদেয়ে নেমে এলাম চাতালে, গুরু আপনার কথা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে জিগ্যেস করলেন আমাকে।

চারণ আরও অবাক হল।

বলল, আমার কথা ? কেন ?

কেন, তা কী করে বলব ! কত মানুষই তো রোজই এখানে আসেন সারা দেশ থেকে, বিদেশ থেকে, আমার সঙ্গে, এখানের অগণ্য সব সন্নিসীদের সঙ্গে কথা বলেন, চাতালে দিনের পর দিন বসে থাকেন, মোটা টাকা খরচ করে ভোগ দেন, কাঙালি ভোজন করান, কম্বল বিতরণ করেন, কত ভারী ভারী শেঠ, দিল্লি বম্বে কলকাতার ! কই, গুরু তো তাঁদের সম্বন্ধে কিছুই জিগ্যেস করেন না ?

চারণ বলেন, গুরু কি জিগ্যেস করলেন ?

তা নাই বা শুনলেন। নিজেকে একটু কম ভালবাসাই ভাল। নিজের সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য যত কমবে, আর পরের সম্পর্কে বাড়বে, ততই আমাদের চোখে পৃথিবী সুন্দরতর হবে।

চারণ লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল।

কাল রাতের আলো-আঁধারিতে লক্ষ করেনি, আজ সকালের আলোতে দেখল ভীমগিরি মানুষটি অবয়বে অতি সাধারণ, কৃশ, গড়পড়তা ভারতীয়র মতন হলেও তাঁর চোখ দুটি অসাধারণ। একবার করবেট পার্কে একেবারে কাছ থেকে বাঘ দেখেছিল চারণ। বাঘের চোখের মতনই চোখ ভীমগিরির। অথচ ভয় করে না তাকালে। শুধু মনে হয় যে, বুকের ভিতরের সব কিছু অব্যক্ত গোপন কথা বুঝি জেনে নিলেন, কোনও আড়ালই বুঝি আর রইল না।

ভীমগিরি বললেন, গুরু বললেন, আপনার আধার ভাল।

আধার মানে ?

আধার মানে জানেন না ?

নাঃ।

তবে জানবেন। সময়ে জানবেন।

ও মনে মনে বলল, "আমার আঁধার ভাল"।

চারণ, পোড়া মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ ভরা ভাঁড়ে গরম ধোঁয়া-ওঠা বেশি দুধ আর বেশি চিনি দেওয়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভাবল, ওরা গুরু-শিষ্যে মিলে বোধহয় তাকে ফাঁসাবার মতলবে আছে। বাঁ হাতের কব্জিতে বাঁধা রোলেক্স ঘড়িটা বোধহয় চিনতে পেরেছে সাতঘাটের জল-খাওয়া গুরু। 'পার্টি' যে 'মালদার' তা বুঝেই সম্ভবত এই হরকৎ।

সন্ন্যাসী চায়ে চুমুক দিয়েই বললেন, যা ভাবছেন, তা নয় চারণবাবু।

চমকে উঠল চারণ। একটু চা চলকে গেল, পড়ল পায়ের কাছে। বলল, কী ভাবছি ?

যা ভাবছেন।

আমার গুরু, আপনার আধারকে যতখানি ভাল বলে মনে করেছেন, ততখানি ভাল বোধহয় নয় এ আধার।

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

চা খাওয়া শেষ করেই ভীমগিরি বললেন, চলি। পরে দেখা হবে।

কোথায় চললেন ?

তার গলার স্বরে এমন ভাব ফুটে উঠল যে, চারণের নিজের কানেই তা শোনাল অসহায়তার মতন। যেন, এই ভীমগিরি সন্নিসীর ভরসাতেই ও হৃষীকেশে এসেছিল!

নিজেকে বকল, মনে মনে।

তা জেনে কি লাভ ? সন্ন্যাসীরা কোথা থেকে আসেন আর কোথায় যান তা জানতে চাইতে নেই। যদি পারেন এবং মন করে, তবে সন্ধেবেলাতে আসবেন। থাকব আমি ঘাটে।

চারণের সকালটা যেন হঠাৎই ফাঁকা হয়ে গেল। রোদটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একদিনের মধ্যেই এই ভীমগিরি সন্ন্যাসীর উপরে যেন ও বড় বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

খারাপ। খুবই খারাপ।

বকল আবারও নিজেকে।

ভীমগিরি বললেন, কেউ কারও নয় এ সংসারে চারণবাবু। আমিও আপনার নই, আপনিও আমার নন। যান না কুঞ্জাপুরী থেকে ঘুরে আসুন।

কুঞ্জাপুরী! সেটা কোথায় ?

গাড়োয়ালের রাজধানী ছিল নরেন্দ্রনগরে। সেই নরেন্দ্রনগর হয়ে যেতে হয়। বাসে গেলে কুঞ্জাপুরীর পায়ের কাছে নেমে, হেঁটে উঠতে পারেন উঁচু পাহাড়ে। তবে অনেক চড়াই। তারপর আবার মন্দিরে উঠতে প্রায় তিনশ সিঁড়ি চড়তে হবে।

প্রায় তিনশ ? বলেন কি ?

হ্যাঁ। কষ্ট না করলে কি সুন্দরের দেখা মেলে ? যা কিছুই সুন্দর ? তবে আপনার পক্ষে গাড়িতে যাওয়াই সুবিধের হবে। খুব ভাল লাগবে। খুব কম মানুষই জানেন কুঞ্জাপুরীর কথা অথবা যান কুঞ্জাপুরীতে। হয়তো কষ্টের জন্যেই যান না। একেবারে ভিড় নেই। মন প্রসন্ন হয়ে যাবে। যান, ঘুরে আসুন।

বলেই সন্ন্যাসী তাঁর গুরুর জন্যে এক ভাঁড় চা নিয়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ বোবার মতন দাঁড়িয়ে থেকে চারণ হৃষীকেশের বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চলল।

দোকানপাট এখনও খোলেনি সব। শুধু হালুইকরের দোকান আর ফুল ধূপকাঠির দোকানগুলি খুলেছে।

বড় রাস্তায় পড়ে চারণ ঠিক করল যে আজ কুঞ্জাপুরী না কোন জায়গার কথা বললেন ভীমগিরি, সেখানে যাবে না। তা ছাড়া, মন্দির-টন্দিরে তার কোনও ইন্টারেস্টও নেই। দেখা যাবে পরে। তা ছাড়া, গাড়িতে যেতে হলেও হোটেলে ফিরে গিয়ে কোনও ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির গাড়ি ভাড়া করতে হবে। নইলে গলা কাটবে। হিন্দুদের সব ধর্মস্থানেই নির্লোভ সাধুসন্ত যেমন থাকেন, 'ভেক' ধরা সাধুও থাকেন অনেক। আর থাকে তীর্থযাত্রীদের, পুণ্য-প্রত্যাশীদের গলা কাটার জন্যে ছুরি-শানিয়ে বসে-থাকা বিভিন্ন ধরনের বানিয়ারাও। আনজান-গাড়ি ভাড়া করলে তারা এখানকার সব ব্যাপার সম্বন্ধেই-অজ্ঞ চারণের গলা কাটবেই। ও যখন পুণ্য-প্রত্যাশী নয়, তখন তাড়াটাই বা কিসের।

বড় রাস্তাতে পড়ে ভাবল, যে পথ দিয়ে কাতারে কাতারে বাস ও গাড়ি চলেছে কেদারনাথ বদ্রীনাথের পথে সেই পথে কিছুটা হেঁটে এগোয়। জায়গাটাকে পায়ে হেঁটে ঘুরেফিরে না দেখলে হবে না। পায়ে হেঁটে ঘোরাটা খুবই জরুরি যে-কোনও জায়গাতেই। পায়ে হেঁটে না ঘুরলে, যাকে বলে, "To have a feel of the place" তা কখনওই হয় না।

এক কিমি মতো এগিয়েই লক্ষ করল বাঁদিকে একটা সরু পথ বেরিয়ে গেছে এবং সেই পথের মোড়ে বেশ বড় একটা জটলা। তাতে সন্ন্যাসীর পোশাকে অনেকে আছেন আবার সাধারণ পোশাকেও অনেকে। কিন্তু একজনও মহিলা দেখল না সেই জটলাতে। সমবেত জনমণ্ডলীর কারও মুখে কোনও কথাও নেই কিন্তু সকলেই বাঁদিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে।

হাঁটতে হাঁটতে সেখানে পৌঁছে চারণও দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, বাঁদিকের গলির মোড়ে একটি পাঁচিলঘেরা বাড়ি। দেওয়ালে উত্তরপ্রদেশ সরকারের অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ডারি দপ্তরের বোর্ড টাঙানো। দপ্তরটা একতলা। তার সামনে অনেকখানি খোলা চত্বর। সেটি দেখা যাচ্ছে, মস্ত বড় এবং গরাদওয়ালা লোহার ফটকের মধ্যে দিয়ে। সেই চত্বরের মধ্যে একটি জবরদস্ত ষাঁড়কে দিয়ে গরুদের রমণ করানো হচ্ছে এবং এই ধর্মস্থানের বিভিন্ন বয়সী অগণ্য পুরুষ সাতসকালে পরম আগ্রহ নিয়ে আগাপাশতলা আহ্লাদের সঙ্গে সেই প্রক্রিয়া দেখছেন। সমবেত পুরুষদের প্রত্যেকেরই চোখ-মুখেই যেরকম গভীর পরিতৃপ্তি ফুটে উঠেছে, বারংবার-রমিত গরুটির চোখেও বোধহয় ততখানি তৃপ্তি ফুটে ওঠেনি।

হাসি পেল চারণের।

মীর বলেছিলেন, "এখানে মানুষের চেহারার জীব অনেকই আছে, কিন্তু মানুষ অত্যন্ত কম।" "ইঁয়া সুরত্-এ আদম বহত হ্যায়, আদম্ নেহি হ্যায়।"

চারণের মনে হল, মানুষের মতন চেহারার মধ্যে জানোয়ারের সংখ্যা খুবই বেশি। মানুষের মনুষ্যত্বে পৌঁছনোর পথে জানোয়ার পথ আগলে আছে। এবং হয়তো থাকবে আরও বহুকাল।

ব্যাপারটা হাসিরই।

বৈরাগ্যর জায়গাতে এত অতৃপ্তি, এত খিদে? ষাঁড়ের রমণসুখেই এত আনন্দ! এ যেন ভক্তিরসেও হবার নয়। ভোগের নিবৃত্তি না হলে যে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না এ কথা বহু মানুষের কাছে শুনেছে ও পড়েছে চারণ। হওয়া যে যায় না, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেল এইমাত্র। উত্তরপ্রদেশ সরকারকেও বাহাদুরি দিতে হয়। লোহার গেটটা তো চট বা কোনও ধরনের চাটাই বা অন্য কিছু দিয়ে ঢেকেও দেওয়া যেত! পুরো জায়গাটাই দেওয়াল তোলা কিন্তু প্রকাণ্ড ফটকেই কোনও আড়াল নেই।

বহুদিন হল হাঁটাচলার অভ্যেস চলে গেছে। তাও পায়ে আবার কাবলি জুতো। কষ্ট হচ্ছে চলতে। আরও অনেকটা গিয়ে যেখানে পথটা পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছে সেখানে একটি ছোট্ট চায়ের দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চে ও বসে পড়ল।

নিজে একেবারে স্থির এবং গতিরহিত হয়ে সামনে দিয়ে চলমান, বহমান জনস্রোতের দিকে চেয়ে থাকতে ভারী ভাল লাগে। Introspection এর জন্য যে নির্জনেই যেতে হবে এমন মানে নেই। প্রচণ্ড কলরোলের মধ্যে, অগণ্য মানুষের মধ্যে থেকেও নিজের অন্তরে নির্জনতা নিয়ে আসাও সম্ভবত ভগীরথের গঙ্গা আনার মতনই কঠিন কাজ। চারণ পারে না তা করতে কিন্তু শিশুকাল থেকেই চেষ্টা করে। এই চেষ্টা করার মধ্যে দিয়েও বুঝতে পারে, পারত সব সময়েই যে, আর দশ জন মানুষের সঙ্গে তার তফাত আছে।

ভাবছিল ও, তেমনটিই তো হবার কথা ছিল। শরীরে এবং মননে সব জন্তুই একরকম। শুধু মানুষই আলাদা। প্রত্যেক মানুষই। এইটেই তো একমাত্র অহংকার হওয়া উচিত প্রত্যেক মানুষেরই। তার স্বাতন্ত্র্যর অহংকার।

দোকানঘর ঠিক নয়। একটি খুপরি মতন। কেটলিতে দুধ সেদ্ধ হচ্ছে। বয়ামে কিছু সস্তা বিস্কিট ও সন্দেশ। বিড়ি, সিগারেট, দেশলাই। এক গাড়োয়ালি বুড়ো দোকানি। মূল পথ থেকে দোকানটির সামনে দিয়ে ডানদিকে, একটি কাঁচা পথ চলে গেছে নদীর দিকে। বাঁদিক থেকে একটা চওড়া জলহীন নদী এসে মিশেছে গঙ্গাতে। কিছুক্ষণ পর পরই যাত্রীবোঝাই এক-একটি বাস ডানদিকে চলে যাচ্ছে এ পথ বেয়ে নদীর দিকে। এখানে ঘাট নেই কিন্তু নদীর গভীরতা কম। আর বিস্তৃতি বেশি। পুরুষ ও মহিলা যাত্রীরা বাস থেকে নেমে চান সেরে নিচ্ছেন। বাসের পাশেই Instant ঘাট। অধিকাংশ বাসই দেখল, বাঙালিতে বোঝাই। বাঙালিকে "ঘরকুনো" যাঁরা বলেন তাঁরা কোনও খোঁজই রাখেন না।

কোনও কোনও বাস কোনও ভ্রমণ সংস্থার। কোনও বাস বা উত্তরপাড়া, বালি, শ্রীরামপুর, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, বর্ধমান ইত্যাদি জায়গার কোনও ক্লাবের যাত্রীদের নিয়ে এসেছে। কোনও বাসে

বা একটি বৃহৎ পরিবারের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। যৌথ পরিবারের চলমান বিজ্ঞাপন। বাসের গায়ে রঙিন সিল্কের ব্যানারে ক্লাবের নাম লেখা। অধিকাংশই যাচ্ছে কেদার-বদ্রী।

ইংরেজিতে যাকে বলে Cooling off one's heels তাই করছিল চারণ, বেঞ্চে বসে বসে দোকানির সঙ্গে গল্প করতে করতে।

তার কাছ থেকে এক প্যাকেট বিড়ি দেশলাই কিনে নিতেই সে দোকানির খদ্দের হয়ে গেল। সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। সে আর অনাহুত রইল না। তারপর চা-ও চাইল এক কাপ। দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

কথায় বলে, "নাই কাজ তো খই ভাজ", চারণ বলল নিজেকে, নাই কাজ তো বিড়ি ফোঁক। বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ভীমগিরির কথা মনে হল ওর। চার বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে নিল সন্ন্যাসীর জন্য।

সেই দোকানে বসে বেশ অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল। চারণ লক্ষ্য করল যে অটোগুলোকে এই সমতলের শেষ অবধিই আসতে দেওয়া হয়, পাহাড়ে চড়তে দেওয়া হয় না।

এই হৃষীকেশে, হয়তো এই সমুদয় অঞ্চলেই যেখানেই সমতল, সেখানেই এই অটোরাই অশান্তির বাহন। যেমন এদের বিকট আওয়াজ, তেমনই কালো ধোঁয়ার ছিরি! সমস্ত পরিবেশ এরা সব চেয়ে বেশি দূষিতও করে। অবশ্য পেট্রলের ধোঁয়াই সব চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। কিন্তু যেহেতু চোখে দেখা যায় না সেই হেতু তারা কারওই তাৎক্ষণিক বিরক্তি উৎপাদন করে না।

দোকান ছেড়ে এসে চলতে লাগল ওই পথ ধরে উপরের দিকে। ডানদিকে অনেক পেছনে পড়ে রইল গঙ্গার উপরে লছমনঝুলা এবং রামঝুলা। পথের এই জায়গাটুকুতে পায়ে চলাও খুব বিপজ্জনক। কারণ, রাস্তা খুবই সরু এবং দুপাশ দিয়ে অতি দ্রুতগতিতে নানারকম যানবাহন যাতায়াত করে। যে-কোনও মুহূর্তেই গাড়ি-চাপা পড়া এখানে মোটেই আশ্চর্য নয়।

তবে, সেই সরু পথ, বেশি দূর অবধি সরু নয়। আরও বেশ কিছুটা ওঠার পরেই রাস্তা ধীরে ধীরে চওড়া হয়ে এল এবং বাঁদিকে একটি পথ বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গিয়ে দেরাদুনের রাস্তাতে গিয়ে মিশেছে। এখানের পথের ম্যাপে দেখেছিল চারণ যে, দেরাদুনের পথে "দইঅলা" নামে একটি জায়গা পড়ে। পথটি ভারী সুন্দর। সে পথেও অনেক আশ্রম আছে এবং দু-একটি হোটেলও আছে।

চলতে চলতে আধ ঘণ্টার মধ্যে চারণ যেন অন্য এক জগতে পৌঁছে গেল। বাঁদিকে খাড়া পাহাড়ের গা, তার উপরে বাড়িঘর, ফুলের বাগান, টেরাসিং-করা ক্ষেত, তাতে ফসল লেগেছে। আর ডানদিকে খাদ নেমে গেছে খাড়া। সেই খাদ দিয়ে তীব্র বেগে উপলখণ্ড ঘূর্ণন-চূর্ণন করে জলকণা উৎসারিত করে গঙ্গা বয়ে চলেছে হৃষীকেশ-হরিদ্বার হয়ে। আরও অনেক নীচে নেমে গেলে চুনার, বিন্ধ্যাচল, একপাশে এলাহাবাদ অন্য পাশে কাশী তারও পর অনেক জনপদ পেরিয়ে সেই ডায়মন্ডহারবারে গিয়ে মিশেছে সমুদ্রের সঙ্গে। মোহানাতে। অবশ্য তারও আগে পথে তার সঙ্গে আরও অনেকেই নদীর ভাব হয়েছে, মিলন হয়েছে, ঝগড়া হয়েছে।

যে-কোনও নদী যখন সমুদ্রে পড়ে, তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তার অস্তিত্ব বুঝি লীন হয়ে গেল। নদীর সাগরে লীন হওয়ার প্রসঙ্গে চারণের রবীন্দ্রনাথের কিছু কথা মনে পড়ে গেল। 'নদী যেখানে থামে সেখানে একটি সমুদ্র আছে বলেই থামে। তাই থেমে, তার কোনও ক্ষতি নেই। বস্তুত এ কেবল একদিক দিয়ে থামা, অন্যদিক থেকে থামা নয়। মানুষের জীবনের মধ্যেও এইরকম অনেক থামা আছে। ...কোনও একটা জায়গায় যে পূর্ণতা আছে, এ কথা মানুষ যখন অস্বীকার করে তখন চলাটাকেই একমাত্র গৌরবের জিনিস বলে মনে করে। ভোগ বা দান যে জানে না, সঞ্চয়কেই সে একান্ত করে জানে।

জীবনকে যারা এইরকম কৃপণের মতন দেখে, তারা কোথাও কোনও মতেই থামতে চায় না, তারা কেবলই বলে, চলো চলো চলো। থামার দ্বারা তাদের চলা সম্পূর্ণ ও গভীর হয়ে ওঠে না ; তারা চাবুক এবং লাগামকেই স্বীকার করে, বৃহৎ এবং সুন্দর শেষকে তারা মানে না।...

আমাদের দেশ অবসানকে স্বীকার করে, এই জন্য তার মধ্যে অগৌরব দেখতে পায় না। এই

জন্য ত্যাগ করা তার পক্ষে ভঙ্গ দেওয়া নয়। কেন না সেই ত্যাগ বলতে তো রিক্ততা বোঝায় না। পাকা ফলের ডাল ছেড়ে মাটিতে পড়াকে তো ব্যর্থতা বলতে পারি না। মাটিতে তার চেষ্টার আকার এবং ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়। সেখানে সে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে পলায়ন করে না। সেখানে বৃহত্তর জন্মের উদ্যোগপর্ব, সেখানে অজ্ঞাতবাসের পালা। সেখানে বাহির হতে ভিতরে প্রবেশ।'

নিজেই অবাক হয়ে গেল চারণ এতখানি গদ্য নির্ভুল ভাবে মনে রেখেছে বলে!

সত্যি! কত বছর পরে! যেন কমপুটারের চাবি টিপল আর শব্দমঞ্জরী ফুটে উঠল চোখের সামনে। গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের মতন।

ভাবছিল। দাদু আরও কিছু দিন বেঁচে থাকলে আরও কত কী জানতে পারত, শিখতে পারত তাঁর কাছ থেকে! একদিকে যেমন সূর্যস্তব শেখাতেন অন্যদিকে তেমনই শেখাতেন আরও কত কিছু। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালা তাঁর মাথার কাছে থাকত, গীতা এবং বাইবেল-এর সঙ্গে। মাঝে মাঝেই দাদু বলতেন : রবীন্দ্রনাথ ভাল করে না পড়লে, তোর বাঙালিয়ানা এবং হয়তো ভারতীয়ত্বও সম্পূর্ণতা পাবে না। বুঝেছিস। ভাল করে পড়বি।

কিন্তু তেমন করে পড়া আর হল কোথায়!

ইতিমধ্যেই ও বেশ হাঁফিয়ে পড়েছিল। খাড়া চড়াই। পথের পাশে ডানদিকে একটি বড় গাছতলার নীচের মস্ত পাথরের উপরে বসে সে নদীর দিকে চেয়ে রইল। যেন সেই প্রথমবার বুঝতে পারল ও, কেন সারা ভারতের অগণ্য মননশীল মানুষ, মুক্তিকামী মানুষ, নির্জনতাপ্রিয় মানুষ এই সব অঞ্চলে এসে থিতু হয়ে যান। পুরো জীবন কাটান। এত শান্তি, এত নিস্তব্ধতা, প্রকৃতির এমন ভয়াবহ অথচ গভীর সৌন্দর্যময় রূপ, Introspection এর এইরকম স্থান হয়তো সত্যিই কম আছে।

আজ সকালের সুন্দর হু-হু করা ঠাণ্ডা নিষ্কলুষ হাওয়ায় দাঁড়িয়ে দুনাকে জোরে প্রশ্বাস নিয়ে চারণের মনে হল যেন কলকাতা শহরবাসী তার, বুকের সমস্ত কলুষই শুধু নয়, তার মনেও যে সব অদৃশ্য সব কলুষ ছিল, সে সব কলুষও যেন দূরীভূত হয়ে তার সমস্ত শরীর মনকে পুণ্য করল।

চারণ অনেকক্ষণ সেই পাথরে বসে নীচে গভীর খাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে-যাওয়া নদী, ওপারের খাড়া পাহাড়ের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল। ও পাশের পর্বতের গায়ে বিশেষ গাছপালা দেখল না। তবে একেবারে রুক্ষ নয়। সবুজাভা আছে। তৃণগুল্ম আছে বহুরকম। তবে বড় গাছ নেই বিশেষ। খাড়া নেমেছে পর্বত। কতখানি খাড়া তা নিজের চোখে না দেখলে উপলব্ধি করা অসম্ভব। পর্বতের পর পর্বত, গায়ে গায়ে লেগে মৌন উর্ধ্ববাহু সন্নিসীদের মতন দাঁড়িয়ে আছে কতকাল ধরে। ভাবলেও শিহরণ জাগে মনে।

এদিকে গাছপালা আছে ওদিকে কেন নেই ভেবে পেল না। অবশ্য খাদ এমনই খাড়া নেমেছে যে, গাছপালারও পা রাখার জায়গা নেই। নদীর দিকে চেয়ে ছিল চারণ, হু-হু হাওয়ার মধ্যে বসে, এমন সময়ে অল্পবয়সী একটি স্থানীয় ছেলে উপর থেকে নেমে এল নিজের মনে গান গাইতে গাইতে। তার বাঁ হাতে একটা দড়ি। দড়ির অপর প্রান্ত একটা ধবধবে সাদা ছাগলের গলাতে বাঁধা। আর ডান হাতে একটা হ্যাজাক। ছেলেটি চারণকে সেখানে কবির মতন বসে থাকতে দেখে হেসে বলল, কী বাবু, আত্মহত্যা করবে না কি?

সেই আচমকা-করা উদ্ভট প্রশ্নে চমকে উঠল ও। তারপরই হেসে ফেলে বলল, কেন?'আমাদের কলকাতাতে কি বহুতল বাড়ি কম আছে? নাকি সেখানে গঙ্গা নেই? আত্মহত্যা করতে সেখান থেকে এত পয়সা খরচ করে কেউ কি হৃষীকেশে আসে?

তা জানি না। তবে যদি কখনও আত্মহত্যা করতে মন চায় তো আমাকে বোলো, এর চেয়ে আরও ভাল জায়গাতে নিয়ে যাব। আরও উঁচু জায়গাতে। দেবপ্রয়াগে গেছ?

না।

তারপর হেসে বলল, সুক্রিয়াৎ।

তারপর বলল, তুমি তো বেশ রসিক দেখছি। তোমার নাম কি?

বুদ্ধু সিং।

তোমার মা-বাবার কি আক্কেল বলে কিছুই নেই ? এমন বুদ্ধিমানের নাম বুদ্ধু ?

বুদ্ধু সিং হেসে বলল, তোমার চেয়ে তাঁদের আক্কেল বেশিই আছে। আমার দাদার নাম রেখেছিল মা-বাবা বুদ্ধিরাম। সে ফৌজ-এ নাম লেখাবার বাহানা করে দেরাদুনে গিয়ে একটা মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করে মাটন-রোল-এর দোকান দিয়ে মোটা কামাচ্ছে। মোটরবাইক কিনেছে। আর বুড়ো মা-বাবা ক্ষেতি করে মরছে। এ দুনিয়াতে বুদ্ধি যারই আছে সেই নিজের ফায়দা ওঠাতে সেই বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। তাই মা-বাবা বলেন, বুদ্ধিরাম আমাদের হাঁদা বানিয়েছে, আমাদের বুদ্ধুই ভাল।

তুমি চললে কোথায় ?

কোথায় আবার ? হৃষীকেশে।

বুদ্ধু সিং বলল।

কেন ?

আলোটা খারাপ হয়ে গেছে। মেরামত করতে হবে। আর বকরীটার গতি করতে হবে।

কি গতি ?

সদগতি।

এখানে তো কেউ মাংস খায় না।

চারণ বলল।

বুদ্ধু সিং বলল, তোমরা বুঝি ছাগলের মাংস খাও ? নাম আমার বুদ্ধু আর তোমার কাম বুদ্ধু।

তারপর বলল, দেখছ না, ওর পেট ফুলেছে। বিয়োবে ও। আমার মাসী ওকে চেয়েছে, মানে, ওর বাচ্চাদের। তাই বাচ্চাদের অগলা-পত্তা যেখানে হবে, সেখানেই তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাচ্চাগুলো একটু বড় হলে ওকে আবার নিয়ে আসব ফেরত।

ছেলেটাকে ভারী ভাল লেগে গেল চারণের। বলল, থাকো কোথায় তুমি বুদ্ধু সিং ?

ওই তো।

বলেই, বুদ্ধু সিং ঘুরে দাঁড়িয়ে হ্যাজাক শুদ্ধু ডান হাতটা উপরের দিকে তুলে দেখাল।

চারণ দেখল, সত্যিই তো ! ওই খাড়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে খাঁজ কেটে ক্ষেত, উঠোন, ঘর, সবই করা হয়েছে। ফুলকপি লাগানো হয়েছে। তার পাতা ছেড়েছে কচি কলাপাতা সবুজের মধ্যে একটু সাদাটে সাদাটে রং-এর। লাল আর হলুদ ঘাগরা পরে একজন বয়স্কা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোমরের উপরে দুহাত রেখে।

বুদ্ধু সিং বলল, ওই দেখো। আমার পেয়ারী।

তোমার পেয়ারী ?

জী বাবু। আমার মা। মা ছাড়া বুদ্ধু সিং-এর সঙ্গে আর কে পেয়ার করবে বল ? পেয়ার দুলহার যাই বল, সবই মা।

আর বাবা ?

সে পেছনের উঠোনে বসে হুঁকো খাচ্ছে বাঁ পায়ের উপরে ডান পা তুলে মাথাতে টুপি চড়িয়ে, খাটিয়াতে বসে। বাবা আমার বড় কুঁড়ে। সবই করে মা।

হবে না কেন ? বুদ্ধু সিং-এর মতো ভাল ছেলে যার আছে, সে কাজ করতে যাবে কোন দুঃখে।

বুদ্ধু সিং হাসল। এক মুখ। খুশি হল খুব।

চারণ ভাবল, কত সহজে খুশি হল বুদ্ধু সিং।

চারণ শিলাসন থেকে উঠে পড়ে তার সঙ্গে নীচে নেমে চলল কথা বলতে বলতে।

পথের দুপাশে ঘন একরকমের ঝোপ, তাতে বিভিন্ন-রঙা ফুল ফুটেছে। কমলা, নীলচে, বেগুনি, লাল, গাঢ় লাল, নীল এমনকি সাদাও।

চারণ জিজ্ঞেস করল, এই ফুলগুলোর নাম কি ?

বুদ্ধু সিং বলল, লালটায়েন।

চারণের মনে হল, এইগুলোই ল্যানটানা। যে সব ঝোপের বর্ণনা সে জিম করবেটের বিভিন্ন লেখায় পড়েছে। জিম করবেট তো এই গাড়োয়াল এবং কুমায়ুঁ হিমালয়েই তাঁর কুখ্যাত মানুষখেকো বাঘ এবং চিতা শিকারের বিখ্যাত সব কাহিনী লিখে গেছেন।

ভাবছিল, এই পথেই তো যেতে হয় রুদ্রপ্রয়াগ। রুদ্রপ্রয়াগের কুখ্যাত মানুষখেকো চিতাবাঘের কাহিনী চারণ স্কুলে থাকতেই পড়েছিল। এখনও পড়ে মাঝে মাঝে, রাতে ঘুম না এলে। সে কথা মনে হতেই আরও অনেক ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল এবং ওর খুব ভাল লাগল এ কথা ভেবে যে, সেই সব অঞ্চলেই সে পা রেখেছে। এ তো আর তীর্থযাত্রা নয়। সে কোনও মন্দিরে ঢোকেনি কোনও দিনও। ঢুকবেও না হয়তো। কিন্তু এই পথই তার তীর্থ। দেশের মানুষই তার কাছে মন্দিরের মতো। তাদের প্রত্যেকের কাছেই কত কি জানার আছে, শেখার আছে।

বুদ্ধু সিং যেন কেমন ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে উতরাই নামছিল বড় বড় পা ফেলে। তার সঙ্গে তাল রাখা দুষ্কর হচ্ছিল চারণের।

চারণ বলল, এমন করে হাঁটছ কেন ?

কেন ? উতরাই তো এমন করেই নামতে হয়। কথাতেই বলে, "চড়াইমে বুঢঢা ঔর উতরাইমে জওয়ান।"

কি বললে ?

চারণ উৎসুক গলাতে আবার জিগ্যেস করল।

বুদ্ধু সিং বলল, চড়াইমে বুঢঢা ঔর উতরাইমে জওয়ান।

বাঃ।

স্বগতোক্তি করল ও।

বুদ্ধু সিং-এর সঙ্গে গল্প করতে করতে চারণ নেমে এল সমতলে। যেখান থেকে সেই কাঁচা রাস্তাটা বাঁদিকে চলে গেছে নদী অবধি। এবং সেই অবধি গিয়েই তার পায়ে যথেষ্ট ব্যথা বোধ করতে লাগল। চড়াই উতরাই এবং প্রায় সাত-আট কিলোমিটার, হোটেল থেকে বেরোনোর পর হাঁটাহাঁটি হয়েছে কম করেও। রামঝুলা, লছমনঝুলা সব পেরিয়েই তো এসেছে। বুদ্ধু সিং-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অপেক্ষমাণ একটি অটোতে উঠে বসল হোটেলের দিকে যাবে বলে।

বুদ্ধু সিং বলল, ফিন মিলেঙ্গে।

কৈসে। আঃ হাঃ। কঁহা ?

আপ যঁহা বৈঠেতে পাঞ্চল পর, হুঁয়া বৈঠকে বুদ্ধু সিং কো নাম লেকর পুকারিয়েগা, ম্যায় তুরন্ত উতারকে আয়েগা। খ্যয়ের, আপ রাজি হ্যায় তো আপকো হামারা ঘরমেভি লেতে যাউঙ্গা।

তুমি কি সকলের সঙ্গেই এমন ব্যবহার কর না কি ? সব তীর্থযাত্রীর সঙ্গেই ?

অবাক হয়ে বলল চারণ।

না, না, তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে কখনওই করি না। তাঁদের সময় কোথায় দুদণ্ড বসবার ? দেখবার ? তাঁরা তো সাতদিনে সব তীর্থ শেষ করে কলকাতাতে ফিরে গিয়ে রিস্তেদারদের আর দোস্তদের বলেন গাড়োয়াল দেখে এলাম! আহা! কী অপূর্ব। আপনি যে তীর্থযাত্রী নন, যদিও বাঙালি, তা আপনাকে দেখেই বুঝেছিলাম।

চারণ হেসে বলল, আসব বুদ্ধু সিং। আবার আসব দু-এক দিনের মধ্যে। কী নিয়ে আসব বল তোমার জন্যে ?

আমার জন্যে ?

হ্যাঁ।

পেয়ার, ব্রিফ পেয়ার।

চারণ মনে মনে বলল, আমিও তীর্থযাত্রী বুদ্ধু সিং। তবে আমার গন্তব্য অন্য। যে তীর্থ সকলের বুকেরই মধ্যে থাকে অথচ যা বহু দূরে এবং অদৃশ্য এবং যেখানে পৌঁছনোর পথ খুবই দুর্গম।

অটোটা ছেড়ে দিল।

বুদ্ধু সিং আবার হ্যাজাক-ধরা ডান হাতটা তুলে হাত নাড়ল।

সকাল থেকে যে সব ঘটনা ঘটল বা যেখানে যেখানে গেল তার বিবরণটুকু দিতে হয়তো সময় বেশি লাগল না, কিন্তু যেতে যেতে দেখল যে তার ঘড়িতে এগারোটা বেজে গেছে।

হোটেলে ফিরে একটু বিশ্রাম করল।

অনভ্যস্ত পা দুটো টনটন করছে। ঠিক করল, বিকেলে বেরিয়েই প্রথমে একটা নরম কেডস কিনতে হবে, আর একটা লাঠি। শিশুকাল থেকেই ও হেঁটে বেড়ানোর সময়ে হাতে একটা লাঠি রাখতে ভালবাসত। উত্তরপাড়ায় মামাবাড়িতে যাওয়ামাত্রই দাদু তাকে নিজে হাতে একটি লাঠি বানিয়ে দিতেন উচ্চতা অনুযায়ী। যখন পাঁচ বছরের শিশু, তখন সে লাঠির উচ্চতা একরকম ছিল, যখন সে তেরো বছরের কিশোর তখন তার উচ্চতা অন্যরকম। লাঠি হাতে হাঁটতে হাঁটতে চারণ যেন পৃথিবী শাসন করত মনে মনে। কত কী ভাবত, হাওয়ায় লাঠি দিয়ে আঘাত করত, বামে ডাইনে, পিছন পানে। আর তার মনের মধ্যে কত কিছু গড়ে উঠত। কত দুর্গ, কত প্রাসাদ, কত প্রাকার, কত গম্বুজ আবার পরক্ষণেই তার নিজেরই লাঠির ঘায়ে সে সব ছত্রখান হয়ে যেত।

সাম্প্রতিক অতীত থেকে বড় বেশি পুরনো কথা মনে আসছে চারণের। ও কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে?

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে, ভাল করে গরম জলে স্নান করে রুম-সার্ভিসে খাবার অর্ডার করল।

এখানে এসে অবধি একটা জিনিস দেখছে যে, এখানে কোনও আমিষ খাবারের চল নেই। সকলেই নিরামিষ খায়। সব দোকানেই নিরামিষ, সব হোটেলেই নিরামিষ। তবে, এটাও ঠিক যে, শুনেছে যে হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশের পথপাশে ডানদিকে একটি দোকান আছে নাকি যার সামনে দুটি খোঁটার উপরে পেরেক দিয়ে সাঁটা টিনের ছোট্ট হোর্ডিং-এ লম্বকর্ণর ছবি আছে বাইরে। আর লেখা আছে 'মিট শপ'।

আর একটি দোকানও আছে এক সর্দারজীর। 'ফরেন লিকার শপ'।

তার মানে, হৃষীকেশে যাঁরা আসেন তাঁরা যে সকলেই নিরামিষাশী কিংবা পান-বিলাসী নন, এমন নয়। তেমন হলে হৃষীকেশে ঢোকার মুখে এসব দোকান থাকতই না।

চারণ তো নিরামিযাশী নয়, মদ্যপানও করে কখনও সখনও। কিন্তু এবারে ওর ওই হঠাৎ-করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়াটা, জীবিকার ওপরে বিতৃষ্ণায়, চারপাশের মানুষজনের ওপরে বিতৃষ্ণায়, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত সকলের ওপরে বিতৃষ্ণায় এবং নিজের জীবনের গন্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধা জন্মানোতেই হঠাৎই নোঙর তুলে চলে আসা। কোনও শিকড়ই রেখে আসেনি। অন্য কোথাওই যাবার সঙ্গে এ যাত্রা আদৌ তুলনীয় নয়। ও সত্যিই নিজেকে পুনরাবিষ্কার করতেই বেরিয়েছে এবারে এবং ওর মনের পরতে পরতে এতরকম তঞ্চকতা, এতরকম অকৃতজ্ঞতা, এতরকম আঘাত পুঞ্জীভূত হয়েছে মাড়িয়ে-আসা বছরগুলিতে যে, ও যদি এবারে আর তার দাঁড়ে ফিরে নাও যায়, তার অফিসের গুরুদায়িত্ব পুর্ণগ্রহণ না করে, তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার শত আরাম-সুবিধা থেকে নিজেকে স্বেচ্ছায় সত্যিই বিযুক্ত করে, তা হলেও আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

লাগছে কিন্তু চমৎকার। এই দুদিনেই। হৃষীকেশ, এই ত্রিবেণীঘাট, এই নদী, এই নগাধিরাজ হিমালয়, এই সব সাধু-সন্নিসী, বুদ্ধু সিং-এর মতন এমন সব আশ্চর্য সরল মানুষ। তাও তো মাত্র একজন সন্ন্যাসীকেই এ পর্যন্ত দেখেছে। এরা সবাই চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই তার জীবনে ইতিমধ্যেই যেন এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে।

গতকাল থেকে, যখনই খাওয়ার সময় হচ্ছে এবং কিছু খাচ্ছে, তখনই ভীমগিরির সেই কথাটি তাকে বড়ই ভাবাচ্ছে। "বেশি খেলে, মাথা মোটা হয়।"

বেশি খেল না আজকে। ভাত, ডাল, মটর ডাল দিয়ে ভাল করে মেখে, স্যালাড, মুলো, পেঁয়াজ, শশা, কাঁচালঙ্কা আর একটু ছোলার তরকারি, যাকে অবাঙালিরা চানা বলেন, আর একটু টক দই।

খেয়ে উঠে বিছানাতে গা এলিয়ে দিল। সেই স্কুল-কলেজ জীবনের মতন। আঃ কী আরাম! পায়ে ব্যথা বলেই যেন আরামটা আরও বেশি লাগছিল।

দেখতে দেখতে প্রায় সপ্তাহখানেক কেটে গেল। মনে হচ্ছে, মন বসে গেছে এই হৃষীকেশে।

এক বিকেলে, চা খাওয়ার পরে, চারণ তার তিনতলার ঘরের লাগোয়া বারান্দাতে দাঁড়িয়েছিল।

নীচের পথ দিয়ে সাংঘাতিক আওয়াজ করে বাস, ট্রাক, গাড়ি, অটো ছুটে চলেছে। অধিকাংশ যাবে দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, কেদারনাথ, নয় বদ্রীনাথ, যমুনোত্রী, নয় গঙ্গোত্রী। কত জায়গায়ই না মানুষ যাচ্ছে। আর কিছু যাবে দেরাদুনের দিকেও। এখানে বিভিন্ন যানবাহনের এই আগ্রাসী আওয়াজটাই বড় বিরক্ত করছে। একবার ভাবল, বিকেলের দিকে ম্যানেজারকে বলে ঘর বদলে পিছন দিকের ঘরে চলে যাবে। আবার ভাবল, তা হলে তো ঘরে বসে এবং নিজস্ব বারান্দাতে বসে গঙ্গা দেখতে পাবে না। ওপারের গহন অরণ্যানী, হিমালয়ের পাদদেশে খাঁজে খাঁজে জমাট বাঁধা রুখু উত্তুঙ্গ শিবালিক পর্বতমালা।

তারপর ভাবল, ভেবে দেখবে বিকেলে, কী করবে! তাড়া নেই কোনও সিদ্ধান্ত নেবার।

চারণ ভাবছিল, এই যে এত মানুষে ছুটছেন, কেউ পুণ্য করতে, কেউ বেড়াতে। তাদের মধ্যে সকলেই কি তাদের এই মত্ততার মানে খুঁজেছেন? বা, খুঁজলেও পেয়েছেন খুঁজে? তাঁদের সমস্ত আনন্দ কি ধেয়ে গিয়ে বুড়ি ছোঁয়ারই মধ্যে? বুদ্ধু সিং যেমন বলছিল?

তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই কি শুধুমাত্র দেশ বেড়ানোর বা তীর্থস্থানে যাবার শ্লাঘার জন্যই যাচ্ছেন? 'ঘামণ্ড' এরই জন্যে? গতিমাত্রই, গন্তব্যমাত্রই, সে বন-পাহাড়ের গন্তব্যই হোক কী মন-পাহাড়ের; পৌনঃপুনিক যতি বিনা যে নিতান্তই অর্থহীন হয়ে যায়, তা কি তাঁরা জানেন? কে জানে! হয়তো এই অগণ্য ধাবমান নারী-পুরুষের মধ্যে কেউ কেউ জানেন। অবশ্যই জানেন। তবে অধিকাংশই হয়তো জানেন না।

চমৎকার ঘুম হল দুপুরে। দুপুরে ঘুম! অভাবনীয়। প্রায় তিনটে অবধি ঘুমোল চারণ। তারপরে উঠে, হোটেলেরই প্যাডে সেদিনের ঘটনাবলী সংক্ষেপে লিখে রাখল। সেদিনের নয়, এখানে আসা অবধি যা কিছু ওর মনে দাগ কেটেছে সেই সব। সফল কবি বা সাহিত্যিক হওয়া হয়নি কিন্তু জাগতিকার্থে সফল মানুষ হয়ে, সেই আনন্দে ডগমগ হয়ে, কলকাতার বিভিন্ন ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব এবং রোটারিতে 'এলিট' সমাজে দশজনের ঈর্ষার কারণ হয়ে জ্বলজ্বলে তারার মতো সে বিরাজ করেছে।

এইটাই হাইট অফ অ্যাচিভমেন্ট। এবং এইটা ট্র্যাজেডিও বটে।

তবে সুখের কথা এইটুকুই যে, চারণ অবশ্যই বোঝে যে তার এই চোখ-ঝলসানো সাফল্য ট্র্যাজেডি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সহজ সস্তা সাফল্য যে ওর প্রার্থিত নয়, ও এই সরল সত্যটা যে বুঝেছে সে কারণেও কৃতজ্ঞ থাকে। তবে এ কৃতজ্ঞতা যে কার কাছে সেটা স্পষ্ট বোঝে না।

হোটেল থেকে যখন বেরুল তখন রোদের তেজ কমে এসেছে। কিছুটা এগোতেই দেখল পথের বাঁদিকের একটি আশ্রম থেকে অতি অল্পবয়সী এক সাধু বেরুল, বন-থেকে-টিয়ে বেরুনোর মতন। তার বয়স বেশি নয়। হয়তো বাইশ-তেইশ হবে। পরনে ইস্ত্রি-করা রক্তচন্দন-রঙা টেরিকটের ধুতি, লুঙির মতন করে পরা এবং তার উপরে পাঞ্জাবি। টেরি-কাটা চুল। ঘাড়ের পেছনটাতে কোনও দক্ষ হাজামৎ-এর সযতনে ডিজাইন করা ছাঁট। ইনি টালিগঞ্জের 'অধম-কুমার' না সন্ন্যাসী বোঝা দুষ্কর। লম্বা জুলফি। বাঁ হাতে একটি টাইটান ইন্ডিগ্লো ঘড়ি। পাছে ঘড়িটা দেখা না যায়, তাই বাঁ হাতের পাঞ্জাবির হাতাটি একটু গোটানো।

সন্ন্যাসীসুলভ পোশাক-আশাক না থাকলেও হৃষীকেশের যাত্রী মাত্রই যে সন্নিসী অথবা পুণ্যার্থী এমন ভেবে নিয়ে তিনি চারণের কাছে পেছন থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন। এসে বললেন, 'কবে এলেন ?'

সন্ন্যাসী দেখেছিল যে, চারণ 'মন্দাকিনী হোটেল' থেকে বেরিয়েছে। একসপেনসিভ হোটেল।

ভাবল, ভীমগিরিও সন্ন্যাসী, এ মক্কেলও সন্ন্যাসী।

কোনও উত্তর দিল না।

উত্তর না-দেওয়াতে সন্ন্যাসী চটে গেল। চারণ জানে যে, কোনও মানুষকে উপেক্ষা করলে সে যতখানি অপমানিত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। অবশ্য যদি তার অপমানবোধ আদৌ থাকে।

চলতে চলতে সন্ন্যাসী বলল, উত্তর দিচ্ছেন না যে !

এমন সময়ে পথের উলটোদিকের, মানে, ডানদিকের একটা বড় অডিও-ক্যাসেটের দোকান থেকে ভীমসেন যোশীজির বিখ্যাত এবং গায়ে কাঁটা দেওয়া, ভৈরবীতে বাঁধা ভজন ভেসে এল। "যো ভজে হরিকো সদা,...পরমপাদ...মিলেগা" বাজছিল।

সেই সন্ন্যাসীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই পথ পার হয়ে চারণ সেই ক্যাসেটের দোকানে গিয়ে ঢুকল। পেছনে পেছনে বর্মী-জোঁকের মতন সেই সন্ন্যাসীও এসে ঢুকল।

ক্যাসেট তো চারণ কিনতে ঢোকেনি ! একটু পরেই বেরিয়ে এসে ত্রিবেণী ঘাটের দিকে এগোল। সেই সন্ন্যাসী কিছুটা রাগে, কিছুটা ঔৎসুক্যে কিছু দূর অবধি চারণের পেছন পেছন এসে তারপর অন্য কোথাও চলে গেল। চারণ কেন যে অমন করল তা ও জানে না। ওর মধ্যে যে অনেকগুলো মানুষ বাস করে। তাদের একজনের চরিত্রও সে তখনও বুঝে উঠতে পারেনি। ওর সবচেয়ে বড় বিপদ নিজেকে নিয়েই। ওর নিজের ভেতরটা এমনই অগোছালো যে একদিক গোছাতে গেলে অন্যদিকে ধুলো জমে। এ জীবনে নিজেকে নিয়েই সবচেয়ে বেশি হিমসিম খায় চারণ।

নিজেই নিজেকে বোঝে না, তার অন্যদের বোঝাবে বা বুঝবে কী করে।

চারণ যখন জনস্রোতে মিশে গেল তখন হঠাৎই ওর খুব হালকা লাগতে লাগল। এই ভারশূন্যতার রকমটি ও ঠিক ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে না। কারণ, তার স্বরূপ সে নিজেও জানে না। শিকড় উপড়ে গেলে যেমন মনে হয়, তেমন এক বোধ। রিচার্ড বাক-এর লেখা জোনাথন লিভিংস্টোন সীগাল বইটি পড়ে যেমন বেশ কিছু দিন শিকড় আলগা করে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল, সেইরকম স্বপ্ন সে আবারও দেখতে আরম্ভ করেছে এখানে এসে।

শিকড়বাকড় মানুষের সব কি ঘরের মধ্যেই থাকে ? চার দেওয়ালেরই মধ্যে ? শৈশব থেকে বার্ধক্য এই সব পর্বেই কি শিকড়বাকড়ের দড়াদড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে মানুষ মাত্রই ? ওই সমস্ত প্রশ্নর একটিরও উত্তর ওর কাছে নেই। দেখবে, উত্তর যদি খুঁজে পায় হৃষীকেশের বাসিন্দা অগণ্য সব ঘরছাড়াদের কারও কাছে।

ভাবছিল চারণ, কিসের নেশাতেই বা মানুষ ঘরে থাকে ? আর কিসের নেশাতেই বা ঘর ছাড়ে ? ঘরছাড়ারা যদি ঘরের বাইরের টানের মধ্যে এক ধরনের তীব্র আসক্তিই বোধ করে, তবে গৃহস্থরা দোষ করল কি ? এটা নইলে চলবে না, ওটা নইলে চলবে না, এই তো আসক্তির মূলে। আর যদি তাই হয়, তবে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে, নিজের অন্তরের মধ্যের বন্দী আমিত্বকে অন্তরতমর কোরক থেকে বিচ্ছিন্ন করে উৎপাটিত রক্তাক্ত হৃৎকমলের মতন তাকে যদি নিজের করপুটে রেখে তীব্র কিন্তু নিরাসক্ত আগ্রহের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা যেত তা হলে কি উত্তর পেতে পারত ওর এই প্রশ্নর ?

এত সব গভীর তত্ত্বের বোধের চৌকাঠে পৌঁছেই ও হোঁচট খেল এই সরল সত্যটি উপলব্ধি করে যে, ভীমগিরি তাকে ত্রিবেণী ঘাটের দিকে টানছেন। কোনও টানেই যদি ধরা দেবে, সে টান যে টানই হোক না কেন, পুরনো গোপন রোগের মতন নিজের মনের মধ্যে গভীরে প্রোথিত অগণ্য বিরক্তি এবং আসক্তি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টাতে এসেও আর এমন গা-ভাসানো কেন ? ভীমগিরি নামক এক বিড়ি-ফোঁকা গঞ্জিকাসেবী, অশিক্ষিত সন্নিসীর টানেই যদি স্রোতের মুখে কুটোর মতন

ভেসে যাবে চারণ চাটুজ্জে, তবে কক্ষচ্যুত সে আবার তার নিজকক্ষে ফিরে গিয়ে জয়িতাকেই বরং জয়ী করুক। স্মিত, স্নিগ্ধ, পূর্ণ চন্দ্রই গ্রাস করুক তীব্র দৃপ্ত মার্কণ্ডকে। সেই সর্পিণীর ছোবলেই প্রাণ এবং মান হারাক ও।

জাহান্নামে যাক চারণ চাটুজ্জে। রিয়্যাল জাহান্নামে।

ভারী রাগ হল চারণের নিজেরই উপরে। আইন বোঝে, অর্থনীতি বোঝে, লাভ-লোকসান বোঝে, কমপ্যুটার বোঝে, জীবনের মীন-মিডিয়ান-মোড বোঝে, এতরকমের কোশিয়েন্ট বোঝে, বাণিজ্য জগতের ঝাঁ-চকচক নিত্যনতুন টার্মস আর ভ্যারিয়েবলস যার নখদর্পণে, যার অঙ্গুলি হেলনে বিনুর স্বপ্নের রেলগাড়ির মতন দুলে উঠে চলতে আরম্ভ করে আধুনিক পৃথিবী, সেই মানুষ কেন, কী করে ভীমগিরি নামক একজন চাতালবাসী হা-ভাতে সন্নিসীর প্রতি এমন করে আকৃষ্ট হয়?

যে নিজে এত বড় আইনজ্ঞ সে এ কোন বে-আইনে বাঁধা পড়তে চলেছে?

আশ্চর্য!

না। ও ঠিক করল, যেখানেই যাক, আজ সন্ধেতে ত্রিবেণী ঘাটে মোটেই যাবে না। এই মোহ ওকে ত্যাগ করতেই হবে। সে ব্যাটা সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই তাকে কোনও তুকতাক করেছে। গুরুকে দিয়ে হয়তো বাণ মারিয়েছে। তার মতন বিজ্ঞানমনস্ক বামপন্থী ইনটেলেকচুয়াল, তার মতন সফল ভারতবিখ্যাত আইনজ্ঞর পক্ষে অমন এক গঞ্জিকাসেবীর খপ্পরে পড়ার চেয়ে বড় লজ্জা আর কি হতে পারে। "Emancipation"-এর এই সব মুখ্খুরা বোঝেটা কি? রামমন্দিরের চাতালে বসে ভজন গাওয়াই যার সিদ্ধিলাভের একমাত্র প্রক্রিয়া তার কাছে বা তাদের কাছে আর যারই কিছু শেখার থাকুক চারণের শেখার কিছুমাত্রই নেই।

আর একটু এগোতেই দেখল পথের বাঁ পাশে প্রাচীন একটি হর্স-চেস্টনাট গাছের নীচে ঝুপড়ি বানিয়ে আছে এক পরিবার। তারা বড়ই গরীব। এক বৃদ্ধ এক হাতে দু-আড়াই বছরের নাতনিকে জড়িয়ে ধরে কোলে বসিয়ে মেরুদণ্ড টান টান করে একটি ছোট চৌপাইতে বসে অন্য হাতে হুঁকো ধরে, গালের সঙ্গে লাগিয়ে হুড়ুক-ভুড়ুক শব্দ করে হুঁকো খাচ্ছে। তার জওয়ান ছেলে আগুনের মধ্যে লোহা গরম করে সেই গনগনে লাল লোহা চিমটে দিয়ে তুলে একটি মোটা লোহার থামের মতন জিনিসের উপরে ধরে আছে আর তার যুবতী, সুগঠিতা বউ একটি বড় হাতুড়ি দিয়ে সেই লাল লৌহখণ্ডকে পিটছে। ছেলেটির হাতের কাছেও একটি ছোট হাতুড়ি রয়েছে। তা দিয়ে সে নরম লোহাকে পিটে-পাটে চূড়ান্ত রূপ দিচ্ছে, লোহার একপ্রান্তকে ছুঁচোলো করছে। সম্ভবত ত্রিশূল বানাবে।

মেয়েটি একটি বহুবর্ণ ঘাঘরা পরে আছে আর বহুবর্ণ ছিটের আঁটসাঁট ব্লাউজ। ঘাঘরার ঘের বেশি নয়। আর তার ঝুল থেমে গেছে তামাটে গোড়ালির অনেকখানি উপরে এসে। তার সুগঠিত পা, সুন্দর সুডৌল, ঘর্মাক্ত, পুরনো-সোনার রঙের স্তনযুগল ছেড়ে ঘরছাড়া চারণ চাটুজ্জ্যের চোখ কোথাওই আর যেতে চাইছিল না। দুটি স্নিগ্ধ এবং কোমল পাখি যেন জোড়ে উড়ে এসেছে স্বর্গ থেকে। এই মর্ত্যভূমিতে আদৌ এদের স্থায়ী বাস যে হতে পারে, তা বিশ্বাসই হয় না।

জয়িতা কত ইটালিয়ান অলিভ অয়েল, কত বিদেশি ময়েশ্চারাইজার, কত ম্যাসুরের সাহায্য নিয়েও এই মেয়েটির স্তনের মতন সুন্দর করতে পারেনি নিজের স্তনকে। এ যে পথপাশের পারিজাত! কখন যে ফোটে শুধু তাই জানা নেই চারণের। শুনেছে, পারিজাত রাতে ফোটে।

পরমুহূর্তেই ভাবল ও, স্তনী তো প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কা নারীই। কিন্তু জয়িতার স্তনের সঙ্গে কি তুলনা হতে পারে অন্য কারও স্তনের? সে যে জয়িতারই স্তন!

চারণের জিগরি দোস্ত লক্ষ্ণৌ-এর বাসিন্দা হাফিজ একটি শায়ের বলত প্রায়ই, যখন লানডান স্কুল অফ ইকনমিকস-এ পড়াশুনো করত ওরা একসঙ্গে। বলত: "নীগাহ্ যায়ে কঁহা সীনেসে উঠকর? হুঁয়াতো হুসনকি দওলত গড়ী হ্যায়।" অর্থাৎ, সুন্দরীর সব সৌন্দর্য, তার সব দৌলত তো ঈশ্বর যুগলবুকেই গড়ে রেখেছেন। বুক ছেড়ে চোখ আর কোন চুলোতে যাবে?

মানল নয় তা। কিন্তু এই সৎ, পরিশ্রমী, স্বনির্ভর ক্ষুধাকাতর ভারতীয় পরিবারের

পরিশ্রমমুখিনতাতে বা তাদের কষ্টে বা সততাতে চারণ একটুও চমৎকৃত না হয়ে চমৎকৃত হল অজ্ঞাতকুলশীলা যুবতীর স্তনযুগলে ! ছিঃ ছিঃ।

মনে মনে বলল, শান্তি ? নির্বাণ ? বোধি ? চারণ চাটুজ্যের জন্যে ? দূর অস্ত। দূর অস্ত।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ওদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল চারণ।

বুড়ো বলল, জাতে ওরা পান্ধী। যাযাবর। এমনই ঝুপড়ি বানিয়ে আবার ভেঙে ফেলে পথ থেকে পথে, জেলা থেকে জেলাতে চলে যাবে। কোনও পিছুটান নেই। ওদের শুধুই সামনে চাওয়া।

ভারী ভাল লাগল চারণের। ভাবল, কত বড় দেশ এই ভারতবর্ষ ! কত বিচিত্র পেশার, বিচিত্র নেশার মানুষের সমাহার এখানে। দেশকে ভাল করে না দেখলে, দেশের মানুষকে ভাল করে না জানলে, তাদের জন্যে সমব্যথী না হলে মানুষ হয়ে জন্মানোই বোধহয় বৃথা। এরাও তো এক ধরনের সন্ন্যাসীই !

ভাবল ও।

মেয়েটি অত বড় ও ভারী হাতুড়ি বারংবার ওঠাতে নামাতে, হাঁপ উঠছিল তার। কথা বলার মতন অবস্থা তার ছিল না। অপরিচিতর সঙ্গে কথা সে বলতও না হয়তো।

মাঝে মাঝেই সে কোমর টানটান করে দাঁড়িয়ে পড়ে চোলি দিয়ে মুখ, গলা এবং ঘাড়ের ঘাম মুছছিল। সে যখনই নিচু হচ্ছিল তখনই তার স্তনযুগল ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরা ফুলের মতনই বিভাসিত হচ্ছিল।

সেই দৃশ্যে বিমোহিত হয়ে ছাত্রাবস্থায় পঠিত কবি ও সাহিত্যিক মণীশ ঘটকের (যুবনাশ্ব) কবিতার দুটি পঙক্তি মনে পড়ে গেল হঠাৎই চারণের : "বল্কলমুক্ত তুঙ্গ স্তনদ্বয়, সহসা উদ্বেল হল শুভ্র বক্ষময়।" বল্কলমুক্তর আগে একটা শব্দ ছিল। একটি দারুণ শব্দ। কিছুতেই মনে করতে পারল না।

কবিতাটির আশ্লেষ সেই একটি হারিয়ে যাওয়া শব্দে যেমন ক্ষুণ্ণ হল, তেমন আবার ভাস্বরও হল।

মেয়েটিকে দেখে, তার সন্ন্যাসী হওয়া যে এ জীবনে অথবা এ যাত্রাতে হবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হল চারণ। এবং নিশ্চিত হয়ে বিলক্ষণ দুঃখিত হল। তরুণ, শক্তিশালী কোনও গদ্যকারের লেখা গদ্যর মতন গদ্যে এই মেয়েটি সম্বন্ধে কিছু লিখতে ইচ্ছে করল চারণের।

মাত্র একটি প্যারাগ্রাফ। জীবনে একটিমাত্র প্যারাগ্রাফের মতন প্যারাগ্রাফও যদি লেখা যেতে পারত, সারা জীবনের চেষ্টা দিয়ে নিজেকে নিয়ত ভাঙচুর করে, মাত্র একটিমাত্র তেমন প্যারাগ্রাফ বা মণীশ ঘটকের ওই কবিতাটির মতন মাত্র দুটি ছত্র, তা হলেই যথেষ্ট ছিল।

স্বপ্নময়ের গদ্যর স্বপ্নহীনতা চারণকে এই যুবতীর স্তনযুগলেরই মতন আবিষ্ট করে, ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাসের অশ্রুত ছন্দ তাকে মুগ্ধ করে, হুসেনের তেল রঙের মারদাঙ্গা অথচ নয়নশোভন ঔজ্জ্বল্য, জয়নুল আবেদিনের হালকা জল রঙের গাঢ় আভিজাত্য, জয় গোস্বামী অথবা অনিল ঘড়াই-এর অথবা শিবতোষ ঘোষের, তাদের পদ্য ও গদ্যর মধ্যে দিয়ে জীবনকে দেখার ভঙ্গি, জিন-কণ্ঠী ইফফাত আররা খান-এর অননুকরণীয় গভীর যৌনগন্ধী স্বরের নাব্যতা, অথবা শ্রুতি সাডোলিকারের গলার প্রভাতী বিভাস এ সব কিছুর কথাই একই সঙ্গে মনে পড়ে গেল চারণের সেই হাতুড়ি-পেটা ঘর্মাক্ত পান্ধী মেয়েটির কর্বুর ব্লাউজের মধ্যে অস্ফুটে ফুটে-থাকা স্তনযুগলে চোখ পড়েই।

হঠাৎই যেন কানের মধ্যে কে বলে উঠল, 'বেটা। তোর আধার ভাল।'

চারণ হতভম্ব হয়ে গেল। পরক্ষণেই কান্না পেয়ে গেল তার। মনে মনে বলল, হবে না, হবে না। যে জীবনকে এতখানি ভালবাসে, জীবন যাকে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে, তার কখনওই পালানো হবে না ভোগের জীবন থেকে। বন্ধনই তার কপাল-লিখন। চির-বন্ধন। জীবনকে যে ভালবেসেছে, যে ঘৃণা করেছে, যে প্রেমিকার মতন জড়িয়ে ধরেছে, যে ফুটবলের মতন লাথি মেরেছে চারণের মতন, শুধু সেই জানে যে জীবন অক্টোপাস। সহস্র হাতের সুদৃঢ় অদৃশ্য

বন্ধনে জীবন মানুষ-মানুষীকে বেঁধে রাখে। অভ্যেসের মধ্যে। প্রতিদিনের কাজের মধ্যে, সুগীত গান, সুলিখিত কবিতা, সুললিত কথোপকথন, সুন্দর দৃশ্য, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দর মায়ার ঘেরে।

সংসারের থেকে, জীবনের বজ্রমুষ্ঠি থেকে, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে যাওয়া খুবই সহজ। কিন্তু লুকোনো যাবে না কোথাওই। দৌড়নো হয়তো যাবে, দূর হতে বহু দূরে, হয়তো দিগন্ত অবধিও কিন্তু লুকোনো হবে না। জীবন ঠিক পিছনে পিছনে এসে তার বজ্রমুষ্টিতে কব্জি আঁকড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে চারণকে তার ঘেরাটোপের মধ্যে। চারণ অলীক মানুষ নয়, অলীক স্বপ্নও দেখে না!

চারণ জানে যে, একদিন হৃষীকেশের এই কটি দিনকে স্বপ্নের মতন মনে হবে। সত্য, কঠিন এবং বাস্তব জীবনের ফ্রেমের মধ্যে এই দিনকটি, এই পান্ধী যুবতীর কর্বুর ব্লাউজের মধ্যে দিয়ে উঁকি মারা ভীরু কবোষ্ণ পাখির মতন স্তনযুগলের মতন, পৃথিবীর সব সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতার সংজ্ঞার মতনই বাঁধানো থাকবে মনে।

না কি, মোড় নেবে তারও জীবন ?

বাঁকে বাঁকে কি বয়ে যাবে নতুন খাতে ? হয় হৃষীকেশ, নয় আরও উপরের দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, কোথায় ? তা কে বলতে পারে!

মুক্তি নেই ভীমগিরি মহারাজ। মুক্তি নেই।

যদি আত্মহত্যা করে ও ?

জীবন্মৃত জীবনের চেয়ে মৃত্যুই কি শ্রেয় নয় ?

পাঠক। আপনি ভাবছেন চারণ চাটুজ্জ্যেকে রাঁচির কাঁকে রোডে পাঠানো দরকার। যার প্রকৃত বেদনা নেই, আর্থিক কষ্ট নেই, যার কষ্ট বেদনা-বিলাস মাত্র, তার দুঃখটা কিসের ?

পাঠক। আপনি যদি মানুষ হন অথবা মানুষী, তবে অবশ্যই জানবেন যে, মানুষের প্রকৃত কষ্টটা কোনও দিনই ভাত-কাপড়ের ছিল না। এ সব কথা নানা মতের, নানা দেশের রাজনীতিকদের বানানো কথা। ভোট বাগানোর কল। ভাত-কাপড়ের কষ্টই যদি মানুষকে কোনও দিনও তেমন করে ক্লিষ্ট করত তবে ভীমগিরির মতন কেউই হাসিমুখে বলতে পারতেন না 'ভুখখা মরো।'

মানুষের মতন মানুষ যে, সে চিরদিনই দুঃখী। বড়লোকই হোন, কী গরীব, রাজাই হোন কী প্রজা। এই দুঃখবোধেরই আর এক নাম বোধহয় মনুষ্যত্ব।

ভেবেছিল যে, অন্য কোথাও যাবে। ত্রিবেণী ঘাটের দিকে যাবে না। কিন্তু সেই ডানদিকেই ঘুরল। তবে প্রথম মোড়ে নয়, এগিয়ে গিয়ে, দ্বিতীয় মোড়ে। ঘাটে যাওয়ার সেই দ্বিতীয় পথটি ভাল করে দেখা হয়নি ওর এখনও।

একটু এগোতেই দেখল, বাঁদিকে একটি ইডলি-দোসার দোকান। বিকেলে চায়ের সঙ্গে কিছু খায়নি। একটু খিদে-খিদে বোধ করছিল। দুদিনেই তো আর 'ভুখখা মরো' বাণীতে উদ্বুদ্ধ হতে পারবে না। সময়কে সময় দিতে হবে বৈকি, যতখানি সময়, সময় চায়। ঢুকে পড়ল, দোকানটিতে। দেখল, দেওয়ালময় রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং শরৎচন্দ্রর ছবি তো বটেই দার্জিলিং-এর সূর্যোদয়, দীঘার শীতকালের তটের ফোটো, এই সব টাঙানো। একটি প্লেইন দোসা আর কফির অর্ডার দিয়ে ও ছবিগুলো দেখতে দেখতে ভাবল দোকানি নিশ্চয়ই বাঙালি। ক্যাশ কাউন্টারে যে ছেলেটি বসে ছিল, তাকে জিগ্যেস করল উঠে গিয়ে, মালিক বাঙালি কি না। সে দুদিকে মাথা নেড়ে তামিলিয়ান অ্যাকসেন্টের আড়ষ্ট হিন্দিতে বলল, "আম হাজহি আয়া, আমারা ইন্দি নেই আতা আয়।"

এক ভদ্রলোক বসে ডিশের উপরে কফি ঢেলে সুরুৎ সুরুৎ করে মেপে মেপে চুমুক দিয়ে কফি খাচ্ছিলেন। চারণের ঔৎসুক্য দেখে আপনা থেকেই তিনি হিন্দিতে বললেন, "মালিক মাড্রাজি হ্যায়।"

দক্ষিণ ভারত যে একটি মস্ত বড় জায়গা, সেখানে যে অনেকগুলি রাজ্য আছে এসব খবর পূর্ব, উত্তর এবং পশ্চিম ভারতেরও সাধারণ মানুষে রাখেন না। অনেক শিক্ষিত মানুষও রাখেন না। তামিল, তেলেগু, মালয়ালি, কর্নাটিকি, কুর্গি, সকলেই "মাড্রাজি" বলেই বর্ণিত হয়। আশ্চর্য

সরলীকরণ !

দেওয়ালের ছবিগুলো দেখিয়ে চারণ বলল, তব ?

তব ক্যা ?

ইয়ে সব বাঙালি ঔর বাঙালকি তসবির ?

সে বলল, হাঃ। ইয়ে সব বাঙালি কাস্টোমার পাক্কাড়নেকো লিয়ে !

হাসি পেল চারণের।

সত্যি। বাঙালি এক আশ্চর্য জাত। তাদের নিজ শহরে অমিতাভ বচ্চন আর মাধুরী দীক্ষিতে মজে থাকে তারা, কিন্তু প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দর ফোটো দেখেই কাত। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্রর একটি বইয়ের এক লাইনও পড়া থাক আর নাই থাক, তাতে যায় আসে না কিছুমাত্রই। প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রামকৃষ্ণদেব বা বিবেকানন্দর চার ফেললে বাঙালিরা যে মাছেরই মতন বুড়বুড়ি তুলে হুড়মুড়িয়ে আসে এই তথ্য দোকান-মালিকের ভাল করেই জানা ছিল। তাই সেই দোকানের বিক্রি ঠেকায় কেডা ? চাকরি-করা আর বসে-খেতে ভালবাসা বাঙালি অন্য সব রাজ্যের সব স্তরের ব্যবসায়ীকে যেমন নির্বিকারে বড়লোক করে তেমন আর কোনও রাজ্যের মানুষই করে বলে চারণের জানা নেই।

দোসাটা যখন তৈরি হচ্ছে তখনই হঠাৎ সেই নবীন সন্ন্যাসী পথ দিয়ে দুধারে উঁকিঝুঁকি মারতে মারতে যেতে যেতে চারণকে দেখতে পেয়েই দোকানে ঢুকে পড়লে।

সন্ন্যাসীরাও কি দোসা খান ?

ভাবল চারণ।

তারপরই ভাবল, না খাওয়ার কি আছে ? তা ছাড়া ইনি তো সন্ন্যাসী ননও। ভেকই ধরেছেন শুধু।

চারণের উলটোদিকের চেয়ার টেনে বসে পড়ে সন্ন্যাসী বলল, পালাতে চাইলেই কি পালাতে পারা যায় ?

চারণ উত্তর দিল না।

সন্ন্যাসী মিটিমিটি হাসতে লাগল।

চারণের রাগ, বিরক্তি, কৌতূহল সব মেলানো এক অনুভূতি জাগল মনে। কিন্তু ঠিক করল যে, কথা বলবে না।

রক্তচন্দন-রঙা টেরিকট পরা সন্ন্যাসী বলল, আমি অনেক ঘাটের জল খেয়ে এখানে এসেছি।

চারণ বোবার মতন চেয়ে রইল।

উত্তর না পেয়ে সন্ন্যাসী আরও চটে গেল।

বলল, সন্ন্যাসী কত রকমের হয় জানেন ?

চারণ এবারে তার তর্জনী আর মধ্যমা দেখাল তাকে ?

মানে ?

চারণ মুখে বলল, দুরকমের।

ঘণ্টা জানেন।

সন্ন্যাসী বলল।

বলেই বলল, কোন কোন রকম ?

সাচ্চা আর ঝুঠা।

আপনি একটা ইডিয়ট !

মুখের উপরে প্রকৃত ইডিয়ট যে, তাকেও ইডিয়ট বললে সে চটে উঠত কিন্তু স্থান মাহাত্ম্যে এবং ওই ল্যাকব্যাকে ভীমগিরির সামান্য প্রভাবেই বোধহয় চারণের আমিত্ব কিছুটা ঢিলে হয়ে গিয়ে থাকবে ইতিমধ্যেই। সে না রেগে, ঠাণ্ডা গলাতে বলল, "লজ্জা, মান, ভয়, তিন থাকতে নয়।"

এই বাক্যটি দিদিমার উত্তরপাড়ার পুজোর ঘরের দেওয়ালে কাঁচ ঢাকা ফ্রেমের মধ্যে বাঁধানো

ছিল।

তারপরই সন্ন্যাসী যা বলল, তা শোনার জন্য চারণ তৈরি ছিল না। সে বলল, আপনাকে আমি চিনি। আমার বাবার সঙ্গে আপনার অফিসে আমি বহুবার গেছি।

আপনার বাবার নাম কি?

অবাক হয়ে চারণ জিগ্যেস করল।

সেই তরুণ সন্ন্যাসী যে নামটি বলল তা শুনে চারণ চমকে উঠল। তার নির্মোহ নির্মোক আর বজায় রাখা সম্ভব হল না।

চারণ বলল, দোসা খাবে?

নাঃ।

এবার তার পালা চারণকে উপেক্ষা করার।

চারণ বলল, তুমি ঘর ছাড়লে কবে? আর ছাড়লেই বা কেন?

সে সব অনেক কথা। পূর্বাশ্রমের কথা আমি আলোচনা করতে চাই না। আপনার Arrogance ভাঙবার জন্যই পিতৃপরিচয় দিতে হল। তবে সে লোকটাকে আমি বাবা বলতে যা বোঝায়, মানে যে সম্মান সম্ভ্রম প্রাপ্য থাকে সব বাবারই তার ছেলের কাছ থেকে, তার কণামাত্র দিতে পারিনি, দেব না। কারও গর্ভে কাম-উৎসারিত এক ফোঁটা ঔরস নিক্ষেপ করলেই কেউ কারও বাবা হয়ে ওঠে না। সব বাবার বেলাতেই 'পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাহি পরমন্তপ' বলা চলে না। সন্তানের জন্মদাতা পাবেন কোটি কোটি কিন্তু বাবা কজন তাঁদের মধ্যে?

নিজের বাবাকে এত ঘৃণা কি করা ভাল? এত ঘৃণা নিয়ে কি তুমি সন্ন্যাসী হতে পারবে? তোমার নামটা যেন কি? তোমার নাম অবশ্য আমি জানতামও না কোনও দিন?

সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের নাম জেনে লাভই বা কি? আমার এখনকার নাম পাটন। গুরুজি বলেন পাটনানন্দ।

পাটন! অদ্ভুত নাম তো। পাটন। মানে কি?

বাঙালির ছেলে হয়ে পাটন মানে জানেন না? 'পাটনি' শব্দের মানে জানেন তো?

পাটনি? ও হ্যাঁ।

তবে পাটনের স্ত্রী লিঙ্গই তো পাটনি। আমি খেয়াঘাটের মাঝি। আপনার মতো শর্ট টেম্পারড অ্যারোগ্যান্ট মানুষদের নদী পার করাই আমি, আমার নির্বাণের খেয়া নৌকোতে।

বাব্বা! তুমি বয়সে ছোট হলে কি হয়, কথা তো বেশ বড় বড় বলতে শিখেছ।

এখনও কিছুই শিখিনি। শুধু কথাই না, কাজও শিখব। কথা বলা তো অতি সহজ। এই সব কথাকে জীবনে ট্রানস্লেট করে দেখাতে হবে।

বাবা। বাংলাও তো খুব ভাল বলো দেখছি তুমি!

সবই গুরুর কৃপা। তার পায়ের কাছে বসে থাকি। যা উপচে পড়ে এসে জোটে তাই তো যথেষ্ট।

দীক্ষা-টিক্ষা নিয়েছ নাকি? হাসালে তুমি। তুমিও!

এমন করে কথাটা বলল চারণ যে, 'You too Brutas! এর মতনই শোনাল।

সে বলল, আপনি মস্ত বড় ইমপর্ট্যান্টি লোক হতে পারেন, সমাজের দণ্ডমুণ্ডের একজন মালিক, কিন্তু আপনি জানেন না কিছুই।

তুমিও কিছুমাত্রই জানো না আমার সম্পর্কে। অবান্তর কথা বোলো না। চৌধুরী সাহেবের একমাত্র ছেলে ঘর ছেড়ে গেরুয়া পরে হৃষীকেশের এই ইডলি-দোসার দোকানে বসে আমার সঙ্গে বে-এক্তিয়ারে বিতণ্ডা করবে এ আমার পক্ষে অভাবনীয় ব্যাপার। আমি তো বলব তুমি উন্নতি করোনি, অধঃপাতে গেছ। তোমার বাবা কখনওই আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলতেন না।

কি করে বলবেন? তাঁর টিকি যে বাঁধা আছে আপনাদের মতন Professionalsদের কাছে। আমার বাবা তার কর্মচারীদের সঙ্গে কী ভাষাতে কথা বলে তা কি আপনি কখনও শুনেছেন?

না শুনিনি।

ওঁর যত বিনয় সব আপনাদেরই কাছে।

তোমার বয়স কত পাটন ?

বয়স কি বয়সে হয় স্যার ?

বয়স তবে কিসে হয় ?

বয়স হয় অভিজ্ঞতায়। বয়স, কোনওদিনই বয়সে হয় না, হয়নি। জীবনের মূল্যও কোনও দিনও আয়ু দিয়ে মাপা হয় না। এ সব জানেন না বলেই তো খেয়াঘাটের মাঝির দরকার আপনার। আমার বয়স পঁচিশ। কিন্তু হিসেব করলে দেখা যাবে আমি হয়তো আপনার চেয়ে পঞ্চাশ বছরের বড়।

পঞ্চাশ বছরের ?

ইয়েস স্যার।

দোসাটা এসে গেল। এক কাপ কফিও দিতে বলল চারণ। তারপর বলল, কফিও খাবে না এক কাপ ? অথবা চা ?

নাঃ। থ্যাঙ্ক উ্য।

তুমি না গোয়ালিয়রের পাবলিক স্কুলে পড়তে ? তারপরে কোথায় ছিলে ? সত্যি। ভাবা যায় না। সেই তুমিই এখন...

স্কুলিং শেষ করে স্টেটসে গেছিলাম।

কেন ?

বাবা বলেছিল এ দেশে পড়াশুনো হয় না। আমাকে 'মানুষ' করতে পাঠিয়েছিল। ম্যাসাচুসেটসও গেছিলাম। সেখান থেকে এম বি এ করে ফেরার কথা ছিল।

তা চলে এলে কেন ?

ওসব না করেই লেজ গজিয়ে গেল। স্টেটস-এ তো লোকে লেজ গজাতেই যায়। তা ছাড়া গুরুও ডাকলেন।

গুরুও কি লেজ গজাবার জন্য স্টেটস-এ গেছিলেন না, তোমাকে ডাকতে ?

সে সব কথা অবান্তর। আপনি জেনে কি করবেন ? তবে লিটারালি ডাকেননি। আমার অন্তরে সেই নিরুচ্চারিত ডাক পৌঁছেছিল। দুত্তোর বলে সব ছেড়ে ছুড়ে চলে এলাম তাঁরই সঙ্গে।

তোমার গুরু কে ?

গাড্ডুবাবা। কেউ কেউ বলে ভোঁদাই মহারাজ।

সেকি! এমন বিচ্ছিরি নাম কেন ?

তা জানি না। আমি তো দিইনি নাম। তবে মনে হয় ওই নামটা আসল মানুষটাকে প্রচ্ছন্ন রাখে। যদি কোনও গুরুর নাম হয় ইন্টেলিজেন্ট মহারাজ তবে জানতে হবে তাঁর মতন বড় বুদ্ধু আর দ্বিতীয় নেই।

চারণের বুদ্ধু সিং-এর কথা মনে পড়ে গেল। কফি আর দোসার দাম দিয়ে দোকান থেকে বেরোল চারণ, পাটনের সঙ্গে।

কোন দিকে যাবেন আপনি চ্যাটার্জি সাহেব ?

পাটন বলল।

আমাকে তুমি চারণদা বলেই ডেকো।

বলব। কিন্তু আপনিও আমাকে পাটন বলেই ডাকবেন।

তারপর বলল, ক্যাসেটের দোকানে কি আমাকে ফলো করেই ঢুকেছিলে না কোনও ভজনের ক্যাসেট কিনতে ?

ফলো করে তো নিশ্চয়ই! তবে ভজনের ক্যাসেটের জন্য নয়, মাইকেল জ্যাকসনের কোনও ক্যাসেট পাওয়া যায় কি না খোঁজ করতে গেছিলাম।

মাইকেল জ্যাকসন ! মাই গুডনেস। মাইকেল জ্যাকসন এবং পাটন মহারাজ। ভাবা যায় না।

কেন ? Incompatibility-টা দেখলেন কোথায় ?

Incompatibility নেই ?

নাঃ। কোনও Incompatibility-ই নেই।

তুমি তো চিন্তায় ফেললে আমাকে।

চিন্তাই তো মানসিক উৎকর্ষতার একমাত্র পথ। তবে চিন্তার রকম-ভেদ আছে। সৎ চিন্তা করতে হবে। আমার বাবাও তো সব সময়েই চিন্তা করে। তবে শুধুই টাকার চিন্তা, টাকার, আরও টাকার। অথচ টাকার ব্যবহার জানে না। এ ছাড়াও প্যাঁচ মারার চিন্তা, অন্যকে 'টাইট' দেওয়ার চিন্তা। পরের অপকার করার চিন্তা।

তোমার বাবার জন্যই তুমি তা হলে এই অন্য জীবনে প্রবেশ করতে পারলে বল। এ জন্যও তো তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তোমার।

তা বলতে পারেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু আপনি এখানে কেন ?

এমনি।

নাঃ। এমনি নয়। এমনি যারা আসেন তাঁদের দেখেই বোঝা যায়।

তাই নাকি ? তা হলে মনে করো এমনি নয়। আচ্ছা ভীমগিরিকে চেনো ? ভীমগিরি মহারাজ ?

এখানে কত মহারাজ, কত বাবা আছেন। আমি চিনি না। তা ছাড়া আমি তো থাকিও না এখানে।

এখানে থাকো না ? তবে কোথায় থাকো ?

উপরে। ভিয়াসির আগে। এখান থেকে মাইল কুড়ি দূরে দেবপ্রয়াগের পথ থেকে বাঁদিকে পোয়া কিমি মতো উঠে এক মস্ত গুহা আছে। সেখানেই গাড্ডু মহারাজ থাকেন। আমিও সেখানেই থাকি।

তাই ? নিয়ে যাবে আমাকে ?

কেন ? গাড্ডু মহারাজকে দেখতে ?

না, না থাকতে। তোমরা বাইরের লোকদের থাকতে দাও ?

কে যে বাইরের আর কে যে অন্তরের তা তো অন্তর্যামীই জানেন। গুরুকে জিগ্যেস করতে হবে। কিন্তু কেন ? ভাল লাগছে না এখানে ?

মন্দাকিনী হোটেলে থেকে সাধু-সন্ত-মহারাজদের নাগাল পেতে বড়ই অসুবিধা হচ্ছে। তাদের কাছে পৌঁছতে পারছি না, পারব না যে, তাও বুঝতে পারছি।

নাগাল পাওয়ার জন্য এমন কাঙালপনাই বা কেন ? আপনি Instant Coffee-র মতো Instant বৈরাগ্য প্রার্থী ?

না তা না।

ঠিক বলতে পারব না। বলব, যাকে সাধু বাংলাতে বলে "মন উচাটন" হওয়া, তাই হয়েছে। সে জন্যই...

বাঃ।

আমার গুরু বলেন, এই হল প্রকৃত সাধকের লক্ষণ। মানে, সাধক হওয়ার প্রস্তুতির লক্ষণ। দামি বলে যা-কিছুকেই জানতেন তার সব কিছুই হঠাৎ মূল্যহীন, অসার বলে ঠেকেছে তো ? হুমম। কিন্তু আমি যদিও ওঁকে গুরু বলি, উনি আমাকে কেন, কারওকেই শিষ্য বলে মানেন না।

বলেই বলল, আপনি জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির লেখা পড়েছেন ?

হ্যাঁ।

চারণ বলল, আচ্ছা আরও একটা কথা বলো তো ? তুমি তোমার পাঞ্জাবির বাঁ হাতের হাতাটা গুটিয়ে ঘড়িটা বের করে রেখেছ কেন ? দেখাবার জন্যই তো ? এটা কোন সাধনার লক্ষণ ? এটা কি এগজিবিশানিজম্ নয় ?

চারণের কথাতে খুব জোরে হেসে উঠল পাটন।

হাসছ কেন ?

হাসি পেল বলে।

তারপর বলল, এর পরে আপনি নিশ্চয়ই জিগ্যেস করবেন যে আমি রক্তচন্দন-রঙা টেরিকটের এবং ইস্ত্রি করা লুঙি-পাঞ্জাবি কেন পরেছি ? তাই না ?

চারণ লজ্জিত হল।

তারপর বলল, তোমার কথাটা ঠিকই।

তা হলে শুনুন। ঘড়িটা বাঁ হাতের কব্জিতে বের করে রেখেছি কারওকে দেখাবার জন্য নয়। না। এই দেখুন। ডান হাতের পাঞ্জাবির হাতা ডান হাতের আঙুল দিয়ে উঠিয়ে ঘড়ি দেখার উপায় নেই। ডান হাতটা সব সময়েই আটকে থাকে। এই দেখুন।

বলেই, ডান হাত বের করে দেখাল পকেট থেকে। চারণ দেখল, সত্যিই তার হাতে জপমালা।

তুমি জপমালা পকেটে নিয়ে ঘোরো ? চৌধুরীসাহেবের ছেলে। যিনি পশ্চিমবঙ্গের পয়লা নম্বরী ঢালাইওয়ালা, 'মাধুরী স্যানিটারি ন্যাপকিন'-এর মালিক...। তুমি গোয়ালিয়রের পাবলিক স্কুলের ছাত্র।

হ্যাঁ। ঘুরি। তারা টাকার জন্য মালা জপে আর আমি জপি মোক্ষর জন্য।

মোক্ষ ! হাসালে তুমি পাটন।

বলল, চারণ।

তারপর বলল, এই বয়সে মোক্ষর তুমি বোঝোটা কি ?

আবারও বয়স বয়স করছেন ! স্বামী বিবেকানন্দ মারা গেছিলেন কত বয়সে ?

চারণ চুপ করে গেল।

তুমি যাই বল, ব্যাপারটা অভাবনীয় আমার কাছে। প্রিন্স-অফ-ওয়েলস মালা জপছে রক্তচন্দন বসন পরে !

কেন ? এতে অবাক বা স্তম্ভিত হবার কি আছে ? অভাবনীয়ই বা কেন ? মুসলমানেরা তো দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ে। কি ? পড়ে না ? খ্রিস্টানেরা প্রতি রবিবারে চার্চে যায় না ? বৌদ্ধরা, সেই ডাব্বার মতন জিনিসটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, নাম মনে পড়ছে না, বলে না, ওঁ মণিপদ্মে হুঁম। ওঁ মণিপদ্মে হুঁম। ওঁ মণিপদ্মে হুঁম ? তা হলে লজ্জা কি শুধু পুজোআচ্চা করাতেই ? মালা জপাতেই ? স্তম্ভিত হবার কথা তো ছিল আমারই ! আপনার অজ্ঞতাতে অথবা ঔদাসীন্যে ! অথবা হিন্দু হয়েও আপনার হিন্দুত্ব অস্বীকার করার এই হাস্যকর চেষ্টাতে। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে ভারতবর্ষে বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গে এখন নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেওয়াটা আউট অফ ফ্যাশান।

আমি হিন্দু নই।

চারণ বলল।

আপনি তবে কি ?

আমি জন্মসূত্রে অবশ্যই হিন্দু, কারণ আমার মা-বাবা হিন্দুই ছিলেন। কিন্তু তোমার জানবার কথা নয়, তাই তোমাকে জানাবার জন্যই বলছি যে আমার প্রথম (এবং শেষও বটে) চাকরির দরখাস্তে Religion-এর যে Column ছিল সেখানে লিখেছিলাম "Hindu by birth but do not conform to any known form of Religion."

পাটন বলল, কোনও Known form of Religion-এ আপনার ভক্তি না থাকতে পারে কিন্তু আপনি কি ধর্মই মানেন না ?

ধর্ম মানে ইডিয়টসরা, হাফ-উইটসরা, জড়বুদ্ধিরা।

চারণ বলল।

পাটন দুঃখিত অথবা ক্রুদ্ধ অথবা অপমানিত কোনও কিছুই না হয়ে, হাসল।

ছেলেটা বয়স অনুপাতে সত্যিই বড় বেশি পেকে গেছে। সবজান্তা হয়ে গেছে। ভাবল চারণ।

পাটনের হাসিতে একটু শ্লেষও ছিল।

পাটন বলল, আপনি তা হলে যথার্থই এক জন নিটোল বাঙালি ইনটেলেকচুয়াল। কোনও ভেজাল নেই আপনার ইনটেলেক্ট-এ। ধর্ম-মানা মানুষ মাত্রই আপনার কাছে ইডিয়টস, হাফ-উইটস, জড়বুদ্ধি। Very well said indeed!

তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে, একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি এবারে ফিরে যাব। আপনার পেছন পেছন অন্য পথে অনেকই দূর চলে এসেছি।

সকলেই তো অন্যের পেছন পেছনই ভুল পথে চলে যায়। অনেক দূর। তারপর পস্তায়। তোমার এখনও সময় আছে। বয়স বেশি নয়। এখনও অন্যের পেছন ছাড়তে পার।

থ্যাঙ্ক ড্যু ফর দ্য অ্যাডভাইস স্যার।

ভেকধারী চৌধুরী, অধুনা পাটন মহারাজ বলল।

তারপর বলল, চলে যাবার আগে আমার এই ইস্ত্রি করা রক্তচন্দন-রঙা টেরিকটের বসনের রহস্যটাও জানিয়ে যাই। এ নিয়ে প্রথম দর্শন থেকেই আপনার মনে জিজ্ঞাসা জেগেছে যে তা বুঝতে পেরেছি।

কি করে?

বুঝেছি। কি করে, তা নাই বা জানলেন। তা হলে শুনুন, এই পোশাকও আমার নয়। আমার বলতে আমার গায়ের চামড়াটুকুই। তবে সুখের বিষয় এই যে চামড়াটা মানুষের, চোখের চামড়াসুদ্ধ, গণ্ডার অথবা শিম্পাঞ্জির নয়। পোশাকটি পথপাশের যে আশ্রম থেকে আমাকে বেরোতে দেখলেন, যেখানে গত রাতটি কাটিয়েছিলাম, সেই আশ্রমের এক সৌখিন সন্ন্যাসীর। আমার জিনের ট্রাউজার আর শার্ট ছিঁড়ে গেছে। একজোড়ার দুটিই। তাই সেলাই ও রিপু করতে দিয়েছি। আজ মানে, এখনই দিয়ে দেবে। যাঁর পোশাক তাঁকে ফেরত দিয়ে পুনর্মূষিকঃ হব।

চারণ অবাক হয়ে বলল, জিনস পরা সন্ন্যাসী?

পাটন বলল, পোশাকে কি আসে যায় বলুন? আমার গুরুও তো গেরুয়া পরেন না। মুসলমান কসাইরা যেমন চেক-চেক রঙিন লুঙি পরে, গাড্ডুবাবাও তাই পরেন। উপরে সাদা পাঞ্জাবি। টুইলের। তাঁর এক শিষ্য আছেন মুসলমান। তাঁর নাম ইমতিয়াজ। লানডান স্কুল অফ ইকনমিকস-এর ছাত্র ছিলেন।

ইমতিয়াজ?

চমকে উঠল চারণ।

কেমন দেখতে?

কে?

ইমতিয়াজ?

নবাবের মতন চেহারা। লক্ষ্ণৌ-এর মানুষ। কথায় কথায় শায়েরের ছেরছাড় করেন, যেন মির্জা ঘালিব। লম্বা। আগুনের মতন গায়ের রং। ছিপছিপে। আগে মোটা-সোটা ছিলেন কি না বলতে পারব না।

প্রত্যেক সেন্টেন্স-এ একবার করে ইনসাল্লা বলে কি?

ঠিক ঠিক। আপনি চেনেন নাকি তাঁকে?

চিনি। আমার সহপাঠী ছিল লানডান-এ।

তাই?

হ্যাঁ। কিন্তু সে কি হিন্দু হয়ে গেছে? কাফির বনেছে।

না। তা কেন বনবেন? তা ছাড়া আমার গুরুর মধ্যে তো কোনও রকম গোঁড়ামি নেই। থাকলে, মুসলমান শিষ্য কি থাকত? তবে ইমতিয়াজ মহম্মদ সাহেব এখানে থাকেন না বরাবর। বছরে দু-তিনবার ঘুরে যান। আমার গুরুর কাছে এসে নানা জিজ্ঞাসার নিরসন করেন, আলোচনা করেন তারপর ফিরে যান। কোরান, হাদিস-এর উপরে যেমন, কনফ্যুসিয়াস, স্পিনোজার উপরেও

তেমন দখল। পোলিটিকাল এবং ইকনমিক থিওরিতে যেমন, দর্শনেও তেমন দখল।

চারণ স্বগতোক্তির মতন বলল, জানি। তারপর বলল, ইমতিয়াজ মহম্মদ থাকে কোথায় এখন ?

তাঁর বাড়ি তো লক্ষ্ণৌতে। কিন্তু আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে না দিল্লির কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান যেন। দিল্লিতেই থাকেন। অত জানি না।

তাই ?

হ্যাঁ। এবারে আমি চলি।

কবে ফিরে যাবে ?

আজই যাব।

কখন ?

আমার জামাকাপড় পেলেই। তা ছাড়া, একটু রাবড়ি নিয়ে যাব গুরুর জন্য। রাবড়ি খেতে খুব ভালবাসেন গুরু।

বাঃ। বেশ ভোগী গুরু তো তোমার।

শুধু ভোগী নন, ত্যাগীও। তিনি গুরুবাদে বিশ্বাসী নন। আমরাই তাঁকে গুরু মানি। উনি কারওকেই দীক্ষা দেন না, কারও উপরেই নিজের কোনও মত বা ইচ্ছা বা দর্শন আরোপ করেন না। গাড্ডুবাবা এই ভাগীরথীরই মতন। তিনি নিজের খেয়ালেই বয়ে যান। কেউ সে নদীতে চান করে যায়, কেউ তা থেকে খাবার জল নিয়ে যায়, কেউ বা নোংরা কাপড় কাচে, কেউ বা হাতমাটিও করে। যার যেমন আস্থা, যার যেমন আধার।

বলেই বলল, আর দেরি করতে পারব না। অন্ধকারে পাহাড়ে চড়তে অসুবিধে হবে। ভুলে টর্চটাও ফেলে এসেছি।

তারপর দুপা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আপনি এখানে কি করতে এসেছেন চ্যাটার্জি সাহেব ?

বললামই তো। ঘুরতে। জাস্ট ঘুরতেই।

বাঃ। ভাল। 'মন উচাটন' রোগ যদি পুরোপুরি না সারে, তবে চলে আসবেন আমাদের গুহাতে।

চিনব কি করে ?

আপনিই পথ চিনে নেবেন। আপনি রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' পড়েছেন ?

না। তবে একবার নাটকটি দেখেছিলাম।

তাই ? তাতে ধনঞ্জয় বৈরাগীর সেই গানটি ছিল না ?

কোন গান ?

'পথ আমাকে সেই দেখাবে যে আমারে চায়।'

মনে নেই।

মনে পড়ে যাবে। চলি আমি, চ্যাটার্জি সাহেব।

চারণ তখনও অবিশ্বাসীর চোখে কলকাতার কোটিপতি বুজু চৌধুরীর একমাত্র ছেলের দিকে চেয়েছিল। ধীরে ধীরে পরম-বিস্ময় পাটন, নির্বাণের নৌকো-বাওয়া, খেয়াঘাটের-মাঝি, জনারণ্যে মিলিয়ে গেল।

পাটন চলে গেলে, চারণ বলতে গেলে, অনবধানেই ত্রিবেণী ঘাটের দিকে পা বাড়াল।

নানারকম দোকান সেই পথে। দর্জির, মনোহারির, হিন্দি বইয়ের, নানারকম ধর্মপুস্তকের। সরল গ্রামীণ তীর্থযাত্রীদের লুব্ধ করার জন্যে চোখ-ঝলসানো কাঁচের চুড়ির দোকান। কোথাও, কোথাও নানা-রঙা প্লাস্টিকের খেলনা। কোথাও বা গরম জিলাপি আর সিঙ্গাড়া ভাজা হচ্ছে। কোথাও পুরী আর আলুর তরকারি, লেবু ও লংকার আচার সহযোগে পরিবেশিত হচ্ছে। সস্তা ঘি আর আচারের গন্ধ উড়ছে হাওয়াতে। এখানকার দুধ খুবই ভাল। তাই, দুধের নানারকম মিষ্টিও অঢেল। রাবড়ি, মালাই।

চারণ ভাবল, এখানে সিদ্ধির সরবতও নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। কিন্তু কোথায় পাওয়া যায়, তার

খোঁজ জানে না। ভীমগিরি জানবেন হয়তো।

শ্লথ পায়ে, উদ্দেশ্যহীন এই চলা ওর। বেশ লাগছে চারণের।

যে কোনও আধুনিক শহরেই অধিকাংশ মানুষেই হাঁটে না, দৌড়োয়ই। দুলকি চালে চলে। TROT-এ। আর পশ্চিমে তো Literally দৌড়োয়। কলকাতার কথা আলাদা। কলকাতা তো তিলোত্তমা। কলকাতার তুলনা একমাত্র কলকাতাই। সেখানে সকলেই হয়তো অজানিতেই তাঁদের আলসেমি ও অনিয়মানুবর্তিতাতে এক একজন দার্শনিক বনে গেছেন। তাঁদের হাঁটা দেখলে মনে হয় যে, তাঁদের কোনও গন্তব্য তো নেইই, থাকলেও সেখানে পৌঁছবার জন্যে আদৌ কোনও তাড়া নেই।

এই যে!

কে যেন পথ চলতে চলতে নানা চিন্তাতে বুঁদ হয়ে-যাওয়া চারণের ঘোর ভাঙালে।

এই যে! চারণবাবু।

চারণ চেয়ে দেখল, ভীমগিরি। বিড়ি কিনছেন বিড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে। মাথায় একটা সস্তা বাঁদুরে টুপি।

চারণ হাসল। বলল, বিড়ি-সিগারেট খাওয়া ভাল নয়।

তারপরেই নিজের পকেট খুঁজে বিড়ির সেই বাণ্ডিলগুলো বের করল। করে, ভীমগিরিকে দিল।

কেন? ভাল নয় কেন?

ভীমগিরি শুধোলেন।

ফুসফুসে ক্যানসার হয়, হার্ট অ্যাটাক হয়।

হলে?

মানুষ মরে যায়।

কোনও মানুষই কি আর চিরদিনের জন্যে ইজারা নিয়েছে জীবন, চারণবাবু? জন্ম-মুহূর্তেই যে সত্য সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তা হল মৃত্যু।

ভীমগিরি বিড়িগুলো নিয়ে হেসে বললেন, সুক্রিয়া।

তারপর বললেন, মৃত্যু নিয়ে এত উদ্বেগ শুধুমাত্র ভোগী মানুষদেরই থাকে। আমার মতন একজন নগণ্য উদাসী যত তাড়াতাড়ি এই গরীব দেশের অন্নধ্বংস করা বন্ধ করি ততই তো মঙ্গল। এই ভাগীরথী, শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশ দিয়ে, এই ত্রিবেণী ঘাটের সামনে দিয়ে ঠিকই বয়ে যাবে। বসন্তর পরে গ্রীষ্ম আসবে, প্রতিবছরই, গ্রীষ্মর পরে বর্ষা, তারপরে শীত। ত্রিবেণী ঘাটও আজ সন্ধেরই মতন গমগম করবে রোজই, আমার মতন উদাসী, সাধু, সন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থীদের ভিড়ে। দিনের বেলা দক্ষিণ বাহিনী আর রাতের বেলা উত্তর বাহিনী হাওয়া ঠিক এমন করেই বয়ে যাবে, যেমন করে বইছে যুগযুগান্ত ধরে। 'কড়োয়া চওথ'-এ এমনি করেই প্রদীপ ভাসাবে সালঙ্কারা বিবাহিতা মেয়েরা। কোনও কিছুরই কিছুমাত্রই পরিবর্তন হবে না। শুধু আমিই থাকব না। এই ঘাটটিটুকুও কারও চোখেই হয়তো পড়বে না।

তারপর একটু থেমে বললেন, চারণবাবু, জীবন নিরবধি চলছে, চলবে। মানুষের জীবন বড়ই ছোট। এখানে জলের উপরে নাম লিখতে এসেছি আমি। অগণ্য সাধারণ মানুষেরই মতন। আমার মৃত্যুতে মহাদেবের ওই পাথরের চতুষ্পদ নন্দীও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না। তাই বলছিলাম, বিড়ি খাওয়ার সামান্য সুখটুকু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব কেন?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, তাছাড়া, আমরা প্রত্যেকেই তো প্রাপ্তবয়স্ক। কেউই শিশু নই। তাই "এটা কোরো না", "ওটা কোরো না" কারওকে না বলাই ভাল। কথা তো কেউই শুনবে না অন্যের। মধ্যে দিয়ে আপনিই মিছিমিছি নিজের মান হারাবেন।

চারণের দুকান লাল হয়ে গেল। চুপ করে রইল ও।

ভীমগিরি বললেন, চলুন। আজ আমার গুরুর কাছে দুজন বিদেশি শিষ্য এসেছেন। তাঁরাই গুরুসেবা করছেন। তাই আমি আজ একটু ঘুরে-ঘারে গিয়ে ভজনে বসব।

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

বিদেশি শিষ্য মানে ? কোন দিশি ?

অস্ট্রিয়া।

তারপরই তিনি জিগ্যেস করলেন চারণকে, আপনি কি গেছেন সে দেশে ? দেশটা কোনদিকে ?

গেছি। দেশটা পশ্চিমে। ইউরোপেরই দেশ একটি আর কী ! টীরল বলে একটি প্রভিন্স আছে অস্ট্রিয়াতে। দারুণ। জেনারাল রোমেল-এর নাম শুনেছেন আপনি ? তিনি সেখানেই জন্মেছিলেন।

কে জেনারাল রোমেল ?

জার্মান জেনারাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মরুভূমির যুদ্ধে যিনি বাঘা বাঘা ইংরেজ জেনারালদের, মন্টোগোমারি সুদ্ধ, একেবারে ঘোল খাইয়ে ছিলেন। জেনারাল রোমেলকে বলা হত 'ডেজার্ট-ফক্স'। মানে মরুভূমির শেয়াল। নাম শোনেননি ? তাঁর নাম শুনলেই শত্রুপক্ষের সৈন্যদের বুকের রক্ত হিম হয়ে যেত।

তাই ? নাঃ। শুনিনি।

হেসে বললেন, ভীমগিরি।

তারপরই বললেন, আমি শুধু একজন জেনারালেরই নাম শুনেছি। এ পৃথিবীর সব দেশে কত শয়ে শয়ে জেনারাল আছেন। সকলকে জানার সময় কোথায় ? প্রয়োজনই বা কি ? এই ছোট জীবনে একজনকে জানাই যথেষ্ট। তাঁর নামেই এ ভবতরী পার হয়ে যাব। তারপরে একটু থেমে বললেন, আপনাদের গোলমালটা কোথায় জানেন ?

কোথায় ?

আপনারা বড় বেশি জানেন। অত কিছু জানার প্রয়োজন নেই কোনও।

তাই ?

তা নয়তো কি ? জ্ঞান হলেই তো হল না, জ্ঞান তো হজমও করা চাই। গরু-ছাগলেও জাবর কাটতে জানে, শুধু জানল না মানুষে। ভাবলেও বড় অবাক লাগে।

কে তিনি ? মানে আপনার সেই একজন ?

ধিয়ানগিরি মহারাজ। আর কে আমার জেনারাল ? আমার গুরু।

বলেই, আবার হাসলেন।

এখানে সিদ্ধি পাওয়া যায় ?

প্রসঙ্গ বদলে, চারণ বলল।

সিদ্ধিলাভের জন্যেই তো এত মানুষের এখানে আনাগোনা। কেউ কেউ অবশ্যই পায়।

আহা ! সে সিদ্ধি না। মানে, খাওয়ার সিদ্ধি।

ও বুঝেছি। ভাঙ্গ এর কথা বলছেন ? অবশ্যই পাওয়া যায়। তা আপনি গুলি খাবেন, না সরবত ?

গুলি কখনও খাইনি। দশেরার দিনে সরবত খেয়েছি কয়েকবার।

সরবতই যখন খাবেন তো আমি নিজে হাতে বানিয়ে দেব। দোকানের সরবত ভাল নয়।

কোথায় বানাবেন ?

আমার ডেরাতে নিয়ে যাব।

আপনি তো ওই চাতালেই থাকেন। ডেরা আবার কোথায় আপনারা ?

এতদিন তাই ছিলাম। কাল রাত থেকেই উঠে গেছি ডেরাতে। পরশু থেকেই শীতটা বড় জাঁকিয়ে পড়েছে। বিন্ত ডাগদার বলেছেন আমার ব্লাড প্রেসার নাকি লো, তাই ঠাণ্ডা বেশি লাগে। তাছাড়া, সাইনাসাইটিস না কি রোগ, তাও আছে আমার। ঠাণ্ডা সয় না বেশি।

তাই ?

হ্যাঁ।

আর আপনার গুরু ?

গুরু আমার সিদ্ধপুরুষ। তিনবছর এই নদীতেই গলা অবধি ডুবিয়ে নাঙ্গা হয়ে বসেছিলেন।
বলেন কি ? কবে ? শীতেও ?
চমকে উঠে বলল, চারণ।
হ্যাঁ।
সে বহুদিনের কথা। সব ঋতুতেই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা। লাগাতার তিন বছর।
কেন ?
নিজেকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে। শরীরটা যে কিছু নয়, মনটাই আসল, এই জানাকে ধ্রুব করার জন্যে।
চারণ অবাক হয়ে গেল। ভাবল, এমনিতেই বেঁচে থাকতে কতরকম কষ্ট। তাতেও কুলোল না! নিজেকে আরও কষ্ট দেওয়া! এখনও পুরো শীত আসেনি তবুও নিজে ও এই বরফ-গলা নদীতে পনেরো মিনিটও থাকতে পারবে না। আর তিন বছর ?
তারপরই মনে মনে ভাবল, এসব গাঁজাগুল। সত্যি হতেই পারে না। এ সব করা হিউম্যানলি ইম্পসিবল। এ কথা সত্যি হওয়ার পেছনে কোনওই যুক্তি নেই। এঁরা নিজেরা গাঁজা খান বলে তো আর চারণ গাঁজা খায় না যে যা-ই শুনবে অশিক্ষিত তীর্থযাত্রীদের মতন তা-ই বিশ্বাস করবে ?
ভীমগিরি বললেন, যা ভাবছেন, তা নয়।
চমকে উঠে চারণ বলল, কি ভাবছি ?
যা ভাবছেন।
তারপরই বললেন, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।
বলেই, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
এই বাক্যটি এর আগে বহু মানুষকে বহুবারই বলতে শুনেছে চারণ। ও নিজেও হয়তো বলেছে কখনও সখনও সম্পূর্ণ অন্য প্রেক্ষিতে। কিন্তু আজ এই সন্ধেবেলাতে ত্রিবেণী ঘাটের পাশের গলিতে দাঁড়িয়ে ভীমগিরির মুখ থেকে শুনে বুঝতে পারল যে, ওই বাক্যটি জানত ঠিকই কিন্তু তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই ছিল না। বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস কলকাতাতে নিছকই দুটি শব্দ মাত্র। কিন্তু হৃষীকেশের এই ত্রিবেণী ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে শব্দ দুটির যে কী তাৎপর্য তা যেন বুঝতে পারছে একটু একটু।
চলুন এগোই। আজ আবার মাদ্রীও এসে বসে থাকবে।
মাদ্রী ! মাদ্রী কে ?
চেনেন না ? সেই যে গুরুবহিন আমার। আমার কাছে এসে কথা বলল না সেই রাতে ? দেখেছেন নিশ্চয়ই, মনে নেই আপনার ?
হবে।
স্বগতোক্তি করল চারণ। আসলে মনে ঠিকই ছিল। সেটা দেখাতে চাইল না।
চলতে চলতে ভীমগিরি বললেন, আমাদের এই সব হঠযোগ নিয়ে পশ্চিমী দেশে অনেক হাসি-তামাশা করা হয় বলে শুনেছি। কলকাতা বম্বে দিল্লির মতন বড় বড় শহরেও আপনাদের মতন ইংরেজি-নবীশেরাও করে থাকেন যে, তাও জানি। তাতে আমার গুরুর মতন যোগীর কিছুমাত্রই এসে যায় না অবশ্য। শুধু অঙ্গারই জানে, আগুনের মাহাত্ম্য। যারা আগুন পোহায়, আগুনে শুধু উষ্ণতাই খোঁজে, তারা আগুনের স্বরূপ সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানে। সকলকেই সব কিছু জানার জন্যে মাথার দিব্যিই বা কে দিয়েছে কাকে !
বলেই, একটি বিড়ি বের করে বলল, নিন, বিড়ি খান একটি। তারপরই বলল, এইরকম তিনবছর জলে ডুবে ছিলেন দুধাহারী বাবাও। হরিদ্বারে।
কি নাম ?
দুধাহারী বাবা। শুধু দুধ খেয়ে থাকতেন তাই নয়, তাঁর আশ্রমে আজও যেই যায় তাকে হয় দুধ, নয় লস্যি বিতরণ করা হয় বিনামূল্যে।

তিনি কি বেঁচে আছেন ?

না, গত হয়েছেন বহুদিন হল।

আমি যে এনেছিলাম, সেই বাণ্ডিলগুলো থেকে খেলেন না বিড়ি ?

চারণ বলল।

আপনি এনে দিয়েছেন তো বটেই। সবসময়েই 'আমি' 'আমি' করবেন না। আমিত্বকে পুরোপুরি মাটি চাপা দিতে হবে। এই প্রথম পাঠ। আমার এই বিড়ি সে বিড়ি নয়। এতে গাঁজা আছে। খেয়ে দেখুন।

গাঁজা খেলে কি হবে ?

চিন্তিত গলাতে বলল চারণ।

তাজা হবেন আর কী ! খেলে, মনের গ্রহণ ও প্রেরণ শক্তি বেড়ে যাবে, বৃষ্টির পরে প্রকৃতির যেমন হয়। আপনাদের বিলিতি মদের চেয়ে অনেকই ভাল। পশ্চিমী দেশের নেশা মাত্রই উত্তেজনা বাড়ায়। আর আমাদের নেশাকে, ঠিক নিস্তেজক বলব না, বলব এ নেশা নির্লিপ্তি আনে। গাঁজা বা ভাঙ্গ খেয়ে কেউ কারোকে ধর্ষণ করেছে এমন কি শুনেছেন কখনও ? খুনোখুনি করেছে ? কিন্তু মদ খেয়ে অনেকেই করে। করে কি না বলুন ?

হ্যাঁ। কাগজে তো প্রায়ই দেখি তেমন খবর।

গাঁজা খেলে না কি বিশেষ কোনও কোনও ক্ষমতা বাড়ে।

বাড়ে কি না বলতে পারে তেমনই মানুষ, যার দুরকমের অভিজ্ঞতাই আছে। অর্থাৎ, খেয়ে এবং না খেয়েও যে··· । বলব বলব, সে সব কথা হবে এখন। এবারে একটু পা চালিয়ে চলুন দেখি চারণবাবু।

দূর থেকে আলো-ঝলমল ত্রিবেণী ঘাট দেখা যাচ্ছিল। মাইকে ভজনের আওয়াজ ভেসে আসছিল। এত স্ত্রী পুরুষ, দেশ-বিদেশের কত বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা, কেউ ঘাটের দিকে যাচ্ছেন, কেউ ফিরে আসছেন। কেউ হাসিখুশি, কেউ বিমর্ষ। দ্রুতধাবমানা দীপমালা বুকে-করা গঙ্গা অন্ধকারে কতজনের সুখ দুঃখ বয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে হর-কি-পউরির দিকে।

ঘাটের কাছে এলেই মনটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যায়। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও দেখেছে যে এমনটি হয়। ভক্তি বা বৈরাগ্য বা ভীমগিরি সন্নিসীর ভাষায়, 'উদাসীনতা' (নিজেকে উনি 'উদাসী' বললেন আজ।) সম্ভবত কোনও বিশেষ স্থানের দান নয়। তা থাকে এক-একজনের অন্তরেরই মধ্যে। কোনও বিশেষ স্থান সেই ভাবকে উদ্দীপ্তই করে মাত্র।

দেখল, চাতালের সেই কোণে দুজন লম্বা শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সাদা ধবধবে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে ধিয়ানগিরি মহারাজের সামনে বসে আছেন জোড়াসনে। একজনের হাতে ফাইফ-ফাইফ-ফাইভ সিগারেটের খোলা-প্যাকেট, দুহাতে ধরে বাবাকে নিবেদন করছেন। অন্য জন, গাঁজার কলকে সেজে বাবার জন্যে ধরে আছেন। নিবেদন করবেন বলে স্থির। ধিয়ানগিরি মহারাজ যেন ধন্দে পড়েছেন আগে কোনটির সেবা করবেন তা নিয়ে। পাশেই, ভীমগিরির সেই গুরুবহিন মাদ্রী দাঁড়িয়ে আছে। আজ একটা লাল শাড়ি পরেছে মাদ্রী, সাদা ব্লাউজ। দেখে মনে হচ্ছে যেন তামাকের টিকেতে আগুন লেগেছে। কিন্তু মাদ্রীর গায়ের কালোরঙের কথা কারোরই মনে থাকবে না, তার সাদা দাঁতের হাসি একবার দেখতে পেলে। ওই হাসি দেখলেই বোঝা যায় যে ও সাধারণ নয়, হয় 'উদাসী' নয় 'সন্ন্যাসিনী'। গৃহী মানুষী অমন হাসি হাসতে পারে না। চারণ লক্ষ করল যে, আজও মাদ্রীর মাথাতে ফুল। আজকে বেণী বাঁধেনি, খোঁপা করেছে। মুখে বিন্দুমাত্র প্রসাধন নেই তার, সারল্য আর বুদ্ধির প্রসাধন ছাড়া।

ভীমগিরিকে তার ভালই লেগেছিল। কিন্তু এখনও তাঁর গুরু ধিয়ানগিরি সম্বন্ধে কিছুমাত্রই ব্যক্তিগতভাবে না জেনে তাঁকে ভাল বা মন্দ কিছুই এখনও লাগেনি। পরের মুখে ঝাল খাওয়া স্বভাব নয় চারণের। মানুষটি তার দিকে তাকিয়েছেন, ভীমগিরির পাশে বসে সেই রাতে অনেকক্ষণ যে

াারণ গল্প করেছে তাও লক্ষ করেছেন। কিন্তু তাতেই ধন্য হয়ে যাবার মতন কিছু ঘটেনি চারণের। এখনও অন্ধভক্তি বা মূর্তি বা ব্যক্তি-পুজোর মতন বোকামি তাকে পেয়ে বসেনি। তবে এ কথা ঠিক, যতই দিন যাচ্ছে, চারণ এই অনুষঙ্গে, এই প্রেক্ষিতে বেশ এক মজা তো বটেই একধরনের সম্ভ্রমও যেন বোধ করতে শুরু করেছে। ধিয়ানগিরি তাকে পাত্তা দেননি। তারই বা কি দরকার পড়েছে তাঁকে পাত্তা দেওয়ার। ওর কোনও পাটন-পাটনির দরকার নেই।

হঠাৎ পাশ থেকে ভীমগিরি বললেন, 'জগৎ আমি-ময়, তাই না চারণবাবু ?

ভীষণ চমকে উঠল চারণ।

তারপরই একটু ভয়ও পেয়ে গেল। এই উদাসী ভীমগিরি তো উদাসী মাত্র নন। যাই চারণ ভাবুক না কেন সঙ্গে সঙ্গেই তা জানতে পেরে যাচ্ছেন এই সন্নিসী। যেন, কোনও মন্ত্রবলে।

চারণ মাথা নেড়ে জানাল, যে, তাই। জগৎ আমি-ময়।

ভীমগিরি বললেন, জানেন, এক ব্যাধ গেছিল এক অদৃষ্টপূর্ব সাংঘাতিক হিংস্র জানোয়ারকে মারতে, গ্রামবাসীদের অনুরোধে। সেই জানোয়ারকে গ্রামবাসীরাও দেখেনি কেউই। কিন্তু তাদের গ্রামের লাগোয়া-জঙ্গলে সেই প্রাণীর ভয়ংকর উপস্থিতি টের পেয়েছে তারা নানাভাবেই। ব্যাধ যখন খুঁজতে খুঁজতে বনের মধ্যে এক তালাও-এর পাশের নিবিড় বনের মধ্যে আলোড়নের শব্দ শুনল হঠাৎ, তখন সে বিষাক্ত তীর, ধনুকের ছিলাতে চড়িয়ে অতি সাবধানে এগোল সেদিকে। এগোতে এগোতে যখন সেই ভয়ংকরের খুবই কাছে পৌঁছে গেল তখন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল সেই জানোয়ার। ব্যাধ চমকে উঠল নিজে, নিজেরই গলার স্বর শুনে। তারপরই দেখতেও পেল। তার নিজেরই চেহারা, তাকেই। তবে ভয়াবহ, রোমশ, পৃথুল, বিকটদন্তী, কোনও প্রাগৈতিহাসিক আরণ্যক জন্তুরই মতন।

জন্তু বলল, মারবি কাকে ? আমি বাইরের কেউ নই, আমি তোরই অন্তরবাসী। আমিই তুই। তোকে কাছে আনবার জন্যেই আমি গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে ছিলাম। তীর খুলে নে ছিলা থেকে। নিজেকে শাসন কর, শোধন কর, তোর অন্তরের জানোয়ারকে, শৃঙ্খলাবদ্ধ কর, তাহলেই আমার মৃত্যু হবে। তোর মধ্যে যে-আমি আছি, সেই-আমিকে গলা টিপে মেরে ফেল। যদি মানুষের মতন মানুষ হয়ে বাঁচতে চাস।

চারণ বলল, এ গল্প আপনি কোথায় পড়েছেন ?

কোথাওই পড়িনি। গুরুর মুখে শোনা। গুরু কোথায় পড়েছেন তা গুরুই বলতে পারবেন। পড়াশুনা আমি আর কতটুকু জানি। আমার যতটুকু শেখা, সবই গুরুমুখী।

ভীমগিরি মাদ্রীর কাছে চলে গেলেন।

চারণ কিছুক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে কী এক অপ্রতিরোধ্য টানে ধিয়ানগিরির কাছে পৌঁছেও তাঁর একেবারে সামনে গেল না। বুঝল, তার ভিতরের জন্তুটা তখনও একটুও দুর্বল হয়নি। সে ওই অস্ট্রিয়ান ছেলে দুটির পেছনে চাতালে বসে ঘাটের দিকে চেয়ে রইল যেন ও ধিয়ানগিরির প্রতি আদৌ মনোযোগী নয়। তবে কান দুটি খাড়া করে রাখল, আধো-শোয়া আধো-বসা উবু হয়ে থাকা অতি সাধারণ চেহারার সেই সন্নিসীর মুখনিঃসৃত কথা শোনার জন্যে।

এই অস্ট্রিয়ান যুবক দুটিও কি হিন্দি জানে ! তাদের বয়স চারণের চেয়ে পাঁচ-ছ-বছর কম হবে হয়তো। আরও কম হতে পারে। পশ্চিমদেশের আর পর্বতবাসীদের বয়স চট করে বোঝা যায় না।

গাঁজা-দেওয়া বিড়িটা খেয়ে বিশেষ কিছু যে মনে হল এমন নয়, তবে এক অভূতপূর্ব বোধ জাগতে লাগল ধীরে ধীরে। ভীমগিরি যেন বুঝতে পেরেই হঠাৎই উদয় হয়ে আর একটি বিড়ি দিয়ে গেলেন চারণকে। ছোট হয়ে-আসা প্রথম বিড়িটি থেকে চারণ দ্বিতীয় বিড়িটি ধরিয়ে নিল।

ছেলে দুটির মধ্যে একজন, যে, চাতালের উপরে কিন্তু ঘাটের দিকে বসেছিল, ইংরেজিতে বলল, গুরুজি, আপনি বললেন, Religion মানে "A force which binds together". কিন্তু হিন্দুধর্মর বাঁধন এমন আলগা হয়ে গেছে কেন ? এইরকম ধর্মস্থান ছাড়া হিন্দুধর্ম যে বেঁচে আছে তাই তো বোঝা যায় না। আমাদের মতে, মানে আমরা দেখি এদেশে এসে, ইসলামের বাঁধন, ধর্ম হিসেবে,

অনেকই দৃঢ়, অনেকই সহজ গোচর। প্রতি শহরে এবং গ্রামেও আমাদের ঘুম ভেঙে যায় আজানের শব্দে। অধিকাংশ মুসলমানই দিনে পাঁচবার না হলেও দুবার অন্তত নামাজ পড়েন। ধর্মাচরণ করাটা (Rituals) শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই কমবেশি কর্তব্য বলে মনে করেন দেখি অথচ শিক্ষিত হিন্দুরা ধর্মাচরণকে ছোট চোখে দেখেন। আপনি কি বলেন? এটা কি হিন্দুধর্মের দৌর্বল্য বা হীনতা?

কথাবার্তা সবই হচ্ছিল ইংরেজিতেই। চারণের নেহাত বিদেশিদের সঙ্গে নিত্য ওঠা-বসা ছিল, নিজেও একসময়ে পড়াশোনাও করেছিল ইংল্যান্ডে। তাই অস্ট্রিয়ান ছেলেটির ইংরেজি উচ্চারণ বুঝতে তার কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। কিন্তু ও অবাক হয়ে যাচ্ছিল ভিখিরির চেয়েও গরিব, প্লাস্টিকের নোংরা চাদরের চাঁদোয়ার নীচে কুঁজো হয়ে বসে, অ্যালুমিনিয়ামের খালি-দুধের বাসনের গায়ে তাল দিয়ে গুনগুনিয়ে গান-গাওয়া এই ধিয়ানগিরি সন্নিসী কী করে এইরকম অ্যাকসেন্টের ইংরেজি অতি সহজে বুঝছেন!

বুঝছেন যে, তা বুঝল তাঁর উত্তর শুনেই।

ধিয়ানগিরি যখন মুখ খুললেন, মিটিমিটি হাসতে হাসতে, তখন চমক লাগল চারণের তার ইংরেজি উচ্চারণ শুনেও। শুদ্ধ অক্সোনিয়ান উচ্চারণে কথা বলছেন ধিয়ানগিরি মহারাজ। যে উচ্চারণের কথা আজকের তেল-সাবান টিভি ভিসিআর বিক্রি করা 'ভারতীয় ইংরেজি'-বলা, অধিকাংশ অ্যাড-এজেন্সির সর্বজ্ঞরা অথবা তাঁদের মক্কেলেদের এক-লাথি দু-লাথি চাকরেরা কল্পনাতেও আনতে পারেন না।

খুবই লজ্জা পেল চারণ, নিজেরই কারণে। ভাবল, সাহেবরা পাত্তা দিচ্ছে, এ দেখে বা ধিয়ানগিরি দারুণ সাহেবি ইংরেজি বলছেন বলেই কি তার মনে সম্ভ্রম এল সন্নিসী সম্বন্ধে? ছিঃ। ছিঃ। ছিঃ।

হতেও পারে। ইংরেজরা এদেশে থাকাকালীন ওদের উপরে যতখানি প্রভুত্ব করতে পেরেছিলেন, তাঁরা চলে যাবার পঞ্চাশ বছর পরে সেই প্রভুত্ব আরও অনেকই বেশি দৃঢ় হয়েছে। তবে তার প্রকৃতি পালটে গেছে। উইনস্টন চার্চিল কবরের মধ্যে শুয়ে তাঁর বিদ্রূপাত্মক হাসিটি হয়তো সমানে হেসে চলেছেন। উনি বলেছিলেন যে, এই অসভ্য বর্বর মানুষেরা (ভারতীয়রা) নিজেদের স্বাধীনতার যোগ্য করে তোলেনি এখনও।

কে জানে। হয়তো তিনি ঠিকই বলেছিলেন। স্বাধীনতার যোগ্যতা যদি চারণদের সত্যিই থাকত তাহলে পঞ্চাশ বছরে দেশের অবস্থা এইরকম করে তুলত না। হয়তো নিজেদের স্বরাজ এমন নৈরাজ্যে এসে পৌঁছত না।

পরক্ষণেই অস্ট্রিয়ান শিষ্যর কঠিন প্রশ্নর উত্তরে ধিয়ানগিরি কি বলেন তা শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইল চারণ সমস্ত মনোযোগ সেদিকে দিয়ে।

ধিয়ানগিরি হেসে বললেন, সব ধর্মেরই বাহ্যিক রূপটি একরকম নয়।

তারপর একটু চুপ করে থেকে কী যেন ভেবে বললেন, তুমি কি আমাদের ফল্গু নদী দেখেছ? গৌতম বুদ্ধ যেখানে বোধিলাভ করেছিলেন সেই বোধগয়ারই পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ফল্গু। অন্তঃসলিলা।

সাহেবরা সমস্বরে বলে উঠল ইয়েস ইয়েস, নিয়ার গায়া।

ধিয়ানগিরি হাসলেন। উনি জানতেন যে গয়াকে ওরা গায়া উচ্চারণ করবে।

তারপর বললেন, সে নদীর দুটি শাখা নদীও আছে। নাম, জাঁম আর ইলাজান।

দ্বিতীয় শিষ্য বলল, জাঁম। অদ্ভুত নাম তো।

অদ্ভুত নয় বেটা। আমাদের দেশ মস্ত দেশ। বহু ভাষাতে কথা বলে এখানে মানুষ। অধিকাংশ মুসলমানের ভাষাই হল উর্দু। জাঁম শব্দটা একটি উর্দু শব্দ।

জাঁম মানে কি?

এক শিষ্য প্রশ্ন করল।

ধিয়ানগিরি হাসলেন।

কাছ থেকে তাঁর হাসি দেখে চারণ এই প্রথমবার বুঝল যে, এই ব্যক্তিটির সঙ্গে তার অনেকই

অমিল। এমন সরল পবিত্র হাসি বহুকাল দেখেনি কারওকেই হাসতে।

উনি হেসে বললেন, "জাঁম মানে, পানপাত্র।" বিখ্যাত এক মুসলমান কবির কবিতা আছে :

"অ্যায়সা ডুবাই তেরী আঁখো কি গেহ্‌রাইমে,

হাত মে জাঁম হ্যায়, মগর পীনেকি হোঁস নেহি।"

চারণ মুগ্ধ হয়ে গেল এবারে ধিয়ানগিরির উর্দু উচ্চারণ শুনেও। যদিও মানেটা সাহেবের ঠিক বোধগম্য হল না।

তারপরই বললেন, Hinduism, as a religion is like that river. River Falgu. It is not apparent. The water flows Beneath the sands Unseen.

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, You have to scratch a Hindu to find Hinduism in Him.

অর্থাৎ হিন্দুধর্ম ফল্গু নদীরই মতন অন্তঃসলিলা। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না যে, আছে।

তারপর ধিয়ানগিরি গাঁজার কল্কেতে একটান দিয়ে কিছুক্ষণ দম আটকে রেখে তারপর ধুঁয়ো ছেড়ে বললেন, এই ধর্মের আচার-আচরণ, রেজিমেন্টেশান, অন্য ধর্মের চেয়েও অনেক কম দৃশ্যমান কিন্তু ফল্গুর বালি খুঁড়লেই তবেই যেমন জল বেরোয় তেমনই কোনও শিক্ষিত ইংরেজিনবীশ, ধর্মে আপাত-অবিশ্বাসী উচ্চমণ্য হিন্দুকে খোঁচাখুঁচি করলে হিন্দুত্ব যে নিহিত আছে তার চামড়ার নীচে, তখনই তা বোঝা যাবে।

এ কথা কেন বলছেন ? একটু বুঝিয়ে বলুন।

প্রথম শিষ্য নিজের কল্কেতে টান দিয়ে বললেন।

বলছি, এ জন্যে যে, এটাই সত্যি। আজকের অর্ধশিক্ষিত, দাম্ভিক, স্বাভাবিক বুদ্ধিরহিত অগণ্য ধর্ম-বিশ্বাসহীন আধুনিক হিন্দুদেরও কানে যখন মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টা, ফুলের আর ধূপ-ধুনোর গন্ধ, তাদের সদ্য-স্নাতা মা-ঠাকুমার লালপেড়ে গরদের বা তাঁতের বা মিলের শাড়ির গন্ধ স্মৃতি থেকে উঠে আসে নাকে, সেই সব পবিত্র, পাখিডাকা সকাল-সন্ধে, পুজোর ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে যখন ফিরে আসে তাদের মস্তিষ্কে, তাদের স্মৃতিতে, পরিযায়ী পাখিদেরই মতন বহুদূরের বিস্মৃতি ও পণ্ডিতম্মন্যতার কুয়াশা-ভেজা জলাভূমি থেকে, তখন তারা বুঝতে পারে এবং বোঝেও যে, ঈশ্বরবাদ যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ হয় (তারা 'প্রমাণ' বলতে যা বোঝায়) তবে নিরীশ্বরবাদও সমানভাবেই প্রমাণ সাপেক্ষ। ধর্ম মানা বা ধার্মিক হওয়ার মধ্যে কোনওই লজ্জা নেই। সে ধর্ম, যে ধর্মই হোক না কেন। সে হিন্দু বলে তার লজ্জিত হওয়ারও বিন্দুমাত্র নেই, যদি না সে সর্বার্থে অজ্ঞ এবং কাপুরুষ হয়।

ধিয়ানগিরি অবশ্যই হুবহু এই ভাষাতে বলছিলেন না। তবে চারণ, অন্য কিছু না জানলেও ইংরেজিটা হয়তো ধিয়ানগিরির চেয়ে একটু ভালই জানে, তাই ধিয়ানগিরির বক্তব্য তার নিজের ভাষাতে ব্যক্ত করতে গিয়ে হয়তো একটু অন্যরকম করে ফেলল।

একটু চুপ করে থেকে আবার ধিয়ানগিরি বললেন, ইসলাম কি শেখায় জান ? শেখায়, আল্লা ছাড়া দ্বিতীয় কারও কাছেই মাথা নোয়াবে না। আমাদের হিন্দুধর্মও তাইই শেখায় : ঈশ্বর ছাড়া আর কারওকেই ভয় করবে না।

তবে, মাঝে মাঝেই যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় এই দুই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আপনাদের ভারতে ?

বাঁদিকে বিদেশি শিষ্য জিগ্যেস করলেন।

সব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই গুণ্ডা বদমাইস থাকে। মানুষ হিসেবে যারা বাজে। তাদের চেয়েও বড় বদমাইস সব ধর্মের রাজনীতিকেরা। শালারা সবাই গিধ্বড়। ধর্মাবলম্বীদের এক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ সব কালেই সব দেশেই ছিল, ক্রিশ্চান-ইহুদি, ইহুদি-মুসলিম, মুসলিম-হিন্দু কিন্তু কোনও ধর্মের সঙ্গেই অন্য ধর্মের বিরোধ নেই। কখনওই ছিল না। All Roads lead to Rome।

বলেই, হেসে, এমন এক টান লাগালেন তাঁর গাঁজার কল্কেতে যে, কল্কে প্রায় ফাটে ফাটে আর কী ! তারপর আবারও দম বন্ধ করে রইলেন, গাল ফুলিয়ে বেশ অনেকক্ষণ। চোখ দুটি লাল হয়ে

বড় হয়ে গেল। চোখের মধ্যেও যে শিরা আছে, থাকে, তা দৃশ্যমান হল।

দুই বিদেশি শিষ্য মন্ত্রমুগ্ধের মতন বসে রইলেন গুরুর পায়ের কাছে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। তাঁদের মুগ্ধতার অনেকখানিই গুরুর বহুমুখী পাণ্ডিত্যর কারণে। আর কিছুটা এল গঞ্জিকা সেবনেরও ফলে। চারণ এখানে এসে পৌঁছবার ঠিক কতক্ষণ আগে থেকে তারা গুরু এবং গঞ্জিকার সেবা করছিল তা অবশ্য জানা ছিল না চারণের। তবে, খুব বেশিক্ষণ হবে না। সন্ধে তো হয়েছে মাত্র ঘণ্টা-খানেক ঘণ্টা-দেড়েক হবে।

চারণ উঠে পড়ল।

ভাবল, জ্ঞান আহরণ ভাল কিন্তু একসঙ্গে ডোজ বেশি হয়ে গেলে দলমা থেকে আসা পুরুলিয়ার বা মেদিনীপুরের Over-Tranqulaised বুনো-হাতিরই মতন বেঘোরে অক্কা পাবে। সবে গাঁজার নেশা জমেছে চারণের, গুরুর নেশাও। এখুনি সে মরতে চায় না আদৌ।

সে একটু তফাতে গিয়ে বসল চাতালে। গুরু আজও তাকে পাত্তা দিলেন না। সেও বিশেষ পাত্তা দিল না। পাত্তা দেবার মতন কিছু হয়ওনি। গুরু যত বড় মানুষই হন না কেন চারণকে তিনি ইম্পর্ট্যান্ট মনে করলে তবেই চারণ তাঁকে ইম্পর্ট্যান্ট মনে করবে।

আপাতত, তাঁর ভীমগিরিই ভাল।

মাদ্রী মেয়েটির মুখে সবসময়েই হাসি ঝুলে থাকে এবং একটি আলগা শ্রী-র সঙ্গে আলগা দীপ্তি, তার চুলের ফুলেরই মতন। এই দীপ্তিময়ী শ্রী, তার গায়ের রঙের কালিমাকে ধুয়ে-মুছে দিয়ে তাকে এক আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। প্রথম দর্শনেই মনে হয়েছিল চারণের যে, মাদ্রী যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যকের ভানুমতী। রাজা দোবরু-পান্নার কন্যা, পথ ভুলে, লবটুলিয়া বইহার বা নাড়া বইহারের তৃণভূমি পেরিয়ে, মহালিখাপুরের পাহাড়ের মায়া কাটিয়ে, এই শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশে প্রবাহিত পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর পাশে এসে থিতু হয়েছে। এখনও সে অবিবাহিতা। 'অতি বড় বরণী না পায় বর, অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর'। চারণের মা এই বাক্যটি বলতেন ওদের ছেলেবেলায়। মানেটা তখন ঠিক বোঝেনি, আজও বোঝে না। তবে আন্দাজ করতে পারে অবশ্যই।

মাদ্রী, ভীমগিরিকে ছেড়ে, সেদিন যেমন ঘাটের দিকে গেছিল, তা না গিয়ে বাজারের অলিগলির মধ্যে ঢুকে আলো-ঝলমল বহুবর্ণ কাঁচের দোকানের সারির মধ্যে তার লাল-শাড়ি পরে হারিয়ে গেল।

ভীমগিরি, চারণকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বলল, এবারে একটু ভজন করা যাক।

চারণ বলল, করুন। ভজন শুনব বলেই তো বসে আছি। আপনার গলাতে সপ্তসুর জীবন্ত হয়ে ওঠে।

ভীমগিরি লজ্জা পেয়ে বললেন, ছিঃ ছিঃ। আমি গান গাইতেই জানি না, সপ্তসুরই সুপ্ত এখনও। গান করেন আমার গুরু। যেদিন শুনবেন, সেদিন বুঝবেন।

ঠিক সেই সময়ে একজন সন্নিসী যেন শূন্য থেকেই উদিত হয়ে ভীমগিরির সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার পথজুড়ে। তার পিঠের উপরে গোল করে পাকানো একটি চিতল হরিণের চামড়া। বেঁটে-খাটো, গাঁট্টা-গোট্টা চেহারা। গায়ের রঙ কালো না হলে হুবহু ডিয়েগো মারাদোনা বলে চালিয়ে দেওয়া যেত অনায়াসে। তবে বয়স হয়েছে পঞ্চাশ-মতন। ভীমগিরি তাঁকে দেখেই ভজনের তোড়-জোড় ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন।

আগন্তুক বললেন, মেধানন্দ মহারাজ নেই?

মেধানন্দ?

প্রথমে অবাক হলেন, তারপরে একটু ভাবলেন ভীমগিরি।

তারপর বললেন, আমার গুরু হয়তো তাঁকে জানাতে পারেন। আমি তো তাঁকে জানি না। কোথায় থাকতেন তিনি?

এই ত্রিবেণী ঘাটেই।

কোন সময়ে?

তা বছর কুড়ি আগে হবে।

ভীমগিরি আগন্তুককে ধিয়ানগিরি মহারাজের কাছে নিয়ে গেলেন। দূর থেকে, ধিয়ানগিরি মহারাজ এবং আগন্তুক সন্নিসীর মধ্যে কি কথা হল শুনতে পেল না চারণ ঘাটের গোলযোগের মধ্যে তবে দেখল যে, আগন্তুক ধিয়ানগিরির কাকের বাসার মতন বাসাটিরই অনতিদূরে খোলা আকাশের নীচে পিঠের মৃগচর্মটি বালির উপরে সমান করে পেতে নদীতে গেলেন আচমন করতে। একটু পরেই ফিরে এসে, ওই চিত্রল হরিণের চামড়ার আসনের উপরে পদ্মাসনে পশ্চিমে চেয়ে ধ্যানে বসলেন।

ভীমগিরি তাঁকে বসিয়ে দিয়ে, আবার চারণের কাছে ফিরে এলেন।

বললেন, বহু দূর থেকে আসছেন। সারাদিন অভুক্ত আছেন।

উনি কে ? এলেন কোথা থেকে ?

ওঁর নাম স্বামী পদ্মানন্দ, মেধানন্দ মহারাজের শিষ্য। মেধানন্দ মহারাজ নাকি সিদ্ধ-যোগী ছিলেন। আমার গুরু তাঁকে জানতেন। তবে তিনি এই ঘাটেই দেহ রেখেছেন আজ প্রায় দশ বছর হল। এখানের অনেক আগন্তুক সাধু-সন্তই তাঁর কথা জানেন না। পদ্মানন্দ এখন এসেছেন পউরি থেকে। কিন্তু থাকেন কুমায়ুঁ হিমালয়ের বিনসার-এ।

পউরি জায়গাটা কোথায় ?

গাড়োয়াল হিমালয়েই। তবে বেড়াবার জায়গা হিসেবেই বেশি পরিচিত।

ভীমগিরি বললেন, তেহরি-গাড়োয়ালে গেছিলেন কাজে। ফিরেও যাবেন আবার পউরি হয়েই, পাহাড়ে পাহাড়ে। সারাদিন খাওয়া দাওয়া করেননি। এদিকে সন্ধেও হয়ে গেছে। আজ আর কিছু খাবেন না। ধিয়ান সেরেই শুয়ে পড়বেন ভজন করে।

এসেছিলেন কেন ?

গুরু সন্দর্শনে।

ও।

বলল, চারণ।

তা উনি থাকবেন কোথায় ?

এই চাতালেও থাকতে পারেন। যদি অসুবিধে হয় তো নিয়ে যাব ওঁকে কালিকমলি বাবার আশ্রমে। গুরু আমাকে বলেই দিয়েছেন। আমি যখন ভজন করব তখন ওঁর উপরে একটু নজর রাখবেন তো। ধ্যান শেষ হলেই আমাকে তাঁর সেবা করতে হবে। গুরুর আদেশ।

সেবা ? এঁকে তো আপনি চেনেনই না। অচেনা মানুষকে, যাঁর প্রতি আপনার কোনও ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই, তাঁকে সেবা করবেন ? মনের সায় পাবেন সেবা করার ?

নিশ্চয়ই।

কী আনন্দ পান এমন অপরিচিত আনজান মানুষের সেবা করে ? কি সেবা করবেন ?

আগে পদসেবা করব। কতদূর থেকে হেঁটে এসেছেন।

পুরোটা হেঁটে এসেছেন ?

না পুরোটা নয়। নরেন্দ্রনগর থেকে।

কেন ?

বাসভাড়া ছিল না, তাই।

সত্যি ?

হ্যাঁ।

পদসেবা করবেন ?

হ্যাঁ।

বদলে কি পাবেন ?

ভীমগিরি হেসে ফেললেন।

তারপরে বললেন, আমার গুরু একটা কথা বলেন। বলেন, এখন না হয় টাকাপয়সার চল হয়েছে। মুদ্রা, কাগজের টাকা, কিন্তু মানুষের সভ্যতার গোড়ার দিকে যদি পেছনে হেঁটে যান তবেই মনে পড়বে যে তখন কারেন্সি ছিল না, "Legal Tender" বলতে আজকে আমরা যা বুঝি তা ছিল না।

আপনি "Legal Tender" শব্দের মানে জানেন ?

অবাক হয়ে বলল চারণ।

ভীমগিরি হাসলেন। বললেন একটু একটু জানি বই কী ! সব কিছুই কি আর বই পড়ে শিখেছি ? জীবনের পথে চলতে চলতে আপনাদের মতন অনেক মানুষের সঙ্গে মিশেছি, যেখানেই গেছি, ভাল ভাল গুরু পেয়েছি। আমি খুবই ভাগ্যবান বলতে হবে। আমার এক গুরু ছিলেন সাবারিমালাতে, তিনি ফিজিসিস্ট। অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে ছিলেন। সন্নিসী হয়ে গেছেন।

সাবারিমালাটা আবার কোথায় ? এ জায়গার তো নাম শুনিনি।

দক্ষিণ ভারতের কেরালাতে। খুব উঁচু পাহাড়ের উপরে সে তীর্থ। এখানকার কেদার বদ্রীরই মতন বছরের এক বিশেষ সময়ে সেই তীর্থ করতে হয়। কালো পোশাক পরে পদব্রজে যেতে হয় সেখানে।

কালো পোশাক ?

হ্যাঁ। সকলেই কালো পোশাক পরে যেতে হয়। পুরো দক্ষিণাঞ্চল থেকে তামিল, তেলেগু, কন্নড়, সকলেই যান সেই তীর্থে। তবে মেয়েদের···

মেয়েদের যাওয়া বারণ ?

সব মেয়েদের নয়। যাঁরা রজস্বলা তাদের যাওয়া বারণ। ঋতুমতী হবার আগে অথবা ঋতুবন্ধ হওয়ার পরে যেতে কোনও বাধা নেই।

কদিন লাগে সেই তীর্থে, মানে তীর্থ শেষ করতে ?

নির্ভর করে। অনেকে পুরো পথটিই হেঁটে যান, পায়ে হেঁটে পাহাড়ে চড়েন, যেমন এখনও অনেকে যান কেদার-বদ্রীতে পায়ে হেঁটেই, অমরনাথে, কৈলাসে, মানস সরোবরে। পায়ে না হাঁটলে কি পৃথিবীকে জানা যায় ? নিজের মনের চালই খোলে না। মন গাঁটে-গাঁটে আটকে থাকে যে। না হাঁটলে পায়ের বাতেরই মতন মনের বাতও ছাড়ে না। একা পদব্রজে কোথাওই যাওয়াটা, উদাসী হতে হলে, খুবই দরকার।

আর সন্ন্যাসী হতে হলে ?

ভীমগিরি আবারও হাসলেন, একেবারে disarming হাসি।

বললেন, বলেইছি তো ! সন্নিসী বা সাধু সন্ত কি সকলের হওয়া হয়ে ওঠে চারণবাবু ? সারা জীবন সাধুসঙ্গে থেকেও অনেকেরই হওয়া হয়ে ওঠে না আবার অনেকে ঘনঘোরা ভয়াল সংসারের মধ্যে থেকে তার সব দাবি অবহেলে মিটিয়েও পংকের মধ্যে ডুবে থেকেও সন্ত হতে পারেন। পাঁকের মধ্যে বাস করেও পাঁক লাগে না তাঁদের গায়ে, পেঁকো গন্ধ থাকে না, তাঁরা পদ্মর মতন ফুটে থাকেন পাঁকেরই মধ্যে। আসল হল আধার চারণবাবু। আধারটাই আসল। আমার গুরু বলেছেন না, আপনার আধার ভাল।

চারণ লজ্জিত হল নতুন করে। একটু ভীতও হল। মাত্র কদিনের মধ্যেই সে কলকাতা থেকে এসে ক্রমশ এ কোন এক অন্য জগতে ঢুকে পড়ছে অনবধানে ? একের পর এক ঘটনা, একের পর এক অভিঘাত তাকে এ কোন অন্য নিয়তির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে, ও ঠিক বুঝতে পারছে না। এই অনুষঙ্গ, এই পরিবেশ, এই হৃষীকেশ, ত্রিবেণী ঘাট এসবই কি টানছে শুধু ? না, তাও বোধহয় নয়। ওর মনের ভিতরে বহুদিন ধরে যে শূন্যতা, যে অসারতা যে উদ্দেশ্যহীনতা বাসা বেঁধেছিল তাই ত্বরান্বিত করছে তার এই তাড়াতাড়ি বদলে যাওয়াটাকে।

যা বলছিলাম, ভীমগিরি বললেন। বলছিলাম, গুরু বলেছিলেন, আগে মানুষে Barter System এ জিনিস দেওয়া-নেওয়া করত। Currency বা সোনা রুপো বা তামার মুদ্রাও ছিল না তখন। তাই

তো। ছিল কি ?

না। কিন্তু কি বলতে চাইছেন আপনি ?

চারণ বলল, একটু অধৈর্য হয়ে। হয়তো একটু বিরক্তিরও সঙ্গে।

বুঝলেন না, কি বলতে চাইছি ?

না।

সভ্যতার গোড়াতেও মানুষের দেনা-পাওনার জ্ঞানটা আজকের মতনই টনটনে ছিল। লেন-দেন এর। তুমি নুন দাও তো আমি বদলে চাল দেব। আমি হাঁসের ডিম দিচ্ছি তুমি খাম আলু দাও বদলে। তার মানে কি ? মানে, কোনও কিছুই আমরা দেওয়া-নেওয়া করতে শিখিনি নিজেদের স্বার্থ-ছাড়া। আর Barter ই বলুন, Shopping ই বলুন এই দেওয়া-নেওয়ার তাগিদই তো আমাদের চালিত করে ! আজকের পৃথিবীর যা-কিছু ক্রিয়া-কাণ্ড দৌড়ো-দৌড়ি দেখেন এর সবই তো এই দেওয়া-নেওয়া লেন-দেনে নিজে কতটা বেশি লাভবান হওয়া যায় এই জন্যেই। আমার কত বাড়ল Profit? এই তো এখন একমাত্র সাধনা। না কি ?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমার গুরু প্রথম দিনে, যেদিন আমাকে চেলা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, আমাকে বলেছিলেন, তুই যে আমার সেবা করতে এসেছিস ? কি জন্যে ? কিসের লোভে ? কী পাবি তুই ?

আত্মার শান্তির জন্যে, উন্নতির জন্যে।

আমি বলেছিলাম।

তোর মাথা।

গুরু বলেছিলেন।

তারপর বলেছিলেন, এ সংসারে কেউ কারওকে কিছুই শেখাতে পারে না। যারা বলে যে পারে, তাদের ঘামণ্ড যায়নি এখনও। আর যারা বলে যে, তারা অন্যের কাছ থেকে শিখতে পারে, তাদেরও ঘামণ্ড সবে তৈরি হচ্ছে। কান খুলে শুনে রাখ যে, আমি তোকে কিছুই শেখাব না, কোনও জ্ঞানই দেব না। কারওকে বিলি করার মতন জ্ঞান নেইও আমার। অন্য দশজন মানুষেরই মতন তোর ভিতরে যে এঞ্জিনটা আছে, যা নিরন্তর জ্ঞান তৈরি করে জনমাবধি নিজের ভেতরে, সে যদি তা তৈরি করে নিতে পারল তো পারল, নইলে অন্যে কেউই তোকে কিছুই দিতে পারবে না। তুই শুধু দিয়েই যাবি, পদসেবা করবি, গাঁজা সেজে দিবি, অসুস্থ হলে আমার শুশ্রূষা করবি। হাঁসের ডিম দিবি, খাম আলু দিবি, নুন দিবি, চাল দিবি কিন্তু বদলে চাইবি না কিছুমাত্রই। চাইলেও, পাবি না আদৌ। কিছু দিয়ে, বদলে যদি কিছুমাত্রও চাস তাহলে তোর দেওয়াটা দান আর রইবে না, বিনিময় হয়ে যাবে। 'Barter', 'Exchange', 'বাণিজ্য'। হৃদয়ের গোড়া থেকে এই লেনদেন এর ব্যাপারটা, সংজ্ঞাটাকেই তোর একেবারে নির্মূল করে মুছে ফেলতে হবে। বদলে কিছুমাত্রই না চেয়ে।

এতকথা যে ভীমগিরি একনাগাড়ে বলে গেলেন ঠিক তা না। ধীরে ধীরে, ধুনির আগুনের কাঠের অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস, কাঠের জ্বলে-ওঠার অস্ফুট শব্দ, আগুনের ফুলকির ঊর্ধ্বপানে উঠে নিঃশব্দে মিলিয়ে যাওয়ারই মতন করে বললেন, আলতো করে। আমাকে শোনাবার জন্যেও নয়, যেন স্বগোতোক্তিই করছেন, এমনইভাবে।

ভারী ভাল লাগল চারণের। Shopping এর জীবন যে জীবন নয়, Barter এর জীবনও যে জীবন নয়, জীবনের এই এক সম্পূর্ণ অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য নতুন ব্যাখ্যা ওকে বুঝতে শেখাল, ঠিক বুঝতে নয়, অনুভব করতে শেখাল, কেন এত আধন্যাংটো মানুষ, তার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী ও শিক্ষিত, ভারতের বিভিন্ন জায়গার সব মানুষ, সারা দেশের এই ত্রিবেণী ঘাটেরই মতন অগণ্য ঘাটে, দুর্গম অরণ্যে, পর্বতে, কন্দরে, গিরি গাত্রে, মরুভূমিতে, নির্জন নদীর মধ্যের নির্জনতম দ্বীপে, বছরের পর বছর এমন কি সারা জীবনও অবহেলে কাটিয়ে দেন, কারও কাছে কিছুই বিন্দুমাত্র না চেয়েও।

এমন সময়ে হঠাৎই দূরের এক শেঠের বাড়ির কোনও আলোকোজ্জ্বল উৎসবের প্রাঙ্গন থেকে অ্যামপ্লিফায়ারে জোরে ভেসে এল মাধুরী দীক্ষিতের লিপ-দেওয়া সেই গান : টুক টুক টুক টুক টুক

টুক, চোলি কা পিছে ক্যা হ্যায় ? মেরী চুনরী কি পিছে কেয়া হ্যায় ?"

দ্য সঙ অফ দ্য টাইম।

এক দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটে উঠল চারণ চাটুজ্যের মুখে।

"চোলিকে পিছে ক্যা হ্যায়" তা যেন এই প্রথমবার বুঝতে পারল ও। সাচমুচ। শুধু পৃথিবী-বিখ্যাত আর্টিস্ট এম এফ হুসেইন এর বন্দিত সুন্দরী নায়িকার চোলিকা পিছেই নয় শুধু এই পৃথিবীর আপামর নারী এবং নারীর হৃদয় আর মস্তিষ্ককে আড়াল করে যা-কিছুই আছে, তার সব কিছুরই অপার অসারতা তাকে আবিষ্ট করে ফেলল যেন।

সে রাতে মন্দাকিনী হোটেলের দিকে ঠাণ্ডার মধ্যে হেঁটে হেঁটে ফিরে আসতে আসতে ভাবছিল যে, ভীমগিরিও নিশ্চয়ই উচ্চশিক্ষিত। পূর্বাশ্রমের কাহিনী তিনি মিথ্যে করে বলেছিলেন সম্ভবত চারণকে। মহারাষ্ট্রের এক গ্রামের স্কুলের ছাত্রর পক্ষে Barter, Currency এবং অর্থনীতির গোড়ার এসব কথা, ডিম্যান্ড-সাপ্লাই এবং লেনদেনের ব্যাপার-স্যাপার এমন প্রাঞ্জলভাবে শুধু নিজেই বোঝা নয়, অন্যকেও বোঝানো বড় সহজ কথা নয়।

অনেকের উপরেই অনেক রাগ এবং অভিমান নিয়ে চারণ পথে বেরিয়েছিল। এখন দেখছে, সে ঠিক করেনি। না, পথে বেরোনোটা ঠিকই হয়েছিল কিন্তু দশজনের উপরে রাগ এবং অভিমান করাটা আদৌ ঠিক হয়নি। ও যেন হঠাৎই ক্ষমা করতে শিখছে এবং যেন পারছেও একটু একটু।

এই কথা ভেবেই ওর ভারী আনন্দ হল।

জয়িতাকে ও যতটুকু দিয়েছিল তার চেয়ে সম্ভবত অনেকই বেশি চেয়েছিল, আশা করেছিল, তার কাছ থেকে। Barter-এ সেই জিততে চেয়েছিল। পচা ডিম দিয়ে রক্ত গোলাপের গুচ্ছ পেতে চেয়েছিল। হয়তো।

তখন রাত ন-টা বেজে গেছে। দেখল, পান্ধীদের সেই পরিবার তখন ঘন হয়ে বসে, সামনে ধুনী নয়, কাঠকয়লার উনুন জ্বেলে রুটি বানাচ্ছে। এবং উনুনেরই তিন পাশে গোল হয়ে পরিবারের পাঁচজনই বসে আগুন পোয়াচ্ছে। খুবই গরিব ওরা, বড় হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয় ওদের। কিন্তু মুখে হাসির অভাব নেই। দুটি ছিন্ন ও মলিন রাজস্থানি রাজাই চৌপায়ার উপরে বিছানো আছে। শীতের মোকাবিলা আসলে ওরা করবে একে অন্যের শরীরের উত্তাপ দিয়েই। এই রাজাই দুটি শীতের সঙ্গে লড়াইএর অস্ত্র নয়, অজুহাত মাত্র।

তখন হঠাৎই জয়িতার কথা মনে হয়েছিল চারণের। জয়িতাকে এমনি বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে, কবোষ্ণ কল্পনাতে কত শীতের রাতই না কাটিয়েছে! শুধুই কল্পনাতে। একা একা। আজ রাতে এই পান্ধী বিবাহিত যুবতীর মধ্যে ও যেন হঠাৎই জয়িতাকেই আবিষ্কার করল। ওর সুখই যেন জয়িতার সুখ।

ও দাঁড়িয়ে পড়ে পান্ধী পরিবারকে উদ্দেশ্য করে বলল, দিনের কাজ শেষ হল ?

বুড়ো বলল, হুঁ।

যুবকটি আর যুবতীটি খুবই ক্লান্ত ছিল সম্ভবত। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না ওদের, তবুও ওরা হাসল।

বুড়ি, শিশু নাতিকে বলল, এই তো দাদু রুটি পাকাচ্ছি। হয়ে গেলেই খাবে আর শোবে।

চারণ লক্ষ করল, নদীর খাত বেয়ে কনকনে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে শরীরের হাড় হিম করে।

কত কামালে আজ সারাদিনে ?

চারণ শুধোল।

পর্ন্দরো রুপাইয়া।

বুড়ো বলল।

বাসস ?

ঔর ক্যা বাবু ?

এতে তোমাদের এতজনের ডাল-রুটি হবে ?

খুবই।

বলে, হুঁকোতে ভুড়ুক ভুড়ুক টান তুলে এই মস্ত ভারতবর্ষের, চারণের সুন্দর দেশের, চারণের ভাইবোন ভারতবাসীর প্রতিভূ সেই বুড়ো বলল, কত পরিবার আছে, দিনে মাত্র পাঁচ টাকা কামায়। আমরা তো বড়লোক।

বলেই হাসল। দুঃখের হাসি নয়, সুখের হাসি।

স্তম্ভিত হয়ে গেল চারণ।

বলল, মিথ্যে কথা বলছ তোমরা। তোমাদের কষ্ট নেই ?

কষ্ট কি নেই বাবু ? কিন্তু ওপরের দিকে চাইবার কি শেষ আছে ? আমরা নীচের দিকে তাকাই। নিজেদের কষ্টকে কষ্ট বলে মনেই হয় না। সত্যিই কষ্ট নেই বাবু। কোমর-ভাঙা মেহনত করে যা কামাই তাতে রোটি-ডাল তো হয়ে যায়। হারামের পয়সাতে খাই না বাবু, চুরির পয়সা বা ঘুষের পয়সা বা অত্যাচারের পয়সাতেও খাই না। বড়ই আনন্দ আমাদের। উপরওয়ালা যা দেন, দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। তুমি দেখো আমার এই নাতি একজন ইমানদার দেশোয়ালি হবে। ভারতের মুখোজ্জ্বল করবে এ একদিন।

নিশ্চয়ই করবে।

চারণ বলল।

উপরওয়ালা যা দেন তাই যথেষ্ট। কোনও খেদ নেই।

বুড়ো বলল।

চারণ তার হিপ-পকেট থেকে একটি একশ টাকার নোট বের করে ওদের দিল।

যুবতী বৌটির মুখে একটু চকিত ভয় দেখতে পেল যেন। নৃত্যরতা আগুনের শিখাতে সারসার সোনার গরাদ নেচে গেল তার মুখে। যুবকটির মুখে রাগ ফুটল, যদিও ক্ষণিক। বুড়ো কিন্তু চারণের মুখের দিকে একমুহূর্ত চেয়েই, টাকাটা দুহাতের পাতা মেলে পরম সম্মান দিয়ে নিল।

বুড়ি বলল, তুমি বিকেলে যাওয়ার সময়েও দাঁড়িয়েছিলে এখানে। আমার বহু...। আমরা ভেবেছিলাম তুমি মানুষটা খারাপ।

ভুল ভাবনি একটুও।

চারণ বলল।

যুবকটির মুখের মাংস আবার শক্ত হয়ে এল। চিবুক, রাগের বাহক হয়ে আকাশ পানে উঠল উদ্ধত হয়ে।

বুড়ো বলল, তাহলে ?

তাহলে কিছু নয়। যে-মানুষটা তখন এ পথ দিয়ে গেছিল সে হয়তো খারাপ মানুষই ছিল। পুরোপুরি খারাপ না হলেও পুরোপুরি ভালও নয়। কিন্তু যে-মানুষটা এখন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে ভাল মানুষ। বলতে পার, পুরোপুরিই ভাল। আপাতত।

তুমি কোথায় থাক ?

ছেলেটি জেরা করার গলাতে বলল।

চারণ বলল, আমি পরদেশী।

তুমি কে ?

এবার যুবতী বধূটি বলল।

চারণ হেসে বলল, আমি উপরওয়ালার দূত। কিছু কি বুঝলে বহিন ?

মেয়েটি অবিশ্বাসী গলাতে হেসে বলল, ততক্ষণে তার ভয় কেটে গেছে, উপরওয়ালার দূত কখনও এমন পোশাক পরে ?

চারণ বলল, তোমাদের উপরওয়ালা কি কারওকে দেখা দিয়েছেন ? আমি ঈশ্বরের অগণ্য দূতের মধ্যে একজন। টাকাটা তোমরা হাসিমুখে নিলে আমার খুব আনন্দ হবে, রাতে ঘুম হবে।

উপরওয়ালাও খুবই খুশি হবেন। নেবে তো ?

ওদের সকলের মুখে অবিশ্বাস-মাখা আনন্দের হাসি ফুটে উঠল।

চারণও হাসল।

ওরা বলল, ভগবান আপ কি ভালা করে গা।

চারণ চমকে উঠল। ভাবল, এও তো Barter-ই!

তাড়াতাড়ি বলল, না, না, আমি তোমাদের ভগবানের কাছে কিছুমাত্রই চাই না। তোমরা খুশি হলেই আমি সুখি। বিশ্বাস করো।

ওরা বিশ্বাস করল কি করল না তাতে চারণের বিন্দুমাত্র যাবে আসবে না। তার মুখনিঃসৃত কথা কটিতে চারণ নিজে যে একশভাগ বিশ্বাস করল এইটেই সবচেয়ে বড় কথা।

বরফ গলতে শুরু করেছে হিমবাহর। এখন সে কোনও শীতার্ত বা উষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ সাগরে ভেসে যাবে। পরিযায়ী দুধলি রাজহাঁসের মতন মসৃণ গতিতে ভেসে যাবে কি না তা ঈশ্বর নামক অস্তিত্বহীন এই পাহ্বীদের উপরওয়ালাই জানেন অথবা ভীমগিরি বা ধিয়ানগিরি মহারাজদের ঈশ্বর। ঈশ্বর বলে কোনও ব্যাটা আদৌ আছে কি নেই তা জানতেই ওর কলকাতা ছেড়ে-ছুড়ে হঠাৎ আসা এই অশিক্ষিত সাধু সন্ন্যাসীদের denএ। ব্যাপারটার শেষ দেখতে চায় ও।

মানে, এই নিরবধি কালের বুজরুকির।

বেশ ঠাণ্ডা আছে। মাঝরাতে ঠাণ্ডাতে ঘুম ভেঙে গেল একবার ওর। বারান্দার পুরোটাই কাচের স্লাইডিং-ডোর। দুটো কম্বলেও শীত করছে। কম্বল দুটি দিয়ে ভাল করে গলা ও ঘাড় আর কাঁধ ঢেকে পাশ ফিরে শুতে শুতে ভারী এক আনন্দে চারণের মন ভরে উঠল। পাহ্বী পরিবারটির কথা মনে পড়ল। এমন সংরক্ষিত ঘরে যদি ওর এত শীত করে তবে ঐ অরক্ষিত পথে ওদের কত না শীত করছে, কে জানে। ভাবল, প্রয়োজন, আরাম, বিলাস এসব বাড়ালেই বাড়ে।

আজ হোটেলে ফেরার পথে, জীবনে এই প্রথমবার, বদলে কিছুমাত্রই প্রত্যাশা না করে, কারও জন্যে সামান্য কিছু করল ও। এমন নিঃস্বার্থভাবে কারও জন্যে একতরফা কিছু করার মধ্যে যে এত আনন্দ, দেওয়া-নেওয়ার নয়, শুধুই দেওয়ার আনন্দ, আগে সত্যিই জানত না।

শেষ রাতে একবার টয়লেটে গেছিল। বেরিয়ে, উষ্ণ বিছানাতে জোড়া-কম্বলের নীচে যাওয়ার আগে কী মনে হওয়াতে একবার বারান্দাতে এসে দাঁড়াল চারণ।

ঝরনার মতন শব্দ করে শেষ রাতের হাওয়া বইছে তীব্রগতি অথচ আপাত-স্থির নদীর উপর দিয়ে। জল এদিকে গভীর। রাতের হাওয়া ওখানে উত্তরবাহিনী।

গতবছরের বইমেলাতে, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত শ্রী দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতের অনেকই নদনদী সম্বন্ধে ছোটদের জন্যে লেখা সুন্দর একটি বই কিনেছিল ও। বই যদি ভাল হয় ও তাতে জানার মতন কিছু থাকে তাহলে ছোটদের বই বড়রা এবং বড়দের বইও ছোটরা অনায়াসেই পড়তে পারেন। যত্ন করে পড়েছিল বইটি চারণ। না পড়লে, হয়তো গঙ্গা সম্বন্ধেও এত কিছু জানতে পারত না।

যে কোনও নদীই চারণকে অভিভূত করে। কোথায় যে চর ফেলে নদী, আর কোথায় যে পাড় ভাঙে, তা সেই জানে। কত জনপদ গড়ে ওঠে একটা নদীর দুদিকে এই নদীমাতৃক দেশে। মানুষ মরে যায়, গাছ পড়ে যায়, ঐরাবতের মতন অতিকায় প্রস্তরখণ্ড তার ঘর্ষণে-চূর্ণনে নুড়িতে পরিণত হয় কালের প্রবাহে। পরিবর্তিত, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তার খাতের দুপাশের সব কিছু। কিন্তু নদী চলে নদীরই মনে। অবিরত, বাধাহীন।

উত্তরকাশী জেলায় গঙ্গোত্রী থেকেও প্রায় কুড়ি কিমি দূরের এক বরফের গুহা গোমুখ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছে গঙ্গা তারপর গঙ্গোত্রী হয়ে নেমে এসেছে হিমালয়ের গা বেয়ে। গোমুখের উচ্চতা সাত হাজার মিটার মতন। উত্তরকাশী শহর গঙ্গোত্রীর উজানে। অত্যন্ত প্রাচীন শহর।

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ স্কন্দপুরাণে এর নাম বর্ণিত আছে 'বারণাবর্ত'। চীনদেশী পর্যটক হিউয়েন সাঙ এই শহরের নাম অবশ্য ব্রজপুর বলে উল্লেখ করেছিলেন।

অনেকে এও বলেছেন যে, মহাভারতে-বর্ণিত জতুগৃহ নাকি এখানেই নির্মিত হয়েছিল।

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, অন্য অধিকাংশ নদ নদীরই মতন গঙ্গার নাম কিন্তু উৎসমুখেও তো বটেই, তার অনেক নীচে পর্যন্তও গঙ্গা নয়। দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে ভাগীরথীর সঙ্গমের পর থেকেই এর নাম গঙ্গা হয়েছে।

অলকানন্দার জন্ম গাড়োয়াল হিমালয় ও তিব্বতের সীমানাতে দুর্গম পার্বত্য এলাকাতে। সতোপন্থ হ্রদ আর ভগীরথ হিমবাহ থেকে জন্মেছে অলকানন্দা প্রায় আটহাজার মিটার মতন উচ্চতাতে। বেশ কিছুটা নেমে এসে সে মিলেছে মন্দাকিনীর সঙ্গে, রুদ্রপ্রয়াগে।

রুদ্রপ্রয়াগ অবশ্য চারণের কাছে বেশি জানা জিম করবেট এর বই-এর মাধ্যমেই। 'দ্য ম্যান-ইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ'।

রুদ্রপ্রয়াগেই ওই দুই নদীর সঙ্গমের নীচে পথ-পাশের একটা আমগাছের ডালে বসে মেরেছিলেন ওই চিতাটিকে জিম করবেট সাহেব এক রাতে।

জয়িতার আর্ম-চেয়ার ওয়াইল্ড-লাইফ এন্থুজিয়াস্ট দাদার কাছে শুনেছিল চারণ যে, রুদ্রপ্রয়াগে যে জায়গাতে চিতাটাকে মারা হয়েছিল সেখানে একটি বোর্ড লাগানো আছে নাকি।

যদি কখনও রুদ্রপ্রয়াগে যায়, তবে সে ওই তীর্থ-দর্শনেই যাবে। মন্দির-মসজিদে তার কোনও মন নেই।

বদ্রীনাথ বা বদ্রীবিশাল অলকানন্দারই ঐ পারে। রুদ্রপ্রয়াগের ব্রিজ পেরিয়ে অলকানন্দা যে পারে, সেই পারের পাহাড় বেয়েই বদ্রীনাথের পথ চলে গেছে। আর নদী না পেরিয়ে সোজা চলে গেলে কেদারনাথের পথ।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে হৃষীকেশ অনেকখানি পথ। এখানে এসেই গঙ্গা সমতলভূমি পেয়ে বিস্তৃতিলাভ করেছে। তারপর হরিদ্বার হয়ে কানপুর। তারপর ইলাহাবাদ। যেখানে যমুনা ও প্রাচীনকালে সরস্বতীর মিলন ক্ষেত্র। সঙ্গম। এই শহরের নাম আর্যদের সময়ে ছিল প্রয়াগ। কিন্তু মুঘল বাদশা আকবর যমুনার তীরে একটা দুর্গ তৈরি করেন এবং শহরের নাম বদলে করেন ইলাহাবাদ। ইলাহাবাদ থেকে এলাহাবাদ। এলাহাবাদের থেকে প্রায় দেড়শ কিমি দূরে কাশী বা বারানসী। এখানেই উত্তরবাহিনী গঙ্গার পশ্চিম পারে বরুণা ও অসি নদীর সঙ্গমে বেড়ে উঠেছিল প্রাচীন জনপদ, হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ বারানসী।

এই কাশী শহর পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরগুলির মধ্যে একটি। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ উপনিষদ ও পুরাণেও কাশীর নাম রয়েছে। এখানে বিশ্বনাথের মন্দিরের এবং বিগ্রহের বর্ণনা চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণীতেও আছে। এর দশাশ্বমেধ ঘাটের কথাও সর্বজনবিদিত। আরও অনেক ঘাট আছে বারানসীতে।

কিংবদন্তী আছে যে, ব্রহ্মার আদেশে কাশীর রাজা দিব্যদাস নাকি দশটি অশ্ব দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন রুদ্র সরোবরের তীরে। সেই থেকেই নাম : দশাশ্বমেধ।

আরও অনেকই কথা জানা গেছিল এই নদী সম্বন্ধে দিলীপবাবুর বইটি পড়ে। সে-নদী যেখানে এসে সমতলবাসী হয়েছে সেখানে, সেই হৃষীকেশে দাঁড়িয়েই এই সব মনে পড়ছে চারণের।

গঙ্গা, পাটনা বা পাটলিপুত্রকে পাশে রেখে, পৌঁছেছে শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরে। সে সবও পেছনে রেখে রাজমহলের কাছে এসে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। আরও শ-খানেক কিমি নেমে এসে ভাগ হয়ে গেছে গঙ্গা দুভাগে। একটির নাম হয়েছে পদ্মা। সেটি চলে গেছে মুর্শিদাবাদ জেলা হয়ে বাংলাদেশে আর অন্যটির নাম হয়েছে ভাগীরথী। তারপর আরও দক্ষিণে পৌঁছে ভাগীরথীর নাম হয়ে গেছে হুগলি।

চারণের ভাবনারই মতন সব মানুষেরই ভাবনা এইরকমই, নদীরই চালের মতন। কোথায় যে

তার উৎপত্তি, কোথায়, কোন নদীর সঙ্গে যে তার সঙ্গম আর কোথায় যে সে লীন হয়েছে মহত্তম সঙ্গমে সমুদ্রের সঙ্গে, তা তার উৎসে দাঁড়িয়ে বোঝা পর্যন্ত যায় না।

শেষ পর্যন্ত আসা হল কুঞ্জাপুরীতে।

প্রভাকর মার্কেটের কুমার ট্রাভেলস এর থেকে একটি অ্যাম্বাসাডার ভাড়া নিয়েছিল চারণ।

ওর সঙ্গে আলাপ হওয়ার দিনেই ভীমগিরি কুঞ্জাপুরীর কথা বলেছিলেন।

সত্যি সত্যি কোথাওই পৌঁছানো বড় সোজা কথা নয়। সে মনেই হোক, কী পাহাড়-বনে। হৃষীকেশে আসা অবধিই ভাবছিল যে আসবে, এই মন্দিরের কথা শোনার পর থেকেই, কিন্তু আসতে আসতে এতদিন লেগে গেল।

মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে, মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে পেছনে এবং ডানে হৃষীকেশ শহরটা চোখে পড়ে। ছড়ানো-ছিটোনো। খাত-এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার পুরোটাই যে এখান থেকে দেখা যায়, তা নয়। কিন্তু নদীর এ পারের তপোবন, মুণিকা-রেতি এবং ওপারের স্বর্গাশ্রম ইত্যাদির আভাস পাওয়া যায়।

চারণ বসেছিল, মন্দিরের পেছনে, চাতালের প্রাচীরের ওপর। রোদ পড়েছিল পিঠে। ভারী আরাম লাগছিল। চোখ বুঁজে আসছিল আরামে।

কুঞ্জাপুরী মন্দিরের পুরোহিত পণ্ডিত কুঁবারসিংজী তার পাশে দাঁড়িয়ে বহু দূরের বরফাবৃত শৃঙ্গগুলি চেনাচ্ছিলেন।

একদিকে উত্তুঙ্গ গিরিগাত্র এবং অন্যদিকে গভীর এবং প্রায় খাড়া নেমে-যাওয়া খাদ রেখে নাতিদূরের আঁকা বাঁকা এবং সর্পিল পথ দিয়ে বাস চলে যাচ্ছিল তেহরি-গাড়োয়ালের দিকে। কোনও বাস আসছে হৃষীকেশ হয়ে, কোনও বাস দেরাদুন থেকে। এই পথই চলে গেছে চাম্বাতে। কলুষহীন উঁচু শিবালিক পর্বতমালার গিরিগাত্র এবং খাদে রোদ ও ছায়ার মায়া রচিত হয়েছে। টেরাসিং-কালটিভেশান করা ক্ষেত-খামার, SURE-FOOTED গাই বলদ, খচ্চর, ছাগল-ভেড়া, পাহাড়ী কুকুর, গৃহকর্মে ব্যস্ত নারীর চিকন স্বরে ডাকাডাকি, ছাগলের দূরাগত ব্যাঁ ব্যাঁ রব, একঝাঁক Rock Pegion-এর ওড়াউড়ি শীতের ওম-ধরা রোদমাখা সুনীল আকাশে, সমস্ত কিছুর দিকেই চেয়ে থাকতে থাকতে চারণের ঘোর লেগে যাচ্ছিল। ওর কলেজের সহপাঠী অমলেশের কথা বারেবারে মনে পড়ে যাচ্ছিল ওর। অমলেশের পাহাড়ে ট্রেকিং করার নেশা ছিল।

চারণ ওকে বলত, কী যে দৌড়োস ছুটি পেলেই পাহাড়ে বার বার! পাহাড় ছাড়া পৃথিবীতে দ্রষ্টব্য কি আর কিছুই নেই?

অমলেশ হাসত। ঝকঝক করত ওর উজ্জ্বল কালো চোখের মণি দুটো। ও বলত, একবার চল আমার সঙ্গে, তখন বুঝবি, কেন যাই? একবার গেলেই ঘোর লেগে যাবে। বারেবারে আসতেই হবে।

একবার এসেই বুঝতে পারছে চারণ যে, তাকেও আসতে হবে বারে বারেই। কিছু আছে এইসব পর্বতরাজিতে, গাড়োয়াল এবং কুমায়ুঁ হিমালয়ে। হয়তো আছে এর চেয়ে কম উঁচু বিন্ধ্য ও মাইকাল পর্বতমালাতেও। কে জানে! পশ্চিমঘাটের পর্বতমালাতেও হয়তো আছে। পূর্ব-আফ্রিকার কিলিম্যানজারো বা পশ্চিম আফ্রিকার রুয়েনজোরি রেঞ্জ বা পশ্চিমী দুনিয়ার ইউরোপের আল্পস, পিরিনিজ, ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের এই সব নগাধিরাজদের কোনও তুলনাই চলে না। আমেরিকার রকি মাউনটেইনস রুক্ষ, দুর্দম যদিও কিন্তু এই দেবদুর্লভ মাহাত্ম্য তাদের একটুও নেই। নিজ চোখে

না দেখলে কুমায়ুঁ আর গাড়োয়াল হিমালয়কে, এসব কথা বোঝা যায় না আদৌ। এসব দেখে নিজের দেশ সম্বন্ধে গর্ব জাগে। কলকাতা দিল্লী, মুম্বাই, চেন্নাই ভারতবর্ষ নয়। সে সব নগরের কোনও বিশেষ ভারতীয়ত্ব নেই। পশ্চিমী দুনিয়ার সস্তা, দৃষ্টিকটু নকল বলে মনে হয় সে সব শহর দেখলে। ভারতবর্ষকে জানতে হলে এই রকম সব জায়গাতেই আসতে হয়। নয়তো বনে-জঙ্গলে।

ভাবছিল, নিজের এই আশ্চর্য সুন্দর দেশের কতটুকুই বা দেখেছে! কী বিচিত্র দেশ তাদের। কত বিভিন্ন তার রূপ, কত বিচিত্র তার দেশবাসীর ভাষা, বেশবাস, আচার ব্যবহার। কিন্তু এই বৈচিত্র্যেরই মাঝে মূল সুরটি একই। ভারতের শাশ্বত সম্ভ্রান্ততাকে দারিদ্র কোনওদিনও মলিন করতে পারেনি, পারবে না। এই মূল সুর কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বয়ে চলেছে একটি অবিরত প্রবহমাণ স্রোতেরই মতন, তাতে দুপাশে অববাহিকা থেকে অগণ্য উপস্রোত এসে মিশেছে একে একে। তাতে মূল স্রোতে বাধা পড়েনি। বরং তার জোর বেড়েছে, ভার বেড়েছে, সে বিস্তৃত হয়েছে আরও।

ভারী গর্ব হচ্ছিল চারণের এই প্রাচীন দেশে জন্মেছে বলে। এই ঐতিহ্যের দেশে, রামায়ণ, মহাভারতের দেশে। নিজের দেশকেই যে-মানুষ ভাল করে দেখেনি, জানেনি, তার পক্ষেই বিদেশের প্রশস্তিতে মুর্খর মতন পঞ্চমুখ হওয়া সম্ভব। নিজেকে যে জানে, শুধু সেই না পরের সঙ্গে তুলনা করতে পারে নিজের!

কুঞ্জাপুরীর পুরোহিত প্রথমে চারণের ওপরে বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন। তার কারণও ছিল। চারণ গাড়ি করে উঁচু শৃঙ্গর ওপরে ওঠার পরও আরও তিনশ ষাটটি সিঁড়ি ভেঙে যখন এই ছোট্ট মন্দিরের চাতালে এসে পৌঁছেছিল তখন পুরোহিত সিঁড়িতে চারণের পদশব্দ পেয়ে নিজেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন চাতালের মুখে। চারণ তাকে নমস্কার করার আগেই তিনি তাকে নমস্কার করেছিলেন।

চারণ বলেছিল, আমি কিন্তু এখানে পুজো দিতে আসিনি।

তবে?

বলেছিলেন কুঁবারসিংজি, বংশানুক্রমে যিনি এই মন্দিরের পুরোহিত। গাড়োয়ালের রাজা যাঁর পূর্বপুরুষকে উত্তরপ্রদেশের সমতলভূমি থেকে এনে এই উত্তুঙ্গ শৈল-শিখরের উচ্চতম চুড়োতে অধিষ্ঠিত শিব-কর্তৃক ছেদিত মহামায়ার পীঠের পূজারী করেছিলেন। জনশ্রুতি আছে, এখানে নাকি মহামায়ার স্তন পড়েছিল। জানে না চারণ। কুঁবারসিংজি যা কিছুই বলবেন তার সবকিছুই বিশ্বাস করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। তবে নারী শরীরের সবচেয়ে সুন্দর অংশ, চারণের মতে, তার স্তন এবং তলপেট। দেবীর শরীরেরও তাই হবে হয়তো।

ভাবল, নাস্তিক চারণ।

ভেবেই ভাবল, এই কুভাবনার কথা আর এস এস-রা বা শিবসেনারা জানতে পারলে হয়তো তার শিরশ্ছেদ করবে।

কুঁবারসিংজির 'তবে'র উত্তরে একটি লাল-রঙা পঞ্চাশ টাকার নোট তাঁকে দিয়ে চারণ বলেছিল, পুজো আপনি দিন কিন্তু আমি মন্দিরের ভিতরে ঢুকব না।

সে কি?

না। আমি কোনও মন্দিরের ভিতরে ঢুকিনি। কখনওই ঢুকবও না।

অজীব আদমী আপনি। তবে এলেন কেন কষ্ট করে এতদূরে? তারওপর ওই তিনশ ষাটটি সিঁড়ি চড়ে?

এলাম, মন্দির দেখতে। আপনাকে দেখতে। যে-কোনও মন্দিরের চাতালে এলেই আমার মনে এক ধরনের শান্তি আসে। ভাল লাগে।

শান্তি থাকে আপনার বুকেরই মধ্যে, কোনও মন্দির মসজিদ বা গির্জাতে নয় বাবুজি। তবে সেই শান্তি হয়তো ভ্রমরের মতন কৌটো বন্ধ থাকে। এমন এমন জায়গাতে এলে সেই কৌটোর ঢাকনি হয়তো খুলে যায়।

ভাল লাগল খুব চারণের, কুঁবারসিংজির এই কথাটি। ভাবল, আমাদের প্রত্যেকেরই বুকের মধ্যে অনেক কথাই থাকে, শান্তির ঐ ভ্রমরেরই মতন, যা আছে বলে আমরা জানি অথচ কী করে তাকে

বাইরে আনা যায় সুন্দরভাবে, পুরোহিত কুঁবারসিংজি এই মাত্র যেমনভাবে আনলেন, তা আমাদের জানা নেই।

ভাবছিল চারণ যে, লেখাপড়া শিখলেই যে, সকলেই শিক্ষিত হন এমন নয়, লেখালেখি করলেই যে সকলেই তাঁরা লেখক হয়ে ওঠেনই এমনও নয়, নিজের অথবা পাঠকের মনের ভিতরের গোপন কথাটিকে, ওই ভ্রমরেরই মতন, কৌটোর ঢাকনি খুলে বাইরে যিনি আনতে পারেন অবহেলে, তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত, প্রকৃত লেখক !

ওই দেখুন ! ডানদিকে, মানে, সবচেয়ে ডানদিকে যে তুষারাবৃত পর্বতটি দেখা যাচ্ছে, তা হল নন্দাদেবী। তার পাশে, বাঁ পাশে ঘন্টাকর্ণ। দেখতে পাচ্ছেন ?

হ্যাঁ। চারণ বলল।

আরও একমাস পরে যদি এখানে আসতে পারেন একটি দূরবীণ সঙ্গে নিয়ে তবে এই কুঞ্জাপুরীর চাতালে বসেই বদ্রীবিশালের মন্দির দেখতে পাবেন। কুঞ্জাপুরী, হৃষীকেশের চারদিকে শিবালিক পর্বতমালাতে যতগুলি শৃঙ্গ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। অথচ লক্ষ লক্ষ ভ্রমণার্থী প্রতি বছরে বাবা কেদারনাথ এবং বদ্রীবিশাল দর্শনে, হৃষীকেশের উপর দিয়েই যান অথচ তাঁদের মধ্যে প্রায় কেউই কুঞ্জাপুরীতে আসেন না। খোঁজই রাখেন না অধিকাংশই এই পাহাড়চুড়োর মন্দিরের। নামও জানেন না। জিগ্যেস করে দেখবেন আপনি।

চারণ বলল, ভাগ্যিস !

কেন ? একথা বলছেন কেন ?

মন্দির মসজিদের বা অন্য সব ধর্মস্থানের মাধুর্য, মাহাত্ম্যর কথা আমি বলতে পারব না, তবে আমার কাছে সব ধর্মস্থানের মাহাত্ম্যই কিন্তু তার নির্জনতাতে, শান্তিতেই। যে মন্দিরে অতি কম মানুষ আসেন, যে মসজিদে বা গির্জাতে অতি কম মানুষে নামাজ পড়েন বা প্রার্থনা করেন, সেখানেই মনে হয় মানুষ মন্দিরে মসজিদে যা খুঁজতে আসে, তাই বেশি করে পেতে পারে। আমি যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতাম তবে কোনও মন্দিরেই বা মন্দিরের কাছাকাছিও কোনও যানবাহনকে আসতেই দিতাম না।

তারপর থেমে বলল, আমি এখানে এসেছি অল্প কদিন। কিন্তু এখানের সাধুসন্তদের সঙ্গে মিশে এ কদিনে যতটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়, ঈশ্বর কখনওই মন্দিরের বিগ্রহ নন। ঈশ্বর থাকেন মন্দিরের পথের ধুলোতে, পথপাশের ফুলে-পাতায়, পথকষ্টে, সহযাত্রীর প্রতি সহমর্মিতা এবং দয়ামায়ারই মধ্যে। যদি তাঁর কোনও অবয়ব থাকেও তবুও তিনি পাথর বা রুপোর বা সোনার মূর্তিতে আদৌ বদ্ধ থাকবেন, তা কিন্তু আমার মনে হয় না।

কুঁবারসিংজি বললেন, এমন সব কথা বলবেন না বাবুজি। অবিশ্বাসীরা মন্দিরের চাতালে তবে আসেনই বা কেন ? আপনিই বা এলেন কেন ? মা জানতে পারলে মুখে রক্ত উঠে মারা যাবেন আপনি।

চারণ হাসল, কুঁবারসিংজির কথাতে।

তাতে, মনে হল, পূজারী আরও চটলেন।

চারণ বলল, কুঁবারসিংজি আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি। ঈশ্বর-বিশ্বাস আর মূর্তি-পুজো, আমার মনে হয় সমার্থক নয়। কেন নয়, তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। বরং একথা বলতে পারেন যে, এইসব কথা বোঝার জন্যেই হৃষীকেশে এসে মৌরসী-পাট্টা গেড়ে বসেছি। দেখি, কিছু বুঝতে পারি কি পারি না।

কুঁবারসিংজি তখনও রেগেই ছিলেন।

পূজারী বললেন, আপনি কি জানেন যে, হিন্দুর দেবদেবীকে যে মানুষ নিজে হিন্দু হয়েও অপমান করেন, আপনারই মতন, তিনি মুখে রক্ত উঠে বা দুর্ঘটনাতে মারা যান। অন্য কারওকেই নিধন করতে হয় না তাকে। খুনোখুনি করার শিক্ষা হিন্দুধর্ম দেয় না। আমার ধর্মের সঙ্গে অন্য সব ধর্মেরই অনেক তফাৎ আছে।

চারণ, ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ গলাতে বলল, এ প্রসঙ্গ বরং থাক এখন।

থাক তবে।

এখন বলুন, মানে, ওই বরফাবৃত চুড়োগুলো চিনিয়ে দিন আমাকে দয়া করে।

ঘণ্টাকর্ণ দেখেছেন ত, নন্দাদেবীর বাঁ পাশে?

হ্যাঁ। ওই ঘণ্টাকর্ণর পায়ের কাছেই আছে চন্দ্রবদনী।

চন্দ্রবদনী? কী চমৎকার নাম। কিন্তু কই? দেখা যাচ্ছে না তো!

না। দেখা যায় না এখান থেকে। মধ্যে একটি অন্য পর্বত পড়ে গেছে। দেখছেন? কালো, মানে, বরফ-ঢাকা নয়। ওই কালো পর্বতটি অনেকই কাছে এখান থেকে। তাই দূরের চন্দ্রবদনী তার পেছনে পড়ে যাওয়াতে আড়ালে পড়ে গেছে।

তাই?

হ্যাঁ।

তেমনই বোধহয় ঘটে সবসময়ই। জড় তো বটেই, জীবন্তর বেলাতেও।

কি? কুঁবারসিংজি বললেন।

যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন শুধুমাত্র কাছে আছে বলেই আমরা কেবল তাদেরই দেখতে পাই। তাদের প্রকৃত আকারের চেয়ে অনেক বড় দেখি তাদের আর তাদের আড়ালে যে কত সুন্দর এবং বড় কত কিছুই ঢাকা পড়ে গিয়ে আমাদের চোখের আড়ালেই থেকে যায় চিরদিন, তা আমরা জানতে পর্যন্ত পাই না।

কুঁবারসিংহজি কী যেন বললেন, অস্ফুটে। ঠিক বুঝতে পারল না চারণ। তবে বুঝল যে, অকবি চারণের মুখ নিঃসৃত এই আকস্মিক কাব্যিক মন্তব্যে পুরোহিত কিঞ্চিৎ প্রীত হয়েছেন।

আবার চারণ বলল, চন্দ্রবদনী? বাঃ!

হুঁ।

কুঁবারসিংজি বললেন।

ভাবল চারণ যে, এ জীবনে এই নামের কোনও নারীর সঙ্গে যদি কখনওই দেখা হয় তবে শুধু নামমাহাত্ম্যরই কারণেই তাকে মন-প্রাণ সব দিয়ে দেবে। মানুষে যদি রূপ দেখেই মনপ্রাণ সঁপতে পারে, যদি পারে গুণ দেখে, তবে শুধু নাম শুনে তা পারতেই বা দোষ কোথায়?

কুঁবারসিংজি বলে চললেন, তারপর দেখুন ঘণ্টাকর্ণর বাঁপাশে, মানে আমাদের বাঁপাশে চৌখাম্বা। দেখেছেন? কেমন চৌকো মতো, বিরাট।

চৌখাম্বা দেখে চারণের মনে পড়ে গেল তার মেজমামার ছেলে পল্টুর কথায় কথায় 'আখাম্বা' বলে ওঠার কথা। ওই একটি শব্দ যে সে দিনের মধ্যে কতবার, কত অর্থে ব্যবহার করত।

পল্টু সঙ্গে থাকলে চৌখাম্বা দেখেও নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠত "আখাম্বা"।

পল্টু অবশ্য আর চারণের সঙ্গে কোথাওই যাবে না। কারণ, সে পৃথিবী থেকেই চলে গেছে মাত্র সাতাশ বছর বয়সেই। কোথায় গেছে, কে জানে।

মানুষ মরে কি কোথাওই যায়?

হৃষীকেশে যে অগণ্য প্রশ্ন বুকের মধ্যে জড়ো করে নিয়ে চারণ এসেছিল তার একটিরও উত্তর এখন পর্যন্ত পায়নি। জানে না, পাবে কি না আদৌ। তবে এটা অবশ্যই বুঝতে পারছে যে এক অভিনব বাতাবরণের মধ্যে সে ঢুকে পড়েছে, যা বাতানুকূল। যার মধ্যে বিশ্বাসের শিখা জ্বলে স্থির হয় সতত। নিবাত, নিষ্কম্প।

কুঁবারসিংজি বললেন, চৌখাম্বা থেকেই বেরিয়েছে অলকানন্দা আর মন্দাকিনী। চৌখাম্বার পায়ের কাছে এদিকে কেদারনাথের মন্দির আর উলটোদিকে বদ্রীবিশাল। অলকানন্দা বেরিয়ে উত্তরে গেছে, কেদারনাথের দিকে, তারপর সেখান থেকে নেমে এসেছে রুদ্রপ্রয়াগে আর মন্দাকিনী দক্ষিণে বদ্রীবিশালের দিকে গিয়ে নেমে এসেছে রুদ্রপ্রয়াগের দিকে এবং সেখানেই মিলন হয়েছে এই দুই নদীর।

তার পরের শৃঙ্গটির নাম কি ? চৌখাম্বার বাঁ পাশের ?

চারণ জিগ্যেস করল।

হ্যাঁ। ওটির নাম বান্দরপুঞ্ছ।

বান্দরপুঁছ ? নাম ? পর্বত শৃঙ্গর ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তার একটা ইতিহাস আছে।

কি ইতিহাস ?

মহাপ্রস্থানের পথে বেরিয়ে যখন পাণ্ডবেরা ওই সব অঞ্চলে পৌছোন তখন সহোদর ভীমকে, যুধিষ্ঠির তাঁরই কোনও কাজে পাঠান। ভীম সে কার্যে যেতে গিয়ে দেখেন পথ জুড়ে আছে এক বিশাল বাঁদরের লেজ। পথ অবরুদ্ধ। তখন তিনি অনুরোধ করেন সেই বাঁদরকে তার লেজটি পথ থেকে সরাতে। তখন বাঁদর বলেন, 'আমি বুড়ো হয়েছি, গায়ে একটুও জোর নেই। আপনিই লেজটা সরিয়ে নিন বরং। রেখে দিন পথের একপাশে। আপনি তো মহাবলী ভীম।'

ভীম হেঁইও-হাঁইও করেও যখন লেজটা সরাতে পারলেন না পথ থেকে একচুলও তখনই তাঁর সন্দেহ হল। পরক্ষণেই তিনি বুঝলেন যে, এই বাঁদর অন্য কেউই নন, সাক্ষাৎ পবননন্দন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নত হয়ে প্রণাম করে হনুমানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, হনুমানজি যেন তাঁকে মাফ করে দেন ?

তাই এই শৃঙ্গের নাম বান্দরপুঞ্ছ।

চারণ বলল, তাই ?

তারপর জিগ্যেস করল, বান্দরপুঞ্ছের বাঁ পাশের ওই শৃঙ্গগুলির নাম কি ? মানে, যেগুলি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

গোমুখ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, তারপরে সারকুণ্ডা, একেবারে শেষে। ওই বান্দরপুঞ্ছ থেকে নীলকণ্ঠ অবধি পর্বতগাত্রে স্ফটিক পাওয়া যায়। স্ফটিক ছাড়া অন্য সব গ্রহরত্নরাজি তো পাওয়া যায়ই।

নীলকণ্ঠ কোথায় ? দেখালেন না তো ? সেই শৃঙ্গও কি বরফাবৃত ?

না, না। নীলকণ্ঠ অত উঁচু নয়। নীলকণ্ঠ হৃষীকেশের উলটোদিকে। স্বর্গাশ্রমের পারে। পায়ে হেঁটে যাবার পথ আছে। খুব চড়াই। ঘণ্টা তিনেক লাগে। আজকাল গাড়িতেও যাওয়া যায়। গঙ্গাজির উপরের বারাজ পেরিয়ে রাজাজি ন্যাশনাল পার্ক হয়েও যাওয়া যায়। নীলকণ্ঠের পাশে পাশে বয়ে গেছে সুন্দরী ইউওল নদী।

ইউওল ? বাঃ। সুন্দর নাম তো ! কোথায় গিয়ে পড়েছে সে নদী ?

ইউওল গিয়ে মিশেছে গঙ্গাজির সঙ্গে, ফুলচট্টির কাছে।

ফুলচট্টি কোথায় ?

কুঁবারসিংজি হাসলেন। বললেন, আগে তো কেদারবদ্রী যেতে হত লছমনঝুলার পায়ে হাঁটা ব্রিজ পেরিয়ে গঙ্গাজির ওপারে ওপারেই। পায়ে হেঁটে। পুণ্যার্থীদের প্রথম হল্টই ছিল ফুলচট্টি। নানা চট্টিতে থামতে থামতে রাত কাটাতে কাটাতে অনেকদিন হাঁটার পরই তখন পৌঁছনো যেত কেদারনাথ আর বদ্রীবিশালে। আজকাল তো গাড়িতে আর বাসে হুস-হাস করে বুড়ি ছুঁয়েই সকলে চলে আসে। এখন কি আর সেই তীর্থযাত্রা আছে ?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমরা তো সব নিষ্কর্মা ছিলাম। এখনকার মানুষদের যে সময়ের দাম হয়ে গেছে ভারী। সময় নষ্ট করে মানুষ, এমন সময় এখন কোথায় ? কিন্তু যে-সময়টা তারা বাঁচাচ্ছে তা দিয়ে কী করে তা জানতে বড় ইচ্ছে করে। আরও টাকা রোজগার করে কি ? তাই মনে হয়। কথাটা কি জানেন বাবু, অনেক টাকা করার পরেই শুধু মানুষে বোঝে যে টাকা কাগজই মাত্র। তার নিজের নিজস্ব কোনও দাম নেই। কে কেমন ভাবে টাকাকে কাজে লাগায় তার উপরেই নির্ভর করে সব।

নীলকণ্ঠতে লোকে যায় কেন ?

চারণ জিগ্যেস করল।

নীলকণ্ঠের মন্দির আছে যে সেখানে। ওইখানে বসেই নাকি মহাদেব বিষপান করে নীলকণ্ঠ হন। এইরকমই জনশ্রুতি আছে।

তাই ?

এমন সময়ে মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠল। মন্দিরের পেছন দিকে বসে থাকায় সিঁড়ি বেয়ে কেউ উঠলে তা এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় না। এই ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে কলকাতার বা বাংলার মানুষেরা কাঁসর-ঘণ্টা বলতে যা বোঝেন তার কোনও মিল নেই। চারণ লক্ষ করেছিল যে, এদিকের প্রত্যেক মন্দিরের চারদিকেই প্যারাপেট থেকে অসংখ্য ঘণ্টা ঝোলানো থাকে। পুণ্যার্থীরা মন্দির প্রদক্ষিণ করার সময়ে এবং মন্দিরে ঢোকা এবং বেরুবার সময়ে ওই ঘণ্টাগুলিকে নাড়িয়ে দিয়ে, বাজিয়ে দেন। তাতে দারুণ এক সুন্দর শব্দমালা তৈরি হয়। হাওয়ার বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন তরঙ্গ তুলে, বিভিন্ন স্বরগ্রামে সেই শব্দলহরী ফুলমঞ্জরীর মতন নিস্তব্ধ পাহাড়-উপত্যকাতে গড়িয়ে গিয়ে, ছড়িয়ে যায়। এই শব্দমালাকে যদি ছবিতে অনুবাদ করা যায়, তাহলে কর্বুর জলরঙে-আঁকা ACUQA-র কোনও নিপুণ কাজ বলে মনে হবে।

কুঁবারসিংজি চলে গেলে চারণ একা হয়ে যেতেই ওই নিস্তব্ধ রৌদ্রস্নাত পর্বত ও উপত্যকারাজির সৌন্দর্য যেন হঠাৎই বাঙময় হয়ে, আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে।

কী একটা পাখি ডাকছে। কী পাখি, জানে না চারণ। পাখি চেনে না, ফুল চেনে না, ঘাস চেনে না। জীবনের প্রায় অর্ধেকটাই আনকুথ সব মানুষ চিনে, অকাজে অন্যের আরও আরও আরও অর্থোপার্জনে সাহায্য করেই কাটিয়ে দিল। মিছিমিছি। এই সত্য উপলব্ধি করেই মন খারাপ হয়ে গেল ওর। এবারে বাকি সময়টুকু কাজের কাজ করলে হয়। কাজের কাজ। ওরও যে মন বলে একটা পদার্থ ছিল, সেটার খোঁজ যে এতদিন করেনি কেন, তা ভেবেই বড় অবাক হয়। মনের দেরাজের গভীরে বহুবছর ধরে রেখে-দেওয়া অব্যবহৃত, স্বার্থগন্ধহীন, নিরাসক্ত মনটি হঠাৎ এই এক আকাশ রোদের মধ্যে, উত্তুরে হাওয়ার মধ্যে, যখন আচমকা বেরিয়েই পড়ল তখন খুবই অস্বস্তিতে পড়ল চারণ তাকে নিয়ে। কোথায় রাখবে, কী দিয়ে ঢাকবে, তা ভেবে পেল না।

নিজের ভাবনাতে নিজে বুঁদ হয়ে বসেছিল, কতক্ষণ যে, তার হুঁস নেই। একেকবার প্রশ্বাস নিচ্ছে আর মনে হচ্ছে যেন নতুন জীবন পাচ্ছে। "নূতন প্রাণ দাও, প্রাণ সখা" গানটির কথা মনে পড়ে যেতে লাগল। প্রতি প্রশ্বাসেই নতুন প্রাণ।

ঠাণ্ডাতে নাকের পাটাটা ব্যথা ব্যথা করছে। কিন্তু ভাল লাগছে খুবই।

হঠাৎই পেছনে খটা-খট শব্দ শুনে ওর ঘোর ভেঙে গেল। চমকে চেয়ে দেখে পাকদণ্ডী পথ বেয়ে একটা গাড়োয়ালি ছেলে উঠে আসছে প্রায় নব্বই ডিগ্রি খাড়া পথ বেয়ে। তার হাতে এক গাছা দড়ি। দড়ির অপর প্রান্ত রয়েছে একটা খচ্চরের গলাতে বাঁধা। খচ্চরের পিঠে পাথরের চাঙর। এমনি পাথরের নয়। সবুজ রঙা গ্রানাইটের।

আশ্চর্য হয়ে গেল, এমন খাড়া পথে মানুষ অথবা জানোয়ার ভার বহন করে কি ভাবে উঠে আসে উপরে এই কথা ভেবে। তারপরই ভাবল, এখানে এই মন্দির এবং চাতাল যখন তৈরি হয়েছিল একদিন, তখনও গাড়োয়াল-রাজ এমনই প্রক্রিয়াতেই তো মানুষ, জানোয়ার, মালমশলা সব এই পর্বত চুড়োয় তুলেছিলেন!

নিজের নির্বুদ্ধিতাতে নিজেই লজ্জিত হল।

খচ্চরটি ওই খাড়া পথ বেয়ে এসে যখন চাতালের বেঁটে পাঁচিলের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল তখন যেন বাঁচল। তার বড় বড় কান সমেত খয়েরি-রঙা মুখটা চারণের মুখের থেকে মাত্র দুহাত মতন দূরে ছিল। এপর্যন্ত শান্তিনিকেতনি, কেষ্টনগর-সিটি, নানা বরেন্দ্রভূমি, বদ্যিবাটী ইত্যাদির জায়গার কিছু "খসসর" সে কলকাতাতে দেখেছে ওর কর্মজীবনে। এবং তার অফিসের টেবিলের উলটোদিকে তারা যখন বসেছে, তখন তাদের মুখগুলিও ওই দুহাত মতনই দূরে ছিল। কিন্তু এত বড় বড় কানওয়ালা রিয়্যাল খচ্চর, মানে, পেডিগ্রি-খচ্চর, এত কাছ থেকে আগে আর দেখেনি। হাত বাড়িয়ে, পরম শ্রদ্ধাতে, তার কান মুলে দিতে ইচ্ছা করল চারণের।

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

চারণ, লোকটির মুখের দিকে, খচ্চরটির মুখেরই দিকের মতন মনোযোগ সহকারে ভাল করে চেয়ে দেখে বুঝল যে, লোক নয়, ছেলে। মানে, সদ্য যুবক। সবে দাঁড়ি-গোঁফের রেখা উঠেছে।

আসছ কোথা থেকে ?

চারণ শুধোল।

বিরেডা।

গ্রাম ?

হ্যাঁ।

সেটা কোথায় ?

ওই নীচের নদী পারে।

কোন নদী ?

নদী নয়, ঝোরা।

নাম কি ঝোরার ?

গ্রামের নামে নাম, বিরেডা।

এই খচ্চর কি তোমার ?

প্রশ্নটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যেতেই নিজের ভুল বুঝতে পারল চারণ।

কোনও "খসসর" বা খচ্চরই কি কোনও কালেই কারও হয় ? সে বা তারা, না হয় মালিকের, না হয় স্ত্রীর, না হয় প্রেমিকার, না হয় জনগণের। এমন কি, না হয় নেতারও। খচ্চরদের সব খচরামিই এখানে। খচ্চর অথবা খসসর সর্বকালেই তার নিজেরই। অর্থাৎ, খচ্চর, খচ্চরেরই।

তোমাদের জমি-জমা নেই ?

আছে। অল্প।

ছেলেটা কতখানি চড়াই বেয়ে আসছে, তা কে জানে। পাহাড়িরা হাঁফায়-টাফায় না। অত সহজে হাঁফ-টাফ ওঠে না। তবে সামান্য পরিশ্রান্ত হয়েছে যে, তা মুখ দেখে বোঝা গেল। তার মাথার গোল টুপি খুলে তার ভেতর থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বের করে পকেট থেকে কেরোসিনের সস্তা লাইটার বের করে কুট্টুক আওয়াজ করে আগুন জ্বেলে একটা বিড়ি ধরাল। তারপর তাতে একটা টান লাগিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গাল ফুলিয়ে থেকে পরম আরামে ধোঁয়া ছাড়ল।

কি চাষ কর সেখানে ?

কী আর করব, মক্কী, গেঁহু, মসুর এইসব।

এই গ্রানাইট পাথর এখানে বয়ে আনছ কেন ?

মন্দিরের মাথাতে চড়বে।

কেন ? কালো পাথরের মন্দির তো চমৎকার মজবুতই আছে।

কে জানে, কেন ? পুরোহিতজি জাদা যাত্রী লানেকো ফেরমে হ্যায় শায়েদ। মন্দির চকমকানেসে জাদা যাত্রী উপ্পর আয়েগা। দোনো সাইডসে ঔর দোনো মন্দিরভি বনে গা রামজি ঔর সীতাজিকি।

উসসে কুঁবারসিংজি কি ক্যা ফ্যায়দা ?

কামাই জাদা হোগা, ঔর ক্যা ?

তারপরে একটু থেমে বলল, আসতে তো অনেকই ঝকমারি এখানে, কী তেহরি থেকে বা দেরাদুন থেকে। হৃষীকেশ থেকেও তেহরি রোড ধরে গাড়োয়ালের পুরনো রাজধানী নরেন্দ্রনগর ছাড়িয়ে এসে বাস থেকে নেমে বহৎ চড়াই উঠে, তারপর আবার তিনশ যাট সিঁড়ি। গাড়িতে আর কজন আসতে পারে। তবে অবশ্য উপরে একবার উঠে আসতে পারলে ভারী আরাম।

বলেই বলল, এখানের জল খেয়েছেন ?

জল ? এখানে ?

হ্যাঁ। কল আছে তো সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁদিকে। বৃষ্টির জল ট্যাঙ্কিতে জমা হয়। তারপর পাম্প করে তা উঠিয়ে ফিল্টার করিয়ে তারপর দেওয়া হয়। জল খেলে দিল খুশ হয়ে যাবে।

আবার একটু থেমে বলল, ফেরার পথে তেহ্‌রির দিকে একটু গেলেই যা রাবড়ি পাওয়া যায়, তা বলার নয়। পুরো গাড়োয়ালে এর জবাব নেই।

তাই ?

তারপর চারণ বলল, উনি ঈশ্বরের সেবক, কামাইএর ধান্দা কেন ?

হাঃ। ঈশ্বরের সেবা আজকাল আর কজন করেন বাবু ?

তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, সবাই নিজের নিজের পেটেরই সেবা করে। ডাক্তারও কী রোগীর সেবা করে আজকাল ? না, উকিল মোক্তারের ? জমানাই বদল গ্যায়া।

তাই ?

এই সত্য কথনে আহত হল চারণ।

ওঁর ছেলে মেয়ে নেই ? সংসার ?

আছে না! উনি তপোবনে থাকেন। ওঁর ছেলে ভারী চাকরি করে। এক ছেলে ব্যবসা। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে ভারী-ভারী সব অফসারদের সঙ্গে।

ছেলেরা কেউ পুজো করে না ? মানে, পুরোহিত হয়নি ?

নাঃ। এখন প্রত্যেকেরই অনেক টাকার দরকার। এই টঙে সারাদিনে কজন যাত্রীই বা আসে।

ধূপ-ধুনো, ফুল, মন্দিরের গা-থেকে ঝোলানো ঘণ্টার মন্দ্রস্বর এই কলুষহীন উত্তুরে বাতাস, পাখির ডাকে নিজের মনটাতে বেশ একটু নিরাসক্তি এসেছিল, ধার্মিক-ধার্মিক ভাব। আর ঠিক সেই সময়েই এই খচ্চরওয়ালা উলটো বকে এই শান্তির বাতাবরণ ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিল। চটকে দিল শ্রদ্ধা।

খচ্চরের মালিকও কি খসসর হয় ? কে জানে!

এসব কথা তো সে জানেই। রোজই শুনে শুনে ক্লান্ত। আর ক্লান্ত বলেই তো এতদূরে এসেছে অন্য কিছু শুনবে বলে। তবে কি এসব চারণের উইশফুল থিংকিং ? সকলেরই কি ভেক আছে ? সব সাধুর ? সব পুরোহিতের ?

না, না, তা হতেই পারে না। এই পুরোহিতের ত এই পেশা। ওঁর সঙ্গে ত্রিবেণী ঘাটের ভীমগিরির ধিয়ানগিরিদের কোনওই মিল নেই। ওঁরা প্রকৃতই সাধু। সন্ত আদমি। মাধুকরী করে খাওয়া সহজ মানুষ সব।

আবারও মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠল। চারণ বুঝল যে, আবারও যাত্রী এল তিনশ ষাটটি সিঁড়ি ভেঙে, পাহাড়ের চুড়োতে ওঠার পর। আরও কামাই হবে কুঁবারসিংজির।

মনটা খারাপ হয়ে গেল চারণের। ও তো কোনও মন্দিরে ঢোকেই না। মন্দিরের বাইরেটাই ওর কাছে সব। এই পাহাড়-চুড়োর কালো পাথরের চাতালটির প্রেমে পড়ে গেছিল ও। মন্দিরটিও ছোট চাতালের একেবারে মধ্যিখানে বানানো আর পর্বত-শীর্ষের পুরোটা নিয়ে পাঁচিল-ঘেরা চাতাল। পৌঁছে, ভারী শান্তি পেয়েছিল।

তারপর ভাবল, এঁদেরই বা দোষ কি ? সারা দেশই যখন লুঠমার এ মেতেছে, সব পেশারই মানুষ, রাজনীতিক, চাকুরিজীবীরা, পঞ্চায়েতের মাথা থেকে মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকেরই যখন আরও টাকার, অনেক টাকার দরকার, গণ্ডা-গণ্ডা অপোগণ্ড ছেলেদের হিল্লে করা দরকার, তখন কুঁবারসিংজি বেচারি, দেবতার সেবা করেন বলেই কি আর দেশের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন ?

থাকবেন, কি করে ?

ভাবছিল চারণ যে, হৃষীকেশের দুপাশে স্বর্গাশ্রম এবং তপোবনেও টিভি-র ডিশ-অ্যান্টেনাতে ভরে গেছে। এই আপদের হাত থেকে, সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে বাঁচতে হলে, হয় ত্রিবেণী ঘাটের মতন কোনও উদোম ঘাটে নয়তো কোনও গুহাতে কন্দরে না গেলে উপায় নেই। একদিন বিদ্যুৎ স্বাগতম ছিল। কারণ, অন্ধকারকে তা আলোকিত করত। আজকে, চারণের মনে হয় যে বিদ্যুৎ চরম অন্ধকারের বাহন হয়ে এসেছে। তার নানা-রঙা আলোর ঝলকানির আড়ালে অন্ধকারের সর্বনাশা বীজকে সাধারণে দেখতে পায় না, পাবে না আরও কিছুদিন।

কিন্তু...।

কে জানে ! হয়তো কেদারনাথ ও বদ্রীবিশালেও ডিশ-অ্যান্টেনা পৌঁছে গেছে।

হৃষীকেশ শহরে ঢোকার মুখেই রুদ্রপ্রয়াগের একটি হোটেলের বিজ্ঞাপন দেখেছিল। হোটেল পুষ্পদীপ। 'অল কমফর্টস ! টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স রানিং হট অ্যান্ড কোল্ড ওয়াটার। কেবল টিভি ইত্যাদি।'

ভাবতেও খারাপ লাগছিল ওর। আজ থেকে বছর ষাটেক আগে, যখন অলকানন্দার পারে একটি আমগাছের উপরে বসে মহান ভারতপ্রেমী জিম করবেট রুদ্রপ্রয়াগের মানুষ খেকো চিতাবাঘটিকে মেরে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর এবং এইসব অঞ্চলের বাসিন্দাদের অলিখিত, অঘোষিত কিন্তু 'DEFACTO' কার্ফু থেকে মুক্ত করেছিলেন, যখন টর্চের ড্রাইসেলের ব্যাটারি পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি, তাই অন্ধকারেই নিশানা নিয়ে গুলি করতে হয়েছিল তাঁকে। তখন উনি কি ভেবেছিলেন যে, সেই গাছটির অনতিদূরের একটি হোটেলে এবং রুদ্রপ্রয়াগের অন্য জায়গাতেও কেবল টিভি এসে যাবে।

কী উদ্ভাবন বিজ্ঞানের ! অভাবনীয়। ড্রাইসেলের টর্চ ছিল না মাত্র ষাট বছর আগে আর এখন বিদ্যুতে আর কৃত্রিম উপগ্রহে কি না করছে ? নিজে আর দাঁত মাজছে না মানুষ, কোমর টিপছে না, দাড়ি কামাচ্ছে না, ফলের রস করছে না, গাড়ি চালাবার সময়ে অ্যাকসিলেটরে পা দিয়ে চাপ দিতে হচ্ছে না, গিয়ার দিতে হচ্ছে না, শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে বোমা ফেলতে হলে বম্বার প্লেনে পাইলট লাগছে না। যে-মরুভূমিতে, ইংরেজ জেনারাল মন্টাগোমারি আর জার্মান জেনারাল রোমেল ঢোলা খাকি হাফ-প্যান্ট আর বুশ শার্ট পরে ট্যাঙ্কের যুদ্ধ করেছেন সেই মরুভূমিতেই সেদিন যুদ্ধ করল অ্যামেরিকান সৈন্যরা এয়াকন্ডিশনড ফাইটিং-স্যুট পরে। মেয়ে 'সৈন্য'রা গর্ভবতী হয়ে পড়ল সারেসার, রাতারাতি, যুদ্ধ করতে 'হবে না' বলে। মিসিল ছুটল, মৃত্যুর দূত। কোনওরকম তর্জনগর্জন ছাড়াই। নিছক তর্জনী হেলনে। বোতাম টিপে। মানুষের শৌর্য, বীর্য, মহত্ত্ব, ত্যাগ, দয়া, মায়া, সংযম, মনুষ্যত্ব এ সব কিছুরই আর কোনও দাম রইল না।

পৃথিবী দুর্বার গতিতে এগিয়ে গেছে গত ষাটবছরে। অভাবনীয় ভাবে। জয় ! বিজ্ঞানের জয় ! আরাম-আয়েসের জয় ! ভোগের জয় ! মৃত্যুর জয়।

চারণ ভাবছিল, এই যে সব হাজার হাজার বৈজ্ঞানিকদের 'উদ্ভাবন' করা যন্ত্র মানুষের সময় বাঁচিয়ে দিল, দিনের কয়েকঘণ্টা, ভিডিও, ক্যাসেট রেকর্ডারি, কেবল টিভি-র মাধ্যমে জ্ঞানী করে তুলল মানুষকে, পেজার এবং মোবাইল ফোন দিয়ে সব মানুষকেই 'গম্য' এবং 'লভ্য' করে তুলল, তার পরিণাম কি ?

কি হবে ?

এই বেঁচে-যাওয়া সময় নিয়ে মানুষ কি করল ? মানুষ ? বিধাতার সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ?

বান্দরপুঞ্ছ-র দূরের আকাশ-জোড়া বরফাবৃত পর্বতশৃঙ্গরাজির দিকে চেয়ে চারণ ভাবছিল, মানুষ যাকে অগ্রগতি ভাবছে, যাকে ভাবছে উদ্ভাবন, যাকে ভাবছে বিজ্ঞানের জয়জয়কার, তা কি মানুষকে আবার বাঁদরত্বেই ফিরিয়ে আনছে ? আমাদের সকলেরই কি বান্দরপুঞ্ছ-রই মতন লেজ গজাবে আবারও ? বিজ্ঞান কি সত্যি সত্যিই কিছুমাত্রই উদ্ভাবন করেছে ? এ সব কি নিছকই আবিষ্কার নয় ?

অনেকক্ষণ বান্দরপুঞ্ছ-র দিকে চেয়ে চারণ বসে রইল চুপ করে। ভাবছিল, ওর লেখাপড়া শেখা কি বিফলেই গেল ? এই প্রচণ্ড বিজ্ঞানমনস্কতার দিনে মানুষের মগজ কম্প্যুটারকে দাদন দিয়ে, মানুষে যখন পরমানন্দে ওয়েফার-চিপস আর আইসক্রিম খেতে খেতে সোপ-অপেরা দেখছে এই বাঁচানো-সময়ের সদ্ব্যবহার করে, নয়তো সকালে উঠে রেসের ঘোড়ার বা কেনেল ক্লাবের প্রতিযোগিতাতে সামিল হওয়া কুকুরেরই মতন ফিজিক্যাল ফিটনেসের ক্রেজে সামিল হয়েছে, তখন চারণ একা এত বিজ্ঞান-বিরোধী কেন ?

প্রকৃতই অশিক্ষিত বলে কি ?

মুঝে মাফ কর দিজিয়ে। ম্যায় জারা বীজী হো গ্যায়া থা।

কুঁবারসিংজি এসে বললেন।

চারণ উঠে পড়ল।

মনে মনে বলল, মাফ করা গেল না এই সুন্দর চাতাল আর মন্দিরকে কদর্য করে তোলার পরিকল্পনার জন্যে।

মুখে বলল, আজকে যাচ্ছি। আসব আবার কখনও।

নিশ্চয়ই আসবেন।

পকেট থেকে বের করে আরও একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিল ওঁকে চারণ। দেখেও না দেখে, উনি সেটা নিলেন।

চারণ ভাবল, অনেক সময় তো নষ্ট করেছে ও কুঁবারসিংজির। প্রত্যেক মানুষেরই সময়ের দাম থাকে। কিন্তু কে কার সময়কে কী ভাবে ব্যয় করল তার ওপরেই একজন মানুষের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য।

কুঞ্জাপুরীর মন্দিরের তিনশ ষাটটি সিঁড়ি বেয়ে চারণ যখন নেমে আসছে নীচে, তখন দেখল একটি সাদা মারুতি এস্টিম গাড়ি উপরে উঠে আসছে নীচ থেকে।

তবে যে খচ্চরওয়ালা বলল, পুণ্যার্থীরা আসেন না এখানে!

ও যখন উপরে উঠছিল মন্দিরের পথের চড়াই খাড়া ফার্স্ট গিয়ারে ঠেঙিয়ে, তখন অত্যন্তই বিপজ্জনকভাবে দুটি গাড়িকে উপর থেকে নামতে দেখেছিল। নেশাগ্রস্তর মতন এদিক-ওদিক করতে করতে আসছিল গাড়িগুলো খাড়া উতরাইয়ে। কিসের নেশা করেছিল ড্রাইভারেরা কে জানে!

সত্যি! নিরামিষ—পুরী হৃষীকেশে না এলে নিজের দেশের নিরামিষ-নেশার জগতের অলিগলিও অজানাই থেকে যেত হয়তো। কতরকম বৈচিত্র্য! আহা রে! এ সবের সামনে হুইস্কি-রাম-জিন-ভডকা এসব কোনও নেশাই নয়। অথচ ওই সবই এখানে Taboo! । যদিও এসবের প্রত্যেকটিই মাছ-মাংস নয়, ফল-ফুল ধান্য-শস্য থেকেই তৈরি হয়। তারাও নিরামিষই। অথচ এখানে সম্পূর্ণই বর্জ্য। ও সব নাকি বিজাতীয়, উত্তেজক নেশা। একশো ভাগ দিশি হলেও কারণ-বারিরও চল নেই এখানে। মনে হয়, রাগটা, জলীয় পদার্থের উপরেই। কারণটা অবশ্য অজানাই। এখানের নেশা হল সিদ্ধির নেশা, গাঁজার নেশা, চণ্ডুচরসের নেশা, আসলি কেন্দুপাতাতে মোড়া আসলি তামাকের এক আঙুল লম্বা বিড়ির নেশা, রুখা-শুখা, রুখা-প্রকৃতির নেশা, শুখা-ভৈরবীর নেশা, এত সব নেশার কথাও তো আগে জানত না চারণ! আস্তে আস্তে জানছে। খচ্চরের নেশার কথাও।

খচ্চরের নেশাটা অবশ্য ঠিক কী বস্তু তা ও নিজেই ভাল করে জানে না। তবে, নাকে এখনও খচ্চরের গন্ধটা, তীব্র এবং টাটকা আছে। নাকে নিয়েই চারণ বুঝতে পেরেছে এই গন্ধ যে, খচ্চরেরও মানুষকে ইনটক্সিকেট করার ক্ষমতা আছে।

গরুর গায়ের গন্ধ, কুকুরের গায়ের গন্ধ, ঘোড়ার গায়ের গন্ধ সম্বন্ধে ও অভিজ্ঞ ছিলই। কিন্তু তাদের গায়ের গন্ধে এমন kick নেই, যে kick, সব নেশারই মূলে। তার সঙ্গে আজ যোগ হল গাড়োয়াল রেঞ্জের বিরেডা গ্রামের 'থারো-ব্রেড' খচ্চরের গায়ের গন্ধ।

বৃষ্টিতে ভিজলে মোটা-মোটা রোমওয়ালা চতুষ্পদ জন্তুদের গায়ের গন্ধ ভুরভুরায়। তা তারা বন্যই হোক কী গৃহপালিত।

চারণ জানে।

চারণের মা বলতেন, ও যখন ছোট ছিল তখন ওর মাথাতে উড়ন-চাঁটি মেরে বলতেন, তুই একটা গন্ধ-গোকুল, বলতেন, "ছুছুন্দরকী শর পর চামেলিকি তেল।"

কেন বলতেন, তা জানে না। খচ্চরের গায়ের গন্ধটা কিন্তু তীব্র হলেও বেশ বন্ধুভাবাপন্ন। চারপেয়ে প্রাণী বলেই এই প্রজাতিকে গন্ধ দিয়েই দূর থেকে চেনা যায়। এদের চেনা, দুপেয়ে 'খসসরদের' মতন কঠিন নয়। 'খসসরদের' গায়ে নিজস্ব কোনও গন্ধ নেই। যে-ধান্দা নিয়ে তারা যখন ঘোরে তাদের গা থেকে তখন সেই ধান্দার গন্ধ ছাড়া অন্য সব ধান্দার গন্ধই ওড়ে।

এও 'খসসরদের' এক ধরনের 'খসরামি'।

চারণও নীচে পৌঁছেছে আর সাদা মারুতি এস্টিমটাও এসে পৌঁছল।

চারণ, কুমার ট্রাভেলস-এর ভাড়া গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল এমন সময়ে এক বামাকণ্ঠ ওই গাড়ির দরজা খুলে নেমেই ইংরেজিতে বলল, হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ। ইন দিস আউট অফ দ্য ওয়ার্লর্ড প্লেস! চারণদা-দা+আ+আ+আ!

চারণ, বিষম খাওয়ার মতন চমকে উঠে দেখল, মিলি!

তুমি!

দক্ষিণ কলকাতার সোসাইটি-গার্ল, ক্লাব-পার্টি করা, রেসের মাঠে যাওয়া সুন্দরী মিলিকে এখানে দেখে অবাক হল চারণ।

মিলি একটা কমলা-রঙা সিল্কের শাড়ি পরেছে। সাদা সিল্কের ব্লাউজ। কপালে কমলারঙা বিন্দি, পায়ে চামড়ার কমলা-রঙা চটি। হাতে, এক্সপোর্ট-লেদারের নরম কমলা-রঙা ব্যাগ, কোমরে রুপোর পৈঁছা আর এক বিঘৎ অনাবৃত ফরসা মসৃণ পেট-দেখানো কোমর থেকে গোঁজা কমলা-রঙা রুমাল। পেটটা এমন করে দেখায় ও, যেন পেট দেখলেই পেটের নীচে কি আছে তা দেখতে ইচ্ছে যায় দেখ-ভাল করণেওয়ালা পুরুষদের।

চারণদা! আপনি এখানে? অফ অল প্লেসেস, এই গড-ফরসেকেন কুঞ্জাপুরীতে?

হু সেইড সো? দিস প্লেস, আই অ্যাম টোল্ড, ইজ ভেরি মাচ অ্যান অ্যাবোড অফ গড। আই মীন, গডেস।

তা বলতে পারেন। আপনি যেখান থেকে নেমে এলেন সেখানে আর কোনও ভগবান থাকেন তা আমি জানি না, কিন্তু আমার ভগবান অবশ্যই থাকেন।

ভয়ে চারণের পেট গুড়গুড়িয়ে উঠল।

মিলিটা তো ফার্স্ট-রেট-ফ্লার্ট হয়ে উঠেছে। ভাবল, চারণ।

তারপর তুতলে বলল ই-ই-ইয়ার্কি কোরো না। তুমিই বা কোত্থেকে? পথ ভুলে?

ওপাশের দরজা খুলে কাৎলা মাছের মতন লাল-চোখো এবং বোয়াল মাছের মতন মুখশ্রীর বেঁটে-বাঁটকুল ফেডেড-জিনস আর 'ওয়্যারহাউসের' ক্যাজুয়াল-ওয়্যার একটা খাকি জামা পরে নামলেন একজন। তিনি ডান হাতের আড়াইখানা আঙুল তুলে শিঙ্গিমাছের লেজেরই মতন দ্রুত নাড়িয়ে বললেন, হাই!

চারণও যন্ত্রচালিতের মতন বলল, হাই!

এ. কে. ফর্টিসেভেনের গুলির মতন এফর্টলেসলি বেরিয়ে গেল শব্দটা।

তারপরে চারণ বলল, ইনি?

ও, আই অ্যাম সরি। ইনি গবেশ গুহ।

চারণ ভাবল, 'শ'টি কর্তন করে 'ট' বসিয়ে দেওয়া উচিত অবিলম্বে।

আর এই যে!

যে ডিমিন্যুটিভ ভদ্রমহিলা গাড়ির পেছনের সিট থেকে নামলেন, শুশুকের মতন, কিন্তু সাদা শুশুক, তাঁর দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বলল মিলি, এই যে, আমাদের চামচুমা বৌদি।

নমস্কার!

বলল, চারণ।

মিলি বলল, হরিদ্বারে ফ্ল্যাট কিনেছেন গবেশদা। ওঁরা বিষনই ভালবাসেন হারডয়ার।

চারণের ইচ্ছে হল বলে, যে কোনও HARDWAREই ওঁদের অবশ্যই ভালবাসেন। ভালবাসাবাসিতে মিউচুয়ালিটিই হল প্রধান শর্ত।

কেমন দেখলেন মন্দিরের বিগ্রহ? দেবা, না দেবী?

আমি মন্দিরের ভিতরে ঢুকিনি।

মাই গুডনেস। হোয়াই?

আমি ঢুকি না কোনও মন্দিরেই।

সিলি! হাইট অফ স্টুপিডিটি চারণদা-আ+আ।

ফোর-প্লে করার পরেও প্রবেশ না করে চলে যাওয়া। হাউ মরবিড।

বলেই, গবেশ হাসল।

খিঃ খিঃ। করে, হাসল মিলি।

চারণ অফেন্ডেড হল। মিলির বাবা পর্যন্ত তাকে সম্মানের চোখে দেখতেন আর মেয়েটার কোনও পাত্র-জ্ঞান নেই।

বিরেডা গ্রামের নাম না জানা ছেলেটার ইনোসেন্ট খচ্চরটার গন্ধ ফিরে এল ওর নাকে। তার পরেই এই দুপেয়ে মেয়ে খসসর-এর। এটা নতুন খসসর। এখনও গন্ধ ক্যামোফ্ল্যাজ করা শেখেনি।

ভাবল, চারণ।

চামচুম বৌদির মাথার উপর দিয়ে মিলির স্থূল রসিকতা এবং ইংরেজি ভাষা, বাউন্সার এর মতন বেরিয়ে গেল। চার হাত পা এবং তাঁর তাবৎ বুদ্ধির বেঁটে ব্যাট ঘুরিয়েও তিনি খেলতে পারলেন না মিলিকে।

পরক্ষণেই চারণের মনে হল, গবেশ কোনও অশিক্ষিত বড়লোকের মেয়েকে ফাঁসিয়েছে অথবা তার বাবাই গবেশকে ফাঁসিয়েছে। বড়লোকদের মধ্যে অধিকাংশই অবশ্য অশিক্ষিত। কিছু ক্ষমতান্ধ শিক্ষিতর মধ্যে শিক্ষার গুমোর অবশ্য থাকে। প্রকৃত শিক্ষিত নন বলেই থাকে।

মোটা চামচুম বৌদি ফুলে ফুলে হাসলেন। হুঃ হুঃ হাঃ হাঃ।

অবভিয়াসলি-মোটা, রসিকতার বিন্দুমাত্রই না বুঝে।

চারণের ভাল লাগল চামচুম বৌদিকে। কোনও প্রিটেনশানস নেই। অ্যাজ পিওর অ্যাজ ছ-মাসের গাব্দাগোব্দা ছাগলছানা। মানে, মানসিকভাবে, যদিও শরীরে তিনি জলে-ঢেউতোলা শুশুক।

আপনি কোতায় উটেচেন ?

মন্দাকিনী হোটেলে।

ও+ও+ও ম+অ+আ+আ। আমরাও তো সেকানেই চেক-ইন করে সোজা একানে আসচি। কাল সকালে পাহাড় ছড়ব। মানে, গাড়িতে। আপনার ঘরের নাম্বার কত ?

আমি আজ বিকেলেই চেক-আউট করে চলে যাব।

চারণ মিথ্যে বলল।

যাবেন কোতায় ?

চারণের ইচ্ছে হল যে বলে, জাহান্নামে। কিন্তু বলল, কিছু না ভেবেই, চাম্বাতে।

সেটা কোথায় ? বাট হোয়াই ? নো-ও-ও। উ্য কান্ট। রাতে আমরা ডিনার খাব একসঙ্গে।

চারণ বলল, মিলির মানসিকতার স্তরে নিজেকে অদৃশ্য প্যারাসুট দিয়ে নামিয়ে এনে, মাই ফুট! ডিনার! রুটি-তড়কা না রুটি পালক-পনির ? ডিনার ? আর তার পর ? নাচবে কোথায় ? তোমার তো শুনেছি ডিনারের পর না নাচলে ডিনার হজম হয় না। তা, এ কি তাজবেঙ্গল পেয়েছ ? 'ইনকগনিটো' আছে এখানে ভেবেছ বুঝি ?

গবেশ মধ্যে পড়ে এবারে খাটাশের মতন হাসল, খোঃ। খোঃ।

মিলি বলল, আপনিই তো আচেন। আপনিই আমার তাজ বেঙ্গলের 'ইনকগনিটো', এবং ওবেরয় গ্রান্ডের 'পিংক-এলিফেন্ট।'

চামচুম চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তাকে দেখলে মনে হচ্ছে, দাঁড়াতেও ভারী কষ্ট তার। তাকে শুইয়ে দিলেই আরামে থাকে। এতই মোটা সে মহিলা!

চারণ মনে মনে বলল, মিলিকে, পেঁচি, ক্ষ্যামা দে।

চুপ করে আচেন কেন চারণদাদা ?

মিলি অধৈর্য গলাতে বলল।

চারণভূমিতে যেতে হবে আমার।
সেটা কি জিনিস আবার।
সংসদের অভিধান দেখে নিও।
সেটাই বা কি ? কী যে কুইজ করো না তুমি।
গবেশ শব্দের মানে কি স্যার ?
গবেশের দিকে ফিরে হঠাৎই জিজ্ঞেস করল চারণ। কথা ঘুরিয়ে।
ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং, গলাটা একটু খাঁকরে নিয়ে গবেশ বলল, আমি জানি না স্যার।
সে কি ! নিজের নামের মানে জানেন না ?
না চারণদা।
চারণ মনে মনে গায়ে-পড়া, বোয়াল-মুখো, কাৎলা-চোখো লোকটার উপরে চটলো।
চেনা নেই শোনা নেই, দাদা ! বঙ্গভূমের এই এক কাদা !
নাম দিয়েছিলেন কে ?
বাবা-মায়ের দেওয়া নাম তো ছিল প্রাণধন। তা চামচুম আমার সঙ্গে বিয়ের পরে বলল, তুমি প্রাণ তো নয়ই, ধনও নয় !
চামচুম ডলফিনের মতন শব্দ করে হাসল।
ধনও নয় কেন ? বাংলার সব ছেলেই ধন। 'ধন ধন ধন, আমার সো-না-র খো-ও-কন।'
শোনেননি ?
চারণ বলল।
না, তা নয়, চারণদা। আমি আমার স্ত্রীকে খুব বালবাসি। তাই, অ্যাফিডেভিট করে নামটা বদলে নিলাম।
গবেশ নামটা ঠিক করেছিলেন কে ? এরই বা মানে কি ?
নাম ঠিক করে দিয়েছিল চামচুমই। তবে মানে, ওও জানে না।
সে কী।
আজ্ঞে।
এ নামটা বুদ্ধদেব গুহর কোনও উপন্যাসের নায়কের নাম। এমন সব উদ্ভট উদ্ভট নাম দেন না ভদ্রলোক !
আপনার স্ত্রী বুঝি বুদ্ধদেব গুহর ভক্ত ?
না, না, আমার স্ত্রী নন। আমার মেয়েকে যিনি বাংলা পড়ান, সেই দিদিমণি।
মিলি ফুট কাটল, হ্যাঁ। সে বিষনই বক্তু।
বাংলা তো আমার মেয়ে পড়তেই চায় না অনেক আধুনিক 'শিক্ষিত' বাঙালির মতন।
গর্বিত গলাতে বললেন গবেশ অথবা গবেট,
তা, উনি নামের মানেটা বলেননি ? মানে, মেয়ের বাংলা দিদিমণি ? নামটা তো ওঁরই দেওয়া ?
না, না। নাম আমিই দিয়েছি।
এবারে চামচুম বললেন।
তারপর বললেন, রিনা বলল, একটা উদ্ভট নাম দিয়ে দাও। বুদ্ধদেব গুহ ঠিক একটা মানে বের করে দেবেন।
চারণ হেসে বলল, তাই ? বাঃ দ্য জোক অফ দ্য ইয়ার। গ্রেট লেখক তো !
ভাবল, এদের জন্যেই বাংলা সাহিত্যের এই অবস্থা। ঘিলু বলতে কিছু নেই, বাবরির বাহার।
মিলি বলল, কতবার বললুম। তোমার নাম রাখো গলিয়াথ, গবেশ বদলে, তা শোনে কই ?
গলিয়াথ ?
স্তম্ভিত হয়ে বলল, চারণ।
হ্যাঁ গলিয়াথ ! হোয়াই নট ?

মিলি যেন চারণের মনের কথাই আঁচ করে বলল, আমি কিন্তু ওইসব ট্র্যাশ পড়ি না। আমি কোনও বাংলা বই-ই পড়ি না।

পড়বেই বা কেন ? তুমি তো মেমসাহেব।

ওয়েল, ড্য ন্যো চারণদা, আই অ্যাম।

বলেই বলল, তুমি কি নীচে নামছ ?

চারণ হেসে বলল, নীচেই তো নামছি সারাটা জীবন। নীচে নামা তো চিরকালই সহজ মিলি। তুমি তারাশংকরের 'দুই পুরুষের' সুশোভনের ডায়ালগটি জানো না বুঝি ? নাটকের রেকর্ডও ছিল। জহর গাঙ্গুলি অভিনয় করতেন ওই চরিত্রে, আর ছবি বিশ্বাস, নুটুবিহারী। পড়েছ কি দুই পুরুষ ?

না। পড়িনি। বললামই তো যে, বাংলা পড়িনি। বলো না, কী ডায়ালগ ?

নুটুবিহারী মোক্তার, মাতাল সুশোভনকে বললেন, 'তোমার এত বড় অধঃপতন হয়েছে সুশোভন ?'

জবাবে সুশোভন বললে, জড়ানো গলাতে, 'পতন তো চিরকাল অধঃলোকেই হয় নুটুদা ! কে আর কবে ঊর্ধ্বলোকে পড়েছে বল ?'

খোঃ খোঃ করে গবেশ হেসে উঠল।

মিলি বলল, ওয়াণ্ডারফুল।

তারপর বলল জানো, মাঝে মাঝে মনটা খারাপ লাগে, নিজে বাঙালি হয়েও বাংলা সাহিত্য পড়িনি, পড়িনা বলে । কিন্তু এত প্যানপ্যানে, ম্যাদামারা না, যে পড়তে ইচ্ছেই করে না। তবে বাঙালি লেখকদের জন্যে আমার ফিলিং আছে। মাই ! মাই ! হাউ পুওর দে আর ! দে লিভ লাইক দ্যা ব্ল্যাকস লিভিং ইন ন্যু ইয়র্কর্স ঘেট্টো। বিক্রম শেঠ, দুধের শিশু, একখানা 'দ্য স্যুটেবল বয়' লিখেও মাল্টি-মিলিয়েনিয়র হয়ে গেল। আর বাংলাতে যাঁরা লেখে ? খেতে পায় না চারণদাদা, খেতেই পায় না। ওয়াট আ পিটি।

সে কথা অবশ্য বেঠিক নয়।

মিলি বলল, তবে খবর-কাগজের সঙ্গে যাঁরা আছেন, মানে চাকরি করে, বা না-করেও চাকর এবং সেখানে নিয়মিত লেখেন তাঁরা সকলেই ওয়েল-অফফ বলে শুনেছি। ফ্ল্যাট আছে, গাড়ি আছে।

তেমনই শুনেছি অবশ্য। চারণ বলল।

দ্যাটস রাইট। অনেকই করেছে খবর কাগজেরা, হা-ভাতে লেখকদের জন্যে, কবিদের জন্যে।

গবেশ বলল। মানে, তাঁদের ভাত-কাপড়ের জন্যে।

আপনি এত জানলেন কি করে ?

চারণ শুধোল।

আমার আপন মাসতুতো ভাইয়ের আপন সেজ ভায়রাভাই-এর মেজ ভগ্নীপতি যে জার্নালিস্ট।

ও। তবে তো জানতেই পারেন। অবশ্যই পারেন !

চারণ বলল।

তারপর বলল, বাংলা সাহিত্য পড়েন না অথচ বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি যে আপনার এতখানি কনসার্ন তা তাঁরা জানতে পেলে প্রীত হতেন। খবর-কাগজেরাও হয়তো খুশি হতেন তাদের পুণ্যকর্মর অ্যাপ্রিসিয়েশনের জন্যে।

মিলি হঠাৎই বলল, বাঈ। পুণ্য করতে যাই।

চারণ, যেন শুনল, "উঠল বাই তো কটক যাই।"

মিলি বলল, আমরা কিন্তু দেবভূমিতে এক-ক্রেট হুইস্কি স্মাগল করে নিয়ে এসেছি। রাতে জমে যাবে। হিঃ হিঃ।

শুকনো থাকতে পারি না মা শ্যামা, আমার কারণ বারি চাই।

কাৎলা-চোখো বোয়াল-মুখো গবেশ বলল।

তারপর হাসল, খিঃ খিঃ।

চামচুম আশ্রম-মৃগীর মতন ড্যাবা-ড্যাবা চোখে চেয়ে রইল তার স্বামীর দিকে। মৃগীরা ছাগীদের কাজিনস।

মনে পড়ল চারণের।

চারণের চিন্তা হল চামচুমের জন্যে। যে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই পারছে না, সে ওই তিনশ ষাটটি সিঁড়ি উঠবে কি করে!

মিলি এগিয়ে যেতে যেতে বলল, বাঈ। আজ রাতে যাবেন না প্লিজ। এই মরুভূমিতে আপনিই ওয়েসিস।

চারণ দাঁড়িয়ে দেখছিল। ওরা উঠতে লাগল উপরে।

গবেশ রেলিং ধরে কচ্ছপের মতন উঠছিল আর চামচুম নীলগিরি হিলস-এর স্লো-লরিস বাঁদরির মতন, ভূকম্পন তুলে, ছেদড়ে ছেদড়ে। আর মিলি উঠছিল ক্যাট-ওয়াকিং করে। যেন কুঞ্জাপুরীতে আজ দুপুরে কোনও অ্যাড-এজেন্সি আয়োজিত ফ্যাশান-প্যারেড আছে।

গাড়িতে বসে, ড্রাইভারকে গাড়ি স্টার্ট করতে বলে, ও ভাবছিল, ওর মুক্তি নেই, মুক্তি হবে না। যে-অনুষঙ্গ ওকে ঘিরে ছিল, যে কালিমা, যে কলুষ, যে সস্তা বিত্তবেষ্টিত সাধারণ্য ওর পা দুটিকে, বাদার দলদলিরই মতন জড়িয়ে ছিল, তা থেকে নিজেকে বিযুক্ত করা হয়তো এ জন্মে আর হবে না।

মিলির মতন, গবেশের মতন, চামচুমের মতন অগভীর মানুষেরা কুঞ্জাপুরীর মন্দিরে এত কষ্ট করে উঠে কী খুঁজবে কে জানে! হয়তো কলকাতাতে ফিরে ঝলমলে ড্রয়িংরুমে বা ক্যালকাটা ক্লাবের লেডিজ কফি-মিট এ কুঞ্জাপুরী দেখার রোমহর্ষক গল্প করবে, যেমন ভাবে রাজস্থানের রানথামবোর স্যাংচুয়ারিতে বাঘ দেখার গল্প করে।

কিছু মানুষ সংসারে চিরদিনই ছিল, আছে এবং থাকবে, যারা চিরটা জীবন অন্যকে ইমপ্রেস করার জন্যেই বেঁচে থাকে। মৃত্যুর ক্ষণ অবধি। যখন যম ডাকে, শুধু তখনই বুঝতে পারে, এ জন্মটা বৃথাই গেল। নিজের জন্যে কিছুমাত্রই করা হল না। মিলিরও এই জন্মটাও হয়তো তেমনভাবেই যাবে। তবে গবেশ আর চামচুমের কথা বলতে পারে না চারণ। অত অল্প সময়ে দেখে কোনও মানুষকেই বিচার কথা উচিত নয়। বাইরে থেকে, কচ্ছপদের, খোলার জন্যে সঠিক দেখা যায় না। তাদের চিৎ করিয়ে ফেলতে হয়। তাতে, সময় লাগে। এমনও হতে পারে যে, গবেশের মধ্যে হয়তো খুবই গভীরতা আছে। সেও মিলিকে ইমপ্রেস করারই জন্যে এই মূর্খর মুখোশ পরে আছে। এমন অনেক মানুষ ও মোসাহেব দেখেছে তার পেশার জীবনে। কারোকেই বহিরঙ্গ রূপ দেখে বিচার করতে নেই তড়িঘড়ি। ঠকতে হয় তাতে।

ভাবছিল চারণ, তার পেশাতে সে সমাজের এমনই Cross-section নিজ চোখে দেখেছে, দূরে এসে সেই অভিজ্ঞতার গভীরতা এখন বুঝতে পারে। এবং পেরে, চমৎকৃত হয়।

পেশা থেকে অর্থ যা পেয়েছে! মান যা পেয়েছে তা তো পেয়েছেই। মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মেছে, সেও তো ফ্যালনা নয়।

মিলিও তার এক মক্কেলেরই কন্যা। যেমন ছিলেন পাটনের বাবাও। দুজনের বাবারই একটাই অসুখ। সে অসুখের নাম টাকা। লক্ষ্মীদেবীর মতন ছিন্নমতি দেবী বোধহয় বেশি নেই। দশটির মধ্যে নটি ক্ষেত্রেই তিনি গিয়ে ভুল বাড়িতে ঢোকেন কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তরা প্রতি বৃহস্পতিবারে তাঁকে পুজো করে, লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিনে যারা দরজার বাইরে থেকে সিন্দুক বা আলমারি পর্যন্ত লক্ষ্মীর পা আলপনায় আঁকে, পরম যত্নে চালের গুঁড়ো আর ময়দার পিটুলি দিয়ে, তাদের বাড়িতে না গিয়ে, যাদের বাড়িতে তাঁর আরাধনা আদৌ হয় না, তাঁদের বাড়িতেই গিয়ে ওঠেন তিনি।

অর্থর মতন অনর্থ যে আর দ্বিতীয় নেই, গোবরের মধ্যে, পুরীষের মধ্যে, পচা-কাঠের মধ্যে, ঝুরো-মাটির নীচের অর্থবানদের, পোকামাকড়েরই মতন তার নৈর্ব্যক্তিক পেশাদারি দৃষ্টি, এবং পর্যবেক্ষণের কাঠি দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে এই সিদ্ধান্তেই এসেছে চারণ।

এই প্রেক্ষিতে চারণ অবশ্যই বলবে যে, পাটন ছেলেটা তাকে একেবারেই বুদ্ধু বানিয়ে দিয়েছে।

বৃদ্ধ সিংকে সঙ্গে নিয়ে, একদিন ভিয়াসির কাছে পাটনের ভোঁদাইবাবার আশ্রমে তাকে যেতেই হবে। পাটনের বাবার মতন এমন একজন ছোট মনের, নিষ্ঠুর, স্বার্থমগ্ন ধনকুবের বেশি দেখেনি চারণ। তাঁদের ছেলেমেয়েরা সাধারণত মিলির মতনই হয়। পাটনের মতন নয়।

মিলি বিবাহিত। তার স্বামী ঘরজামাই। হাবা-গোবা, একজন অতি সাধারণ ঘরের, বি এ পাশ, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন ছেলের সঙ্গে মিলির বিয়ে দিয়েছিলেন মিলির বাবা, নাতি-নাতনি নিয়ে খেলা করবেন বলে, যেমন করে তিনি তার জার্মান স্পিৎজদের নিয়ে খেলেন। কিন্তু বিধি বাম। চারণ জানে না, মিলি আদৌ তার স্বামীর সঙ্গে সহবাস করেছে কি না! বিয়ে অবশ্য হয়েছে মাত্র তিন বছর। তবে সহবাস করার মানুষের অবশ্য মিলির অভাব নেই। এখনও মনে সন্তানের ইচ্ছা জাগেনি হয়তো, তাই সন্তান আসেনি। তবে যখনই আসুক, মিলির সন্তান সম্ভবত কানীনই হবে। জীবনকে তার মতন করে উপভোগ করার সাধ আছে মিলির। সাধ্যও আছে। কিন্তু সাহস নেই। ও যদি কোনও মনোমতো পুরুষ সঙ্গীকে একা নিয়ে আসত এখানে, তাও বুঝত চারণ। কিন্তু এই গবেশ আর চামচুমের গুণগত মান সম্বন্ধে আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারেনি ও। অবশ্য ওর সন্তুষ্টি নিয়ে মাথাই বা কে ঘামাচ্ছে! এইসব অশিক্ষিত অর্থবানদের প্রত্যেকেরই মধ্যে একটা জিনিস দেখেছে ও, যা কমোন। তা হচ্ছে, এঁরা কেউই কোনও স্বার্থ যেখানে নেই, সেখানে মানুষের সঙ্গে মিশতে পারেন না। মোসাহেব ও চাকর-বাকর ছাড়া, এঁরা কারও সঙ্গেই মিশতে পারেন না।

মিলির বাবা হরিচরণবাবু হাওড়াতে থাকতেন এখনও। মিলিই একমাত্র সন্তান। হরিচরণবাবুর স্ত্রী মিলির বিয়ের আগেই গত হয়েছিলেন। হরিচরণবাবুও গত হয়েছেন বছর দুয়েক হল। তারপরই মিলি এই মিলি হয়েছে। বাড়িতে তার স্বামী জনার্দন কুকুরদের দেখাশোনা করে, খরচের হিসাব রাখে, তিনখানা গাড়ি সার্ভিস করায়, মেরামত করায়, ফার্নিচার ঝাড়পোঁছ করায়, ঝাড়গ্রামের বাগানবাড়ির দেখাশোনা করে। জনার্দন ছেলেটা খুব শান্ত। এবং ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেছিল। ভাল ছেলে। বেচারি। ও যদি জানত যে, ওর জীবদ্দশাতেই ও নিজেই ইতিহাস হয়ে যাবে তবে কী করত কে জানে! সবচেয়ে বড় কথা, নিম্নবিত্ত গরিব মা নিজের এবং ওর সুরাহার জন্যে কোটিপতির একমাত্র সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ আসাতে গদগদ হয়ে রাজি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন যে, ওঁর হাওড়ার কদমতলা লেন থেকে বেরোনো সরু গলির মধ্যে তাঁর ভাড়া বাড়িতে এসে মিলি ঘর আলো করবে। ওঁর সব স্বপ্নই বিফল হয়ে ছিল। একাই থাকেন সেখানে। একটা মেয়ে রেখে দিয়েছে জনার্দন তার হাতখরচের টাকা থেকে।

এই জনার্দন ছেলেটা চারণের কাছে এক বিস্ময়। কোনওরকম জাগতিক চাহিদা শূন্য ছেলেটা। ইতিহাসে বি এ-র চাকরি হয় না সহজে। হলেও, মাকে ছেড়ে সে যেতে পারত না, যেতও না। তাই ভাগ্যের হাতে সে নিজেকে সমর্পণ করেছে। আজকের দিনেও লক্ষ লক্ষ বাঙালি ছেলে যা করে।

চারণ এতদিন জানত 'পুত্রার্থে ভার্যা'। কিন্তু জনার্দন 'পুত্রার্থে স্বামী'। অথচ সেই কাজটাও মিলি ওকে দিয়ে করাল না। কিন্তু আশ্চর্য! হরিচরণবাবু বা মিলির এত বৈভবের মধ্যে বাস করেও বড়লোকদের কোনওরকম দোষ ছুঁতে পারেনি জনার্দনকে। ও জানে, ও সব ওর নয়, ও সবে ওর অধিকারও নেই। প্রয়োজনও নেই। সংসারে থেকেও যে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, তা কুঁবারসিংজিরাও শিখতে পারতেন জনার্দন দলুই এর কাছ থেকে।

জনার্দনের সব দুঃখের কথা চারণ জানে, কিন্তু তা শোধন করার কোনও ক্ষমতাই ওর নেই।

হরিচরণবাবু জনার্দনকে কিছুমাত্রই দিয়ে যাননি তাঁর উইলে। বাড়ির ভিতরের একজোড়া স্পিৎজ কুকুর, বাইরে জোড়া অ্যালসেশিয়ান এবং একটি গ্রেটডেন এবং বাগানের আধডজন ম্যাকাও যেমন খেতে পায় দুবেলা, দানা এবং পানি, জনার্দনের অধিকার তাদের চেয়ে একটুও বেশি নয় এ সংসারে।

জনার্দন দুপুরে একবার মায়ের কাছে যায়। সেই তার জীবনের একমাত্র সুখ।

কত মানুষের কত রকম দুঃখ থাকে এ সংসারে তার কতটুকুই বা অন্যে লাঘব করতে পারে!

অন্যের কষ্ট চারণকে চিরদিনই মথিত করেছে। আজও করে। চারণ যে হরিচরণবাবুর মতন মানুষদের, পাটন-এর বাবার মতন মানুষদের সেবা করেই জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ কাটিয়ে দিয়েছে, এটা ভেবে, নিজের প্রতি অনুকম্পা হয়। আবার কখনও ভাবে, যা কিছুই ঘটে, তার পেছনে হয়তো কোনও গূঢ় কারণও থাকে, যা আদৌ আপাত-দৃষ্টিগোচর নয়।

আপশোষ হচ্ছিল, মিলিকে জনার্দনের কথা জিজ্ঞেস করা হল না বলে।

মিলি লা-মার্টস-এ পড়েছিল নাইন্থ ক্লাস অবধি। তাই যথেষ্ট। ফটফট করে ইংরেজি বলতে পারা আর কী করে, কোথায়, মুঠো-মুঠো পরার্জিত টাকা অবহেলে খরচ করা যায়, তা জানলেই ঐ সমাজে সহজেই 'শিক্ষিত' এবং 'সপ্রতিভ' বলে মান্য হওয়া যায়। শিক্ষা আর ঔদ্ধত্য ঐ সমাজে সমার্থক। ঔদ্ধত্য বা দম্ভর আবার রকমভেদ আছে। হরিচরণবাবুদের মধ্যে কেউ কেউ রক্তকরবীর রাজার মতনই লোকচক্ষুর আড়ালে থাকেন। তাঁদের বড় একটা দেখা যায় না। শোনা যায় শুধু। তাও, তাঁদের নিজের কণ্ঠস্বরেও নয়। তাঁদের চাকরবাকরেরই কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে। তাঁরা কারওকে তোলেন, কারওকে ফেলেন। অবলীলায়, অবহেলে।

লক্ষ্ণৌ-এর নবাবেরা যেমন বটেরের বা উটের দৌড় দেখতেন খেলা হিসেবে, তেমনই এই তোলা-ফেলার খেলাটাই তাঁদের একমাত্র খেলা। সাধারণত এই শ্রেণীর অর্থবানেরা কান-পাতলা হন। ফলে, অন্যদের উপরে নির্ভর করতে করতে একটা সময় আসেই, যখন একটা চক্রর শিকার হতে হয় তাঁদের প্রত্যেককেই। হিতার্থীর মুখোশ-পরা একদল চাকরই যে তাঁদের অজ্ঞাতে কখন তাঁদের মালিক হয়ে ওঠেন, তাদের পূর্ণ অনবধানে এবং মৌন-সম্মতিতে, তা বুঝতে পর্যন্ত পারেন না তাঁরা। এই দল, 'খসসর' বড়লোকদের মধ্যে হিমবাহ। তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ডর সামান্যই দেখা যায়। যতখানি না বড়লোক তাঁরা, দেখান তার চেয়ে বেশি। দুহাতে টাকা খরচ করেন।

আবার আরেকদল বড়লোক আছেন, যাঁরা চেঁচান, মাথা গরম করেন, টাকার গরম দেখান। আসল ক্লাস ওয়ান গ্রেড ওয়ান বড়লোকেরা কিন্তু নিজে হাতে টাকা ধরেন না, নিজে হাতে টাকা খরচও করেন না। আয়ের টাকাও নিজে হাতে ছোঁন না, নিঃশব্দে আয় হয়, ব্যয়ও হয়, নিঃশব্দেই। তার জন্যেও মাইনে করা লোক আছে। তাঁরা কখনওই রাগ দেখান না। নিজে হাতে রেগে গিয়ে চড়চাপড়ও মারেন না, নিজ-মুখে বকেন না। তাঁরা খুন করিয়ে দেন অন্যদের দিয়ে অপছন্দর মানুষকে। আয় করার, ব্যয় করারও জন্যে তাঁদের যেমন চাকর থাকে, খুন করার জন্যে, চরিত্র-হননের জন্যেও বিভিন্নরকমের চাকরের চাষ করেন তাঁরা।

কুঞ্জাপুরীর মন্দিরের খাড়া উতরাই নেমে এসে গাড়িটা এবারে তেহরি-গাড়োয়ালের পথে নেমে বাঁদিকে মোড় নিল। পাহাড় নামার টেনশন থেকে মুক্ত হল চারণ। ড্রাইভারকে বলল, ফেরার সময়ে নরেন্দ্রনগরের ভিতরটা একটু ঘুরিয়ে দেখাতে হবে ভাই। গাড়োয়ালের রাজারা আগে থাকতেন তো এখানে!

ড্রাইভারও গাড়োয়ালি। নাম কেশর সিং। তার বাড়ি দেবপ্রয়াগে। সে বলল, দেখাবে।

এতদিন চারণ তার পরতের পর পরত অতীতকে, তার নানা অনুষঙ্গকে ঝামা দিয়ে ঘষে ঘষে তোলার মতন যে তুলছিল, সেই process-টা পুরোপুরি Retarded হয়ে গেল মিলির সঙ্গে দেখা হয়ে। যে-অতীতকে সে ছোট-হয়ে-যাওয়া জামার মতন ছুঁড়ে ফেলতে চায়, ছেড়ে ফেলতে চায়, সেই অতীতই, গন্ধ-শোঁকা গন্ধগোকুল কুকুরেরই মতো মিলির মাধ্যমে তার খোঁজ পেয়ে গেল। হয়তো তার পিছু ছাড়বে না।

চারণকে পালাতে হবে আজই। পালাতেই হবে। ভাবল, মিথ্যাচার যদি ভাল কাজের জন্যে করতে হয়, তবে সেটা দোষের মধ্যে গণ্য নয়। ঠিক করল, আজই হোটেলে ফিরে ম্যানেজারকে বলে, সে চলে যাবে কেশর সিংকে নিয়ে ভিয়াসি। বুদ্ধু সিংকে পথ থেকে তুলতে পারলে তুলবে, নইলে একাই কেশর সিংকে নিয়ে চলে যাবে ভোঁদাইবাবার আশ্রমের সন্ধানে।

মিলিকে দেখার পর থেকে পাটনের কথা খুবই মনে পড়ছিল চারণের। ভাবছিল, এই মেকীর দুনিয়াতে পাটন একটি অরিজিনাল ছেলে। হাইলি ইন্টারেস্টিং। ওর কোনও প্রোটোটাইপ নেই।

রাবড়ি খাওয়া আর হল না। কেশর সিং বাঁয়ে মোড় নিয়ে নিয়েছিল। রাবড়ি খেতে হলে, তেহরির দিকে আরও একটু যেতে হত ডাইনে।

যাকগে।

ভাবল, চারণ। একা একা কোনও বিলাসই করতে ইচ্ছে হয় না। সেই জন্যেই হয়তো সন্ন্যাসের গোড়ার কথা 'ভেড়চাল'-এর ভিড় এড়িয়ে একা হয়ে যাওয়া।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নরেন্দ্রনগরে পৌঁছনো গেল। হৃষীকেশ-এর পথ ছেড়ে শহরের ভেতরে ঢুকল কেশর সিং। বাজারটা প্রধান পথের উপরেই পড়ে। অনেকটা মোগলদের হাভেলি এবং হারেমের মধ্যে যে বাজার থাকত তেমন। দুপাশে সার সার দোকান, মধ্যে দিয়ে পথ। এখনও দিল্লির লালকেল্লাতে যেমন আছে। যাওয়ার সময়ে দ্রুত চলে গেছিল, ভাল করে দেখেনি।

একটু পরেই নির্জনে পৌঁছে রাজার প্রাসাদ দেখা গেল। এখন হৃত-গৌরব, ভাগ্য-হত, অস্তমিত-সূর্য কিন্তু এক সময়ের প্রবল-প্রতাপান্বিত রাজা, মহারাজা, শিল্পপতি, রাজনীতিক এবং মিডিয়া-মালিকদের নরেন্দ্রপুরে একবার আসা দরকার। আসা দরকার এই সরল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে এই প্রাসাদ দেখে যে, কোনও রাজত্বই চিরকালীন নয়, কোনওরকম অন্যায়কারীর রাজত্ব তো নয়ই! যতদিন অর্থ, বাহুবল এবং নানাবিধ ক্ষমতা থাকে, ততদিন তাতে "অন্ধ" না-হয়ে ঐ সবের অনিত্যতার কথা মনে রেখে মানুষের সঙ্গে মানুষের মতন ব্যবহার করা যে উচিত ছিল, এই কথা, এই সব করুণ ছবি, হয়তো তাঁদের মনে করিয়ে দিতেও পারে। অবশ্য যদি মনুষ্যত্ব তাঁদের মধ্যে তখনও বিন্দুমাত্র বেঁচে থাকে।

গাড়োয়াল রাজের রাজধানীর মূল রাজবাড়িতে এখন কেউই থাকেন না। তা, ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার রাখার মতন রেস্তও আজকের রাজার নেই বলে মনে হল। নইলে, বহুবর্ণ লম্বকর্ণদের মিটিং বসত না সুউচ্চ, চওড়া, অগণ্য ধাপ-সম্বলিত সিঁড়িতে।

রাজা কোথায় থাকেন?

জিগ্যেস করাতে, কেশর সিং চারণকে বলল, পেছনের দিকের একটা অংশে। রাজবাড়ির পেছন দিকের গেট দিয়ে ঢুকতে হয়। তবে গেট-এ তালা দেওয়া থাকে। একজন মাত্র দারোয়ান আছে। ভারী পর্দা ঝোলে একতলার স্বল্পকটি ঘরের বড় বড় জানালা থেকে দিনের বেলাতেও। এই জন্যে যে, যদি কেউ ভেতরে ঢুকেও আসে, তবেও যেন কিছুই দেখতে না পায়। রাজা নাকি দিন-রাত মদ খান।

কেশর সিং তারপরে বলল, ভিতরে কি যাবেন পেছন দিক দিয়ে?

চারণ বলল, না, না। ঠিক আছে।

তারপর চারণ নিজেকে বলল, সব জিনিসই নিজে চোখে দেখার উদ্‌গ্র বাসনার মধ্যে একধরনের অশিক্ষা আছে। অবশ্যই আছে। চানঘরে না-বলে ঢুকে পড়ে কোনও স্নানরতাকে দেখতে, আর হৃত-রাজ্য, হৃত-দৌলত কোনও রাজার অ-সুরক্ষিত বাসস্থানে অমন ঢুকে পড়তে, তার রুচিতে বাধে। তাছাড়া, অনেক কিছুই না-দেখেই দেখা যায়। কল্পনা দিয়ে। মানুষ হয়ে জন্মানো বড় সৌভাগ্যের কথা। এই কল্পনার দান কি বিধাতা অন্য প্রাণীকে দিয়েছেন?

জানা নেই।

থাকুন রাজা, আহত-বাঘের মতো তাঁর নিভৃতির আড়ালে, ক্ষতস্থানের রক্ত জিভ দিয়ে, আক্ষেপ আর ক্ষোভের লালার সঙ্গে চাটুন তিনি সকল দুঃখহারী মদের সঙ্গে। তাঁর নিভৃতি তাঁরই থাকুক। ভাগ্যহতকে যদি গলা-খাঁকারি দিয়ে জানান দেওয়া যায় যে, তিনি ভাগ্যহত, তাতে আর যাই হোক, যিনি জানান দেন, তাঁর মানও যেমন বাড়ে না, তেমনই ভাগ্যহতর দুঃখও কমে না। প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষেরই সম্ভবত উচিত, এই শিক্ষাতে শিক্ষিত হওয়া। কতটুকু চোখে দেখবেন আর কতটুকুকে দূর থেকে কল্পনা দিয়েই ভরিয়ে নেবেন, অন্যকে কোনওরকম অস্বস্তিতে না ফেলে, সেই discretion-এর ব্যবহার জানাটা শিক্ষার অঙ্গ অবশ্যই!

গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বলল চারণ, কেশর সিংকে।

তেহরি-গাড়োয়ালের পথ ছেড়ে দেরাদুন রোডে পড়ে যখন হৃষীকেশের দিকে বাঁয়ে ঘুরল গাড়িটা তখন চারণ কেশর সিংকে বলল, ওর কোম্পানিতেই যেতে। মানে, কুমার ট্র্যাভেলস-এ। হৃষীকেশ-দেবপ্রয়াগ রোডের উপরে।

সেখানে যখন পৌঁছল তখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। ওখান থেকেই মন্দাকিনী হোটেলে ফোন করে বলল যে, যদি কেউই ওর খোঁজ করে, তাহলে বলতে যে ও চাম্বাতে চলে গেছে।

সেখান থেকে হয়তো মুসৌরি হয়ে, দিল্লি হয়ে কলকাতাতে ফিরে যাবে। এবং এও বলতে বলল যে, হোটেল থেকে চেক-আউট করে চলে গেছে চারণ।

ম্যানেজার উত্তরপ্রদেশের মানুষ। জিন্দা-দিল।

বললেন, কিঁউ সাহাব, মার্ডারি-উর্ডারি তো কিয়া নেই না ? ম্যায় কোই লাফরামে তো নেহি ফাঁসে গা ?

নেহি নেহি জি ! ম্যায় মার্ডারি নেহি কিয়া মগর খুদকো মার্ডারি হোনেকা ডর হ্যায়। উসী কারণমেই ঝুট বোলনে পড়েগি আপকি।

ম্যানেজার রসিক লোক। বললেন, ঠিক হ্যায়। হররোজ সুবেব সে সামতক তো আপনা আপনা রোটি-ডালকে ফিক্করমে বহতই ঝুট সবহিকা বোলনাহি পড়তা, কিসিকো জান বাঁচানে কো লিয়ে এক ঔরভি ঝুট বোল দেগা। আপ বেফিক্কর রহিয়ে।

তারপর বলল, রাতমে খনাত লিজিয়েগা না ?

চারণ বলল, কুছ কহ নেহি শকতা। ভিয়াসিকি তরফ যানেকা বিচার হ্যায়। খয়ের, হুঁয়া রোক গিয়া তো রাতমে লওটনে নেহিভি শকতা।

ভিয়াসিমে ?

বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, ম্যানেজার।

তারপর বললেন, অজীব বাত। হুঁয়া আভ্‌ভি হ্যায় কেয়া ? হামারা কোঈ ভি যাত্রী তো হুঁয়া যাতে নেহি। মগর হাঁ। পাস কর যাতা হ্যায় জরুর। দেওপ্রয়াগ যানেকি রাস্তেমেহিতো পড়তা না ভিয়াসি !

হ্যাঁ। ম্যায় জানতা হুঁ।

তব ঠিক হ্যায় সাহাব। রুম বেয়ারাকো বোল দুংগা ম্যায়, কামরা ঠিক-ঠাক করকে রাখে গা।

সুক্রিয়া।

বলল, চারণ।

চারণ, গাড়ি ওখানেই ছেড়ে দিল। তবে কুমার ট্র্যাভেলস-এর মালিককে বলল যে, তিনটে-চারটের সময় ফিরে ও বেরোতে পারে। ঠিক নেই। কেশর সিং তখন থাকলে ভাল হয়।

মালিক বললেন, গাড়ি দেব ঠিকই সাব কিন্তু কোন ড্রাইভার আর কোন গাড়ি তা আগে থাকতে বলা শক্ত। আপনি যদি সকাল থেকে পুরোদিনের জন্যে নিতেন তো কথা অন্য ছিল।

ও বলল, ঠিক আছে।

তারপর ত্রিবেণী ঘাটের দিকে এগোল। ঠিক করল আজ ওই ঘাটেরই কাছাকাছি কোনও দোকানে কিছু খেয়ে নেবে।

হাঁটতে হাঁটতে ত্রিবেণী ঘাটের দিকে যেতে যেতে ভাবছিল ও, কে জানে। এখন ভীমগিরিকে পাবে কি না ঘাটে।

না পেলে ?

এই কদিনে ও যে এতখানি ভীমগিরি-নির্ভর হয়ে উঠেছে এই সত্যটা বারে বারে উপলব্ধি করে ভীষণই বিরক্ত হল। একা থাকতে পারে, একা ভাবতে পারে, এই গুণ ওর আছে বলেই একধরনের শ্লাঘা জন্মে গেছিল মনে কিন্তু এই হৃষীকেশের ভীমগিরি সন্নিসী তাকে পুরোপুরি পর-নির্ভর করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে ক্রমশই। এমন মুক্তি তো ওর আদৌ প্রত্যাশিত ছিল না।

ঘাটে যখন পৌঁছল তখন ভিড় পাতলা হয়ে গেছে। নিত্যই যাঁদের যাতায়াত, তারা ঘরে গেছেন

খাওয়া-দাওয়া করতে কিন্তু ভ্রমণার্থী যাঁরা, বহু দূর দূর দেশ থেকে যাঁরা আসছেন, কেউ বা কেদার-বদ্রী যাবার পথে ঢুঁ মেরে যাচ্ছেন, তাঁদের ভিড় সবসময়ই লেগে থাকে ত্রিবেণী ঘাটে। এবং আছে।

ভীমগিরিকে দেখা গেল না। কিন্তু তাঁর গুরু ধিয়ানগিরি যথারীতি লুঙির মতন করে ধুতি আর গায়ে একটা হাতওয়ালা সাদা গেঞ্জি পরে সামনে ঝুঁকে তাঁর কোণটিতে বসে আছেন। গায়ের উপরে আড়াআড়ি করে একটা নস্যি-রঙা বহু-ব্যবহৃত গরম চাদর ফেলা। উনি মনোযোগ দিয়ে এবং তাঁর চারপাশের প্রতিবেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে কী একটা তারের বাজনা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন।

দেখল বটে চারণ, কিন্তু কাছে গেল না। ভাবল, কী দরকার।

ওর কারওকেই দরকার নেই। ও নিজেতে নিজেই সম্পূর্ণ। ভীমগিরিকেও দরকার নেই চারণের, তার গুরুকেও নয়। ধিয়ানগিরি হঠাৎ মুখ তুললেন। এবং চারণকে দেখতে পেয়ে হাসলেন। আশ্চর্য এক হাসি। চারণ অভিভূত হয়ে গেল সেই হাসি দেখে। সেই হাসির মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। না, নিজেকে কৃতার্থ-করা সেই হাসি, না, পরকে। সেই হাসি যেন কোনও বনফুলের হাসির মতন, বুদ্ধু সিং এর বাড়ি থেকে উতরাইতে-নামা পথের দুপাশে ফুটে-থাকা "লালটায়েন" ফুলেরই মতন, পার্বত্য ঝরনারই মতন। হাসলেন, কোনওরকম আদেশ-নির্দেশ-প্রত্যাশা না রেখে। যেন না হেসে পারেন না, তাই হাসলেন। কিন্তু হাসলেনই শুধু।

কাছে আসতে বললেন না তাকে। দূরে যেতেও নয়।

সেই হাসি দেখে চারণের মনে এক আশ্চর্য ভাবের সৃষ্টি হল। ও চাতালের এক প্রান্তে গাছতলিতে বসে পড়ল ওই নদীতীরের মধ্যাহ্ন-প্রকৃতিরই অঙ্গ হয়ে গিয়ে। ত্রিবেণী ঘাটের পটভূমির এক আঙ্গিকই হয়ে গেল যেন। ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে নদীতীরের সিমেন্ট-বাঁধানো ঠাণ্ডা চাতালে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে, ধিয়ানগিরির দিকে চেয়ে চারণের মিলন কুন্দেরার THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING বইটির কথা মনে পড়ে গেল। বইটি এমন কিছুই নয়। ইংরেজি বই হলেই বা পুরস্কৃত বই হলেই যে সুপাঠ্য অথবা ভাল বই হবে তার কোনও মানে নেই। মিলন কুন্দেরা শোভা দে-র চেয়ে একটু অন্যরকম হলেও, ওই একই পদের। প্রায় শ-খানেক অর্ধমনস্ক রতিক্রিয়ার অনুপুঙ্খ বর্ণনাই যদি সাহিত্য-পদবাচ্য করে তুলতে পারে কোনও লেখাকে তবে তো কথাই ছিল না। কুন্দেরা, নিজস্ব কারণেই কম্যুনিস্ট-বিরোধী। কিন্তু শুধু সেই জন্যেই যদি আমেরিকান-লবি তাকে মহৎ-সাহিত্যিক বলে ঠাউরে বসেন তাহলে বলার কিছুই নেই। তাছাড়া, মিলন কুন্দেরার লেখাতে মহৎ কোনও ব্যাপার নেই, যেমন বরিস পাস্টারনাকের লেখাতে আছে। তবে একথা ঠিক যে, কুন্দেরার বইয়ে মাঝে মাঝে কিছু কিছু পংক্তি আছে, কিছু কিছু বক্তব্য আছে, যা মহৎ সাহিত্যের চৌকাঠে পৌঁছেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, চৌকাঠে এসেই ফিরে গেছে। মহত্ত্বর নির্জন ঘরে প্রবেশ করতে পারেনি।

মিলন কুন্দেরার ঐ বইটির এক জায়গায় উনি লিখেছেন যে, কেউ আমাদের দিকে চেয়ে দেখুক অথবা মনোযোগী হোক, এটা আমরা সব মানুষই আশা করি, প্রত্যেকেই চাই। অন্যভাবে বললে বলতে হয়, আমরা প্রত্যেকেই ইম্পর্ট্যান্ট হতে চাই, অন্যের দ্রষ্টব্য, মনোযোগের পাত্র হতে চাই। এই ইম্পর্ট্যান্স-প্রত্যাশী আমাদের মধ্যে, কুন্দেরার মতে, আবার নানা ভাগ আছে। একদল চাই অগণ্য অচেনা অজানা মানুষ আমাদের দেখুন। অর্থাৎ, সেই দল, জনগণের মনোযোগ এবং চোখ চান, জনগণের দেওয়া অসাধারণত্বে সম্পৃক্ত, সিঞ্চিত হতে চান।

আরেকদল আছেন আমাদের মধ্যে, যাঁদের পক্ষে নিছক বেঁচে থাকার জন্যেই অগণ্য পরিচিত মানুষদের মনোযোগের তীব্র চাহিদা থাকে। তাঁদের পরিচিতির গণ্ডীর মধ্যে তাঁরা প্রত্যেকের চোখে ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে উঠতে চান এবং থাকতে চান। এই সব মানুষেরাই প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ককটেল-পার্টি আর ডিনারে নেমতন্ন করেন পরিচিতদের এবং অপরিচিত, অর্ধ-পরিচিতদেরও। যাতে পরিচিতির বৃত্তর মধ্যে তাঁদের এনে ফেলা যায়। সেই চেষ্টাতেই প্রতিমুহূর্তে সচেষ্ট থাকেন।

আর তৃতীয় দল হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা অনুক্ষণ তাঁদের এক বা একাধিক ভালবাসার জনের চোখের মণি হয়ে বেঁচে থাকতে চান।

শুধু এই তিন শ্রেণীই নয়, তিনভাগ জল এবং একভাগ স্থলের মতন একটি চতুর্থ শ্রেণীও আছে। চলিতার্থে নয় যদিও। সেই শ্রেণীর মানুষেরা খুবই বিরল। তাঁদের কোনও মানুষকেই শারীরিকভাবে প্রয়োজন হয় না। মানে, কারওই শারীরিক নৈকট্যর প্রয়োজন হয় না। হয় না, কারও চোখের চাওয়ারও। তাঁরা তাঁদের কল্পনায় অগণ্য অনুপস্থিত এমন কি অস্তিত্বহীন মানুষেরও চোখের সামনে থাকেন অথবা তাঁদের চোখের সামনে রাখেন। এঁরা হলেন স্বপ্ন-দেখা মানুষ। 'DREAMERS'।

কে জানে! ভাবছিল চারণ, মহারাজ ধিয়ানগিরিও হয়তো এই চতুর্থ শ্রেণীতেই পড়েন। পড়েন, অনেক সাধু-সন্নিসী, লেখক, গায়ক, চিত্রকর, যাঁরা সাধরণের শ্রেণীভুক্ত নন বলেই তাঁদের চাওয়া-পাওয়ার রকমসকমও পুরোপুরি আলাদা হয়। এবং হয় বলেই হয়তো ধিয়ানগিরিও চারণকে দেখেও দেখলেন না, হেসেও হাসলেন না।

চারণ ভাবছিল যে, অগণ্য নারী-পুরুষের পরিবেষ্টনে, প্রতিবেষ্টনে, প্রতিবেশে বাস করেও ওই মানুষেরা একেবারেই একা। তীব্র কল্পনা এবং ইচ্ছা শক্তি দিয়েই শুধুমাত্র তাঁরা নিজেদের নিজস্ব জগত গড়ে নিতে জানেন। গড়ে নেন ইমারত, খাট-পালঙ্ক, মালঞ্চ, তড়াগ। কোনও নারী-শরীরের কাছে না গিয়েও অনায়াসে সম্ভোগ করেন তাকে কল্পনাতে। কোনও পুরুষের কাছেও না এসে তাকে, তাদের স্তুতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন চুম্বকের মতন।

মিলন কুন্দেরা হয়তো জানেনও না যে, এই শ্রেণীর মানুষকেই, ভারতীয়রা 'সাধক' বলে থাকেন। সব জাগতিক সাধ-আহ্লাদকেই যাঁরা অবহেলে পায়ে মাড়িয়ে যান অন্য কিছুর, অনেক বড় কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায়, সে সব প্রাপ্তি সম্বন্ধে পশ্চিমী ভোগবাদের দুনিয়ার কোনও ধারণাই নেই। তাদের জগতের, তাদের মানসিকতার, তাদের ভাবনা-চিন্তার স্তরের ভাষাভাষী কোনও মানুষের পক্ষে এই ভীমগিরি-ধিয়ানগিরিদের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করাও হয়তো সম্ভব নয়।

চারণের চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল ভীমগিরির গলার স্বরে।

নমস্কার চারণবাবু।

চমকে উঠে বলল চারণ, নমস্কার।

এই অসময়ে?

সকালে কুঞ্জাপুরীতে গেছিলাম যে!

তাই? তা লাগল কেমন?

ভাল। তবে পরে গেলে হয়তো আর ভাল লাগবে না। শুনলাম, চাতালের উপরে দুটি ছোট মন্দির বানাচ্ছেন কুঁবারসিংজি।

তাই? সত্যিই তো খারাপ খবর তাহলে।

তারপরে বললেন, ভগবানেরা তো আর শরিকদের সঙ্গে ঝগড়া করেন না, মানুষদের মতন যে, এজমালি বাড়িতে তাদের ঠাঁই-এর অকুলান হবে। চাতালটিই তো কুঞ্জাপুরীর সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য ছিল। আশ্চর্য!

আমারও তাই মনে হয়। চারণ বলল। মন্দিরে-মসজিদে মানুষ তো যায়ই সেই জন্যে। পরিবেশে যদি শান্তিই না থাকল, না থাকল space, আক্ষরিকার্থে এবং মানসিকার্থে, তাহলে মন্দিরের অন্ধকারের মধ্যে বসিয়ে-রাখা বিগ্রহ কি শান্তি দিতে পারে কারওকে।

সাহী বাত।

বললেন, ভীমগিরি মহারাজ।

চারণ বলল, আজ এখানেই কোথাও খেয়ে নেব।

কেন?

কারণ আছে।

ও। তাছাড়া খিদেও পেয়েছে নিশ্চয়ই। কুঞ্জাপুরীর তিনশো ষাটটি সিঁড়ি চড়া তো সোজা কথা

নয়।

চারণ হেসে বলল, তা একটু পেয়েছে।

বলেই বলল, আপনি খাবেন না ? আপনার খাওয়া কি হয়ে গেছে ?

ভীমগিরি বললেন, গতকাল থেকে উপোস আছি। পরশু আবার খাব।

সে কি ? কষ্ট হচ্ছে না ?

ভীমগিরি হাসলেন।

বললেন, দেখে কি তাই মনে হচ্ছে ?

না, তা মনে হচ্ছে না। হাসছেন তো কথায় কথায়ই।

হাঃ। হাসির সঙ্গে খাওয়ার কি ? খেতে সময় তো নষ্ট হয়ই, খেলে নানারকম ঝামেলাও হয়।

খেলে ঝামেলা ? কী রকম ?

খেলেই তা হজম করানোর ঝামেলা তো আছেই। তার উপরে আবার খাওয়ার ইচ্ছেও জাগে। সবচেয়ে বড় ঝামেলা সেটা। তবে শরীর বহুতই বেশরম জানোয়ার হলেও তার একটা মস্ত গুণ হল এই যে, সে নিজেকে খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে অনেকদিন। যে গুণ, মনের নেই। মন কেবলি অন্য মনের ফসল খেতে চায়।

ভীমগিরি উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, চলুন দেখিয়ে দিই আপনাকে। এই দোকানের বয়স সত্তর বছরের উপরে। এখন নাতি মালিক। ইমানদার ইনসান সে। এত সস্তাতে এত আড়ম্বরহীন ভেজালহীন খাবার এখানে আর কোথাও পাবেন না।

ভীমগিরি মহারাজ, নদীর সমান্তরালে যে পথটি গেছে দুধারের নানান দোকানের মধ্যে দিয়ে, সেই পথে কিছুটা হেঁটে গিয়ে ডানদিকে একটি ছোট্ট দোকানের সামনে দাঁড়ালেন।

দোকানের সামনেটা হবে বারো থেকে পনেরো ফিট। ভেতরে গভীর। তবে সেই গভীরতা যে কতটা তা পথে দাঁড়িয়ে বোঝা গেল না। ডানদিকে ছোট ছোট গোটা চারেক পেরেক-ওঠা কিন্তু ব্যবহারে ব্যবহারে মসৃণ হয়ে যাওয়া কাঠের সরু বেঞ্চ ও টেবিল। একটি উনিশ-কুড়ি বছরের ফর্সা ছোটখাটো হাসিখুশি ছেলে বাঁদিকের খাদ্য-সম্ভারের মধ্যে বসে আছে।

ভীমগিরিকে দেখেই ছেলেটি বলল, জয় রামজি কি !

জয় রামজি কি।

ভীমগিরি বললেন।

যে রামের নাম ইংরেজি শিক্ষিত চারণের এবং চারণের মতন কলকাতার সর্বজ্ঞ মানুষদের কাছে বিন্দুমাত্র তাৎপর্যহীন, এমনকি তাচ্ছিল্য এবং উপহাসের বিষয়, সেই নামটিই যে কত শ্রদ্ধার সঙ্গে এখানে আপামর জনসাধারণ উচ্চারণ করেন, তা দেখে আশ্চর্য হল চারণ।

তারপর ভাবল, উচ্চারিত হলে আশ্চর্য হওয়ার বা উপহাস করারই বা কি আছে ? জ্ঞানের সীমা তো চিরদিনই ছিল, অজ্ঞতারই সীমা ছিল না কোনওদিন। মুসলমানেরা যদি কথায় কথায়, আল্লা রসুলের নাম বলতে পারেন শ্রদ্ধার সঙ্গে, যদি বলতে পারেন ইনসা আল্লা, বলতে পারেন খুদাহ হাফিজ, যদি খ্রিস্টানেরা বলতে পারেন, ওহ লর্ড, গুড গ্রেশাস, বলতে পারেন খ্রিস্টর প্রতি গভীর স্তুতিতে 'মে গড গিভ উ্য পিস' ইত্যাদি তাহলে ভীমগিরি আর এই হালুইকরের নাতি 'জয় রামজি কি' বললে দোষের বা উপহাসের কিছু আছে এমন তো মনে হল না চারণের। ও বুঝতে পারল যে, ও নিজে ধর্ম মানুক আর নাই মানুক ওর দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ ধর্ম মানে। সে ধর্ম হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্ট, শিখ, জৈন, যাই হোক না কেন। নিজ নিজ ধর্ম মেনে তারা যদি খুশি হয়, আনন্দে থাকে, তাহলে সে তার কলকাত্তাইয়া বুদ্ধিজীবীর মানদণ্ড দিয়ে এঁদের বিচার করার কে ? সে এখানে না এলে হয়তো বুঝতেই পারত না যে, এই কোটি-কোটি মানুষের মান্য ধর্মকে চারপাতা ইংরেজি পড়ে সর্বজ্ঞ হয়ে বাতিল করার আগে তার এই সর্বজনমান্যতার প্রকৃতিকে একজন যুক্তিবাদী হিসেবে যাচাই করা অবশ্যই প্রয়োজন।

ভোজন কিজিয়েগা মহারাজ ?
ছেলেটি বলল।
নেহি যুগলপ্রসাদ। ইনকো আচ্ছাসে ভোজন করাও।
বলে, চারণকে ভিতরে এগিয়ে দিয়ে নিজে পেছন পেছন গিয়ে একটি বেঞ্চে তাকে বসিয়ে নিজে উলটোদিকে বসলেন।
যুগলপ্রসাদ নামক ছেলেটি বলল, বলিয়ে বাবু, কেয়া দুঁ ? চাওল ইয়া রোটি ?
চারণ বলল, চাওল।
ভীমগিরি বললেন, তুমহারা যো যো চিজ আজ বন চুকে হ্যায়, ঔর আচ্ছা হ্যায়, উও সব দো বাবুকো। ম্যায় চল রহা হ্যায়।
আপনি খাবেন না কিছু ? এক গ্লাস দুধ অন্তত খান।
ছেলেটি বলল।
নেহি বেটা। কুছ নেহি। ভগওয়ান তেরা ভালা করে গা।
কোথায় যাবেন এখন ?
চারণ শুধোল।
শ্মশানে।
কেন ?
সেই সন্নিসীকে মনে আছে আপনার ? কাঁধের ওপরে হরিণের ছাল জড়ানো কম্বল নিয়ে এক সন্ধের মুখে এসে পৌঁছেছিলেন গুরুজির আখড়াতে ? আমি কালিকমলি বাবার আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে এলাম যাঁকে ? পদসেবা করলাম···
হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে আছে বইকী!
উনকি দেহান্ত হো গ্যয়া।
ইসস।
দুঃখের সঙ্গে বলল, চারণ।
মৃত্যুর মধ্যে দুঃখের কি আছে বাবুজি ? আর সেই সন্ত তো তাঁর গুরুর সাধন-ক্ষেত্রে দেহ রাখবার জন্যেই হৃষীকেশে এসেছিলেন। এবং আসার পর অতি স্বল্পদিনের মধ্যেই দেহ রেখেছেন। এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে!
যুগলপ্রসাদ একতলার গভীরের অন্ধকারে চলে গেল চারণের খাবারের তদ্বির করতে। মনে হল ছেলেটির বাসস্থান এটি। একতলাতে খাওয়া-দাওয়া, দোতলাতে থাকা-শোওয়া। তারপরই বুঝল যে ওর বাবা এবং ঠাকুর্দা চটিওয়ালা ছিলেন। যখন পুণ্যার্থীরা পদব্রজে যেতেন সব ধর্মস্থানে, পুণ্য যখন ক্যাপসুলের মধ্যে, প্যাকেজ ট্যুরের মাধ্যমে পণ্যর মতন বিক্রি হত না, তীর্থযাত্রীর সব পুণ্য ছিল তার যাত্রাপথেরই মধ্যে, সাধুসন্ত এবং ভাল-মন্দ মেশানো গৃহী মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতারই মধ্যে, তখন এই সব চটিওয়ালারই তাঁদের খাদ্য-পানীয় এবং রাতের আশ্রয় দিতেন।
আমি যাই।
বললেন, ভীমগিরি।
ভীমগিরি বললেন, আমরা আজ সকলে আনন্দ করব। পউরি থেকে নেমে-আসা সেই সন্ত তাঁর প্রয়াত গুরুজির পদপ্রান্তে গিয়ে মিলিত হয়েছেন বলে। মৃত্যু, গৃহীদের দুঃখ দেয়। অজ্ঞদের। জ্ঞানীর কাছে মৃত্যু বলে কিছু নেই। আমাদের গীতাতে আছে আত্মা অবিনশ্বর। আগুন তাকে পোড়াতে পারে না, হাওয়া তাকে শুকোতে পারে না, জল তাকে ভেজাতে পারে না। আত্মার বিনাশ নেই। তার আধারেরই পরিবর্তন হয় শুধু।
চারণের খাবার এসে গেল। কানা-তোলা একটা পেতলের থালাতে। গরম ধুঁয়ো-ওঠা ভাত। অড়হরের ডাল। রাইতা। আলুর চোকা। তার মধ্যে আবার দই দেওয়া। মুলো, ফিনফিনে করে কেটে তার স্যালাড। খিচুড়ির সঙ্গে যেমন কড়কড়ে আলুভাজা খায়, তেমন আলুভাজা। পেঠার

মিষ্টি তরকারি। চমৎকার। সঙ্গে কটি গরম গরম আটার ফুলকা। দেশি ঘি-এ ভাজা।

কেমন ? ভাল ?

চমৎকার।

চারণ বলল।

মনে মনে বলল, এখানেই এসে খাবে দুবেলা।

ভীমগিরি বললেন, আমি এবারে চললাম।

আপনি নিজে কাল থেকে খাননি আর আমি খাচ্ছি দেখেও খিদে পাচ্ছে না আপনার ?

শব্দ করে হাসলেন ভীমগিরি।

বললেন, পাচ্ছে আবার না ? খুবই পাচ্ছে।

চারণ বোকার মতন বলল, তাহলে ?

তাহলে কি ? ওইটাই তো পরীক্ষা !

কিসের পরীক্ষা ?

নিজেকে বঞ্চিত করতে পারার পরীক্ষা। এই বঞ্চনার আনন্দ বড় গভীর চারণবাবু। এই আনন্দর কাছে পৃথিবীর তাবৎ সুস্বাদু খাবার খাওয়ার আনন্দও কিছুই নয়।

এই পরীক্ষার পরীক্ষক কে ?

আবার হাসলেন, ভীমগিরি। বললেন, আমিই পরীক্ষক, আমিই পরীক্ষার্থী।

তারপরই, উঠে চলে গেলেন।

পেট ভরে তৃপ্তি করে খেয়ে উঠল চারণ। আট টাকায় মধ্যাহ্নভোজ !

যুগলপ্রসাদ হেসে বলল, আবার আসবেন বাবু। এই দোকানের বয়স সত্তর বছর। আমার বাবা বলতেন, মুসাফিরদের যত্ন করে খাওয়াবি তাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পুজো। তোর মন্দিরে যেতে হবে না বেটা। তোর আত্মা এমনিতেই মুক্ত হয়ে যাবে।

বলে, যুগলপ্রসাদ চারণের হাতে এবার মৌরি দিল।

আসব যুগলপ্রসাদ।

বলে, পথে নামল ও।

তারপরই ফিরে, জিগ্যেস করল, শ্মশানটা কোন দিকে ?

চন্দ্রভাগাতে। শুখা নদী আছে না ?

যে নদী এসে পড়েছে গঙ্গানদীতে ?

হ্যাঁ। সেখানে। সোজা চলে যান ভিয়াসির পথে। একটা অটো নিয়ে নেবেন। পথটা যেখানে চন্দ্রভাগার উপরের ব্রিজটা পেরিয়েছে সেখানে অটো ছেড়ে নদীতে নেমে গেলেই হবে। না বুঝতে পারলে, সেখানে কারওকে জিগ্যেস করবেন।

সুক্রিয়া, ভাই।

'ভাই' শব্দটা বলতে পেরে বড় খুশি হল চারণ। স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে গেল। এই 'ভ্রাতৃত্ব' বড় উদ্দীপক ভ্রাতৃত্ব। মুসলমানেরা একেই বলে 'বিরাদরী'। মস্ত বড় গুণ এ তাদের।

বড় রাস্তার দিকে হেঁটে যেতে যেতে চারণ ভাবছিল, ভীমগিরি এবং এখানের আরও কত অগণ্য মানুষ, শিক্ষিত, উচ্চ-শিক্ষিত, এবং অশিক্ষিতও কত সহজ দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস করে যে, আত্মা অবিনশ্বর। মৃত্যু শুধু পরিবর্তনের। তার আধার পরিবর্তনেরই দ্যোতক।

ভাবছিল যে, বা যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা বোধহয় এমনই অনড় পাথরের মতন বিশ্বাসকে বহন করেন। এইসব ব্যাপার তর্কের নয়। এই জন্যেই বোধহয় কথাতে বলে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।' কিন্তু সত্যিই কি পরজন্ম আছে ? পূর্বজন্ম ?

চারণের মনে পড়ে গেল যে, জার্মানেরা একটা বাক্য বলেন প্রায়ই। সেটা একটি জার্মান ADAGE।

ওঁরা বলেন WHAT HAPPENS BUT ONCE, MIGHT AS WELL NOT HAVE HAPPENNED AT ALL.

LIVING ONLY ONE LIFE. WE CAN NEITHER COMPARE IT WITH OUR PRIOR LIVES NOR PERFECT IT IN OUR FUTURE LIVES.

সত্যিই কি আমাদের একটামাত্রই জীবন ? নাকি পরজন্ম আছে ? আমাদের গীতা যা শেখায়, উপনিষদ, বেদ, বেদান্ত, কোরান, হাদিস, এসবই কি মিথ্যে ? যে কোটি-কোটি মানুষে মন্দিরে-মসজিদে-গুরদোয়ারাতে মন-প্রাণ নিবেদন করে পুজো করেন, তাঁরা কি সকলেই নির্বুদ্ধি ? অজ্ঞ ? তাঁদের মধ্যে তো চারণের চেয়ে সবদিক দিয়েই বড় এমন অগণ্য মানুষও আছেন।

তবে ?

ঈশ্বরবাবু বলে কি আদৌ কেউ আছেন ? নাকি কলকাতার সর্বজ্ঞ আঁতেল চূড়ামণিরাই ঠিক। ওই জার্মান ADAGE টিই ঠিক ? "EINMAL IST KEINMAL"?

মোড় থেকে একটা অটো নিয়ে চারণ যখন ব্রিজের কাছে অটো ছেড়ে দিয়ে নেমে পড়ল তখন দুপুরের আর খুব বেশি বাকি নেই।

ব্রিজ বানানো হচ্ছে নতুন এবং চওড়া। বর্তমানে যে ব্রিজটা আছে তা বহু পুরনো ও সরু। তাছাড়া, বদ্রীনাথ-কেদারনাথের পঞ্চাশ মাইল ওপাশেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর পার্বত্য রেজিমেন্ট ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে নেহরু সাহেবের আমলের 'হিন্দি-চীনি-ভাই-ভাই'-এর পিণ্ডি-চটকানো তেলাপোকা-খাওয়া চিনেদের হামলার প্রতিষেধক হিসেবে। আধুনিক সেনাবাহিনীর ভারী ও বড় মেকানাইজড যানবাহন চলাচলের পক্ষে এই রকম ব্রিজ তাই একেবারেই অচল। ভাগীরথীর উপরে দেবপ্রয়াগে বা অলকানন্দার উপরে রুদ্রপ্রয়াগে এবং অন্যত্রও যে সব নতুন সেতু হয়েছে এইসব অঞ্চলে, যার জন্যে এখন গঙ্গার বাঁ পাড়ের চওড়া পিচ রাস্তা বেয়ে কেদারনাথ ও বদ্রীবিশালের পুণ্যার্থীরা বাসে বা গাড়িতে সহজেই প্যাকেজ-ট্যুরে তীর্থ করতে যেতে পারছেন, সেই সব পথও সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়াররাই বানিয়েছেন।

ব্রিজ-বানানো একজন মিস্ত্রিকেই শুধোলো চারণ, শ্মশানটা কোথায় ? জানেন ?

লোকটি স্থানীয় নয় বোধহয়। হাতের কাজ থামিয়ে কিছুক্ষণ চারণের মুখের দিকে চেয়ে থেকেই হঠাৎ বলল, সে তো আপনার বুকের মধ্যেই আছে।

চমকে উঠল চারণ।

এই দেবভূমিতে এসে পৌঁছলে কি সকলেই দার্শনিক অথবা খসসর হয়ে যায় ?

ভাবল ও।

লোকটি তারপর ডানহাত প্রসারিত করে দূরে দেখাল।

তার হাতের প্রসার ও হাতটিকে চকিতে ওঠানো দেখে মনে হল যে, সেও হয়তো সেনাবাহিনীরই লোক।

হয়তো।

চারণ শুকনো, দুর্গন্ধ চন্দ্রভাগাতে নামল। পুণ্যতোয়া গঙ্গা, যে-গঙ্গাতে এত সহস্র পুণ্যার্থী, সাধু-সন্ত দুবেলা ভক্তিভরে চান করেন, আচমন করেন, সেই গঙ্গারই সঙ্গে মিলিত-হওয়া এই শুকনো চন্দ্রভাগা বহু স্থানীয় মানুষের উন্মুক্ত শৌচাগার যে, একথা ভেবেই বড় খারাপ লাগল চারণের। হিন্দুদের অধিকাংশ ধর্মস্থানই বড় নোংরা। কেন ? কে জানে। বালি আর নুড়ির উপর দিয়ে বেশ কিছুটা হেঁটে যাওয়ার পরে হঠাৎ এক দৃশ্যে চোখ পড়াতে ও থেমে গেল। গঙ্গার একাংশের তীর ধরে বহমান এক শোভাযাত্রা চোখে পড়ল। সেই শোভাযাত্রা তখন অনেকই দূরে ছিল। এই শব যাত্রীরা কোথা থেকে আসছেন কে জানে। হয়তো কালিকমলি বাবার আশ্রম থেকেই। একটি রক্তবর্ণ, নতুন কম্বলে জড়ানো শবকে স্কন্ধারূঢ় করে হেঁটে আসছেন শবযাত্রীরা সেনাবাহিনীর "SINGLE FORMATION"এ। দীর্ঘ শোভাযাত্রা।

পউরি থেকে, তাঁর গুরুদর্শনে নেমে-আসা শক্তসমর্থ সেই পরবাসী আগন্তুক সন্নিসীর হৃষীকেশে

যে এত আপনজন ছিল, তা সেই সন্ধেতে তাঁকে কিছুক্ষণের জন্যে দেখে অনুমানও করতে পারেনি চারণ। তাছাড়া, তাঁর গুরুরও তো দেহান্ত হয়ে গেছে বহুদিনই হল। তবুও!

ওর মনে হল, সংসারে যাঁর আপনজন বলতে কেউই নেই, যাঁর পূর্বাশ্রমের পরিচয় যিনি নিজে হাতেই মুছে ফেলেন, রক্তের আত্মীয়দের পরিচয় যাঁর কাছে পুরোপুরি অবলুপ্ত নিজেরই ইচ্ছাতে, সেই 'নিরুদ্দিষ্ট'ই বোধহয় সবচেয়ে বেশি পরিবৃত থাকেন আত্মার-আত্মীয়দের দ্বারা। অবাক হল নিজ চোখে দেখে, শবকে ওঁরা কোনও চারপাইতে বহন করছেন না। বহন করছেন, কোন শিশুর শবের মতন নিজেদের কোলে-কাঁখে। আর সেই কম্বলের ঘোর লাল রং, শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশের ঘন অরণ্যানীর গাঢ় সবুজ, গঙ্গার সাদা এবং শুকনো চন্দ্রভাগার ছাই-রং-এর পটভূমিতে যেন সেই চলমান শবযাত্রার সঙ্গে আন্দোলিত, বিস্ফুরিত হচ্ছে। মাথার উপরে পাহাড়ি শঙ্খচিলেরা উড়ছে ঘুরে ঘুরে যেন শব-হয়ে-যাওয়া সন্নিসীর চলমান মাথার উপরে চামর বুলোচ্ছে তারা নরম, আঁশটে গন্ধ পালকের।

চারণ কিছুটা এগিয়ে গেল ওই শববাহী শোভাযাত্রার দিকে। আশ্চর্য! এত আপনজন মানুষটার কোথায় ছিল! যারা 'পরকে আপন করে, আপনারে পর' তাদের পরম্পরা সম্বন্ধে এক গভীর ঔৎসুক্য জাগছিল ওর মনে। বিলক্ষণ বুঝতে পারছিল যে, গোলমেলে সুকঠিন মামলার নথিপত্র ও যত সহজে বুঝতে পারার বিদ্যা করায়ত্ত করেছিল, এই আপাত-সাধারণ, জীর্ণ-শীর্ণ ভীমগিরি-ধিয়ানগিরিদের অত সহজে আয়ত্ত করার নয়। তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি 'কুইজ'। তাঁদের চাউনি আর হাসির সারাৎসার বুঝতেই তার এক জীবন কেটে যাবে। এই অতি সাধারণ, 'মাধুকরী' করে দিন-গুজরানো, আপাত-ফোর-টোয়েন্টি, আপাত-ভগবান, বৃক্ষছায়ার চাতাল-নিবাসী অথবা নানা নদীর ঘাটবাসী বা গুহা-কন্দরবাসী, নানা আশ্রমবাসী অগণ্য সাধু-সন্তদের সঠিকভাবে বোঝা সহজকর্ম নয়। অর্থকরী বিদ্যা শিখে, অর্থোপার্জনের অন্ধ আঁধিতে এতদিন ঘূর্ণিত-চূর্ণিত হয়ে ওর দৃষ্টিই পুরোপুরি আবিল হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের লেখাতে পড়েছিল 'সহজ হবি, সহজ হবি'। আসলে, সহজ হবার মতন কঠিন কাজ সম্ভবত আর দ্বিতীয় নেই।

ভাবছিল, চারণ!

শবযাত্রা আরও এগিয়ে এসেছে। এই ঊষর জনহীন চন্দ্রভাগা নদীর কোন জায়গাতে যে শ্মশানটা অবস্থিত তা সঠিক বুঝতে পারছিল না চারণ। সম্ভবত মোহনার কাছেই হবে। এখন দূরাগত শবযাত্রীদের মুখ-নিঃসৃত মন্ত্রোচ্চারণেরই মতন ওর কানে আসছে 'রাম নাম সত হ্যায়, রাম নাম সত হ্যায়, রাম নাম সত হ্যায়' ধ্বনি, যে ধ্বনি, ভারতের অধিকাংশ স্থানেই শবযাত্রীরা মন্ত্রোচ্চারণেরই মতন উচ্চারণ করে। চারণেরা নিজেরা বাংলাতে বলে 'বল হরি হরি বল, বল হরি হরি বল'।

হরি আর রাম তাহলে কি এক? এই রামায়ণের রাম মানুষটি কি একটি Myth? চারণের কলকাতার আঁতেল-চূড়ামণিরা যেমন বলেন? অথবা, বিভিন্ন দলের মুসলমান-তোষণকারী রাজনীতিকরা?

কারওকেই তোষণ করার বরাবরই বিদ্বেষী চারণ। তিনি যেই হন না কেন। তাঁদের আসল প্রেম তো ভোটের প্রতি। মুসলমানদের জন্যে তাঁরা করেছেনটা কি এতবছর? এখন আর মুসলমানেরা ভারতীয় কোনও দলের অনুগ্রহের প্রত্যাশাতে বসেও নেই।

রাম যে অযোধ্যাতে জন্মেছিলেন এমন কোনও প্রমাণ কারও কাছেই নাকি নেই। যিশুখ্রিস্ট যে জন্মেছিলেন জেরুজালেমে সেই প্রমাণ আছে কি কারও কাছে? মহম্মদের জন্মের এবং জন্মস্থানের প্রমাণ? তাই যদি হয়, তবে নিজেরা ভারতবাসী হয়েও, ভারতের সন্তান হয়েও, শুধুমাত্র রামকেই উড়িয়ে দেবার এমন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে কেন ভারতে? আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, খুব কম ভারতীয়ই, প্রকৃত ভারতবর্ষকে জানেন, তার অন্তর্প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেন। শহুরবাসী ইংরেজিনবীশরা তো ননই। তাই অনেক সহজ ব্যাপারই তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে।

এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সময় বোধহয় হয়েছে।

সেদিন হরিণের চামড়া গোল করে পাকিয়ে ঘাড়ের উপর নিয়ে, দেবপ্রয়াগ থেকে যে সন্ন্যাসী

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

পদব্রজে নেমে এলেন হৃষীকেশে বাসভাড়া না থাকাতে, তাঁর সঙ্গে এই লালকম্বলে মোড়া শবের কি সম্পর্ক ? সেই মানুষটি কতখানি ছিলেন তাঁর জীবন্ত সত্তায় আর কতখানি আছেন তাঁর মৃত সত্তার মধ্যে ?

কে চারণকে বলে দেবে এই তত্ত্ব। তবে এটুকু বুঝেছে চারণ যে, বোঝা অত সোজা নয়। সেইসব মানুষদের আপাত-সপ্রতিভতা এবং অগভীর ইংরেজিনবিশীই শেষ কথা নয়। অনাদিকাল ধরে যা-কিছু ভারতীয় পরম্পরাতে মানুষে বিশ্বাস করে এসেছে তার সবটাই 'কিসসুই' নয় বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার পেছনে অশিক্ষাজনিত হামবড়াই যতটুকু আছে, জিগীষা তার তুলনাতে ছিটে-ফোঁটাও নেই। কিছু সবজান্তা ভুঁইফোঁড়, গূঢ় নিজ-স্বার্থপরায়ণ মানুষে সাম্প্রতিক অতীত থেকে উঠে পড়ে লেগেছেন ঈশ্বর নেই তার প্রমাণ দেবার জন্যে। চারণ, সেইসব প্রগাঢ় পণ্ডিত, খল, ইতর, প্রাইজ ও যশ এবং অর্থ-প্রত্যাশী উদ্বায়ু সমাজতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে কারও কারওকে ব্যক্তিগতভাবেও চেনে। তাঁরা যে প্রণিধানযোগ্য, তা আদৌ নন। কিন্তু ওইসব জীবনের রঙ্গমঞ্চের বালখিল্য অভিনেতারাই চারণকে এমন করে ঘর থেকে বাইরে এনেছে, যেমন এনেছে, তার অর্থপাগল মক্কেলরা। তারা সকলেই তাদের যূথবদ্ধতায়, একদেশদর্শিতাতেই চারণের মধ্যে নিজের চোখ, নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বিচারশক্তি দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করার এক তাগিদ সঞ্চারিত করেছে। কী জানবে, তা ও আদৌ জানে না। তবে অন্ধ ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের প্রতি ওর যেমন অনুকম্পা আছে অন্ধ ঈশ্বর-অবিশ্বাসীদের প্রতিও তার চেয়ে কিছু কম অনুকম্পা নেই। দুদলকেই সে অনুকম্পারই সঙ্গে বাতিল করে মুক্ত মনে, মুক্ত চোখে এই দেশের কোটি কোটি মানুষের মনের মর্মস্থলে পৌঁছে গন্ধমাদন পর্বত উথাল-পাথাল করে বিশল্যকরণী খুঁজতে এসেছে।

চারণ, মহাবীরের চেয়ে সামান্য বেশি বুদ্ধি ধরে। গন্ধমাদন পর্বত উপড়ে নিয়ে যাওয়ার মতন মোটাবুদ্ধি তার নয়। সে বিশল্যকরণীই খুঁজে বের করবে এবং যে সব মূর্খর মূর্খামির এবং ঔদ্ধত্যের কোনও সীমা-পরিসীমা নেই, তাদের মূর্খামির নাকে সেই বিশল্যকরণী ঘষে দেবে। জ্ঞানের সীমা চিরদিনই ছিল কিন্তু অজ্ঞতার সীমা কোনওদিনই ছিল না। এবং ছিল না বলেই, অজ্ঞ এবং গর্দভ প্রবরেরা অনুক্ষণ এত লম্ফ-ঝম্ফ করে।

আবারও মূল ভাবনাতে ফিরে এল চারণ। ওই লালকম্বল মোড়া সন্ন্যাসীর শবের মধ্যে ওই ঘরছাড়া মানুষটি কতটুকু আছেন আর যে জীবন্ত মানুষকে সে সেদিন অর্যমা-লগ্নে ত্রিবেণীঘাটে দেখেছিল তাঁর মধ্যে তিনি কতটুকু ছিলেন, তা জানার এক তীব্র আগ্রহ ওর মধ্যে জাগরূক হয়েছে।

এবারে দাঁড়িয়ে পড়ল চারণ। ভাবল, ও তো সন্ন্যাসী নয়। ও তো ঘোর গৃহী। জয়িতার ভাবনা সে এখনও ভাবে। এতদূরে এসেও মিলি আর তার বাবা হরিচরণবাবুর ছায়া তার এই পরিযানকে গ্রাস করতে সতঃই উদ্যত। তার মুক্তি তো দূরস্থান, মুক্তি-প্রত্যাশাও দূর অস্ত। তার কোনও অধিকারই নেই একজন সন্ন্যাসীর শবযাত্রাতে যোগ দেওয়ার। সেই শবযাত্রাকে সে যে চাক্ষুষ করেছে, এই যথেষ্ট।

মৃতর আত্মার প্রতি তার শ্রদ্ধা জানাল চারণ বহু দূর থেকে নমস্কার করে। এই অভ্যেসটি তার বহুদিনের। কোনও মৃতদেহ দেখলেই সে নমস্কার করে, খ্রিশ্চানেরা যেমন আঙুল দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন দেন নিজের বুকে শব বা কফিন চাক্ষুষ করলেই, মুসলমানেরা যেমন মাথা নোয়ান।

চারণ ফিরে চলল। একটি শেয়ার-অটোতে চড়ে বসল ও। তারপর দেরাদুন রোডের মোড় আর তার পরের মোড়েও না নেমে আরও একটু এগিয়ে কুমার ট্র্যাভেলস-এর দপ্তরের সামনে নেমে পড়ল।

দোকানে ঢুকতেই মালিক বললেন, লিজিয়ে। কেশার সিংজি মজুদ। যাইয়ে আপ, যাঁহা যানা হ্যায় আপকি।

কেশর সিং বেঞ্চে বসেছিল। সিগারেট খাচ্ছিল। মধ্যমা আর বুড়ো আঙুলের মধ্যে ধরে। সেটা হাতে নিয়েই উঠে দাঁড়াল, বলল, চালিয়ে সাহাব।

চারণ বাইরে এসে সামনের সিটে কেশর সিং-এর পাশে বসল।

যানা কাঁহা হ্যায় সাব ?

ভিয়াসি।

সাত বাজে গেট বন্ধ হো যায়েগা পাহাড়পর। ভিয়াসিকি উসপার তো নেহি না যানা ?

কাহে ?

চারণ শুধালো।

কিঁউ ক্যা, লওটনা পড়েগী সাত বাজেকি পহিলেই ভিয়াসি।

চারণ বলল, ভিয়াসি পর্যন্ত যাব না। তার আগেই ভোঁদাইবাবা বা গাড্ডুবাবার আশ্রম। সেই অবধি গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসবে।

তারপর জিগগেস করল, গয়া কভভি ?

নেহি সাব। ভোঁদাইবাবা ইয়া গাড্ডুবাবাকি নামভি নেহি শুনা। ঔর ভিয়াসিকি পহিলে কৌঈ আশ্রমভিত নজারমে আয়া নেহি আজতক। হোনেসে, ট্যুরিস্ট লোগোঁনে কভভি কভভি তো জরুর যাতে থে।

চারণ বলল, কুঞ্জাপুরীর কথাই বা কজন ট্যুরিস্ট জানে বাবা ?

তারপরে না-বলে বলল, সবাই তো প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে কেদার-বদ্রীর বুড়ি ছুঁয়েই ফিরে যায়। তীর্থ করতে তারা আসে যে কেন! তীর্থ করা কাকে বলে, তা জানার মতো মানসিকতাই তাদের নেই। সর্বক্ষণ কলকল-খলখল করে। বাসের বা গাড়ির জানালার পাশে বসে দুধারে তাকিয়ে, অহো! কী অপূর্ব। কী অপূর্ব! করে। যাদের পূর্বাপর জ্ঞানই নেই তাদের আবার অপূর্ব! হাঃ।

'পূর্বাপরের' সঙ্গে 'অপূর্ব' শব্দটাকে মনের মধ্যে একই শিলে বাটনা-বেঁটে ভারী মজা পেল চারণ। এই শব্দজব্দর মতো একা একা খেলার মতো বেশি খেলা নেই।

বুদ্ধু সিংকে ডাকতে পাঠাল কেশর সিংকে চারণ, খাড়া চড়াই উঠতে বলে। সেই কালো বড় পাথরটার উপরে দাঁড়িয়ে কয়েকবার হাঁকাহাঁকি করার পরেও বুদ্ধু সিং-এর সাড়া পেল না।

কেশর সিং মানুষটির বয়স হবে মধ্য তিরিশ। খুব ছটফটে। হাসিখুশি। পরনে একটি নোংরা পাজামা আর ফুল হাতা শার্ট। সেটাও নোংরা। পকেটে চারমিনারের প্যাকেট আর দেশলাই। খুবই ঘন ঘন সিগারেট খায়। ওর সঙ্গে কথা বলে জেনেছিল চারণ যে, ওর বাবা নেই। মারা গেছেন লাঙ্গ-ক্যানসারে। প্রচুর বিড়ি খেতেন নাকি তিনিও।

তারপরও ? তুমি ?

হাঃ।

হেসে বলেছিল, কেশর সিং।

তারপর বলেছিল, ইয়ে জিন্দেগী ক্যা হামারা বাপকি জমিনদারী হ্যায় সাব ? মওত যব আয়েগা তব যানাতো পড়েহি পড়েগা। কাহে আয়েগা ? কব আয়েগা ? ইয়ে সব ফজুল বাঁতে যো শোচতা হ্যায়, উ বিলকুলই বুদ্ধু হ্যায়। সাচমুচ বুদ্ধু। যো দিল চাহে করো, ঔর ভগয়ানকো ইয়াদ রাখখো। কোঈভি দুখ নেহি পৌঁছেগা। প্যায়দা যব হুয়া, মরণা ত পড়েহি পড়েগা। মওত কিসিকো ছোড়েগি থোড়ি! উস বারেমে ইতনা শোচনেকি হ্যায় ক্যা ?

বুদ্ধু সিংকে যখন ডাকবার জন্যে খাড়া পাহাড়ের চড়াই এর পাকদণ্ডী বেয়ে গান গাইতে গাইতে উঠে গেল কেশর সিং তখন চারণ গাড়ি থেকে নেমে নদীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল হু হু হাওয়ার মধ্যে।

ছেলেবেলাতে পড়া প্রাচীন আমেরিকান কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'Leaves of Grass'-এর কয়েকটি পংক্তি মনে পড়ে গেল চারণের, পউরি থেকে আসা সন্ন্যাসীর মৃত্যুর প্রেক্ষিতে হঠাৎই।

> "Great is life...and real and mystical...
> Wherever and whenever, great is death...
> Sure as life holds all parts together death holds
> All parts together;

Sure as the stars return again after they
Merge in the light, death is
great as life."

ভাবছিল চারণ, কী আশ্চর্য! এই গাড়োয়ালী মানুষটি, পেশাতে গাড়িচালক কেশর সিংও হুইটম্যানের মতনই জ্ঞানী। ইংরেজি না জেনে, না পড়েও জ্ঞানী। আসলে জ্ঞান, সম্ভবত মানুষের একধরনের সহজাত সম্পত্তি। একধরনের তরবারির মতন বোধ। এই বৃত্তি বা সম্পত্তিকে যে নিয়ত শাণিত করে, শুধুমাত্র তারই হেপাজতে তা ক্ষুরধার থাকে। এই সহজাত সম্পত্তি অনেকেরই থেকেও না-থাকারই সমান।

কেশর সিং ফিরে এল। বলল, বুদ্ধু সিং বাড়িতে নেই। তার বাবা আছেন। বুদ্ধু সিং চাম্বাতে গেছে তার এক নানার কাছে। আগামীকাল ফিরবে।

চারণ বলল, চল, তাহলে আমরা যাই।

কেশর সিং হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বলল, আশ্রমটা ভিয়াসির কতখানি আগে, জানেন কি ?

না। শুনেছি অল্প একটু আগে।

ঠিক আছে। আমি তো কখনওই দেখিনি বা শুনিনি। চলুন।

পাটন কি তার সঙ্গে রসিকতা করল ?

ভাবছিল চারণ।

হতেও পারে। হি পুলড আ ফাস্ট ওয়ান অন হিম।

কেশর সিং কথা বলছিল না। পুরোটাই চড়াই। ফার্স্ট গিয়ারে বেশি না দিতে হলেও অধিকাংশ সময়ই গাড়িকে সেকেণ্ড-থার্ডেই চলতে হচ্ছে। গাড়ি ক্রমশ গরমও হচ্ছে। সামনের সিটে বসে আছে বলেই বুঝতে পারছে সে কথা। উপর থেকে আর্মির ট্রাক, জিপ, বাস, প্রাইভেট ট্রাক নামছিল ঘন ঘন। রাত নামলেই যানবাহনের যাতায়াত কমে যাবে। সাধারণ মানুষে রাতের বেলা এই সব দেবভূমিকে, এই ভূমে যাঁদের আবাস তাঁদেরই হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয় হয়তো।

চারণ চুপ করেই ছিল। মনের মধ্যে নানা কথা মাথা তুলছিল। তুলেই, ডুবে যাচ্ছিল। দিশি, বারোমেসে জংলি-হাঁস ড্যাবচিকদেরই মতন। যাদের আরেক নাম, ডুবডুবা।

হঠাৎই কেশর সিং বলল, ভিয়াসি ঔর দো মিল হ্যায় হিঁয়াসে।

একটু দাঁড় করাও তো গাড়িটা।

গাড়ি দাঁড় করাল সে।

চারণ নেমে দেখল যতদূর চোখ যায় কোথাওই কিছু নেই। জনমানবও নেই।

কেশর সিং বলল, চালিয়ে ভিয়াসি তক চলকে উঁয়াই পুছপাছ কিয়া যায়গা।

চারণ বলল, তাই ভাল।

আবার গাড়িতে উঠে বসল দুজনে।

ভিয়াসিতে পৌঁছে দেখল ছোট্ট একটু জায়গা। দুএকটি দোকান-টোকান। কেশর সিং সব দোকানে গিয়েই ভোঁদাই বাবা বা গাড্ডুবাবার আশ্রমের খোঁজ করল। চারণও করল। ইতিমধ্যে দেবপ্রয়াগ থেকে একটি বাস এসে দাঁড়াল ভিয়াসিতে। সেই বাসের ড্রাইভার—কন্ডাক্টরের কাছেও খোঁজ করল কেশর সিং। সকলেই একমত হলেন যে, ভিয়াসি আর লছমনঝোলার মধ্যে পথের উপরে ভিয়াসির আগে, ওই নামের কোনও সাধু থাকেন না যে শুধু তাই নয়, গত দশবছরের মধ্যেও কেউই অমন সাধুর নামও শোনেনি এ অঞ্চলে।

বাস ড্রাইভার, মুখে ঠেসে খৈনি মেরে বলল, কোঈ সাধু-সন্তকি নাম ক্যা ভোঁদাই ইয়া গাড্ডু হোনে শকতা ? কোঈ জরুর মজাক কিয়া হোগা।

চারণ যেন তার দুকানের পাশে পাটনের অট্টহাস্য শুনতে পেল। কল্পনাতে দেখতে পেল যে, জিনস-পরা পাটন কোমরে হাত দিয়ে ফুলে ফুলে হাসছে দুলে দুলে আর বলছে, 'কেমন দিলাম

স্যার ! কেমন দিলাম আপনাকে ? দ্য গ্রেট মিস্টার, চারণ চ্যাটার্জিকে ?'

আভ্‌ভি করনা ক্যা সাহাব ?

কেশর সিং জানতে চাইল ।

চারণ বলল, চায়ে পিনা । ঔর ক্যা ?

বহুত আচ্ছা । সাহী বাত ।

বলেই, পায়জামার দুটি পাই, রোগা কিন্তু রোমশ হাঁটুর উপরে তুলে চায়ের দোকানের সামনের চেয়ারে বসে পড়ল ও ।

চারণও তার পাশে বসে চা আর পকৌড়ার অর্ডার দিয়ে পাটনের কথাই ভাবছিল । 'মজাক'-ই করেছে যে পাটন তার সঙ্গে, তাতে কোনওই সন্দেহ নেই । পাটন যে হৃষীকেশের কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে অথবা হয়তো হৃষীকেশেই, সে সম্বন্ধেও এখন আর ওর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই । সে আছেও, মনে হয়, কোনও আশ্রম-টাশ্রমেই । তাকে বুদ্ধু বানাবার জন্যেই হয়তো অমন মিথ্যাচার সে করেছিল । অথবা এও হতে পারে যে, তার গুরুদেবের নাম গোপন রাখবার জন্যেই সে মিথ্যাচার করেছিল । প্রকৃতই যে কেন করেছিল তা শুধু সে নিজেই জানে । তবে চারণকে বুদ্ধু বানালেও চারণ পাটনকে অ্যাপ্রিসিয়েট করল ।

দোকানি রেকাবিতে করে পকৌড়া দিল ।

চারণ বলল, এক চায়েমে শক্কর ঔর মালাই কমতি দেনা ।

জি হাঁ ।

বলল, দোকানি ।

বেলা পড়ে গেছে । একটু পরেই সূর্য হারিয়ে যাবে পশ্চিমের শিবালিক পর্বতমালার আড়ালে । তবে মেঘহীন কলুষহীন আকাশে আলো থাকবে অনেকক্ষণ ।

পাটনকে খুঁজে বের করা যায় কি ভাবে, মনে মনে যখন তাই ভাবছিল চারণ, তখনই কেশর সিং বলল, উও ভোঁদাই বাবাকি ইসপিশালিটি ক্যা হ্যায় ?

ম্যায় কৈইসি জানু ? ম্যায় দিখা থোড়ি !

বিরক্ত ও বিব্রত চারণ বলল ।

খ্যয়ের, শুনাতো হোগা জরুর, নেহিত উনকি তালাসমে ইতনা দূর আয়া হি আপনে কাহে ?

বাবাকে জানি না । তবে তাঁর এক চেলার কাছেই শুনেছিলাম তাঁর কথা । চেলাকে খুঁজতেই আসা ।

কেশর সিং দার্শনিকের মতো বলল, কিতনা কিসিমকি চেলা হোতা হ্যায় ইস দুনিয়ামে । কহতা তো হ্যায় 'গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা মিলে এক' মগর ম্যায় বহুত চেলাভি দেখা যো চিনি বন গ্যয়ে ।

মানে কি হল ? চিনি ?

অবাক হয়ে বলল, চারণ ।

কেশর সিং পকৌড়া মুখে গবগব করে বলে উঠল, অজীব বাত সাব । 'গুরু গুড়, চেলা চিনি' আপ কভভি শুনাহি নেহি ?

নেহি তো ।

কেশর সিং বলল, 'গুরু গুড় চেলা চিনি' মানে গুরু গুড়ই রয়ে গেলেন আর চেলা চিনি হয়ে বেরিয়ে গেল । মানে, গুরুর চেয়েও সরেস হল আর কী ।

চারণ হেসে উঠল, তাকে পাটন বুদ্ধু বানানো সত্ত্বেও ।

কেশর সিং বলল, দেবপ্রয়াগে গেছেন আপনি সাহাব ?

না । এখনও যাইনি ।

বদ্রীনাথের বিগ্রহের যাঁরা বংশানুক্রমে পুরোহিত, সেই 'রাওয়ালেরা' তো ওই দেবপ্রয়াগেই থাকেন শীতের সময়ে, মন্দির বন্ধ হয়ে গেলে । দেবপ্রয়াগেই তাঁদের মূল বাস ।

তাই ?

হ্যাঁ।

সেখানে এক বাবা আছেন, নাম অনন্তানন্দ বাবা। ঠিক দেবপ্রয়াগ বাজারে থাকেন না তিনি। যেখানে অলকানন্দা আর ভাগীরথীর সঙ্গম তারই উপরে পাহাড়ের এক গুহাতে থাকেন। তাঁর দর্শন পাওয়া সোজা ব্যাপার নয়। যাকে তাকে তিনি দর্শন দেনও না। দূর থেকেই তিনি মানুষ চেনেন। মুখও দেখতে হয় না। গন্ধ পান বাতাসে। তেমন উচ্চকোটির কোনও আগন্তুক এলে তবেই দেখা দেন। নইলে দেখা আদৌ দেন না। তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে তিনশ দিনই মৌনী থাকেন। কত মানুষই যে তাঁর দর্শনলাভের জন্যে যান সেখানে। কিন্তু উনি দু একজনকেই দেখা দেন শুধু। তাও রাতের বেলা।

বলেই বলল, যাবেন আপনি সাহাব ?

চারণ বলল, নাঃ।

'নাঃ' শব্দটির মধ্যে একটু বিরক্তিও জড়িয়ে ছিল সম্ভবত। সেটা লক্ষ করেই কেশর সিং বলল, না কেন ?

আমি তো মানুষও খুন করিনি, চুরিও করিনি। কোনও বাবা দর্শন করেই বা গো-ব্রাহ্মণ পুজো করেই মুক্তি পাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

ভাল মানুষ যাঁরা, তাঁরা তো আরও ভালও হতে পারেন সজ্জনের কাছে এলে।

হয়তো। ওসব নিয়ে ভাবিনি। তুমি বরং ভোঁদাইবাবা বা গাড্ডুবাবার একটু খোঁজখবর কোরো। হয়তো এখানেই থাকতেন, চলে গেছেন হয়তো এক দুদিন হল এমনও তো হতে পারে।

কেশর সিং হাসল। বলল, শুনলেন তো যে, দশ বছরের মধ্যে ভিয়াসির এদিকে কেউ কোনও বাবার কথা শোনেইনি।

তা ঠিক।

পকৌড়া আর চা খেয়ে ওরা যখন গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে হৃষীকেশের দিকে ফিরে চলল তখন সূর্য পশ্চিমের পাহাড়শ্রেণীর ঠিক উপরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখল। পাহাড়ের পেছনে ডুবে যাবে আর দুএক মিনিটের মধ্যে।

উতরাইয়ে পথে নামছে গাড়ি এবারে দ্রুত। গাড়ি অবশ্য কেশর সিং গিয়ারেই রেখেছে। দ্রুত আলো কমে আসছে। রাইট-হ্যান্ড-ড্রাইভ গাড়ি। সামনের বাঁদিকের সিটে বসেছিল চারণ। সেদিকেই গভীর গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা, হৃষীকেশের সমতলের দিকে। ঝরঝর করে হাওয়া আর জলের শব্দ আসছে নীচ থেকে। চলন্ত যানে বসে কখনওই প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা যায় না, পাওয়া যায় না তার শব্দ ও গন্ধ, দেখা যায় না তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

চারণ বলল, গাড়ি জারা রোক্কো তো কেশর সিং।

পোরসাব কিজিয়েগা ক্যা ?

নেহি নেহি। এ্যাইসেহি রোক্কো।

কেশর সিং এর অত্যাধিক ঔৎসুক্যে বিরক্ত হয়ে বলল চারণ। ভাবল, দোষটা তারই। সকলকেই মাথায় চড়ায় ও। অনেকেই চড়ে পড়ার পর আর নামতে চায় না।

রাস্তা যেখানে যথেষ্ট চওড়া তেমন জায়গা দেখে গাড়িটা বাঁয়ে দাঁড় করাল একটু পরেই কেশর সিং।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে লম্বা শ্বাস নিয়ে স্বগতোক্তি করল সে, বাঃ।

কেশর সিং বলল, কুছ বোলেঁ আপ ?

নেহি।

আরও বিরক্ত হয়ে বলল, চারণ।

ভাবল, এসব জায়গাতে নিজেই গাড়ি চালিয়ে আসতে হয়। এত কথা বলা, অকারণ কথা

অসহ্য। ওর ঘাসফড়িং মনের প্রকৃতি বুঝে চলার মতো মানসিকতাসম্পন্ন সঙ্গী আর কোথায় পাবে। এখন সব মানুষেরই যেন শুধু একটাই ধান্দা। কী করে দুটো পয়সা বেশি পাওয়া যায়। পকেট মারবার জন্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত গরিব-বড়লোক সকলেই যেন ধার-দেওয়া ব্লেড পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই যে প্রকৃতির মধ্যে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া, এটা যেন চুক্তির মধ্যে ছিল না কুমার ট্র্যাভেলস-এর সঙ্গে, তাই তাদের প্রতিভূ কেশর সিং এত বিরক্ত চারণের এই হঠাৎ-থামাতে।

বিরক্ত তো বিরক্ত! ভাবল, চারণ।

সূর্যটা ডুবছে শিবালিক পর্বতমালার আড়ালে কিন্তু পর্বতমালার ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ে লালিমা তখনও লেগে রয়েছে আর সেই লালিমার ছোঁয়া লেগেছে নীচের নদীর জলেও। ভারী শান্তি এখানে। নীচে হাওয়া আর দ্রুতধাবমানা জল যেন ঝরঝরানির শব্দের প্রতিযোগিতাতে নেমেছে একে অন্যের সঙ্গে। যদিও সেই জায়গাতে পর্বতমালা প্রায় ঊষর, কিন্তু বড় গাছপালা আছে ওপারে। তাড় গাছ দেখা যাচ্ছে কয়েকটি মাথা উঁচোনো। এপারে শুধুই ঝোপঝাড়ের সবুজের প্রলেপ। তারা হাওয়ায় হেলছে দুলছে। দুলছে ঘাস, ঘাসফুল, লালটায়েন। নীচের খাড়া নেমে-যাওয়া গিরিখন্দ থেকে দিনকে বিদায় জানানোর জন্যে পুরবীতে গলা বেঁধেছে রেড-ওয়াটেল্ড ল্যাপউইংগ আর তিতিরেরা, চকোর, বটের আর ব্রেইনফিভার।

নীচের গভীর গিরিখাত দিয়ে বয়েযাওয়া গঙ্গার দিকে চেয়ে, নামতে নামতে হঠাৎই খেয়াল হল যে, জলে যে লালিমার আভা ছিল তা পুরোপুরি মুছে গেছে। কালিমাতে ঢেকে গেছে তখন পর্বতরাজি, নদী। এখন চোখ চলে না আর কোথাওই। এখন শুধু কানে শোনার বেলা। আজ কৃষ্ণা দ্বাদশী। অমাবস্যা সামনেই। দিওয়ালি। তবে শুনেছে, এই দিওয়ালি সিনিবালি। অর্থাৎ, কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিনেই পড়েছে দিওয়ালি। চাঁদ যে উঠবে না আজ তা নয়, তবে উঠবে শেষ রাতে। ফালি চাঁদ।

কত বিচিত্র ফুল আর পাতার গন্ধ বয়ে নিয়ে বেগে বইছে গাঢ় অন্ধকারে, ঝরনার মতো অবুঝ হাওয়া। গাছে ঘাসে ফুলে কানাকানি উঠছে সেই হাওয়াতে। তার খসস-খসস ফিসস-ফিসস শব্দ আসছে কানে। অন্ধকারের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রূপ যেন আরও বেশি করে প্রতিভাত হচ্ছে সেই দ্রুতগতি পার্বত্য হাওয়ার অদৃশ্যমান ব্যক্তিত্বর বিচিত্র গা-শিউরানো শব্দে।

চারণ ভাবছিল, যাঁরা ঈশ্বর দেখতে মন্দিরের অন্দরে, পাহাড়ে-কন্দরে যান, তাঁরা তা যান। চারণের ঈশ্বর এমন এমন জায়গাতে এমন এমন মুহূর্তেই দেখা না-দিয়েও দেখা দেন চারণকে। অবয়বহীন, প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত, কিন্তু অন্তরের অন্তরতমে অন্তরময় অন্তর্যামীর প্রাণস্বরূপ হয়ে।

কেশর সিং হঠাৎই বলে উঠল, কভভি কভভি ভাল আ যাতা হ্যায় হিঁয়া উপ্পরসে উত্তারকে। জানোয়ারসে এলাওয়া ঔর বহত কিসিমকি ডরভি হোতে হ্যায় ইয়ে সব জাগেমে সাহাব, সুরজ অস্ত হো যানে কি বাদহিমে। আইয়ে সাহাব, অব চলা যায়।

ঘোর ভেঙে গেল চারণের। চমকে উঠে অন্ধকারে মুখ ঘোরাতেই দেখল কেশর সিং-এর অনির্বাণ সিগারেটের আগুন সেই নিঃসীম অন্ধকারে বাঘের চোখের মতনই জ্বলছে। সাদা অ্যাম্বাসারডাটাও যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমনই নিকষ কালো অন্ধকার। তবে আর একটু পরেই যখন তারারা আকাশময় এক এক করে ফুটে উঠবে, হাস্যময়ী সদ্য-যুবতীর মুখের মতন টলটলে, নীলাভ সবুজাভ কমলাভ দ্যুতিসমৃদ্ধ হয়ে, তখন এই অন্ধকারও আর অন্ধকার থাকবে না হয়তো।

এখন উঠেছে শুধুমাত্র সন্ধ্যাতারা।

কেশর সিং-এর কথায় সায় দিল না ও, কোনও প্রতিবাদও করল না। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে গাড়ির সামনের বাঁদিকের দরজাটা খুলল। খুলতেই, গাড়ির ভিতরের জ্বলে ওঠা আলো সেই অন্ধকারের নিভৃতি আর আশ্লেষকে ছিন্নভিন্ন করে দিল।

আশ্চর্য! গাড়ির ব্যাটারির ওই অতটুকু সামান্য আলোই ছিন্নভিন্ন করল এই আদিগন্ত অসামান্য অন্ধকারকে! মানুষ বড় ছিন্নমতি প্রাণ। বড়ই ছিন্নমতি!

ভাবল, চারণ।

হৃষীকেশে পৌঁছে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি অবধি না গিয়ে দেরাদুন রোডের ত্রিবেণী ঘাটের দিকে এগোল শ্লথ পায়ে। এখানে কত মানুষ, কত রকমের মানুষ, দোকান, বাজার, চোখ-ধাঁধানো আলো, চিৎকার, দর কষাকষি, সারা ভারতের মানুষের ভিড় অথচ এখান থেকে পনের মিনিট দূরেই কী নিস্তব্ধ আশ্চর্য সুন্দর এক পৃথিবী, যে, সেই পৃথিবীর বাসিন্দা হতে চায়, তার জন্যে প্রায় নীরবেই অপেক্ষা করছে যুগযুগান্ত ধরে। মানুষের মতন Paradox সম্ভবত দ্বিতীয় নেই। এমন স্ব-বিরোধী প্রাণী বিধাতা আর সৃষ্টি করেননি।

কেন জানে না চারণ, আজ গাড়ি থেকে নেমে ত্রিবেণী ঘাটের দিকে এগোতে এগোতেই ওর মন ধিয়ানগিরি মহারাজের কাছে যাবার জন্যে উচাটন হয়েছিল। অথচ এতদিন কাছে গিয়েও তাঁকে উপেক্ষা করেছে। এতদিনে কি তার মনের গুমোর কাটল ? তার ইগোর আবরণ কি ছিন্ন হল কেদার আর বদ্রীনাথের পথে ভিয়াসি অবধি গিয়েই ? ভাবছিল ও।

মানুষের মন বড় দুর্জ্ঞেয়। বড় বিচিত্র সৃষ্টি সে বিধাতার। গিয়ে হয়তো পৌঁছেও যেত সোজা ধিয়ানগিরির কাছে আজ কিন্তু বাদ সাধলেন তাঁর চার পাঁচজন সাদা চামড়ার চেলা-চামুণ্ডা। তাঁরা ঘিরে ছিলেন ধিয়ানগিরিকে। বাদ সাধলেন ভীমগিরিও। ভীমগিরিকে দেখতে পায়নি ও প্রথমে। তিনি ভজন গাইছিলেন অন্যদের ভিড়ে মিশে। রামমন্দিরের মস্ত চাতালে বসে। চারণ গিয়ে পৌঁছল আর তখুনি ভজনও শেষ হল তাঁর। অন্যরা গাইছিলেন তখনও। ভীমগিরি হাত তুলে ডাকলেন চারণকে।

এই চাতাল-সংলগ্ন মন্দিরের বিগ্রহ যে রাম তা চারণ জানত না। জানত যে, কোনও বিগ্রহ আছেন ভিতরে এই পর্যন্ত। মন্দিরের অন্ধকার অভ্যন্তরের কোনও বিগ্রহ সম্বন্ধেই ওর কোনও আগ্রহ তো কোনওদিনই ছিল না। বিগ্রহর নাম জানার পর থেকে ওর অবাক লাগছিল যে, মন্দিরটি যদিও রামের কিন্তু মন্দিরের চাতাল সকলেরই। সেখানে কালিভক্ত, শিবভক্ত, বিষ্ণুভক্ত, গণেশভক্ত, সরস্বতীর ও লক্ষ্মীর পূজারী সকলেরই সমান অধিকার। হিন্দুদের দেবদেবী নাকি তেত্রিশ কোটি। হয়তো হবে। কিন্তু এই রামমন্দির-সংলগ্ন চাতালে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে দেখে তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে যে কোনও বিরোধ বা উচ্চনীচভেদ নেই তা বুঝতে পারছে।

এক একজন তার আরাধ্য দেবতাকে একেকরকম চোখে দেখেন যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু All Roads Lead to Rome এই গন্তব্যের একদেশদর্শিতা যদি সর্বধর্মের মধ্যে ঘটানো যেত, তবে অযোধ্যায় সম্ভবত বাবরি-মসজিদ আর রামমন্দির নিয়ে এত কাণ্ড ঘটত না।

ভীমগিরি বললেন, কোথা থেকে ?

অনেকই জায়গা থেকে।

মানে ?

চন্দ্রভাগাতেও গেছিলাম খাওয়ার পরে, আপনারা শোভাযাত্রা করে যাচ্ছেন দেখলাম শব নিয়ে।

তা এলেন না কেন ? মানে, যোগ দিলেন না কেন ?

আমার কী অধিকার ?

শবযাত্রায় যোগ দিতেও যেদিন অধিকার বিচার করা হবে সেদিন হিন্দুধর্মের মৃত্যুঘণ্টাটা সত্যিই বাজবে। তারপরে কোথায় গেলেন ?

ভিয়াসি।

ভিয়াসি ? হঠাৎ ? ভিয়াসিতে কি আছে ?

কিছু নেই। তবে থাকতে পারত। আচ্ছা আপনি ভোঁদাই বাবা বা গাড্ডুবাবু বলে কোনও সাধুর খোঁজ রাখেন ? আশ্রমও আছে শুনেছি।

হো হো করে হেসে উঠলেন ভীমগিরি। বললেন, আপনার সামনে যে বাবা বসে আছেন তিনিই যদি ভোঁদাই বাবা না হন তো আর কে হতে পারেন ? আচ্ছা, আপনি ভাবলেন কি করে যে কোনও সন্ত তাঁর নিজের নাম রাখবেন ভোঁদাইবাবা ?

সন্তরা নাম কি নিজেরা রাখেন ? নাম তো রাখেন হয় গুরু, নয় শিষ্যরা।

তা ঠিক। হয় গুরুরা নয় গরুরা।

ছিঃ ছিঃ।

বলে উঠল চারণ।

গুরু-শিষ্যর পরম্পরাতে তার যে এমন ভক্তি জন্মে গেছে তা হৃদয়ঙ্গম করে পুলকিত যেমন হল, তেমন ভয়ার্তও হল। এই রোজ ত্রিবেণীঘাটে আসা আর ভীমগিরির সঙ্গ করাটা বোধ হয় মোটেই ভাল হচ্ছে না।

আজকে আপনার গুরুজির কাছে যাব।

চারণ হঠাৎই অ্যানাউন্স করল।

হাসছিলেন ভীমগিরি। বললেন, মন উচাটন হয়েছে এতদিনে ?

তা বলতে পারি না, তবে খুব ইচ্ছে করছে যে, ওঁর সঙ্গে আলাপিত হই। আমি তো আর এখানে মৌরসী-পাট্টা গেড়ে বসার জন্যে আসিনি। কবে যে চলে যাব এখান থেকে তা কে বলতে পারে।

বাঃ।

বাঃ কেন ?

এই মানসিকতাটাইত সব। এক জায়গাতে থেবড়ে বসে থাকে শুধু গৃহীরাই। যে ঘর ছেড়েছে তার স্বাধীনতার মূল মন্ত্রই হল এই। আজ মন করল তো এখানে, কাল করল না তো সেখানে। অস্থাবর জঙ্গমের মতন হবে তাঁর মানসিকতা। স্থাবর সম্পত্তির মতন ভারী হল গৃহীর মন। তার শিকড় পৌঁছে যায় অনেকই গভীরে। তার নিজের চোখেরই আড়ালে আবডালে। সে যদি পাততাড়ি গুটোতেও চায় তাহলেও সে পারে না সহজে। মাটি টানে, নারী টানে, স্বার্থ টানে, প্রেম টানে, যশ টানে, মান টানে। এতসব টানের মোহ কাটিয়ে নিজেকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে কোথাওই চলে যাওয়া ভারী কষ্ট আর অসুবিধের বলেই তো পারে না গৃহী ঘর ছাড়তে।

ঘরে থেকেও তো সন্ন্যাসী হওয়া যায়।

অবশ্যই যায়। তবে যাঁরা পারেন, তাঁরা অত্যন্তই উচ্চমার্গের মানুষ। সে বড় কঠিন তপস্যা।

সংসারে থেকেও সন্নিসীর কথা শুনেছি বটে কিন্তু ব্যাপারটা কিরকম ভেবে দেখিনি।

তাঁরা গাছেদের মতন।

গাছেদের মতন ?

হ্যাঁ। যদি কখনও গহন বনে বা পাহাড়ে গিয়ে থাকেন চৈত্র-বোশেখ মাসে অথবা ভরা গ্রীষ্মে তাহলে দেখে থাকবেন পর্ণমোচী গাছেদের পাতা সব ঝরে গেছে। গাছেরা উর্ধ্ববাহু নাগা সন্নিসীদের মতন সার সার গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে, মনে হবে যে, দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তারা হেঁটে চলেছে অবিরতই, দেশে-দেশান্তরে। না হেঁটেই। গৃহী সন্নিসীরাও ওই পর্ণমোচী গাছেদেরই মতন উর্ধ্ববাহু, বাহুল্যহীন, ঝাড়া হাত-পা, স্থবির অথচ অস্থাবর।

বাঃ।

বলল, চারণ।

ভীমগিরি বললেন, গুরুজির সেই শিষ্যরা ফিরে এসেছেন বদ্রীনাথ থেকে। তাঁদের স্ত্রীরা গেছিলেন মুসৌরী, দেরাদুন হয়ে, তাঁরাও এসেছেন। এঁদের বাড়ি শুনেছি অস্ট্রিয়াতে। জায়গাটা কোথায় চারণবাবু ? আপনি গেছেন কি কখনও ?

জায়গাটা ইউরোপের একটি দেশ। আপনাকে তো বলেইছিলাম একদিন। ভারী সুন্দর দেশ। সে দেশের মানুষেরাও খুব সুন্দর। নারী-পুরুষ সবাই। আমি যে সময়ে গেছিলাম, দেওয়ালির কিছু আগে, তখন ওদের দেশের গ্রামে গ্রামে একটি উৎসব হয় দেখেছিলাম। খুব মজার উৎসব।

কী উৎসব ?

গরুদের চরতে পাঠায় ওরা গ্রীষ্মের গোড়াতে, পাহাড়ে। সঙ্গে যায় বড় বড় শেফার্ড-ডগ। মানে সেই কুকুরেরাই গরুদের চরায়, পাহারা দেয়। মানুষ সঙ্গে যে যায় না তা নয়, তবে নগণ্য। অনেক সময়ে যায়ও না। আমাদের মতো গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলেমেয়ে পয়দা করে না কোনও সভ্য দেশের মানুষেরাই। সে সব দেশে সব কিছুরই প্রাচুর্য। শুধু মানুষের সংখ্যাই কম। গরমের শেষে, সে দেশে তো আমাদের মতো বর্ষা নেই, গরমের পরেই হেমন্ত, ওরা বলে ফল...।

কি বলে ?

Fall। গাছের পাতারা সব লাল, হলুদ খয়েরি, পাটকিলে, কালো এবং আরও যে কত-রঙা হয়ে যায় তা কী বলব ! যখন হেমন্ত আসে, তখন গরুদের নামিয়ে আনে ওরা পাহাড় থেকে সমতলে। গরুদের ঘরে ফেরার পরে অস্ট্রিয়ার গ্রামাঞ্চলের গির্জাতে গির্জাতে উৎসব হয়, তার নাম 'Dorffest'। গরুদের মঙ্গলকামনা করে প্রার্থনা করা হয় গির্জাতে। তারপর রাতে দেদার মদ্যপান, নাচ গান আনন্দ করা হয়।

Fest কথাটা ইংরেজি Festivalএর সংক্ষিপ্ত রূপ নয় ?

ভীমগিরি বললেন।

আপনি তো বেশ ভালই ইংরেজি জানেন দেখছি। অবাক হয়ে বলল, চারণ।

তারপর বলল, অস্ট্রিয়ান আর জার্মানরা দুটি F ব্যবহার করে FFEST।

আপনি ঠিক বলেছেন। Festival কেই ওদের ভাষায় বলে Ffest। ওই উৎসবের নাম Dorffest।

বাঃ। তবে যে অনেকের ধারণা আমরা ভারতীয়রাই গরুদের পুজো করি এবং সে জন্যে তো অনেক কটু-কাটব্যও অনেকের কাছেই শুনতে হয়। সাহেবরাও যে গরুদের এত ভক্তি করে জানা ছিল না তো ! বলব তো সকলকে। কি যেন বললেন নামটা উৎসবের ?

আরেকবার বলুন ?

Dorffest।

হ্যাঁ ডরফফেস্ট। মনে থাকবে এবার।

চারণ বলল, এত দিন আপনার সঙ্গ পাওয়া হল অথচ আপনার দেশের সন্ত তুকারামের সম্বন্ধে কিছুমাত্রও জানা হল না। অনেকদিনই ভেবেছি যে জিজ্ঞেস করব, তা একথা সে কথাতে বেলা গেছে। ধিয়ানগিরি মহারাজের তো ফাঁকা হতে সময় লাগবে ততক্ষণে বলুন না তাঁর কথা, শুনি। উনিও তো আপনারই মতন মারাঠি ?

হ্যাঁ। অবশ্যই মারাঠি।

তারপরই বললেন, আজ কি আপনি হোটেলে ফিরে যাবেন না ?

নাও যেতে পারি। মানে, গেলেও হয়, না গেলেও হয়।

আটটা তো বাজবে একটু পরেই। কী ব্যাপার ?

ব্যাপার আর কী ! আপনাদের হাওয়া লাগছে আর কী গায়ে।

ভাল ভাল। খুব ভাল। আজকে তবে গুরুজির সঙ্গে কথা বলে তবেই যাবেন। রাত বাড়লে চাতাল এবং ঘাটও সুনসান হয়ে যাবে। তখন কথা বলে আরাম হবে। চাই কি গুরুজির মুড ভাল থাকলে আপনাকে গানও শোনাতে পারেন। তবে গান উনি করেন গভীর রাতে।

বলেই বললেন, চা খাওয়া হবে না, কি একটু ? আর গোটাদুয়েক গাঁজার বিড়ি ?

চারণ বলল, হোক।

চাতালের দোকানের ছেলেটা ঘুর ঘুর করে সবসময়েই। তাকে বলে দিল চারণ দুটি চায়ের

কথা। ভাঁড়ে করে নিয়ে আসবে সে।

ভীমগিরি বললেন, হাওয়াতে হিম লেগেছে। আনতে আনতে ভাঁড়ের চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। চলুন, আমরা দোকানে গিয়েই খাই।

চলুন। বলল, চারণ।

তারপর বলল, এদিকে উপোস আছেন আর খালি পেটে চা আর গাঁজার বিড়ি খাচ্ছেন আপনার অম্বল হবে না, তো কার হবে ?

তো হোক। বেচারা অম্বলেরও তো কোনও আধার চাই। তারও তো ক্রিয়া-কর্ম আছে নিজস্ব। আমার মতন মানুষের পেট না পেলে সেই বা বাঁচে কি করে।

হেসে উঠল চারণ ভীমগিরির কথাতে।

ভাঁড়ের চা খেল ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, দোকানের সামনে। তারপর গাঁজা-ভরা বিড়িতে সুখটান লাগিয়ে ফিরে এসে আবার বসল চাতালে।

চারণ বলল, বলুন এবারে তুকারামের কথা।

শুনুন তবে বলি।

ভীমগিরি শুরু করলেন।

তুকারামের উপাস্য দেবতা ছিলেন বিঠ্ঠলজি। একুশ বছর বয়সেই উনি বিঠ্ঠলজির দয়া পান। দারিদ্র্যে, রোগে, শোকে ব্যাতিব্যস্ত তুকারাম বারবার পনঢরপুরের বিঠ্ঠলজির মন্দিরে আসেন। এলেই, বিঠ্ঠলজি যেন তাঁর সর্বদুঃখহরণ করতেন। পনঢরপুরে ভীমা নদীর পারে প্রভুর মন্দির। একদিন উৎসব শেষে ক্লান্ত শ্রান্ত তুকারাম নদীর পারে পৌঁছে, চান সেরে এক পুরনো বটের ছায়াতে এসে বসে সূর্যাস্ত বেলাতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম তো এল না, তন্দ্রা এল। তন্দ্রার ঘোরে তুকারাম হঠাৎ স্বপ্ন দেখলেন যে, এক সুন্দর দিব্যপুরুষ বৈষ্ণব সেই গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হাসিমুখে তুকারামকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বহুদিন ধরে ভক্ত তুকারাম বিঠ্ঠলজির করুণার জন্যে চাতকের মতন প্রার্থনা করেছিলেন। সেই প্রার্থনা এতদিনে সফল হল।

তুকারাম আনন্দে মূর্চ্ছা গেলেন।

মূর্চ্ছা যখন ভাঙল, তখন তাকিয়ে দেখেন সেই দিব্যপুরুষ অদৃশ্য হয়েছেন। কিন্তু তার দেহমনের মধ্যে চৈতন্যমন্ত্রর ঝড় উঠেছে যেন। চৈতন্যদেবের নাম ও প্রেমের প্রচারই সেদিন থেকে তুকারামের জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠল। উনি মারাঠিতে যেসব অভঙ লিখেছিলেন তা আজও লক্ষ লক্ষ মারাঠির মন উদ্বেলিত করে।

সেই অভঙ কেমন ? শোনান না একটা ?

চারণ বলল।

সেই দিব্যপুরুষ দর্শনের পরেই তুকারাম যে অভঙটি লিখেছিলেন সেটি হল :

"রাঘবচৈতন্য কেশবচৈতন্য
সাঙ্গি তালি খুন মাড়ি কেচি।
বাবাচী আপনে সাঙ্গিতলে নামাঙ্গ
মন্ত্র দিলা রাম কৃষ্ণ হরি।
মাঘ শুক্লা দশমী পাহুসী গুরুবার
কেলা অঙ্গীকার তুকা ভনে।"

চারণ বলল বাঃ। মারাঠি ভাষার সঙ্গে তো বাংলা ভাষার অনেক মিল আছে।

মানসিকতারও আছে। এই কথা আমাকে পুনের আশ্রমের জ্যামখিণ্ডিকার বাবাজী বলেছিলেন। তিনি বাংলাও জানতেন।

তাই ?

হ্যাঁ।

ভীমগিরি মহারাজ বললেন, আসলে সেই যে দিব্যপুরুষ, তিনি কিন্তু অলীক নন। তিনি এক সিদ্ধপুরুষ হিসেবে মহারাষ্ট্রে জন্ম নেন। তাঁর সমাধিও আছে মহারাষ্ট্রের ওতুর গ্রামে। তবে তাঁর পুরো পরিচয় এখনও রহস্যাবৃত। তবে তিনি যে তুকাকে সহজ সরল মারাঠা কথ্য ভাষাতে ওইসব অভঙ লিখতে বলেছিলেন সে জন্যেই তুকারামের পক্ষে অত সহজে নিজের হৃদয়ের সব ভক্তি উজাড় করে অভঙ-এর পর অভঙ লিখে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। ...তবে

এই অবধি বলেই থেমে গেলেন ভীমগিরি।

কী হল ?

বলেই, চারণ তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখল অস্ট্রিয়ান শিষ্যর দল ধিয়ানগিরির সামনে থেকে উঠে চলে যাচ্ছেন। ধিয়ানগিরি আবারও একা। সামনে ঈষৎ ঝুঁকে অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রের উপর নিজের মনে আঙুল দিয়ে তাল দিয়ে নিরুচ্চারে কোনও গান গাইছেন।

ভীমগিরি বললেন, চলুন এবারে।

বলেই, তুকারাম প্রসঙ্গ বন্ধ করে চারণকে সঙ্গে করে এগোলেন গুরুর দিকে।

চারণের ভাল লাগছিল না। জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই কখনও দালালের সাহায্য নেয়নি ও। সমস্ত দালালদেরই সে ঘৃণা করে। তা তারা ঘুষের দালালই হোক, কী মেয়ের দালাল, কী যশের দালাল, ক্ষমতার দালাল কী আত্মিক মুক্তির দালাল।

অথচ এখন ভীমগিরির সঙ্গে যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই।

চারণকে দেখেই ধিয়ানগিরির মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেমন হাসির আভাস সে দেখেছিল আজ কুঞ্জাপুরী থেকে ফিরেই তাঁর মুখে। সোজা হয়ে বসলেন তিনি পলিথিনের মলিন, সাদা এবং নিচু, চাঁদোয়ার নিচে। সোজা হয়ে বসলে, সেই চাঁদোয়ার যা উচ্চতা, তাতে তাঁর মাথা থেকে ইঞ্চিদুয়েক ব্যবধান থাকে মাত্র।

মহারাজই বটে। মহারাজার যে কত্বরকম হয়!

ধিয়ানগিরি মহারাজ কোনও কথা বললেন না। আবারও হাসলেন। তারপর ম্যান্ডোলিনটি তুলে নিয়ে তা বাঁধতে লাগলেন।

কিঁউ বেটা ? গানে কি শখ হ্যায় ? না ?

চারণ বলল, শুনতে ভালবাসি।

গাইতেও ভালবাসো।

আমি যা গাই, তাকে গান বলে না।

যাই প্রাণ থেকে ওঠে, এবং সুরে ভরপুর হয়ে প্রকাশিত হয়, তাই গান। তবে যদি কারও গলা সুরে না বলে, তার গান গাওয়া কখনওই উচিত নয়। তা অন্যের আনন্দর কারণ না হয়ে পীড়ারই কারণ হয়। বেসুরো গায়ক বা যার গলাতে সুর কম লাগে বা যার স্বর কর্কশ তার গান শোনার মতো শাস্তি সুরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের আর দ্বিতীয় নেই।

তা ঠিক। বলল, চারণ।

তারপর বলল, একবার আলমোড়াতে বেড়াতে গিয়ে সজ্জনবাবু নামের এক অন্ধ এবং ভক্ত গায়কের ভজন শুনেছিলাম। সেই ভজনে যা ভক্তিরস ছিল, যা ভগবত প্রেম, নিজে নয়নহারা বলেই বোধহয় তাঁর নয়ন দিয়ে ঈশ্বরকে দেখার যে নির্মল, নির্ভেজাল আকুতি ছিল, তা আজও আমাকে আলোড়িত করে। কিন্তু ভজনটার প্রথম কলি দুটি শুধুমাত্র মনে আছে। আর কিছুই মনে নেই। মনে যে পড়ে না, সে জন্যে বড় কষ্ট পাই।

গাও না বেটা। গাকে শুনাওতো সাহী, দেঁখে, কৌনসি গানা ? ম্যায় বয়ানকি ইয়াদ ভি দিলা দেনা শকতা তুমকো উও গানা ম্যায় ভি শুনা হোগা তো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল চারণ। সে তো আর গায়ক নয়।

গাও বেটা গাও। উৎসাহ দিয়ে বললেন ধিয়ানগিরি মহারাজ। ভগয়ানকি ভজন করনেমে শরম 'কওন চি ক্যা ? গাও।

চারণ ধরে দিল ভজনের মুখটা, সাহস করে।

"খোঁজে খোঁজে তুমহে কানহাইয়া মুঝে নায়না ধারে"...

আর সঙ্গে সঙ্গে ধিয়ানগিরি মহারাজ জলদগম্ভীর কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন,

'মোরে মন্দির অবলো নেহি আয়ে
কওনসী ভুল ভঁয়ি মেয়োঁ আলি
প্রেম পিয়া বিনা আঁখিয়া তরস রহি
উনবিনে জিয়া ভরমায়ে'।
খোঁজে খোঁজে তুমহে কনহাইয়া
মুঝে নায়না ধারে।

এই 'ভরমায়ে' শব্দটির মানে কি ?

চারণ, ধিয়ানগিরির গান শুনে মুগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করল।

ভরমায়ে মানে জানো না ? কী বলব ? মানে, মানে, মনে কর, Worry.

ওঃ।

চারণ বলল।

এই ভজনটি জয়জয়ন্তীতে বাঁধা। আমি অন্তত তাই শিখেছি। জয়জয়ন্তীতে আরোহীতে শুদ্ধ নিখাদ আর শুদ্ধ গান্ধার লাগে আর অবরোহীতে দুইই কোমল। তবে বক্রভাবে লাগে। এখানে মন্দির শব্দটির মানে হচ্ছে মন-মন্দির।

ধিয়ানগিরি মহারাজ সঙ্গে ম্যান্ডোলিনটি বাজাচ্ছিলেন। ঠিক বাজানো যাকে বলে তা নয়। শুধুই একটু ছেড়ছাড়। সুর যদি উপচে পড়ে এদিক ওদিক হয়ে না যায়, তারই ঘেরাটোপ হিসেবে যেন ব্যবহার করছিলেন যন্ত্রটি। ম্যান্ডোলিনের আওয়াজটা চারণের কানে যেন সরোদের মতনই শোনাল। অবাক হয়ে বাজনাটির দিকে চেয়ে রইল ও।

আমার এক আমেরিকান শিষ্য এনে দিয়েছিল বছর দুয়েক আগে। গান গাইলে, খালি গলাতেই গাই। আমি গাই, তিনি শোনেন। মাঝে অন্য কোনও অনুষঙ্গর দরকারই বা কি ?

বলেই বললেন, আচ্ছা বছর কুড়ি আগে প্রয়াগে একবার তোমাদের কলকাতার এক বাঙালি ছোকরার সেতার শুনেছিলাম, ভারী ভাল হাত। সে কি এখনও কলকাতাতেই আছে ?

কি নাম ?

নিখিল ব্যানার্জি।

নিখিল ব্যানার্জি ! তিনি তো বিখ্যাত বাজিয়ে।

আছে কোথায় ? দেখা হলে বলো তো বেটা যে ধিয়ানগিরি মহারাজ তার খোঁজ করছিল। একদিন এই রাম মন্দিরের চাতালে তার পক্ষে গভীর রাতে বাজানো কি সম্ভব হবে ? যা খুশি ওর, তাই বাজাবে। হাম্বির বা দেশ বা জয়জয়ন্তী বা মালকোষ বা ঝিনঝোটি।

চারণ বলল, তিনি তো গত হয়েছেন।

দেহান্ত হো গ্যয়ে ? তাই ? কবে ?

অবাক হয়ে বললেন ধিয়ানগিরি।

বছর কয়েক হয়ে গেল।

ওঃ, তাহলে তো মিটেই গেল। ও মন্দিরের বিগ্রহর সামনে আর কি বাজাবে ? স্বয়ং দেবদেবীদেরই শোনাচ্ছে এখন তার বাজনা স্বর্গের বাগানে বসে, পারিজাতের গন্ধের মধ্যে। ক্ষণজন্মা ছেলে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ যার উপরে না থাকে তার পক্ষে অমন কলাকার হওয়া কখনওই সম্ভব নয়। ভাল মানুষদেরই ঈশ্বর তাড়াতাড়ি টেনে নেন নিজের কাছে।

আপনি শুনেছি গান-বাজনা গুলে খেয়েছেন।

চারণ বলল, ধিয়ানগিরি মহারাজকে।

আমি ? কে বলেছে ?

ভীমগিরি মহারাজ।

গানবাজনা সম্বন্ধে ভীমার যতটুকু জ্ঞান এবং গুলে খাওয়া সম্বন্ধেও, তারই প্রেক্ষিতে বলেছে। গান তো আর সিদ্ধির গুলি নয় ! যে গুলে খাওয়া অত সহজ।

ওঁর নাম কি ভীমা ?

নাম ভীমগিরিই কিন্তু সন্ত তুকারামের আরাধ্য দেবতা বিঠঠলজির পনঢরপুরের মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ভীমা নদীর নামেই আমি ডাকি ওকে। নামটা ছোটকে ছোটও হয় আর ওরও ওর দেশের সন্ত এর কথা মনে পড়ে যায় প্রতি ডাকে।

তারপর বললেন, নিউটন না কে বলেছিলেন না ? জ্ঞান সমুদ্রের বালুকাবেলায় উপলখণ্ড কুড়োচ্ছি মাত্র, তেমনই আমিও ওই বালুবেলাতে বালুকণাই কুড়িয়েছি শুধু। হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীত এক সমুদ্র বিশেষ। দুঃখ হয়, যখন দেখি যে তোমাদের মতন ছেলেমানুষেরা যা কিছু ভারতীয়, যা কিছু শাশ্বত, সুন্দর তার সব কিছুকেই বর্জন করার মধ্যে একধরনের বাহাদুরি বোধ কর। বাখ, বীটোভেন, মোৎজার্টি, মেন্ডহেলসন বা স্ট্রস এর নাম উচ্চারণ করতে শ্রদ্ধাতে তোমাদের মাথা নুয়ে আসে অথচ সদারঙ্গ, বা তিয়াগারাজন বা শার্ঙ্গদেব বা হালফিলের বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, হাফিজ আলি খাঁ সাহেব, পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুর, বড়ে গোলাম আলি খাঁ, আমীর খাঁ সাহেব, বিসমিল্লা খাঁ সাহেবদের তোমরা ব্রাত্যজন বলে মনে কর। এতে আমরা যে আত্মবিস্মৃত জাত, পরের অনুকরণ করে আমরা যে নিজেদের বড়াই করি এই কথাই প্রমাণিত হয়।

সবাই করে না।

চারণ বলল।

না, তা করে না। খুব উচ্চবিত্ত মহলের কিছু মানুষে কদর করেন। তবে তাঁদের মধ্যেও কজন যে সত্যিই বোঝেন উচ্চাঙ্গসঙ্গীত মন্মথ ঘোষ বা নাটোরের মহারাজার মতন আর কজন 'বোদ্ধা'র ভেক ধরে মহার্ঘ্য শাল গায়ে জড়িয়ে মেহফিল-এ উপস্থিত হন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আর বোঝেন, সাধারণ মধ্যবিত্তরা, তোমাদের কলকাতার পাঁচুবাবুর মতন।

পাঁচুবাবু কে ?

আরে পাঁচুবাবুর নামও শোনোনি ? অমিয়নাথ সান্যাল। তাঁর লেখা বইও কি পড়োনি ? বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ যে সে বই ! আজকাল অবশ্য তোমাদের কলকাতার বাঙালিরা সবাই সাহেব হয়ে গেছে। মাথাতে জোরে টোকা মারলে শুকনো গোবর ঝরে পড়ে যাদের, তারাই প্রত্যেকে তেল সাবান বা খবরের কাগজ কোম্পানির কেউকেটা বা দালাল। সেই হস্তীমূর্খরা জিনস পরে, হাতে ঢাউস ইংরেজি পেপারব্যাক নিয়ে এরোপ্লেনের সিটে বসে সবজান্তা মনে করে নিজেদের।

অমিয়নাথ সান্যাল মশায়ের বইটির নাম কি ?

চারণ শুধোল।

'স্মৃতির অতলে'। সে বই যদি কোনও শিক্ষিত বাঙালি না পড়ে থাকেন, তবে তাঁকে আমি শিক্ষিত বলে আদৌ মানতে রাজি নই। অমন সেন্স অফ হিউমার, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের রথী-মহারথীদের নিয়ে, অমন জিন্দা-দিল, মন-মৌজী লেখা আর হয়েছে বলে তো আমি জানি না। নেহাৎ অমন বই ইংরেজিতে অনুবাদ করা যায় না তাই, নইলে পৃথিবীর সাহিত্যেও ওই বই প্রথম সারিতে স্থান পেত।

কাদের নিয়ে লেখা সে বই ?

কেন ফৈয়াজ খাঁ সাহেব, মৈজুদ্দিন মিঞা, কালে খাঁ সাহেব, বাঈজি গহরজান, মালকাজান, চুলবুল্লেওয়ালি আর আগ্রাবালি, আরও কত সব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদের নিয়ে লেখা সে বই। একটি বিশেষ যুগ, একটি বিশেষ সাঙ্গীতিক আবহ তাতে নিখুঁতভাবে ধরা আছে।

তাই ? তা অনুবাদ করা যায় না কেন ? ইংরেজিতে ?

যায় না, ওই সাঙ্গীতিক আবহ পুরোপুরিই ভারতীয় বলেই। একজন ভারতীয় ইংরেজি ফুটিয়ে কখনওই বাখ বিঠোভেন কপচিয়ে, কাফকা-কাম্যু-মার্কেজ আউড়ে কোনওদিনই একজন 'পশ্চিমী' হয়ে উঠতে পারে না। কখনওই না। তাছাড়া, সাদা চামড়ার মানুষেরা, কেউ তা হয়ে উঠতে গেলেও কোনওদিনও তাকে স্বীকারও করবে না। এই সরল সত্যটা তোমরা বুঝলে না বেটা। তাই তো এমন একটা দেশের আজ এই হাল। যে দেশের মানুষ নিজের ধর্ম, নিজের সংস্কৃতি, নিজের শিল্প-সঙ্গীত, সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণই অজ্ঞ, স্বেচ্ছায় অজ্ঞ, সেই দেশের ভবিষ্যৎ বলে কি কিছু থাকতে পারে ?

চারণ কথা ঘুরিয়ে বলল, 'স্মৃতির অতলে' বইটি আপনি কোন ভাষাতে পড়েছেন ? কোন কোন ভাষায় ওটি অনূদিত হয়েছে ?

অনূদিত কি কোন ভাষাতেই হয়েছে ? কোনও ভারতীয় ভাষাতেও হয়েছে বলে শুনিনি। তবে হিন্দিতে এবং উর্দূতে হওয়া যদিও অবশ্যই উচিত ছিল কিন্তু স্বাধীনতার পরে বাঙালিরই মতন বাংলাভাষারও তো কোনও মর্যাদা নেই আর। বাংলাদেশ যদি না থাকত তবে ভারতবর্ষ থেকে এতদিনে পশ্চিমবঙ্গের মাড়োয়ারি, গুজরাটি, বিহারি, সিন্ধির চাকর ট্যাঁশ-গরুর মতন ট্যাঁশ বাঙালিরা বোধহয় বিলোপই করে দিত এই ভাষাকে। বাংলা ভাষাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবিত্ত বাঙালিরাই।

আপনি এত জানলেন কি করে ? আপনি কি বাঙালি ?

সাময়িকভাবে আত্মবিস্মৃত ও উত্তেজিত ধিয়ানগিরি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপরই বললেন, পূর্বাশ্রমকি বারেমে কভভি কুছ পুছনা নেহি চাইয়ে কইভি সাধু-সন্তকো। ম্যায় ভারতীয় হুঁ। ইস মহান দেশ কি এক সাধারণ নাগরিক। ইসসে বাড়কে ঔর কুছভি পরিচয় হামারা হ্যায় নেহি বেটা। মগর ইয়ে বাত ভি সাহী, যো ম্যায় বাংলা ভাষা জানতা হুঁ, বাংলামে লিখা-হুয়া বহুতই কিতাব পড়ভি চুঁকে হুঁ।

চারণের মন বলছিল ধিয়ানগিরি মহারাজ নিশ্চয়ই বাঙালি। হয়তো বহুদিন যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে বাংলার সঙ্গে কিন্তু বাঙালি অবশ্যই।

তারপরই ধিয়ানগিরি কথা ঘুরিয়ে বললেন, দ্যাখো, হচ্ছিল গানের কথা, কোথায় চলে এলাম।

এমন সময় ভীমগিরি বললেন, জানেন তো চারণবাবু, গুরুজি একটি নতুন রাগ এর জন্ম দিয়েছেন।

হেসে উঠলেন, ধিয়ানগিরি জোরে।

বললেন, এমন করে বলছে ভীমা যেন আমি চারপাঅলা শিশুই প্রসব করেছি। নতুন রাগ জন্ম দেওয়া কঠিন আর কী। সব উস্তাদ, সব পণ্ডিতই তো আজকাল মূল রাগ এর এদিক ওদিক করে নতুন রাগ এর নামকরণ করছেন। তবে এই স্বাধীনতা শেষপর্যন্ত আমাদের রাগ-সঙ্গীতকে কোথায় নিয়ে যাবে তা অবশ্য আমি জানি না। খোদার উপর খোদকারী করার যোগ্যতা কি সকলের থাকে ?

আপনি যে নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন ? নাম কি ?

আরে 'সৃষ্টি' বলে আমাকে উপহাস কোরো না বেটা। সৃষ্টি করতে একজনই পারেন, যিনি সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা।

তবু বলুন।

কোনও রাগ আমি আদৌ সৃষ্টি করিনি। আমার ভীমা ভীম-মূর্খ বলে 'ধ্যানধৈবত' রাগকে, আমার নাম যেহেতু ধিয়ানগিরি তাই আমারই সৃষ্ট বলে মনে করে নিয়েছে। ধ্যানধৈবত জয়ত রাগের মতন। ধা বাদী, রা সম্বাদী। উত্তরাঙ্গে দেশ রাগের মতন লাগে কিন্তু স লাগে কোমল। এর জাতি ঔরব মা, না বর্জিত। গাইবার সময় দ্বিতীয় প্রহর।

চারণ জিগ্যেস করল আরোহণটা কেমন ধ্যানধৈবতের ?

আরোহণ, সা, স গা, পা, ধা, র্সা। আর অবরোহণ, র্সা ধা পা গা ঋ সা।

বাঃ।

চারণ স্বগতোক্তি করল ধিয়ানগিরি মহারাজের সংগীত সম্বন্ধে জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে।

তারপর স্বগতোক্তির মতো বললেন ধিয়ানগিরি, সব রাগের সঙ্গেই সব রাগের অল্পবিস্তর মিল আছে, কিছু রাগ ছাড়া। যেমন ধরো বেহাগ রাগে শংকরার ছায়া আছে। ভূপালি রাগে যদি কেউ দ্রুত খেয়াল গান করেন তবে গায়ক-গায়িকা সাবধানী না হলেই তা দেশকার হয়ে যেতে পারে। তারপরই স্বগতোক্তির মতো স্মৃতিচারণ করে বললেন, আমার মা গাইতেন যোগ রাগে দ্রুত খেয়াল, 'সজ্‌ন মোরে ঘর আও।' আহা! গান্ধার দুটি যেন পাশাপাশি দুটি গন্ধরাজ ফুলের মতো ফুটে উঠত। মায়ের গান শুনে কিশোর আমিও 'সজনু মোরে ঘর আও' নিজের গলাতে তোলার চেষ্টা করতাম।

মা হেসে বলতেন, ওরে পাগলা ছেলে! তিলং হয়ে যাচ্ছে যে রে।

বলেই, হেসে উঠলেন। তাঁর মুখ স্মৃতিমেদুর হয়ে উঠল।

তারপরে একটু থেমে যেন অন্য কোনও দেশে চলে গিয়ে বললেন, কোনও ঘনঘোর শ্রাবণ সন্ধ্যাতে আমার মা গাইতেন সুরদাসী মল্লারে 'গরজত আয়ী বরখা'। কী যে দাপটে 'আ' শব্দটির উপরে সোম দেখাতেন তা আজও ভেবে শিহরিত হই।

মা আছেন?

জানি না। এসব প্রশ্ন কোরো না বাবা। আমার শুধু আমি আছি। প্রেজেন্ট টেন্স এর কারবারি আমি। না অতীত আছে আমার না ভবিষ্যৎ। কিছুদিন পরে যদি আবারও এখানে আসো তো দেখবে আমারও দেহান্ত হয়ে গেছে, আজ যেমন বিনসারের সাধুর হল। দেহান্ত অবশ্যই হবে কিন্তু তোমার স্মৃতিতে এই ভীমগিরি, এই ত্রিবেণী ঘাট এমন কি আমিও থাকব অনন্ত কাল। তুমি এখানে শুধুই বেড়াতে আসনি বেটা, যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষে প্রতি মাসে প্রতি বছরে ভেড়চাল এর মতো এখানে বুড়ি ছুঁয়ে যায়। তুমি ভেড়চাল এর মানুষ নও।

'ভেড়চাল' মানে কি?

'ভেড়চাল' মানে জানো না? গড্ডালিকা মানে জানো তো? হিন্দিতে গড্ডলিকাকেই আমরা 'ভেড়চাল' বলে থাকি।

চারণের বুকের মধ্যে এক ধুকপুকানি শুরু হল। ধিয়ানগিরি মহারাজ তাঁকে যে অসাধারণত্বে ভূষিত করেছেন, তার পেছনে কি তাঁর কোনও উদ্দেশ্যসাধনের মতলব আছে?

ধিয়ানগিরি বললেন, থাকো কদিন। ভীমার ছায়া হয়ে থাকো। তোমার মনের এবং হয়তো শরীরেরও, সব কলুষই ধীরে ধীরে মুছে যাবে। তখন তোমার মন শরতের আকাশের মতো নির্মল হয়ে উঠবে। পরতের পর পরত সন্দেহ, অবিশ্বাস, দ্বিধা যাই জমেছে, তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে নির্মেঘ আকাশের মতো হবে তোমার মন। তখন আর কারওকেই মিছিমিছি সন্দেহ করবে না। তোমার দৃষ্টি স্বচ্ছ হবে। দেখো।

চারণ লজ্জিত এবং অবাক হয়ে বলল, আপনাকে আমি কিন্তু সন্দেহ করিনি।

তোমার বুকের ভেতরটা পর্যন্ত যে আমি দেখতে পাচ্ছি বেটা। এতে দোষের তো কিছু নেই। কলুষ আর সন্দেহমুক্ত হবার জন্যেই না তুমি তোমার সব প্রাপ্তিকে ধুলো মনে করে এমন করে বেরিয়ে আসতে পেরেছ! নিজেকেও ধুলো মনে করতে হবে। ধুলো, নগণ্য, আত্মগরিমারহিত, ঘামণ্ডশূন্য।

পারব?

চারণের মধ্যে থেকে এক অপরিচিত, অসহায় চারণ যেন বলে উঠল।

অবশ্যই পারবে বেটা। ভীমসেন যোশীজির গলাতে সেই ভজনটি শুনেছ কি কখনও? 'যো ভজে হরিকো সদা'।

গত শীতেও তো শুনেছি মহাজাতি সদনে।

শহরের বদ্ধ হলটল-এ নয়, এখানে শুনবে, এইরকম মুক্ত জায়গাতে। গান-বাজনা সবসময়ই প্রকৃতির মধ্যে এসে শুনবে। যা কিছুই প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত তার সবকিছুই প্রকৃতির কোলেই সবচেয়ে

বেশি প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়। এতে কোনওই ভুল নেই।

চারণ চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। কেন জানে না, ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ও কি একজন ইললিটারেট, সুপারস্টিটাস, ইডিয়ট হয়ে গেল? ওর শিক্ষা-দীক্ষা কি সব গোল্লায় গেল? এঁরা কি গুণ করলেন চারণকে? বাণ মারলেন কি কেউ?

ধিয়ানগিরি বললেন, যা এতদিন শিখেছ, যে শিক্ষা নিয়ে তোমার গুমোর, তা শেখা নয় বেটা। সবকিছুই নতুন করে শিখতে হবে। এ এক অন্য ভাষা, অন্য পাঠ। এই যে ভাষার কথা বলছি, তা শব্দহীন। অগণ্য অক্ষর নেই এ ভাষাতে। বর্ণপরিচয়ের প্রয়োজন নেই। স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, ভাওয়েল, কনসোনেন্ট, এসব কিছুই নেই বেটা। সমস্ত শব্দর যোগফল এখানে শুধুই এক পরম নৈঃশব্দ্য। নৈঃশব্দ্যই সবচেয়ে বেশি শব্দময়, সবচেয়ে বেশি অর্থবাহী। যেদিন এই পর্বতমালার বা নদীর বা গহন অরণ্যের বাঙ্ময় নৈঃশব্দ্যকে বুঝতে পারবে, পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ককে, সেদিন থেকে তুমি এই নতুন পাঠশালার পোড়ো হবে। তুমি পোড়ো, আর প্রকৃতি মাস্টের। আমি কি ভীমা, আমরা সকলেই সেই পাঠশালারই পোড়ো। প্রত্যেকেই পোড়ো। আমরা কেউই তোমার মাস্টের নই হে বাবুসাহেব।

তারপর বললেন, তোমার আধারটি ভাল তা তোমাকে প্রথমবার দেখেই বুঝেছিলাম এবং সে কথা বলেওছিলাম ভীমাকে। যদি ঐকান্তিকভাবে সর্বমনপ্রাণ দিয়ে যা খুঁজতে এসেছ, তা খোঁজ, তবে তাকে পাবে বইকী! ভীমা বা আমিও এখনও পাইনি। কিন্তু এই খোঁজ এক দারুণ খোঁজ। প্রাপ্তি নাই বা যদি ঘটেও এই খোঁজে যে সামিল হতে পেরেছিলে এই কথা বুঝলেই জানবে যে, মানবজনম সার্থক হল।

চারণ অভিভূতের মতো বসে ছিল। তার শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন কোনও অদৃশ্য বিদ্যুত্তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছিল। সে স্থির হয়ে বসেছিল। ধিয়ানগিরির দিকে চেয়েছিল পলকহীন চোখে।

ভীমগিরি, ধিয়ানগিরিকে গাঁজা সেজে দিলেন। কলকেটা ধরে উঠলে তিনি প্রচণ্ড জোর এক টান দিয়ে ধুঁয়োটা ধরে রাখলেন কিছুক্ষণ।

হিমেল হাওয়াতে মহীরুহর নীচের রামমন্দিরের চাতালে বসে চারণের ঘুম ঘুম পাচ্ছিল যেন। ভীমগিরি গাঁজা-ভরা বিড়ি এগিয়ে দিলেন একটি।

ধিয়ানগিরিকে বলল চারণ, আপনি একটিও গান শোনাবেন না?

আমার গান গাওয়ার সময় এখনও হয়নি বেটা। রাত গভীর যখন হবে, নদীর জলের শব্দ আর হাওয়ার শব্দর obligato-র পটভূমিতে আমি গান শোনাব তাঁকে, যাঁকে আমার জীবন নিবেদিত করেছি।

বলেই, ব্যোমশঙ্কর ধ্বনি তুলে এমনই এক টান লাগালেন কলকেতে যে, চারণের মনে হল কলকেটা ফেটেই যাবে বুঝি।

ধিয়ানগিরি মহারাজ বললেন, না, আমার গান আজ থাক। বরং তুমিই একটি শোনাও।

চারণ বলল, আমি যে গায়ক নই। কিন্তু ভালবাসি গান।

ধিয়ানগিরি হেসে বসলেন, মেলাই মস্ত মস্ত গায়ক বাদক তোমাকে দেখাতে পারি, বিশ্বজোড়া তাঁদের নাম, কিন্তু তাঁরা গান ভালবাসেন না শুধু নিজেদেরই ভালবাসেন, নিজেদের অর্থ, মান, যশকেই ভালবাসেন শুধু। গান-ভালবাসা গায়কদেরই দরকার আমার। গাও, গাও।

চারণ বলল, সেও তো ওই আধখানাই। সব গানই আমি আধখানা করেই জানি। এই গানটিও আলমোড়ার সেই অন্ধ গায়ক সজ্জনবাবুরই মুখে শোনা। এর শুধু এক লাইনই মনে আছে।

গাও না বেটা, গাও। আমার প্রাণ আজ গান শুইতে চাইছে।

চারণ ধরে দিল,

'বসসো মোরে নায়নানোমে নন্দলালা'।

ভজনটির ওইটুকু গেয়েই থেমে গেল। সত্যিই তার আর মনে ছিল না। একটি পংক্তিই ছিল মনে। আস্থাই এরই পুরোটা মনে ছিল না, তার অন্তরা!

প্রসন্ন কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল ধিয়ানগিরি মহারাজের মুখে। বললেন, ল্যাগতা হ্যায় কি আজ প্রভুজি কি কৃপাসে সবকুছই পুরা হো যায়েগা, কম্মী না পড়েগী কোঈ চিজকি !

বলেই, তিনি ধরে দিলেন,

'বসসো মেরে নায়নানোমে নন্দলাল
সুমরি সুরত মাধুরী মুরত
নয়না বনে বিশাল
বসসো মেরে নায়নানোমে নন্দলাল।'

পাশে-বসা ভীমগিরি বাচ্চা ছেলের মতন আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

ভীমগিরির হাততালি থামলে ধিয়ানগিরি বললেন, তুমি কি হিন্দিগান মাত্রই এমন আধা-ছেঁড়া জানো ? তাহলে বাংলা গানই শোনাও না কেন আস্ত একখানা। নিটোল। এখানে হিন্দি গানই তো গাওয়া হয়, বাংলা গান আর শুনতে পাই কোথায় ?

একেবারেই পান না কি ?

একেবারেই পাই না বললে মিথ্যে হবে। কিন্তু তার বেশিই কলকাতা থেকে দলবেঁধে আসা হরি-মটর-ভাজা 'হরে-গড়ে-একদর' ট্যুরিস্টদের গাওয়া কিছু চটুল গান নয়তো আধখানা বা সিকিখানা সুর-লাগা রামপ্রসাদী বা কীর্তন কোনও সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর মুখে। তারপর বললেন, আসলে ব্যাপারটা কি জানো বেটা, গানে যদি সুরই না লাগে, প্রতিটি স্বর যদি সুরে ভরপুরই না থাকে তবে আজকাল আমার এ দুটি কান গান আর শুনতে পারে না। এ দুটি কান অনেকই অত্যাচার সয়েছে অদ্যাবধি গানের নামে। এখন অসহ্য বলেই মনে হয়। দেখি, সুর যদি বা লাগেও তবেও পুরো সুর লাগে না অধিকাংশ গায়কেরই গলায়। অথচ শুনতে পাই যে, ক্যাসেটের আর সিডি-র বন্যাতে দেশ ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে নাকি !

আপনি ক্যাসেট এবং সি ডি-র খবর রেখেও বৈরাগ্য বজায় রাখেন কি করে ? আমাদেরই তো পাগল হবার অবস্থা।

খবর সবকিছুরই রাখতে হয়। যত Distraction হয় ততই Concentration বাড়ে।

তা নয়, এসব খবর পান কোথা থেকে আপনি।

আমি নিজে অনড় হতে পারি কিন্তু আমার চারধারে সবকিছুই নড়ে। সারা দেশ তো বটেই, পৃথিবীটাই আসে আমার কাছে, আস্ত পৃথিবী। টিয়াপাখির মতন ঠোঁটে বয়ে সব খবর নিয়ে আসে কত দূত।

বাঃ !

চারণ বলল।

ধিয়ানগিরি মহারাজ বললেন, আমরা আমাদের সময়ে কথাটাকে জানতাম 'গান বাজনা' বলে। এখন দেখি, তা হয়ে গেছে বাজনা-গান। বাজনার দাপটে গান মরে ভূত। আগেকার দিনের প্রত্যেক সঙ্গতীয়াদেরই পরিমিতি বোধ ছিল। তাঁদের কোনওরকম হীনম্মন্যতাতেও ভুগতে দেখিনি। তাঁরা যে গায়কদের চেয়ে কোনও অংশে ছোট এমন কথা তাঁরা আদৌ মনে করতেন না। মনে করার কথাও ছিল না কোনওই। এবং করতেন না বলেই কণ্ঠসংগীত শিল্পীর পুরো মর্যাদা দিয়েই সঙ্গত করতেন তাঁরা প্রত্যেকেই।

পরক্ষণেই স্বগতোক্তির মতন বললেন, আভভি আইস্তা আইস্তা সান্নাটা হো যায়েগা গঙ্গাকি তীর। ঠাণ্ডা বাড় রহি হ্যায় না ! গানা গানেমে আর শুননেমে অব মজা আয়েগা। বহতে-হুয়ে নদীকি আওয়াজ তুমহারা তানপুরাকি কাম করে গা। উস সুরসে গল্লে মিলাকে গাহতে গাহতে তুম-বিলকুল মস্ত হো যায়েগা।

ভীমগিরি, ধিয়ানগিরি মহারাজকে আজ বক্তৃতাতে পেয়েছে দেখে তাড়াতাড়ি বললেন, লিজিয়ে গুরুজি, অব উনোনে শুরু কিজিয়েগা।

তারপর তার দিকে ফিরে বলল, অব গানা শুরু কিজিয়ে চারণবাবু।

ভীমগিরি এই বেশি কথা বলা গুরুজিকে ভয় পায়। ভীমগিরি ভাবছিলেন, কথা, গুরুজি অত্যন্তই কম বলেন। শিষ্য-শিষ্যাদেরও নির্বাক থাকতে বলেন। অন্যকে নৈঃশব্দ্যর মাহাত্ম্য বোঝান। কিন্তু কালে-ভদ্রে, গঞ্জিকার মাত্রা বেশি হয়ে গেলে তাঁকে কথাতে পায়। কথা অবশ্য গুরুজি বলেন চমৎকার। ভীমগিরির যদি একটি টেপ-রেকর্ডার থাকত, তার ক্যাসেট কেনার পয়সা থাকত, তবে এরকম সময়ে গুরুজির মুখনিঃসৃত ঝরনার মতন স্বচ্ছতোয়া সব কথাকে তিনি ক্যাসেট-বন্দি করে রাখতেন।

কিন্তু ক্যাসেট কিংবা টেপ-রেকর্ডার, সে-সবও তো বন্ধনই।

হাঁ বেটা। তুমি যো শোচ রহা হ্যায় উও বাত সাহী হ্যায়।

চারণের রাগ হয়ে গেল হঠাৎ ধিয়ানগিরি ভীমগিরিদের উপরে।

সবতেই অত মনস্তত্ত্বর কি আছে? সাইকো-অ্যানালিস্টদের কাছে চিকিৎসা করাবার জন্যেও আসেনি এখানে যে কথায় কথায় এরা সে কি ভাবছে না ভাবছে তা বুঝে ফেলে তাকে চমকে দিচ্ছেন। এও কী একরকমের বুজরুগী নাকি? যত্ত সব ফোর-টোয়েন্টির দল!

ধিয়ানগিরি মহারাজ ম্যান্ডোলিনটিকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, কোন স্কেল-এ বাঁধব বল এবারে? পুরো গান শোনাবে তো বাবা?

চারণ বলল, ভারী গায়ক আমি! ফটাস করে ধরে দেব। আমি কোন স্কেল বুঝে নিয়ে সুর দেবেন। শ্রুতিতেও ধরে ফেলতে পারি। তখন দু-স্কেলের মাঝে পড়ে আপনাকে আঁকুপাঁকু করতে হতে পারে।

মৃদু হাসি হাসতে হাসতে ধিয়ানগিরি মহারাজ বললেন, দেখেগা। যো হোগা সো হোগা। তুম ডরাও মত মুঝে। অব শুরু তো করো। সি মে বান্ধা হুয়া হ্যায়।

চারণ ছোটমামার কাছে শেখা সেই ব্রহ্ম সঙ্গীতটি ধরে দিল।

ছোটমামা বলতেন, নিমাইচরণ মিত্রর লেখা নাকি ঐ গানটি।

> 'কেন ভোলো মনে করো তাঁরে
> যে সৃজন পালন করেন এ সংসারে।
> সর্বত্র আছে গমন অথচ নাহি চরণ
> কর নাহি করে গ্রহণ
> নয়ন বিনা সকল হেরে।
> অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর দ্বিতীয় নাহিকো আর
> কে পারে বর্ণিতে তাঁরে।'

আস্তাই এবং অন্তরাটিও দুবার করে গাইল ও, যেমন করে ছোটমামা শিখিয়েছিলেন। গান যখন মাঝামাঝি পৌঁছেছে তখন ধিয়ানগিরি মহারাজ বাজনা থামিয়ে দিলেন। চারণের মনে হল, তাঁর যেন সমাধি হল। অবশ্য তা ওর গানের গুণে নয়, গঞ্জিকারই গুণে হয়েছে বলে মনে হল ওর।

তার নিজের ভাবনার জাল ছিন্ন করে ধিয়ানগিরি মহারাজ যেন অনেক দূর থেকে বললেন, তুম বহত দূর চলকে আ গ্যায়ে বেটে একেলে একেলে। রাস্তে যো বাকি হ্যায়, উওভি পার হো যায়েগা একেলেই। তুমহারা কোঈ গুরুকি জরুরৎ নহী হ্যায়।

চারণ বুঝল যে, অস্ট্রিয়ান শিষ্যরা গাঁজার কলকেতে ভরে নির্ঘাৎ হাশিস খাইয়ে গেছে আজ ধিয়ানগিরি মহারাজকে। ভীমগিরি মহারাজের দেওয়া গঞ্জিকা বিড়িও সম্ভবত ক্রিয়া করতে শুরু করেছিল চারণেরও ভেতরে ভেতরে। নইলে এমন সব গোলমেলে কাণ্ড ঘটে কি করে!

তারপরেই সভাস্থলে শ্মশানের নীরবতা নেমে এল। ঘাটের শব্দ কমে এসেছে। নদীর শব্দ জোর হয়েছে। তবু ওরা সকলেই নীরব। রামমন্দিরে ভজন পূজন থেমে গেছে। দোকানপাটেও তীর্থযাত্রীরা আর নেই। সামান্য সংখ্যক স্থানীয় মানুষেরাই আছেন শুধু।

নীরবতা ভেঙে ধিয়ানগিরি মহারাজ বললেন, এই গানটি বাংলাতে ভেঙেছেন উনি।

কে ?

চারণ শুধোল।

যাঁর নাম বললে একটু আগে।

ও। নিমাইচরণ মিত্র মশায় ?

হ্যাঁ।

মূল গানটি কি ? চারণ শুধোল।

মূল গান নেই। এটি উপনিষদের একটি শ্লোক।

তাই ?

অবাক হয়ে বলল চারণ।

হ্যাঁ বেটা।

কোন উপনিষদ ? শুনেছি আমাদের অনেক উপনিষদ আর বেদ আছে। আর শ্লোকটা কি আপনি জানেন ?

জানি বইকি। নইলে বললাম কি করে যে শ্লোকটা ভাঙা হয়েছে।

ভাঙা কি অন্যায় ?

কে বলে অন্যায় ? রবীন্দ্রসংগীতে কত অগণ্য ভাঙা-গান আছে না ?

তা আছে।

শ্লোকটি কি বলবেন ? যদি জানেন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-এ আছে এই শ্লোকটি।

'অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যতাচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরত্যং পুরুষং মহান্তম।'

তৃতীয়পর্বের উনিশ নম্বর শ্লোক।

এর মানে কি হল ?

মারাঠি ভীমগিরি মহারাজ শুধোলেন।

ধিয়ানগিরি বললেন, 'যিনি হস্তবিহীন হইয়াও গ্রহণ করিতে পারেন, পাদহীন হইয়াও বেগে গমন করিতে পারেন, চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন করিতে পারেন, কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণ করিতে পারেন, তিনি সকলেরই জ্ঞাতা, কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না। জ্ঞানীগণ তাঁহাকেই আদি পুরুষ বলিয়া জানেন।'

বাক্যটা শেষ করার আগেই ধিয়ানগিরি চারণের পেছন দিকে চোখ তুলে কাকে যেন দেখতে পেলেন। স্মিতহাস্যে বললেন, এতদিনে সময় হল তোর ?

চারণ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, হৃষীকেশ পৌঁছনোর পর সেই প্রথম রাতে ত্রিবেণী ঘাটে এসে যে কৃষ্ণা মেয়েটিকে দেখেছিল, ভীমগিরি যার নাম বলেছিলেন, মাদ্রী, সেই মেয়েটি।

আজ তার পরনে একটি ছাইরঙা শাড়ি। চুলে সাদা ফুল। কোনও পাহাড়ি জংলী ফুল। শহরে চর্চিত ফুল নয় কোনও।

মাদ্রী কাছে এসে দাঁড়াল। তার শরীরে যেন ফুল এবং ধূপ-ধুনোর গন্ধ। শরীরে, না পোশাকে বুঝতে পারল না চারণ। চারণ তার পরিচিত যে সব নারীর কাছাকাছি গেছে তাদের শরীর থেকে চড়া ও হাল্কা বিদিশী পারফ্যুমেরই গন্ধ উড়েছে। সেই সব গন্ধ যে বিজাতীয় গন্ধ, তা মাদ্রী তার খুব কাছে এসে না দাঁড়ালে ও জানতেই পারত না।

মাদ্রী বলল, যা গেল না কটা দিন ! উঃ !

কেন ?

জ্ঞানানন্দজী মহারাজ তো পাড়ি দিয়েছিলেন একটু হলে।

হয়েছিল কি তাঁর।

কী হয়নি তাই বলুন।

আমার তো মনে হয় জ্ঞানানন্দ ভাইয়ার তোর নরম হাতের সেবা খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল, তাই অসুখের ভান করে ছিল। নইলে সন্ন্যাসীর আবার মৃত্যুভয় কিসের জন্যে ?

ওঁর মৃত্যুভয় হতে যাবে কিসের জন্যে ? ভয় তো আমাদের।

তোদের কিসের ভয় ?

বাঃ ওঁকে হারানোর। আপনার কাল দেহান্ত হয়ে গেলে কি আমরা সবাই খুশি হব ?

তা তোরাই জানিস।

গুরুজি, আপনি পথের মানুষের মন পড়তে পারেন আর আমার মনের কথা জানেন না। এও কি বিশ্বাস করার ?

ওসব কথা থাক।

তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ওঁর নাম চারণ চ্যাটার্জি। ইসস বেটি। একটু আগে যদি আসতিস তবে এমনই গান শুনতে পেতিস যে তোর চোখ দিয়ে জল ঝরত। ইনিও অবশ্যই একজন সাধক।

চারণ লজ্জা পেয়ে প্রতিবাদ করে উঠল।

ধিয়ানগিরি বললেন, মাদ্রী নিজে সন্ন্যাসিনী। সাধক শব্দটির মানে ও জানে। তোমার বিচলিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই বেটা। আমি তো সন্ত বলিনি তোমাকে, সাধকই বলেছি। ভুল বলিনি কোনও। প্রথমত, সাধনা না থাকলে অমন গান তুমি গাইতে পারতে না। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর-বোধ যাঁর মধ্যে নেই তাঁর পক্ষে ঐ ঈশ্বর-ভজনার গানে অমন দরদ থাকতেই পারত না।

ঈশ্বর-বোধ বলতে আপনি কি বোঝেন ?

মাদ্রী চারণকে বলল, আপনিও পালাচ্ছেন না, গুরুজিও পালাচ্ছেন না। দিওয়ালির রাতে সারারাত গুরুজি এবং ভীমগিরি ভাই আমার কাছে আসবেন ও থাকবেন। আপনারও নেমন্তন্ন রইল। সেই রাতে রাতভর এই সব আলোচনা ও গানও হবে। এখন আমাকে একখানি গান শোনাতেই হবে। কোনও কথা শুনছি না।

চারণ বলল, বিশ্বাস করুন। একখানাই মাত্র জানি আমি।

সাহী বাত।

ভীমগিরি বললেন।

ধিয়ানগিরি হেসে বললেন, পুরো গান একখানি নয়, আধা বা সিকি গান অনেক। তাই না ?

মাদ্রীকে বললেন, চারণবাবু এইমাত্র আমাদের এমন ভাল গান শোনালেন আর তুই আমাদের মান রাখতে একটি গানও শুনাবি না ওঁকে।

মাদ্রী বলল, চা খেতে হবে। এই তো নদীতে চান করে, জ্ঞানানন্দজি মহারাজের নামে প্রদীপ ভাসিয়ে এলাম।

চারণ অবাক হয়ে বলল, এই ঠাণ্ডাতে ?

ঠাণ্ডা কোথায় ? আপনি গঙ্গা নাহান না। রোজ ?

নাঃ।

আরে ! এদিকে তীর্থ করতে এসেছেন।

আমি তীর্থ করতে আসিনি।

তবে ? কী করতে এসেছেন আপনি ?

এখনও জানি না।

অজীব আদমি আপনি।

বলেই, বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে তার চিবুক ছুঁল মাদ্রী।

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

ভীমগিরি বললেন, জ্ঞানানন্দজির আরোগ্য কামনাতে রোজই তাড়-পাতার দোনাতে ফুল আর প্রদীপ ভাসাচ্ছিস। আমার জন্যেও হয়তো ভাসাবি। তবে তা দেহান্ত হয়ে গেলে ভাসাবি এই যা।

মাদ্রী বলল, আপনার শরীরে তো কোনওই অসুখ নেই ভাইয়া। আপনার সব অসুখ তো মনেরই। নদীতে প্রদীপ ভাসালে কি সন্ন্যাসীর মনের অসুখ সারবে ? আপনি বরং পূর্বাশ্রমে ফিরে গিয়ে একটি ডবকা মেয়ে দেখে বিয়ে করুন। ঈশ্বর-সাধনা আপনার জন্যে নয় ভাইয়া।

ধিয়ানগিরি মহারাজ জোরে হেসে উঠে বললেন, কেন ? নয় কেন ? ও তো ঈশ্বরীরই সাধনা করছে।

ছেঃ ! ছেঃ ! করে উঠলেন ভীমগিরি।

চারণের তার এক মক্কেলের মারাঠি অ্যাকাউন্ট্যান্টের কথা মনে পড়ে গেল। বিরক্তি প্রকাশ করতে মারাঠিরা 'ছিঃ'ও বলে না, 'ছোঃ'ও বলে না। বলে 'ছেঃ'। ভীমগিরি আগে যদি নাও বলতেন ওঁকে, তবু এই 'ছেঃ' শুনেই সে বুঝতে পারত যে, তিনি মারাঠি।

মাদ্রী বলল, আর পূর্বাশ্রমে ফিরে যেতে না চাও তো কোনও ভোগবাদী-নিবৃত্তিবাদীদের আশ্রমে চলে যাও। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আগে করো, তারপরেই ঈশ্বর-ভজনা।

ধিয়ানগিরি বিরক্ত হলেন।

বললেন, মাদ্রী তুমি রসিকতা করছ, কর, কিন্তু ভীমাকে আহত করাটা তোমার আদৌ উচিত নয়। তুমি ভাল করেই জানো ওর ভালবাসাটা কত পবিত্র। কোথায় তুমি কৃতজ্ঞ থাকবে, না সদ্য-পরিচিত চারণবাবুর সামনে যা নয় তা বলে দিলে।

ভীমগিরি মুখ-বিকৃতি করে আরেকটা টিপিক্যাল মারাঠি অভিব্যক্তি করলেন নস্যাৎ করার। ভাবখানা, 'পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।'

মাদ্রী ঝিরঝির করে হেসে উঠল।

ভীমগিরি বললেন, তোমার হাসিটা ইউওল নদীর চলার শব্দর মতন।

তাই ? বাবাঃ। আজকাল কবিতাও লিখছ না কি তুমি ভাইয়া ?

তারপরই বলল, তা ভাল। এক গোছা বরং লিখে রাখ। দিওয়ালির রাতে চন্দ্রবদনী আসছে আমার কাছে, কাজে লাগবে।

চমকে উঠল চারণ।

কুঞ্জাপুরীর কুঁবারসিংজির মুখে একটি পর্বতশৃঙ্গর নাম চন্দ্রবদনী শুনেই ভেবেছিল, কখনও পাগলের মতন প্রেমে যদি পড়তেই হয় তবে ওইরকম কোনও নামের মেয়ের সঙ্গে পড়বে। মাদ্রীর মুখে ঐ নামের কোনও রক্তমাংসর মেয়ের কথা শুনেই বুকের রক্ত তোলপাড় করতে লাগল চারণের।

ওর মন বলল, সন্ন্যাসী হওয়া বোধহয় আর হল না এ জন্মে।

তারপরেই ভাবল, চন্দ্রবদনীর নামের সঙ্গে চেহারার এবং ব্যক্তিত্বর যদি কোনও মিল না থাকে সেই মেয়ের ? তবে বড়ই আশাভঙ্গ হবে।

ভীমগিরি শুধোলেন, কোথায় আছে এখন ? চন্দ্রবদনী ?

রুদ্রপ্রয়াগে ওদের বাড়িতে। আবার কোথায় ?

রুদ্রপ্রয়াগ !

সেই নাম শুনেও আরেকবার চমকাল চারণ। কোথায় জিম করবেট-এর মানুষখেকো চিতার রুদ্রপ্রয়াগ আর কোথায় রুদ্রপ্রয়াগের চন্দ্রবদনী !

ধিয়ানগিরি বললেন, এবারে পরিষ্কার বাংলাতে, গাও বেটি। কলকাতার চারণবাবু না হয় তোকে শোনাবেন আরও গান। পরে। তুইও শোনা ওঁকে একটা। চন্দ্রবদনীর কাছ থেকে তো কম রবীন্দ্রসংগীত শিখিস নি !

উনি কি বাঙালি ?

চারণ জিজ্ঞেস করল।

কে ? আমি ? হুঁ।

মাদ্রী বলল।

আর ঐ উনি ?

কে উনি ?

কুণ্ঠাভরা লজ্জাতে চন্দ্রবদনী নামটা উচ্চারণই করতে পারছিল না চারণ।

নিজেই ওর এই ছেলেমানুষিতে অবাক হল।

চন্দ্রবদনীর কথা বলছেন ? হ্যাঁ ও-ও বাঙালি। তবে পুরো নয়।

সব গোলমাল হয়ে গেল চারণের। রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতা, ত্রিবেণী ঘাটের মাদ্রী, বাঙালি ধিয়ানগিরি মহারাজ, বাঙালি চন্দ্রবদনী এবং তার উপরে রবীন্দ্রসংগীত। রবীন্দ্রনাথ মংপু অবধি ঠিকঠাকই ছিলেন। কিন্তু রুদ্রপ্রয়াগে ? নাঃ। ভাবাই যায় না।

মাদ্রী বলল, এবারে দিওয়ালি তো সিনিবালী।

হুঁ। ভীমগিরি মহারাজ বললেন।

আর কদিন আছে যেন ?

নেইই বলতে গেলে।

ধিয়ানগিরি মহারাজ বললেন।

ধিয়ানগিরি মহারাজ বললেন, গা মাদ্রী, একটা অন্তত গান শুনিয়ে দে বেটি।

চন্দ্রবদনীই তো আসছে। গানই যদি শুনবেন তাহলে একেবারে ওঁর গলাতেই শুনবেন। আবার আমি কেন ?

অত বাহানা আমার পছন্দের নয়। গুরুর আদেশ। গাও একখানা গান।

ভীমগিরি একটু বিরক্তির গলাতে বললেন।

মাদ্রী চাতালের উপরে উঠে ধিয়ানগিরি মহারাজের পায়ের কাছে আসন পিঁড়ি হয়ে বসল। বুকের আঁচল টেনে। ভেজা সুগন্ধি চুল ছড়িয়ে, চারণের দিকে পাশ ফিরে। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল নদী থেকে।

ঠাণ্ডা এখন রোজই বাড়ছে। দিওয়ালির পর থেকেই পুরোপুরি জাঁকিয়ে পড়বে।

ভীমগিরি বললেন।

ঋজু হয়ে বসে, যেন শবাসনেই বসেছে, এমন করে, নাভি থেকে নাদ বের করে মাদ্রী গান ধরল। গলাটা একটু খসখসে কিন্তু সুরেলা। সুরের একটুও খামতি নেই।

'বহুর বজাও বংশী।
কাহ্নুর রচক হাঁ হাঁ।
তেরী মুরলী মন মোহ লিয়ো হৈ।
মধুর বাজত যমুনা-তট হাঁ হাঁ॥
তান শুনত শুধ বুধ সব গয়ে
মনমে লাগত বড় চমক হাঁ হাঁ।
ভানু অরা সলিল জোর উজান বহে
সারি শুক মৌর ভুল গায়ে গাবন। ঠমক হাঁ। হাঁ।'

গানের রেশ-এ ভরপুর হয়ে রইল ও। তারপরে স্বগতোক্তি করল চারণ।

বাঃ।

আমার গান আপনার ভাল লেগেছে ?

ভালই লাগেনি শুধু, রীতিমতন আবিষ্ট করেছে। এখনও কথা বলার মতন সময় আসেনি। বললে, গানের রেশ কেটে যাবে।

হায় ! হায় ! আমার গানেই যদি বলেন বাঃ ! তবে তো চন্দ্রবদনীর গান শুনে আপনি বলবেন বাঃ ! বাঃ ! অনবরতই বাঃ !

তাই ?

হ্যাঁ ।

তারপরই চারণ বলল, গানটা যেন ভারী চেনা-চেনা ঠেকল । অথচ কেন যে, তা বুঝে উঠতে পারছি না ।

ধিয়ানগিরি মহারাজ মিটি মিটি হাসছিলেন ।

বললেন, পূরবীতে বাঁধা বলেই কি ?

চারণ বলল, না তা নয় । পূরবীতে বাঁধা গান তো হাজার গায়ক-গায়িকার গলাতে হাজারবার শুনেছি । কোথায় যে মিল সেটা ঠিক ধরতে পারছি না । কিন্তু মিল অবশ্যই আছে ।

ধিয়ানগিরি এবারে হেসে বললেন, এই গানখানিই ভেঙে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য বাণী দিয়ে মুড়ে এই গানকে বাঙালির একেবারে নিজস্ব করে দিয়েছেন ।

কী রকম ?

এখনও ধরতে পারলে না বেটা ? চেষ্টা করো, ঠিকই পারবে ।

মাদ্রীও হাসছিল ।

'আজি এ আনন্দসন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে, আহা
মন্দ পবনে আজি ভাসে আকাশে
বিধুর ব্যাকুল মধুর মাধুরী আহা ।'

চিনতে পারছো এবারে ? ধিয়ানগিরি মহারাজ বললেন । চারণকে চমকে দিয়ে ।

চারণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল । এই ত্রিবেণী ঘাটে এতটা আশা করেনি ।

অ্যালুমিনিয়ামের দুধের পাত্রে চাঁটি মারা, লুঙি আর ময়লা হাতওয়ালা গেঞ্জি পরে কুঁজো হয়ে বসে-থাকা গাঁজার কল্‌কেতে দম-দেওয়া, কালো-কোলো ঐ সন্নিসীর মোড়কের আড়ালে একজন এমন নির্ভেজাল রবীন্দ্রভক্ত বাঙালিকে আবিষ্কার করল বলে ।

চারণ শুধোল ধিয়ানগিরি মহরাজকে, গান আপনি শিখেছিলেন কোথায় ?

সে সব কথা ছাড়ো বেটা । সে সব তো আজকের কথা নয় । ভীমা আমার সম্বন্ধে তোমাকে কি বলেছে তা আমি জানি না । তবে আমি ওস্তাদ আদৌ নই ।

চারণ বুঝতে পারল না, জবাবটা এড়িয়ে গেলেন কি না উনি । তবে ওস্তাদ উনি অবশ্যই ।

ধিয়ানগিরি বললেন, শার্ঙ্গদেবের বই পড়েছ ?

চারণ বোকার মতন ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে রইল ।

শার্ঙ্গদেবের নাম শুনেছে, যেমন শুনেছে আরও অনেকেরই নাম । বই পড়া তো দূরস্থান, তাঁর লেখা কোনও বইয়ের নামও শোনেনি ।

ধিয়ানগিরি বললেন, 'তাল অংক' ম্যাগাজিনটা রাখতে পারো ।

কোথা থেকে বেরোয় ?

অবাক হয়ে বলল, চারণ ।

কেন ? উত্তরপ্রদেশের আলিগড় জেলার হাতরাস থেকে ।

হাতরাস ? সেখানে তো ভারতবিখ্যাত সব বড় বড় মণ্ডী আছে ঘি-এর । আমার এক ঘি কোম্পানি মক্কেলের আড়ৎ ছিল সেখানে ।

হবেই তো । ঘি-এর সঙ্গে গানের সহাবস্থান যে আছেই ! ঘি না খেলে গলা সুরে বলবে কেন ?

ঘি কি গলার লুব্রিকেটর ?

নিশ্চয়ই। হেসে বললেন, উনি।

তারপরই স্বগতোক্তির মতন বললেন ধিয়ানগিরি, স্বর ঈশ্বর, তাল ব্রহ্মা। গান যে কালান্দরের খুবই প্রিয়।

কালান্দর মানে ? কালান্দর কে ?

কালান্দর মানেও জানো না ?

না তো।

বাঁদর নাচানেওয়ালাকে বলে কালান্দর। যিনি এই জগৎকে, এই কালকে বাঁদরের মতনই নাচান তিনিই কালান্দর। ঈশ্বরেরই আরেক নাম কালান্দর।

তাই ?

অবাক হয়ে বলল, চারণ।

একটু বেশি গান-গান হয়ে গেল যেন রাতটা।

উঠে পড়ল ও ধিয়ানগিরি মহারাজকে নমস্কার করে।

ভীমগিরি বললেন, এখন যাবেনটা কোথায় ? হোটেলে ?

চমকে উঠল চারণ। তাই তো। হোটেলে তো আজ ফেরার পথ বন্ধ। ফিরলেও অনেকই রাত করে ফিরতে হবে, যখন মিলিরা নিশ্চিত শুয়ে পড়বে।

যাতে না ফিরতে হয়, সেই জন্যেই তো ভিয়াসিতে গেছিল এবং ভিয়াসি থেকে ফিরে এসে এতক্ষণ এখানে কাটাল!

ভাগ্যিস মিলিরা এদিকে আসেনি।

রাতেও কি সেই দুপুরের হোটেলেই খাবেন ? নিরামিষ ?

ভীমগিরি শুধোলেন।

আপনি খাবেন না কিছু ? রাতে ?

নাঃ। আমি তো খাচ্ছি না। আগামীকালও খাব না। বললাম না সকালেই আপনাকে।

ধিয়ানগিরি ভীমগিরির দিকে চেয়েছিলেন।

এমন করাটা কি খুব জরুরি ?

চারণ শুধোল। যেন, দুজনকেই। ধিয়ানগিরিও উপোস করছেন কি না তা না জেনেই।

ধিয়ানগিরি বললেন, জরুরি। অবশ্যই জরুরি। তবে অন্য কেউই ভীমাকে উপোস থাকতে বলেনি। আমি তো বলিইনি। ও নিজেই নিজের ইচ্ছাতেই উপোস করছে। তবে এই রেজিমেন্টাশনেরও দাম আছে বৈকি।

মাদ্রী বলল, কালিকমলি বাবার আশ্রমে যাবেন নাকি আপনি আমার সঙ্গে ?

কেন ?

না, যদি খেতে চান সেখানে।

নাঃ। চারণ বলল, কিছুই খাব না আমি রাতে।

আসলে, যেখানে বিনি পয়সাতে আগন্তুক মাত্রকেই খেতে দেওয়া হয় তেমন জায়গার সঙ্গে লঙ্গরখানার তফাৎ নেই বলেই মনে হয়। বুঝল চারণ যে, তার মনের কোণে এখনও অনেক এবং অনেকইরকম গুমোর বাসা বেঁধে আছে।

জোনাথান লিভিংস্টোন-এর 'সীগাল' বইটির কথা আবারও মনে হল তার। নিজেকে আলগা করে ভাসিয়ে দেওয়াটা শুনতে সহজ হলেও করা হয়তো সোজা কথা নয়। আদৌ নয়।

ভাবল ও।

কী হল ?

ভীমগিরি বললেন।

একটু চুপ করে থেকে, ভেবে বলল চারণ, কী আবার হবে। আপনিই না বলেছিলেন, 'ভুখখা

মারো'। পেট শূন্য না থাকলে, মস্তিষ্ক পূর্ণ হয় না।

বলেছিলাম বুঝি ?

বলেননি ?

বললেই বা কি ? আমি সর্বজ্ঞ ? অন্যের কথা শুনবেন কেন আপনি ? নিজের বুদ্ধিতেই চলবেন।

বলেই, ধিয়ানগিরির দিকে ফিরে বললেন, শেঠ শাঁওল বাজাজ আসছেন।

চারণ তাকিয়ে দেখল, একজন কালো, মোটা-সোটা অবাঙালি ভদ্রলোক, দিল্লিওয়ালা অথবা মাড়োয়ারি হবেন হয়তো।

পরনে কালো ট্রাউজার আর সাদা বুশ শার্ট, হাফ-হাতা, খুব মোটা এবং খুব দামি টেরিকট-এর। পায়ে চটি, চোখে অত্যন্ত বেশি পাওয়ারের প্ল্যাস্টিক লেন্সের চশমা, হাতের দশ আঙুলে দশটি আঙটি, বহত রতির। এক একটি পাথরের দামই হবে লাখ দশেক করে। ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যে সিগারেট জ্বলছে। বুক পকেটে ফাইভ ফাইভ ফাইভের প্যাকেট। এবং ঘাটের পথের মোড়ে ঝকঝকে একটি নীল-রঙা মার্সিডিস গাড়ি।

চারণ ভাবল, কোনও কারণে এই ভদ্রলোক আঙুল-হারা যদি হন তবে তৎক্ষণাৎ এক কোটি টাকা খসে যাবে কম করে।

তবে কোটি টাকার দামই বা কি এঁর কাছে ?

ধিয়ানগিরির কাছে এসেই শেঠ শাঁওল বাজাজ তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন।

চারণ বলল, আমি আজ আসছি।

ধিয়ানগিরি কিছুক্ষণ চারণের মুখে চেয়ে থাকলেন।

এক দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটে উঠল ওঁর মুখে।

তারপর বললেন, ফিন আনা বেটা। ঠিক হ্যায়। আজ যাও।

মাদ্রীও পায়ে হাত দিয়ে ধিয়ানগিরিকে প্রণাম করে বিদায় নিল।

চারণের একবার মনে হল তারও কি উচিত পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা ধিয়ানগিরিকে ?

পরক্ষণেই মনে মনে বলল, দুসস। নিজের মা, বাবা, দাদু ও মামাদের ছাড়া আর কারওই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেনি সে কখনওই।

প্রণামটা তার কাছে ritual নয়, কোনও বিশেষ জনের প্রতি গভীর এবং নির্ভেজাল শ্রদ্ধার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। কে ধিয়ানগিরি।

ভাল লেগেছে ধিয়ানগিরি মহারাজকে ঠিকই কিন্তু কারওকে ভাল লাগলেই এমনকি শ্রদ্ধা করলেই যে, যতবার দেখা হবে ততবারই টিপ টিপ করে প্রণাম করতেই হবে তার কোনও মানে আছে বলে মানে না ও।

বলল মাদ্রীকে, অন্য একদিন যাব আপনার সঙ্গে, কালিকমলিওয়ালার আশ্রমে খেতে।

যে কোনওদিনই আসতে পারেন। যেদিন ইচ্ছে হয় আসবেন। মন করলেই আসবেন।

বলল, মাদ্রী হেসে।

মাদ্রী খুবই কাছে দাঁড়িয়েছিল চারণের। আবার সেই ফুলের গন্ধটা নাকে এল ওর ধূপের গন্ধের সঙ্গে মেশা।

এই 'মন করবে' কথাটা কানে নুপূরের মতন বাজল চারণের।

সত্যিই হয়ত মনই সব। 'মন করাটাই' আসল। সব ব্যাপারেই।

তারপর চারণকে নমস্কার করে মাদ্রী চলে গেল ঘাটের চাতালের দিকে। যেদিক দিয়ে কালি কমলিবাবার আশ্রমে উঠে যাবার সিঁড়ি আছে।

অন্য পথও আছে।

মাদ্রীর চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে ভাবল, চারণ। এই শেঠ শাঁওল বাজাজ কে ?

চারণ ধিয়ানগিরির কোণটি থেকে দূরে গিয়ে চাতালের অন্য প্রান্তে গিয়ে বসে শুধোল ভীমগিরিকে।

ভীমগিরি বললেন, চলুন, আরও সরে বসি। এই শেঠ বড় বেশি কথা বলে।

এই শেঠ কে ?

শেঠ, শেঠ।

না, মানে পরিচয় কি ?

কত কোটি টাকা যে আছে মানুষটার ! পরিচয়, টাকা। মুজফফরনগরে আর সাহারানপুরে শেঠের মস্ত মস্ত ফ্যাক্টরি। দিল্লি, বম্বে ম্যাড্রাস, কলকাতা কোথায় অফিস নেই শেঠ-এর ! মানুষটা ভাল। প্রতি বছরই এই সময়েই আসেন। মুনি-কা-রেতির এক আশ্রমে ওঠেন বটে কিন্তু সারাটা দিন আর রাতের অর্ধেক সময়ই পড়ে থাকেন এই ত্রিবেণী ঘাটেই। ফিরে যাবেন দেওয়ালীর ঠিক আগের দিন। দিল্লিতে গিয়ে দেওয়ালি মানাবেন। প্রতি বছরই অনেক দান-ধ্যান করেন মানুষটা।

ভীমগিরি বললেন, আপনি যদি এখানেই খেতে চান তাহলে ঐ হোটেল কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে রাত দশটাতে।

নাঃ। আমিও মিথ্যা বলছি না। সত্যিই খাব না।

বলেই বলল, ভুখখা মারো।

তারপর বলল, গাঁজার বিড়ি আছে ?

ভীমগিরি হেসে একটি বিড়ি ওকে দিয়ে নিজে একটি ধরালেন। তারপর আগুন দিলেন তাতে ফসস শব্দ করে দেশলাই জ্বালিয়ে।

চারণ বলল, আপনাকে একটা লাইটার দেব আমি।

একদম না। আমি নেবই না। কত মানুষে এর আগে দিতে চেয়েছিল।

কেন ? মুহূর্তে মুহূর্তে দেশলাই ধরাচ্ছেন, বিড়ি খাচ্ছেন, বিড়ি নিভে যাচ্ছে, আর লাইটার নেবেন না কেন ?

সঙ্গে দেশলাই থাকলে তবেই ধরাই বিড়ি। নইলে দোকানে দড়িতে আগুন লাগিয়ে রেখে দেয়, সেখানে গিয়েই ধরিয়ে নিই। বন্ধনের কি দরকার ?

বন্ধন মানে ? একটা সিগারেট লাইটারও বন্ধন ? আপনি তো মস্ত সন্ন্যাসী।

ভীমগিরি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, চারণবাবু, সন্ন্যাসী হয়তো হওয়া হবে না এ জীবনে। কিন্তু গৃহত্যাগী তো নিশ্চয়ই হয়েছি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আর বন্ধনের কথাই যদি ওঠালেন, তবে বলব যে, একটি সামান্য সুতোও বন্ধন। যাঁরা ফচকে নন, প্রকৃতই বড় 'সন্ত', আমার গুরুর মতন, তাঁরা শরীরে উপবীতের বন্ধনটুকু পর্যন্ত রাখেন না। বন্ধনের সূত্রপাত হয় উপবীত বা সিগারেট-লাইটার-এর মতন অতি সামান্য সামান্য জিনিস থেকেই। কিন্তু তার পরিণতি, অনড় পর্বতের মতনও হতে পারে। সবই ছেড়ে যখন আসতে পেরেছি, পথে পথে, শ্মশানে, তীর্থস্থানে, নিজস্ব ঘর, নিজস্ব ছাদ, নিজের আপনজনের পরোয়া না করে যখন এতগুলো বছর কাটিয়েই দিতে পেরেছি, তখন একটি সামান্য সিগারেট-লাইটারের বন্ধনে আমাকে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য নাই বা করলেন চারণবাবু।

চারণ চুপ করে রইল।

ভীমগিরি বললেন, তাছাড়া দেশলাই-এর মতন জিনিস আছে।

কেন ? লাইটার তো অনেকই ভাল।

দুর।

দেশলাই ঠুকে দোস্তকে পেয়ার জানানো যায়, দুশমনকে জাহান্নমে যেতে বলা যায়, এক একটি ঘন ঘর্ষণে পাহাড়প্রমাণ ক্রোধ, কাম, দ্বেষের বারুদে আগুন লাগিয়ে তা ধ্বংস করা যায়। লাইটার কি তা পারে ?

চারণ চুপ করেই রইল।

চুপ করে যে !

ভাবছি।

কী ভাবছেন ?

আপনি যদি ওকালতি করতেন তবে আপনার প্রত্যেক মক্কেলই মামলা হারত।

যদি করতেন মানে কি ? ওকালতিই তো করি।

ওকালতি করেন ? কোন কোর্টে ?

ভীমগিরি বিড়িতে এক লম্বা টান লাগিয়ে বললেন, আমার বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন জজসাহেবের এজলাসে সওয়াল করতে হয় না। কোনও বিশেষ কোর্টেও নয়। প্রতিদিনই একই জজসাহেবের ঘরে মামলা পড়ে আমার।

কোন জজ তিনি ?

তাঁর অনেক নাম। কখনও তিনি দিগম্বর, কখনও কৌপিনধারী, কখনও শাড়ি-পরিহিতা, কখনও ক্রুশ-বিদ্ধ, কখনও মুখে সাদা কাপড় আঁটা, কখনও তিনি মৌনী, কখনও বাচাল। তাঁর রূপ অনেক, তাঁর আবাসও অনেক। কিন্তু তিনি একই।

চারণও বিড়িতে এক টান লাগিয়ে চুপ করে রইল। ভীমগিরি যে এমন করে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন তা ও ভাবতেও পারেনি। কিংবা কে জানে ! গাঁজার নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। আকাশটা নেমে আসছে মনে হচ্ছে, নদী যেন ঘাটের বাঁধানো চাতালের ওপর দিয়ে বইছে। ভীমগিরি যাই বলছেন তাই Fool Proof অথবা Full Proof বলে মনে হচ্ছে। কিছু বা কেউ ভর করেছে মনে হচ্ছে তাঁর ওপরে।

ভীমগিরি বললেন, আপনি তো অনেকই জানেন। তা এই গাঁজা ব্যাপারটা কি বলতে পারেন ?

ব্যাপারটা মানে ? আমার সব জ্ঞানই গাঁজা বলছেন ?

মানে, কী বস্তু আছে এর মধ্যে যে দুটানেই জগৎ-সংসার টলমল করে ওঠে ? জ্ঞানচক্ষু খুলে যায় ?

মানেটা আমি বলতে পারব না। তবে রাসায়নিক অ্যানালিসিসে যা বলে, তা বলতে পারি।

ওসব জেনে কী করব।

তাহলে বলব না।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। গঞ্জিকা, প্রভাব বিস্তার করেছে দুজনেরই উপরে সম্ভবত।

হঠাৎই ভীমগিরি বললেন, আচ্ছা তাই বলুন শুনি। অ্যানালিসিস না ফ্যানালিসিস কী বললেন।

চারণ বলল, গাঁজার মূল উপাদান হল T. H. C.।

ভীমগিরি বললেন, T. H. C. মানে কি ?

গাঁজা বা মারিজুয়ানা এসবের মূল উপাদানের রাসায়নিক নাম ট্রান্স-ডেল্টা-নাইন-টেট্রা-হাইড্রো-ক্যানাবিনল। সংক্ষেপে বলে, T. H. C.

এই ছাড়া-ছাড়া শব্দগুলোর মানে কি ?

মানে, আমিও জানি না। আমার এক মামাতো ভাই কেমিস্ট্রির ছাত্র ছিল। তার কাছেই শুনেছিলাম। মানে দিয়ে কি হবে ? গুণাগুণ তো আপনার নখদর্পণে। না, কি ? তাছাড়া, থিওরি দিয়ে হবেটা কি ? আপনি তো প্র্যাকটিসই তো করছেন।

তা তো অবশ্যই ! আপনার নখদর্পণেও আসবে। তবে এই বিড়ি-ফুঁকে কিছু হবে না। আমার গুরুজির মতন কলকেতে করে না খেলে সিদ্ধি লাভ হবে না।

তাই ?

বলে, হাসল চারণ।

তেমনই তো বিশ্বাস করেন অনেকে। যার যেমন নজর। তারা গাঁজা খাওয়াটাই দেখে, আর কিছুই দেখবে যে তেমন চোখই তাদের নেই।

তারপরই বললেন, আজকে আপনি এমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন বলুন তো ? হোটেলের ঘরে কি সাপ বিছে ঢুকে রয়েছে ? নাকি বাঘই ?

হাসল চারণ।

বলল, তার চেয়েও অনেক বেশি খতরনাক জানোয়ার। তবে ভাগ্য ভাল। ঘরে ঢুকতে পারেনি।

কোন লিঙ্গর ?

খতরনাকের আবার লিঙ্গভেদ হয় নাকি! অ্যাডজেকটিভ এরও কি লিঙ্গবিচার হয় ? তাদের সর্বলিঙ্গর গুণাগুণ একই। খতরনাক মানে, খতরনাক। হোটেলে ফিরলেই বিপদ।

ফিরলে কি এই খেয়ালখুশি জীবনে বাধা পড়বে ?

তা হয়তো পড়বে না কিন্তু মনটার দড়াদড়ি যে ক্রমাগত খুলে ফেলে তাকে হালকা করার চেষ্টা করছি এ কদিন হল, সেই চেষ্টাটা ব্যাহত হবে অবশ্যই। আপনি বহু বছর হল ঘর ছেড়ে এসেছেন, ঘর ছাড়া মাত্রই এমন দূরে চলে গেছেন যে, পরিচিত কেউই নাগাল পায়নি আপনার। আজ আপনি ঘরে ফিরতে চাইলে, আপনিই বলেছিলেন, ঘর হয়তো আপনাকে নেবে না। আর আমাকে ঘর ছাড়তেই চাইছে না।

ভীমগিরি কথা না বলে চারণের দুচোখের দিকে চেয়ে রইলেন চুপ করে।

চারণ বলল, মুশকিলটা কি জানেন ? এত বছর ধরে মাকড়শারই মতন জালটাকে এতই ছড়িয়ে দিয়েছি যে নিজেই একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছি নিজেরই বিছানো জালে। কলকাতা জায়গাটা যে এত বড়, তার আঙুল যে ভারত কেন, পৃথিবীর বহু জায়গাতেই পৌঁছয় এই কথাটা ক্রমশই বুঝতে পারছি। এই যে আপনাদের শেঠ শাঁওল বাজাজ, ওঁকেও একটু জেরা করলেই হয়তো বেরিয়ে পড়বে যে ইনিও হয়তো আমার চেনা। নিজের পরিচয় যখন মুছে ফেলে আপনাদের এই ভারহীন, অবস্তুবাদী, নির্মোহ, অর্থ, মান, যশ সবকিছুর লোভহীন জগতের চৌকাঠ মাড়িয়ে ঢোকবার চেষ্টা করছি, তখন পদে পদে এ কী বিপত্তি বলুন দেখি!

বিপত্তি নিয়েই তো আমাদের ঘর করা চারণবাবু। গৃহীর সম্পত্তি। আর আমাদের বিপত্তি।

হাসল চারণ।

বলল, ভালই বলেছেন।

আপনি তাহলে বরং এক কাজ করুন। দেবপ্রয়াগে চলে যান।

সেখানে কি ?

সেখানে ভাগীরথী আর অলকানন্দার সঙ্গম। গভীর গিরিখাত দিয়ে বয়ে এসেছে ভাগীরথী বাঁদিক থেকে আর সমকোণ থেকে এসেছে অলকানন্দা। এই অলকানন্দাতে এসে মন্দাকিনী মিশেছে দেবপ্রয়াগের অনেক উপরে। রুদ্রপ্রয়াগে। মিশে যাওয়ার পর রুদ্রপ্রয়াগে মন্দাকিনীর এবং দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার আর কোনও অস্তিত্বই থাকেনি।

এ কথার মানে ?

মানে এই যে, আপনিও রুদ্রপ্রয়াগের মন্দাকিনী বা দেবপ্রয়াগের অলকানন্দা হয়ে যান। সেই যে গানটি গাইলেন না, সেই যে, গুরুজি বললেন উপনিষদের শ্লোক-নির্ভর যে গানটি, ঈশ্বর-বন্দনার গান ? সেই যিনি পা না থাকা সত্ত্বেও সব জায়গাতে যেতে পারেন, চোখ না থাকা সত্ত্বেও সব কিছু দেখতে পারেন, হাত না থাকা সত্ত্বেও তাঁর হাত দিয়েই এই সংসারের সৃজন পালন করতে পারেন, তাঁরই মধ্যে নিজেকে লীন করে দিন। আপনার পূর্ব জীবন, আপনার আমিত্ব, আপনার অহং সব নিয়ে এমন করে এই নিরবধিকাল বহমানা অদৃশ্য নদীতে ঝাঁপ দিন চারণবাবু, যাতে আপনি আপনার আগের সব অস্তিত্বই মন্দাকিনী আর অলকানন্দারই মতন মুছে ফেলতে পারেন, নিশ্চিহ্ন হয়ে।

চারণ চুপ করে রইল।

ভীমগিরি বললেন, কি ? পারবেন না ?

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, নিজের সব কিছু নিজস্বতা বিসর্জন না দিলে, নিজের সব চিহ্ন নিশ্চিহ্ন না করলে, নতুন দলের নিশান হাতে নিয়ে দৌড়বেন কেমন করে ? রিলে রেস-এ দৌড়াননি স্কুলে পড়বার সময়ে ?

হুঁ।

তবে ? আমাদের গৃহী-জীবনের পুরোটাই তো একটা রিলে রেস। ছেলে বাবার নিশান নিয়ে দৌড়চ্ছে, নাতি ছেলের। ছাত্র মাস্টারমশাইয়ের। জুনিয়র উকিল তার সিনিয়রের, সারাটা জীবনই দৌড়! দৌড়! দৌড়! রিলে রেস নয়তো কি ?

তা ঠিক।

ভাবিত চারণ বলল, স্বগতোক্তির মতন।

ভীমগিরি বললেন, অত ভাবার কি আছে ? আপনিও তাঁর অদৃশ্য হাতে আপনার সব নিশান তুলে দিয়ে তাঁর মধ্যে হারিয়ে যান। দেখবেন, তখন একটা প্লাস্টিকের সিগারেট-লাইটারের ভারকেও ঐরাবতের মতন ভারী বলে মনে হচ্ছে।

দেবপ্রয়াগ জায়গাটা বুঝি খুব সুন্দর ? নানা বইয়েতে পড়েছি। আমাদের বাংলা ভাষার সাহিত্যিকেরা এই পথ এবং এইসব তীর্থস্থান নিয়ে যে কত সুন্দর সুন্দর বইই লিখেছেন। কত সিনেমাও হয়েছে। যখন স্কুলে পড়ি তখন, দেখেছিলাম 'মহাপ্রস্থানের পথে'। এখন সেই বইয়ের লেখক, ছবির পরিচালক, নায়ক নায়িকাদের মধ্যে অনেকেই মরে ভূত বা ভগবান হয়ে গেছেন। এতদিনের আগের ছবি। কিন্তু ছবির কথাটা মনে আছে ঠিকই। তাই নাম শুনলেই মনে হয়, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ যেন কতবার দেখেছি!

বইয়ে-পড়া দেখা আর নিজ চোখে দেখাতে আকাশ-পাতাল তফাত। দেবপ্রয়াগে একবার গিয়ে পৌঁছলে আপনার বাকি জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দিতে চাইবেন। তবে এই পাড়ে, মানে, নদীর বাঁ পাড়ে কিছু নেই। এগিয়ে গিয়ে ব্রিজ পেরিয়ে আবার ডানদিকে ঘুরে ওপারে যেতে হবে। ছোট ছোট হ্যাঙ্গিং-ব্রিজও আছে অবশ্য। ওপারেই প্রাচীন দেবপ্রয়াগ। বদ্রীনাথের যাঁরা পূজারী যাঁদের 'রাওয়াল' বলে, তাঁদের বাস ওখানেই।

হ্যাঁ। শুনেছি। কুমার ট্র্যাভেলস-এর ড্রাইভার বলছিল বটে।

ভীমগিরি হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন, আমি একটু ঘুরে আসি। শেঠ চলে গেলে গুরুজির পদসেবা করব, তারপরে ওঁকে একটু দুধ খাইয়ে দিয়ে দিনান্তে নিজের কাজ করব।

নিজের কাজ মানে ?

মানে, ধ্যান। নিজস্ব ভাবনা।

ভীমগিরি চলে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, গুরুজির কাছে শুনেছি যে, আমাদের উপনিষদে একটি শ্লোক আছে—

> 'আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনম্ সামান্যমেতাৎ কাঃ পশুভিনরানাঃ
> ধর্মহি তেষাম অধিকোবিশেষোঃ ধর্মোণাহীনা পশুভিসমানাঃ'।

চারণ বলল, মানে কি হল এর ?

মানে হল, পশু আর মানুষ দুইয়েরই আহার আছে, নিদ্রা আছে, ভয় আছে আর আছে মৈথুন। কিন্তু মানুষকে সৃষ্টিকর্তা ধর্ম দিয়েছেন কিন্তু পশুকে তা দেননি। পশুমাত্রই ধর্মহীন। এই ধর্ম কিন্তু হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি নয়। এই ধর্ম মানুষের ধর্ম। ভাবনা-চিন্তার ধর্ম, গান গাইবার ধর্ম, ছবি আঁকবার ধর্ম, কবিতা লেখার ধর্ম, ঈশ্বর-ভজনার ধর্ম, যে সব গুণ বিধাতা জন্তু-জানোয়ারকে দেননি।

এই পর্যন্ত বলেই ভীমগিরি পা বাড়ালেন। মুখে বললেন, চললাম আমি।

ভীমগিরি চলে যেতেই চারণ বড় অসহায় বোধ করতে লাগল। এই কদিনে এই মানুষটা তার উপরে এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছেন। ইংরেজিতে যাকে বলে 'SPELL'। এই প্রভাব ভাল কী মন্দ সে প্রশ্নে না গিয়েই ও ঠিক করল যে ওকে এই প্রভাবের হাত থেকে মুক্ত হতেই হবে। ও কেন এই গেরুয়াধারীর খপ্পরে পড়ে জীবনটাকে নষ্ট করবে ?

একবার ভাবল, ফিরেই যাবে হোটেলে।

তারপর ভাবল, নাঃ। ভীমগিরি ছাড়া কি অন্য সাধু-সন্ত নেই এখানে ? তাদের অভাব কি ? এই ভীমগিরিকেই এড়িয়ে চলতে হবে শুধু আগামীকাল থেকে।

পরক্ষণেই ওর মনে পড়ল চন্দ্রবদনীর কথা। কবে যেন আসবে সে ? দেওয়ালীর দিনে। দেওয়ালী পর্যন্ত তাকে হৃষীকেশ-এ থাকতেই হবে। ভীমগিরিকে সহ্য করতেই হবে। চারণ জানে যে, সাধু হওয়া ওর হবে না। অনেকই চাওয়ার কামড়, অতৃপ্ত ভোগ-বাসনা তাকে ঘিরে রয়েছে। বড় অসহায় বোধ করে ও। বড় রাগ হয় নিজের উপরে। ঘৃণাও।

নিজেকে যদি বুঝতে পারত পুরোপুরি !

ভীমগিরি চলে গেলেন।

চারণেরই আজ কোথাওই যাবার নেই। গাঁজার বিড়ির প্রভাবে আর ভীমগিরির বুকনিতে মাথাটা ভোঁ-ভোঁ করছিল। ভাবল, গঙ্গা মাঈর মস্ত বাঁধানো ঘাটের চাতালে একটু পায়চারী করবে। ঠাণ্ডা হাওয়াতে মগজ সাফ হয়ে যাবে। সারাটা দিনই আজ হাঁটা-চলা তেমন হয়নি !

ঘাটে এখন লোকজন কমে গেছে। যে সব নারী ও শিশুরা ফুল, প্রদীপ আর তাড়পাতার দোনা সাজিয়ে বসেছিল এতক্ষণ তারাও গায়ের কাঁথা-চাদর টেনেটুনে নিয়ে উঠে পড়ে তাদের সামগ্রী সব উঠিয়ে নিয়ে আজকের মতন বিকিকিনি সেরে যার যার বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে একে একে।

জলের পাশে দাঁড়িয়ে, নদী রেখা ধরে যতদূর চোখ যায়, চেয়েছিল চারণ। যেখানে নদীর ওপরের বারাজের ওপরে আলো জ্বলছে, সেদিকে চোখ পৌঁছুল। কী যেন এক কারখানা হয়েছে ওইদিকে। উজ্জ্বল আলো জ্বলে। চিমনি দিয়ে ধুঁয়ো উঠে। কারখানা কি অন্যত্র করা যেত না ? কুঞ্জাপুরীর উচ্চতা থেকে নীচে তাকিয়ে হৃষীকেশের উপত্যকাকে সত্যিই দেবভূমি বলেই মনে হয়।

চারণের ভাবনার জাল ছিঁড়ে হঠাৎই কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, 'ব্যোম শংকর'।

'ব্যোম' শব্দটার উপরে এমন করে অ্যাকসেন্ট পড়ল যেন মনে হল তানাজানিয়ার সেরেঙ্গেটি প্লেইনস-এ সিংহই ডাকল।

চমকে উঠে, মুখ ঘুরোতেই দেখল ঘাটের মাঝ-সিঁড়িতে একজন ছিপছিপে লোক বসে। তার মাথাতে বাঁদুরে টুপি। গায়ে একটি সুজনি গোছের চৌখুপি পাতলা তুলোর চাদর। তুলোটও নয়। পরনে জিনস-এর প্যান্ট। মোজাহীন দুটি পায়ে, রাবারের হাওয়াইয়ান চটি। বলতে গেলে, চরণযুগল প্রায় খালিই। এই অচেনা মানুষটির পোশাকের স্বল্পতা ওর নিজের পোশাকের আধিক্যজনিত কারণে চারণকে সত্যিই লজ্জিত করল।

'ব্যোম শংকর', শংকর দেবতার স্তুতিসূচক একটি উচ্চারণই মাত্র। 'ব্যোম শংকর'তো কোনও সম্ভাষণ নয় ! এই নির্জনে এই অপরিচিত বাঁদুরে-টুপি পরিহিত ব্যক্তিটি স্বগতোক্তিরই মতন যেন উচ্চারণ করল শব্দটি। আনন্দে হতে পারে, দুঃখে হতে পারে, ভক্তিতেও হতে পারে। ভাবল, চারণ।

ব্যোম শংকর-এর প্রত্যাভিবাদন হয় না। হয় বলে, অন্তত জানা নেই চারণের।

হঠাৎই সেই কিম্ভূত ব্যক্তি বললেন, কী বুঝলেন স্যার ? চ্যাটার্জি সাহেব ? 'দম মারো দম' 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম শোনেননি ?

চারণ সেই শ্রীমুখে তার নাম উচ্চারিত হতে শুনে আরও চমকে চেয়ে দেখল যে, পাটন।

অবাক হল চারণ পাটনকে দেখে এখানে। তার দুটি হাতই ছিলিমের উপরে। পুরো টান লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই এই উদগীরণ !

ঊষা উত্থুপের গলাতে এই গানটি শোনেননি ? মিস করেছেন স্যার কিছু। 'দম মারো দম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।'

তারপরেই বলল, বেচারি জ্যাকিদা। ভাল মানুষ, আদ্দির পাঞ্জাবির হাতা-গোটানো, চুরুট-খাওয়া, মদ্য সম্বন্ধে বিদ্বেষহীন, স্পোর্টসম্যান জ্যাকিদাকে এই 'দম মারো দম'-এর গায়িকা কী ল্যাংটাই না মারলেন বলুন ? প্রবল-বিক্রম জ্যাকিদাকে একেবারে আলুর দম করে ছেড়ে দিলে গা। সাধে কি আমার বড় পিসিমা বলতেন 'খপদ্দার। কক্কনও কোনও মেইয়েছেলের সঙ্গে টকরাতে যাসনি পাটু। ভেনে দেবে এক্কেবারে। আমরা হচ্ছি গিয়ে মা কালীর জাত।'

বলেই পাটন বলল, কী হল ! আপনাকে যে ব্যোম শংকর বলে উইশ করলাম, আপনি তো আমাকে উইশ-ব্যাক করলেন না। ম্যানার্স জানেন না এতটুকু ! এত বড় একজন উকিল !

ব্যোমশংকর যে কোনও সম্ভাষণ, তা দিয়ে কারওকে আদৌ উইশ করা যে যায়, সে কথাই আদৌ জানা ছিল না আমার আগে। পাটন বলল।

জানুন তবে। ধ্বনি উঠলেই প্রতিধ্বনি ওঠা স্বাভাবিক। ধ্বনি যে ওঠাল তার অন্তত খুবই ইচ্ছে করে যে, তার সাঙাত জুটুক এক-দুজন অন্তত। অনেকসময় তো একাধিক সাঙাতও জোটে। শোনেননি ? মানে এক ধ্বনির একাধিক প্রতিধ্বনি হয়।

তা শুনেছি। কিন্তু...তুমি এখানে কি করছ ? এলে কোথা দিয়ে ? আমি তো চাতালেই বসেছিলাম তোমাকে তো আসতে দেখলাম না !

ঘাটা-অঘাটাতে আসার পথ কি একটা না কি ? কত্ব পথ আছে।

তারপর যেন দয়া করেই বলল, কপিলমুনির আশ্রমে খেয়ে এসে এখানে গাঁজায় দম দিচ্ছি। আজ খাওয়াটা গাণ্ডে-পিণ্ডে হয়েছে।

রাতে থাকবে কোথায় আজ ? মানে শোবে কোথায় ?

শোব ? শোব কোন দুঃখে ?

মানে ? রাতে শোবে না ?

না ঃ।

ভাবল চারণ, এ এক আজব রাজ্যে এসে পড়ল সে। এখানে কেউ বলে, খাব না। কেউ বলে শোব না রাতে। মাথাটাই খারাপ করে দেবে এরা।

তারপর, অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের গলাতে পাটন বলল, গাঁজা কি আপনার হুইস্কি নাকি যে পটাপট চার পেগ চড়িয়ে, পেট-মাদিয়ে খেয়ে, বউ অথবা কোলবালিশ জাপটে শুয়ে পড়বেন। না স্যার। গাঁজা তেমন নেশা নয়। গাঁজা খেয়ে এখানেই বসে কাটাব সারা রাত। অহিফেন, গাঁজা এসবের তরিকাই আলাদা।

কী করবে ? মানে ঘুমোবে তো না, কিন্তু করবেটা কি ?

চিন্তা করব।

চিন্তা ?

হ্যাঁ।

চিন্তাটা কিসের তোমার ? তোমার বাবা যা রেখে যাবেন তা তো পাঁচপুরুষের পক্ষে রাজার হালে থাকলেও যথেষ্ট।

এই তো ! চ্যাটার্জি সাহেব, আপনারা যে টাকার চিন্তা ছাড়া অন্য কোনও চিন্তার কথা ভাবতে

পর্যন্ত পারেন না। যেমন আপনি, তেমনই আপনার মক্কেলরা। আপনি কি করতে এসেছেন এখানে ? ষাঁড়ের পাছা বাজাতে ?

ছিঃ। ইসস ! ল্যাঙ্গোয়েজ ! ল্যাঙ্গোয়েজ। কী যা তা ভাষাতে কথা বলছ তুমি।

আমি তো বলিনি। আমি Quote করলাম মাত্র। 'দেশ' পত্রিকাতে কুমারপ্রসাদ মুকুজ্জ্যে লিখেছেন।

কে কুমারপ্রসাদ ?

ধূর্জটি মুকুজ্জ্যের ছেলে। তা বলে বাচ্চা ছেলে আদৌ নন। সুপারঅ্যানুয়েটেড ভার্সেটাইল বুড়ো। অনেকে ডাকে ওঁকে "আমিময়" মুকুজ্যে। উনি Quote করেছেন। মানে, উনি এক কোট মেরেছেন। আমি দুকোট মারলাম। এই আর কী।

এত গাঁজা খেলে হ্যালুসিনেশান হয় না ?

হয় বইকি। হওয়ার জন্যেই তো খাওয়া।

তারপর বলল, ভালভাবে গঞ্জিকা সেবন করার পরে মাঝরাতে হয়তো দেখব মাকালি এসে দাঁড়িয়েছেন জিভ বার করে। দেখব, কারা যেন তাঁত বুনছে বহুবর্ণ সুতো দিয়ে। অন্ধকার আকাশ সেই সব রঙিন রেশমি সুতোর সাইকেডিলিক রঙের ছটাতে রামধনুর মতন কর্বুর হয়ে উঠেছে।

কর্বুর শব্দের মানে কি ?

লেহ লট্‌কা !

সেটা কি ?

মানে ?

মানে আবার কি ? অভিব্যক্তি। এতটুকু ইংরেজিও জানেন না তো বিলেতে এতগুলো বছর কি করলেন যৌবনে ? লেহ লট্‌কা। একটা এক্সপ্রেশান।

কিসের ? এক্সপ্রেশানটা কিসের ?

মিশ্র অভিব্যক্তি। বিস্ময়ের, আনন্দের, আপনার মতন হস্তীমূর্খ সন্দর্শনের।

তারপরই বলল, কর্বুর মানে জানেন না অথচ আপনি না কবিতা লিখতেন প্রথম যৌবনে ? লিটল-ম্যাগ করতেন ?

তাতে কি ? ওটা একটা রোগ ?

কোনটা ?

ওই লিটল-ম্যাগ করাটা। বাঙালি মাত্ররই যৌবনে ওই রোগ হয় আবার তিরিশে পৌঁছলেই আপসে ছেড়ে যায়। স্বপ্নদোষ রোগেরই মতন আর কী।

তাঁর সঙ্গে কর্পূরের কি ?

চারণ বলল।

আঃ। কর্পুর নয়, কর্বুর। আপনি না নিজের পয়সা খরচ করে একটি কবিতার বইও বার করেছিলেন ? অবশ্যই পরার্থে।

কার স্বার্থে ? চারণ শুধোল।

একদল ফোর টোয়েন্টি প্রকাশক আছেন। তাঁরা, মেয়ের দালালেরা যেমন গরীব ঘর থেকে খুঁজে খুঁজে হাফ-গেরস্থ মেয়ে-বৌ প্রকিওর করে আনে তেমনই কবিযশপ্রার্থীদের প্রকিওর করে এনে বৃষ্টির পরে পরেই শালিক যেমন কপাকপ ফড়িং ধরে খায় তেমন করেই গিলে খান কচি-কবিদের। বা কপিদের। এঁরা টিপিক্যাল বাঙালি সংস্কৃতিসম্পন্ন এক ধরনের কাব্যিক গাঁটকাটা। প্রতি মাসে কলকাতায় ও নানা মফস্বল শহরে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যশপ্রার্থী কবিদের কত হাজার কবিতার বই যে এমন করে প্রকাশিত হয় ব্যাঙের ছাতারই মতন আর কিছুদিনের মধ্যেই কাগজ বিক্রিওয়ালাদের মাধ্যমে তেলেভাজার দোকানের উনুনে চলে যায়, তার হিসেব কে রাখে !

এসব আজেবাজে কথা থাক এখন। তুমি এখন তোমার সেই ভোঁদাইবাবা না গাড্ডুবাবার আশ্রমে যাবে না ?

ফিচিক্ শব্দ করে হাসল পাটন।

বলল, কেন ? খুঁজতে গেছিলেন নাকি আমাকে ?

চারণ চুপ করে রইল।

পাটন বলল, এই বুদ্ধি নিয়ে যে কী করে এত বড় উকিল হয়েছিলেন তা আপনিই জানেন। আপনি একটি গাড়ল-শ্রেষ্ঠ।

চারণ অপমানিত বোধ করল অবশ্যই কিন্তু জবাবে কিছুই বলল না।

পাটন বলল, খবর পেয়েছি ভিয়াসি থেকে যে, আপনি ভোঁদাইবাবা বা গাড্ডুবাবার খোঁজে গিয়েছিলেন ভিয়াসিতে।

বলেই, হাঃ হাঃ করে হেসে উঠিল।

তুমি হাসছ ?

চারণ অসহায় এবং বোকার মতন বলল।

হাঃ। হাঃ। হাসচি-ই-ই !

বলল, পাটন।

চারণ হাতঘড়িতে দেখল দশটা বাজে। এখনও হোটেলে ফিরে যাওয়াটা বিপজ্জনক। মিলির খপ্পরে পড়লে কি ঘটে বলা যায় না। মিলির রুচি খারাপ, শিক্ষা অসম্পূর্ণ কিন্তু ওর একটি উদগ্র কামনা-জরজর নারী-শরীর আছে। দেহসর্বস্বী সে।

চারণ, তার পুরুষসুলভ স্বাভাবিক বুদ্ধিতে চিরদিনই বুঝে এসেছে যে, সে ভগবান নয়। ভূতও নয়। ভগবানের ভূত হতে আর ভূতের ভগবান হতে সময় বেশি লাগে না। পুরুষকে বিধাতা বড়ই ভঙ্গুর করে করেছেন। তথাকথিত দুর্বল নারীরা অনেকে জানেনই না যে, যা পুরুষের দুর্বলতা তাই তাঁদের বল। মদমত্তা মিলির শারীরিক সান্নিধ্যর ঝুঁকি চারণ নিতে রাজি নয়। এখানে আসার পর থেকে, যদিও সম্পূর্ণই অপরিচিত, কিন্তু এক সম্পূর্ণ নতুন জগতের স্বাদ পেতে আরম্ভ করেছে ও। এক নতুন নেশার ঘোর ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। ধীরে। সেই নেশাটা, গাঁজার বিড়ির যতখানি, তার চেয়েও অনেকই বেশি এই অনুষঙ্গর। পাটন যদি স্টেটস-এর সহজ সুখের জীবন ছেড়ে এসে এই ঘাটের সিঁড়িতে গাঁজাতে দম দিয়ে রাত কাটিয়ে দিতে পারে তা হলে চারণেরই বা এই জীবনকে একটু চেখে দেখতে দোষ কি ?

এই কদিন রোজই থ্রি-স্টার হোটেলে রাত কাটিয়ে সকালের ব্রেক-ফাস্ট খাওয়ার পরপরই হাফ-সন্ন্যাসী হওয়ার চেষ্টাটা ওর নিজের কাছেও হাফ-গেরস্থ জনপদবধূদের মতনই না-ঘরকা না-ঘাটকার প্রয়াস বলে মনে হচ্ছিল। জোনাথন লিভিংস্টোনের সী-গাল বইটার কথা আবারও মনে পড়ে গেল ওর। নিজেকে নিজের সব শিকড়বাকড় আলগা করে নতুন স্রোতে ভাসিয়ে না দিতে পারলে কিছুই হবে না। তেমন না করতে পারলে, যা জানতে এসেছে, বুঝতে এসেছে, তার কিছুই জানা বোঝা হবে না যে, সে কথা ও অনুভব করেছে, করছে।

কী ভেবে, চারণ চাটুজ্যে হৃষীকেশে আসার পরে যেন এই প্রথম তার কলকাতাইয়া পরিচয়টা প্রদীপেরই মতন অদৃশ্য দোনাতে করে ভাসিয়ে দিল দ্রুত-ধাবমান কুলুকুল ধ্বনি-তোলা গঙ্গার বুকে, অদৃশ্য হাতে। শুধু ও নিজে জানল, আর নদী জানল এই অদৃশ্য নিবেদনের কথা। আর জানল অন্ধকার রাতের অগণ্য তারারা।

বসে পড়ল চারণ ঝুপ করে নদীর ঘাটের লক্ষ-পদ-চর্চিত নোংরা সিঁড়িতে, পাটন নামক ওর দুর্বিনীত, উদ্ধত, অশিক্ষিত ধনী মক্কেল-তনয়ের পাশে।

পাটন কিন্তু কিছুই বলল না। মুখ ঘুরিয়ে দেখল না পর্যন্ত একবার।

বাহাদুরী-প্রবণ, হাততালি-প্রত্যাশী চারণও কিছু বলল না।

দুজনেই নিশ্চুপ থাকাতে নদীর শব্দ কানে জোর হল।

ঘাটের চাতাল থেকে অনেকই পায়ে-হাঁটা পাকদণ্ডী পথ উপরে চড়াইয়ে উঠে গেছে নানা মন্দির আর আশ্রমের দিকে। উপরের কোনও আশ্রম থেকে কোনও সাধু, শিষ্যদের সঙ্গে কথা

বলছিলেন। শুধু তাঁরই গলার স্বর ভেসে আসছিল। নইলে, শীতের রাতের দশটাতে এখন আর বিশেষ সাড়াশব্দ নেই এখানে।

কে যেন জোরে হাই তুললেন। তারপরই অন্য কেউ অথবা হাই-তোলা মানুষটিই বললেন, সিয়ারাম! সিয়ারাম!

নদীর জল সশব্দে বয়ে যেতে লাগল। চারণ সেদিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে চেয়ে রইল। কিন্তু পাটনের মুখে কথা নেই। সে ছোকরা কিছুক্ষণ বাদে বাদে কলকেতে টান মারছে আর ঝিম মেরে থাকছে কিছুক্ষণ। চারণ নিজে অবশ্য বুঁদ হয়ে ছিল নিজেরই চিন্তাতে। মাঝে মাঝে ওর নিজেকে বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিল। ওর মধ্যে যে এত বিরক্তি, ক্লান্তি, এবং একঘেয়েমির গভীর অবসাদ এমন মারাত্মকরকম ঘনীভূত হয়েছিল এ সত্য সে নিজেও জানত না। একেই বলে স্থান-মাহাত্ম্য! এখানে এক-একটা ঘণ্টা কেটেছে আর জেট-ইঞ্জিনের থ্রাস্ট-এর মতন ও অতীতকে পদাঘাত করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। উৎক্ষিপ্ত, উৎসারিত হাউয়েরই মতন খোলসকে পিছনে ফেলে রেখে আকাশপানে উর্ধ্বমুখী হয়ে ছুটেছে। সেই এগিয়ে যাওয়ার গতিজাড্যটা ওর মনের মধ্যে প্রতিমুহূর্তেই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। একটা UTTERLY INNOCENT BEGINING থেকে এমন এক বিপজ্জনক ও অপরিচিত এবং অনিশ্চিত জীবনে সে প্রবেশ করে যাবে, এবং শুধু যাওয়াই নয়, ক্রমশ তার মধ্যে এমন সেঁধিয়ে যেতে থাকবে, তা ও যেদিন এখানে এসে পৌঁছেছিল সেদিন ঘুণাক্ষরেও জানেনি।

হঠাৎই নিস্তব্ধতা ভেঙে পাটন বলে উঠল, "ব্যোম শংকর"। সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট উচ্চারণে।

চারণ কিছু না বুঝেই, না ভেবেই উত্তর দিল, "ব্যোম শংকর"।

এই তো! এই তো!

পাটন ডান হাত তুলে আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে বলল, চারণকে।

তারপর বলল, গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা মিলে এক। ব্যোম শংকর। চারণ আবারও যন্ত্রচালিতর মতন বলল, ব্যোম শংকর।

বলেই, নিজের মূর্খামি, ও অপরিণামদর্শিতাতে আঁতকে উঠল। ওর মনে হল ধিয়ানগিরি মহারাজের ভক্ত শাঁওল বাজাজ তখুনি দৌড়ে এসে বলবে, আমার সাড়ুভাই-এর কাছে আপনার কথা শুনেছি স্যার। চলুন, চলুন, আমার সঙ্গে। এখানে এই গন্দী জায়গাতে বসে কি করছেন আপনি?

শাঁওল বাজাজ চলে গেছে অনেকক্ষণ যে, তা দেখেছে চারণ। সে অনুপস্থিত শাঁওলকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বলল, তোমরা ওই দুগ্ধফেননিভ মহামূল্যবান ইস্ত্রি করা পোশাক পরে আস বলেই, এই ধুলোতে নিজেকে অন্যদের সঙ্গে একাসনে বসাতে পারো না বলেই হয়তো, যা খুঁজতে আসো তা পাওনা!

যেন, চারণের মনের ভাবনার খেই ধরেই পাটন বলল, শান্ত লাগছে কি? মন? একটু?

জানি না।

লাগবে। সার-গোবর পড়ছে, জল পড়ছে, আরও অনেকই পড়বে। ফুল তখন ফুটবেই।

এমন সময়ে নদীর দিক থেকে কে একজন ভিজে কাপড়ে উঠে এল কাদা মাড়িয়ে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে। এই ঠাণ্ডাতে রাত দশটাতে চান করল কে? উন্মাদদের আড্ডা এই জায়গা!

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল চারণ সেদিকে।

সাধু-সন্তদের চেহারা ও ফিগার দূর থেকে যেন একইরকম দেখায় বলে মনে হয়। মুখ চেনা যায় না। চেনা যায় না, না তাঁরাই চিনতে দেন না, কে জানে!

মানুষটি জল ঝরাতে ঝরাতে পাশ দিয়ে চলে যাবার সময়ে চোস্ত ইংরেজি অ্যাকসেন্টে পাটনকে বলল, গোয়িং ব্যাক?

নোপ্।

পাটন বলল।

চারণ দেখল, ব্যক্তি এক বিদেশি। রোদে জলে ধুলো ময়লায় রঙ জ্বলে গেছে। সম্ভবত

আমেরিকান।

আই অ্যাম গোয়িং টু ভুচাহরী ব্যাব্যা টুমরো।

ফাইন।

পাটন বলল।

হাউ বাউট ড্য ?

অ্যাম গোয়িং ব্যাক।

ওকে।

সী ড্য ইন থ্রী ডেইজ।

ওকে।

পাটন বলল, স্বগতোক্তির মতন।

চারণ উৎসুক হয়ে শুধোল, তোমার গুরুভাই ?

গরুভাই।

তারপর বলল, আমার গুরুটুরু নেই। একজনের কাছাকাছি থাকি, এই যা। মানুষটি প্রগাঢ় পণ্ডিত। ভীষণই ইন্টারেস্টিং।

কার কথা বলছ ?

যার কাছে থাকি, তিনি।

কেন ? ইন্টারেস্টিং কেন ?

একজন ওরিজিনাল মানুষ। বিন্দুমাত্র ভান-ভড়ং নেই। তাঁকে পছন্দ করি খুবই। কিন্তু পছন্দ করলেই কি কারওকে গুরু বলে মানা যায় ? তা ছাড়া উনি দৈত্যকুলে পেল্লাদ।

কী রকম ?

উনি গুরু-কাল্ট-এ বিশ্বাসই করেন না। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির মতন।

যাঁরা ইংরেজি জানেন না কৃষ্ণমূর্তির মতন, তাঁরা কি সম্মানের যোগ্য নন ? যেমন ধিয়ানগিরি মহারাজ।

কে ধিয়ানগিরি মহারাজ ?

এই ত্রিবেণী ঘাটের।

ওরকম কত মহারাজ পাবেন হরিদ্বার হৃষীকেশ-এর আনাচেকানাচেতে। অগণ্য মহারাজ, জাঁহাবাজ, ধোঁকাবাজ, ধান্দাবাজে ছেয়ে আছে এই সব জায়গা। All that glitters are not gold. আমি চিনি না। তবে, আমি তাঁকে না জেনেই তিনি সম্মানের অযোগ্য এমন বলব কেন ?

আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দিলে না পাটন তুমি।

ইংরেজিতে বা ইউরোপের কোনও ভাষাতে নিজেকে সহজে প্রকাশ করতে পারলে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায় তো। ভাষাটা চিরদিনই একটি মস্ত বাধা। দেখেন না ! INSTRUMENTAL MUSIC কত সহজে সাতসমুদ্রে পেরিয়ে চলে গেল। পৃথিবী, রবিশংকর, আলি আকবর, আমজাদ আলি খাঁ, নিখিল ব্যানার্জি বা বুধাদিত্য মুখার্জিকে শিরোপা দিল আর বাবা আলাউদ্দিন খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, কালে খাঁ, গহরজান, বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেব কি হাল-ফিলের রশিদ খাঁও অপরিচিতই রয়ে গেল। দোষ তো তাঁদের নয়, দোষ তো ভাষারই বাধার।

তবে আমি বলব, যিনি প্রকৃত সন্ত তার পশ্চিমের হাততালিতে দরকারই বা কি ? তিনি নিজেই তো নিজের আনন্দে বুঁদ থাকবেন।

তা ঠিক। কিন্তু জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির মতন মানুষেরা তো শুধু সন্তই নন, রাষ্ট্রদূতও বটেন। স্বামী বিবেকানন্দ বস্টনে না গেলে কি অ্যামেরিকার মাধ্যমে সারা পৃথিবী হিন্দুধর্মকে জানত ?

তা ঠিক অবশ্য।

জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির দর্শন ছিল, "জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বাঁচবে। মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে। এদিক দিয়ে ক্রুডভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, অবশ্য সেক্সুয়াল আউটপোরিং অ্যাপার্ট, জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির জীবন

দর্শনের সঙ্গে এরিকা জং-এর জীবন-দর্শনের মিল আছে। এরিকা জং-এর বইটা কি পড়েছেন ?

না। কি বই ?

চারণ পাটনের এই নতুন পড়ুয়া পরিচয়ে অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

"সেইভ ইওর ওন লাইফ।" সিরিয়াস বই নয়। মাঝে মাঝে পর্নোগ্রাফি বলেও মনে হবে কিন্তু সেই FUN-FROLICK-এর মধ্যে দিয়ে এক আশ্চর্য জীবন-দর্শনের কথা বলেছেন মহিলা। SALTY, CRISP, ভাল বেকন ভাজলে যেমন খেতে হয়, তেমন বই।

কৃষ্ণমূর্তি বলতেন, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই হয় অতীতে বাঁচি, নয় ভবিষ্যতে। অথচ আমাদের প্রত্যেকেরই ; বাঁচাটা যে বর্তমানেই, এই মুহূর্তটিতেই সবচেয়ে বেশি দরকার, তা আমাদের মধ্যে কজন মানি ? মানা তো দূরস্থান, জানিই বা কজন ?

চারণ চুপ করে রইল।

চারণ সেদিন তার অশিক্ষিত ট্রিলিয়নিয়র মক্কেলের ছেলেকে এখানে দেখে তার সম্বন্ধে যা ভেবেছিল, সেই ধারণা যেন দ্রুত পালটে যাচ্ছে ক্রমশ। ভাবছিল, আমরা মনে করি, কারওকে চিনি কিন্তু সত্যিই কি চিনি বেশি জনকে ? একজন মানুষের মধ্যে সম্ভবত অনেক মানুষ থাকেন।

চারণ বলল, তুমি হঠাৎ স্টেটস ছেড়ে এখানে চলে এলে কেন ? কিসে কামড়াল তোমাকে হঠাৎ ?

কামড়াল, ওই অ্যামেরিকানদের ভোগসর্বস্বতা, ওদের বাক্যাড়ম্বর, ওদের অর্থময় ডলার-মগ্ন অপসংস্কৃতি। ওই দেশটাকে সামাল না দিতে পারলে সারা পৃথিবীকে নষ্ট করে দেবে ওরা। দেবে কি, দিয়েছেই ইতিমধ্যে। সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, আত্মিক জগতে ওরা যা বিপজ্জনক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, পৃথিবীকে সার্বিক সর্বনাশের যতাখানি কাছকাছি এনে ফেলেছে, তা হিরোসিমা-নাগাসাকি উড়িয়ে দেওয়া এক কোটি অ্যাটামবোমা বা দেড় কোটি হিটলারও চেষ্টা করে পারত না। ওদের খুবই কাছ থেকে জানার পরই আমার এই তীব্র বিদ্বেষ জন্মেছে। আমি ইংরেজিতে একটা বই লিখছি। লেখা শেষ হলে সেই বই সারা পৃথিবীতে হই-চই ফেলে দেবে। না, আমি শোভা দে-র মতন লেখক হতে চাই না। ইচ্ছে করলে, শোভা দে-র চেয়ে অনেক বেশি রগরগে পর্নো লিখতে পারি আমি। না, অর্থোপার্জনের জন্যে লিখছি না সেই বই। লিখছি, পৃথিবীর মানুষদের অবধারিত আত্মিক মৃত্যু থেকে বাঁচাবার জন্যেই।

সব অ্যামেরিকানই কি একরকম ? আমি তো বহুবারই গেছি সে দেশে, যদিও থাকিনি একটানা তোমার মতন, কিন্তু আমার তো ওদের সরল, উদার, খোলামেলা বলেই মনে হয়েছে।

তারা তাই। তবে তাদের স্বার্থমগ্নতাতে তারা এতটাই আত্মমগ্ন হয়ে গেছে যে, শুভাশুভবোধ, ধর্মবোধ, ন্যায়-অন্যায় বোধ তারা হারিয়ে ফেলেছে। তাদের আত্মিক উত্তরণের সব পথই প্রায় বন্ধ।

তারপরে বলল, ভাল কি নেই ? অবশ্যই আছে। আমার বইয়ের প্রচারতো সেই গভীর মানুষেরাই করবে, যখন বেরোবে।

বাঃ। লেখো। অপেক্ষা করে থাকব। তুমি কি জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তিকে দেখেছিলে ?

আমি ? না, না। আমি দেখিনি। তবে তাঁর এক শিষ্যাকে দেখেছিলাম রেবেকা ম্যাকগাওয়েন। রেবেকার পরিবার অরিজিনালি স্কটল্যান্ডের। পঁচাত্তর বছর হল স্টেটসে সেটল করেছেন। রেবেকাকে জানলাম বলেই কৃষ্ণমূর্তিকেও জানলাম।

রেবেকার বয়স কত ?

আমারই বয়সী।

তোমার বয়সী সন্ন্যাসিনী !

সন্ন্যাসিনী হতে যাবে কোন দুঃখে।

ও অ্যানথ্রাপলজিতে মাস্টার করে ইয়েল উনিভার্সিটিতে পড়ায়।

তাই ?

হ্যাঁ। আমরা খুব বন্ধু। চিঠি লেখে ও নিয়মিত। আসবে বলেছে এখানে একবার। আমিও যাব ভাবছি। এর পরের বছরে Fall-এর সময়ে। ওই টিকিট পাঠাবে। বাবার পয়সাতে যাব না।

আমার যা সামান্য নিজস্ব সঞ্চয় ছিল তা প্রায় শেষ হতে চলেছে। কিন্তু এখানে থাকলে তো আমার অর্থর তেমন প্রয়োজনও নেই। অর্থর চেয়ে বড় অনর্থ যে আর নেই এই কথা আমার বাবা এবং আপনার আরও অনেক মক্কেলদের দেখেও কি বোঝেননি চ্যাটার্জি সাহেব আপনি এতদিনেও ?

হুঁ।

বলল, চারণ।

তারপর বলল, ওই যে বিদেশি বললেন "ডুড্যাহারী ব্যাব্যা", তিনি কোন বাবা ?

ওঃ হো।

বলেই, হেসে ফেলল পাটন।

বলল, 'ডুড্যাহ্যারী ব্যাব্যা' নন, 'দুধাহারী বাবা'।

তিনি আবার কিনি ?

চারণ শুধোল।

ছিলেন একজন সন্ত। হরিদ্বারে তাঁর আশ্রম। বিরাট ব্যাপার। কয়েক শো কোটি টাকার সম্পত্তি। ইনকামট্যাক্সওয়ালারা শুধু খেটে-খাওয়া মানুষদেরই, সে চাকুরিজীবীই হোক বা পেশাদার বা ব্যবসায়ী, ক্যাঁক করে কলার চেপে ধরে পটকান দিতে চায়, আর "মা বাবাদের" দিকে চেয়েও দেখে না। এমন ব্যবসা আজকাল আর দ্বিতীয় নেই!

বয়স কত ওই বাবার ?

তিনি গত হয়েছেন। শুনেছি দু-দুবার কায়াকল্প করেছিলেন।

কায়াকল্প! সেটা আবার কি জিনিস ?

ওই পুনর্মুর্ষিকভবঃ-র উলটোটা আর কী! জীবন ফুরিয়ে গেলে কিছু ক্রিয়াকর্ম করে অবার ব্যাকগিয়ারে ফিরে গিয়ে ফিনসে শুরু করার ফর্মূলাকে বলে কায়াকল্প।

সত্যি ?

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর। এখানের অনেকেই বিশ্বাস করেন।

তাহলে এই ফরমূলার পেটেন্ট নিয়ে নেয় না কেন কেউ ? আমেরিকানদের তো এত পয়সা! কায়াকল্প থাকতেও তারা মরতে যায় কেন বুদ্ধুর মতন ? থাকগে, সে কথা। তা সেই বাবার নাম দুধাহারী বাবা কেন ?

বললামই তো, যে সেই বাবা দেহ রেখেছেন। আড়াইখানা আস্ত জীবনের বিস্তর গাঁটওয়ালা গাড়ি পার করে দিয়ে। এখন তাঁর এক শিষ্য সেই আশ্রমের মালিক। মানে, তিনিই গুরুর নির্দেশে সেই সাম্রাজ্য ইনহেরিট করেছেন আর কী! বহু জায়গাতেই নাকি আছে দুধাহারীবাবার আশ্রম। শুধু হরিদ্বারেই নয়।

তাই ?

হ্যাঁ। আর সেই শিষ্য কিন্তু বাঙালি। কলকাতার এঞ্জিনিয়ার না চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কি না কি ছিলেন তিনি আগে। এখন ঘোর সন্ন্যাসী।

ঘোর সন্ন্যাসী মানে ?

আসলে ঘোরতম বলাই উচিত ছিল। 'ঘোর' কথাটা বেশি ব্যবহার করি বলেই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

দুধাহারী মানে কি ?

ওরিজিন্যাল বাবা দুধ খেয়ে থাকতেন। ওঁদের আশ্রমে গেলেই এখনও জনগণকে ঘোল বা মাঠা খাওয়ান ওঁরা বিনি-পয়সাতে। আর গণ্যমান্যদের দুধ। অনেক গরু আছে আশ্রমের। সব আশ্রমেরই গরু আছে।

আশ্রমের মধ্যেই গরু থাকে ?

চারণ শুধোল।

পাটন বলল, তা থাকে কিছু। তবে তারা দু-পেয়ে গরু। চারপেয়েদের জন্যে সব বড় আশ্রমেরই

এক বা একাধিক অন্য নির্দিষ্ট জায়গা আছে। সেখান থেকে দুধ দুইয়ে নিয়ে আসা হয়। তবে হরিদ্বারে দুধাহারী বাবার আশ্রমের এলাকা বিরাট। সে আশ্রমের ভিতরেও থাকতে পারে গরু। ঠিক জানি না। মনে হয়, থাকে। গরুদের দেখভাল করার জন্যে বহুত লোকও আছে।

দুগ্ধপায়ী বাবা না হয়ে দুধাহারী নাম কেন ?

চারণ শুধোল।

পাটন হেসে বলল, আমি তো নাম শোনা পর্যন্তই সেই কথাই ভাবি। আরও ভাবি, আমি হলে, দুধাহারী না হয়ে স্তন্যপায়ী নাম নিতাম।

চারণ বলল, আমরা সকলেই তো স্তন্যপায়ী। মানুষ মাত্রই তো স্তন্যপায়ী।

পাটন বলল, সে তো মাতৃস্তন্য। আমি আশ্রম করলে মেলা সুন্দরী শিষ্যা জুটাতাম। তারপর স্তন্যপানের অসুবিধা বা অভাব থাকত কি ? নিতান্ত মাথা-মোটা না হলে কেউ দুধাহারী হয় ?

হেসে উঠল চারণ, পাটনের কথাতে।

বলল, তুমি এক নম্বরের বাঁদর।

বাঁদরের ছেলে কি বাঘ হবে স্যার ? আমার পেডিগ্রি তো আপনার জানাই। বাঁদর নাচানোই তো আপনার পেশা ছিল।

তোমার ভোঁদাইবাবা না গাড্ডুবাবা সত্যি কোথায় থাকেন বলো তো ?

ওই নামে কোনও বাবা নেই। ও আমারই দেওয়া নাম। তবে তিনি থাকেন দেবপ্রয়াগে।

অনন্তানন্দ নামের এক বাবাও সেখানে থাকেন বলে শুনেছি, অনেকেরই কাছে।

তিনিই কি তোমার গুরু ?

অনন্তানন্দও থাকেন। তবে আমি যাঁর কথা বলছি, তিনি থাকেন অন্যদিকে। তাঁকে আমি ভোঁদাইবাবা গাড্ডুবাবা ছাড়াও অন্য একটি নামেও ডাকি। অবশ্যই আড়ালে।

কি নামে ?

মুখখিস্ত্যানন্দ বাবা।

মুখখিস্ত্যানন্দ বাবা মানে ?

মানে, যিনি মুখ খিস্তি করেন।

সমাস নাকি ?

আজ্ঞে না স্যার। সন্ধি। সুধীর চক্রবর্তী মশায়ের বইয়ে পড়েছিলাম। সুধীর চক্রবর্তী মশায় একজন ভার্সেটাইল মানুষ। কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ডিপার্টমেন্টাল হেড ছিলেন। চমৎকার প্রবন্ধ এবং রম্যরচনাকার। সংগীতজ্ঞ। সংগীত সমালোচক। অত্যন্তই গভীরতা গুণসম্পন্ন মানুষ। সুরসিকও বটেন। যদি গল্প উপন্যাস লিখতেন তবে ঔপন্যাসিক বা গল্পকার হিসেবে মোটা মোটা হরফে যাঁদের নাম বেরোয় বড় বড় কাগজের বিজ্ঞাপনে তাঁদের অনেকেই "হাপিস" হয়ে যেতেন। গুণপনার সঙ্গে এখন তো নাম-যশের কোনও কানেকশান নেই। আপনি জানেন নিশ্চয়ই।

মুখখিস্ত্যানন্দ বাবার কথা ওঁর কোনও বইয়েতে আছে ?

"সদর-মফস্বল"। একটি অসাধারণ বই। আরও অনেক বাবার কথা আছে তাতে।

যেমন ?

যেমন কম্বলনানন্দ বাবা। তদ্বিরানন্দ বাবা। অপ্রিয়সত্যানন্দ বাবা। ভ্রমণানন্দ বাবা। গুরু শব্দটির মানেও তো ওই বইয়েতেই প্রথম পড়েছিলাম। 'গু' মানে অন্ধকার আর 'রু' মানে আলো। যিনি অজ্ঞানকে অন্ধকার থেকে আলোর ইশারা দেন তিনিই হচ্ছেন গুরু। আপনি গুরু শব্দের মানে কি জানতেন আগে ?

না। তা, সুধীরবাবুর ওই বইয়ের প্রকাশক কে ?

প্রজ্ঞা।

পাবলিশারের নাম ?

ইয়েস। স্থিতপ্রজ্ঞ যাদের নাম তাঁরা ছাড়া এমন ভাল বই আর কেই বা প্রকাশ করতে পারতেন ?

ঠিকানা মনে আছে ?

বিলক্ষণ আছে। সুধীর চক্রবর্তীর বই পড়ে কত কী শিখলাম, আর মারলাম আজ পর্যন্ত। আমি কি এমনই নিমকহারাম যে, তাঁর এমন বই-এর একটু প্রচারও করব না ? 'প্রজ্ঞা'র ঠিকানা হচ্ছে ২০ নং, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯। আর সুধীরবাবুর ঠিকানা যদি চান, তাও দিতে পারি।

তাও দাও।

কাগজ আছে ?

তা আছে।

দুর্বুদ্ধিজীবী মাত্রই পকেটে আর কিছু না থাক কাগজ কলম ঠিকই থাকে সর্বক্ষণ। লিখে নিন। আমি চিঠি দিয়েছিলাম ওঁকে তাই ঠিকানা জানি। এই দুনম্বরী দুনিয়াতে এমন পণ্ডিত, গুণী ও রসজ্ঞ ব্যক্তির কদর হয় না আর ব্যাঙ-ব্যাঙাচিরা নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছে চড়কের গাজনের বাঘ সেজে। ছিঃ।

পাটনের ছিঃ আর ভীমগিরি মহারাজের ছেঃ রে মধ্যে বিশেষ তফাৎ দেখল না চারণ।

চারণ বলল, সত্যি বলছি পাটন, তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরকম ছিল। তোমার মধ্যে যে এই মানুষটিও ছিল তা কল্পনারও বাইরে ছিল আমার।

আমার গুরু বলেন, সব বাঞ্চোতের মধ্যে একজন করে পৃথু ঘোষ থাকে। যার মধ্যে অনেকগুলো মানুষ।

সে আবার কে ? পৃথু ঘোষ।

সে এক ফিকশানাল ক্যারেকটার। 'মাধুকরী' উপন্যাসের একটি চরিত্র।

নায়ক নয় ?

না। সেই উপন্যাসে কোনও একজন নায়ক নেই। প্রকৃতিই নায়ক। সব চরিত্রই নায়ক এবং নায়িকাও। কোনও একজন মানুষকেই নায়ক অথবা নায়িকা হওয়ার কৃতিত্ব দেননি লেখক। সে বইটিও পড়েননি আপনি নিশ্চয়ই।

নাঃ। বাংলা উপন্যাস-টুপন্যাস আজকাল পড়তে ইচ্ছে যায় না। নাইন্টি পার্সেন্টিই তো ট্র্যাশ।

বলল, চারণ।

বাঃ। যাচাই করার ধৈর্যটুকুও নেই। বাতিল করাই আপনার সহজ জয়। এক্স-পার্টে জাজমেন্ট। শোভা দে কি সাহিত্য ?

মনে মনে চারণ বলল, কিই-বা পড়েছি আর করেছি। এতগুলো বছর তো তোমার বাবার মতন অশিক্ষিত পয়সাওয়ালাদের চরিয়েই কাটিয়ে দিলাম। বৃথা, বৃথা, বৃথা! তারপর সুধীর চক্রবর্তীর ঠিকানাটি লিখে নিল, রামচন্দ্র মুখার্জি লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিনকোড ৭৪১১০১, পঃ বঃ।

খুব কি ঘুম পেয়েছে আপনার ?

পাটন বলল, একটু পরে।

না তো !

আমি কিন্তু আর কথা বলব না। আমার গাঁজার অমন রমরমে নেশাটাই মাটি হল। সব কনসেনট্রেশনই নষ্ট হল। কিন্তু আপনি হোটেলে ফিরবেন না ? রাতে ঘুমাবেন না নাকি ?

নাঃ। ভাবছি কাল সকালেই ফিরব একেবারে। একটা রাত কাটিয়েই দেখি না বাইরে। তারপর তোমাদের আশ্রমে যদি নিয়ে যাও তো তোমার সঙ্গেই চলে যাব।

যাবেন ? খুবই কষ্ট করে থাকতে হবে কিন্তু। গুহার পাথরের মেঝেতে এক কম্বল বিছিয়ে শোওয়া আর গায়ে আর এক কম্বল। ধুনী জ্বলবে অবশ্য। পারবেন কি স্যার ? শীত তো এখনও পড়েইনি। সবে কলির সন্ধে।

তারপর বলল, তার উপরে মুখখিস্ত্যানন্দর খিস্তি ? পারবেন তো সহ্য করতে ?

তা, তুমি পেরে থাকতে পারলে, আমিও পারব।

গা জ্বালা করবে কিন্তু। অপমানে, মনে হবে, নীচের গঙ্গা বা অলকানন্দাতে ঝাঁপ দিয়ে ইহলীলা

খোচান। এরকম একটা বদমেজাজি রক্তখেকো মানুষ আমি আর দেখিনি।

এতই যদি অপছন্দ তাহলে থাকো কেন?

সেইটাই তো বুঝি না। মানুষটার অন্তরটা ওয়েসিস আর বাইরেটা কাঁটা-ঝোপ, ক্যাকটাস।

বলল পাটন।

ঠিক আছে। এখন আর কথা নয়। ভাবুন। ভাবনাই ধ্যান। নৈঃশব্দ্যর চেয়ে বড় শব্দময়তা আর কিছুই হয় না। বাইরে থেকে দেখে যখন মনে হবে আপনি নীরব তখন আপনার মাথার মধ্যে ষষ্ঠিবাড়ির কড়ায় ফুটন্ত তেলের মতন তরল ভাবনা ফুটবে। আমরা এই জীবনে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে বড় বেশি সময় নষ্ট করি। যত কম কথা বলা যায়, মানুষের চিন্তা শক্তি ততই বাড়ে। আমার গুরু বলেন।

তাই?

ইয়েস।

বলেই বলল, চলুন একটু আড়াল খুঁজে বসা যাক। হাওয়াটা বরফের তীরের মতন খোঁচাচ্ছে।

তোমার জামাকাপড়ও তো দেখছি কিছু নেই। শীত করে না?

নাঃ। শরীরের সব অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিতে হবে। এক মারাঠি সন্ত ছিলেন, সন্ত তুকারাম...

শুনেছি।

কার কাছে?

ভীমগিরি মহরাজের কাছে।

তিনি কে?

ধিয়ানগিরি মহারাজের চেলা।

বাবাঃ! আপনি দেখি আসামাত্রই through proper channel হাঁটাহাটি শুরু করেছেন।

তা কী আর করা যাবে! একটা কথা মনে হল। তোমাদের আশ্রমে গেলে আমি খাব কি? আমাকে খেতে দেবে কেন তোমরা?

আবার কেন? মোটা মাল দেবেন তাই। আপনার মতন শাঁসালো হঠাৎ-বৈরাগি পেলে ছেড়ে দেবে এমন নিস্পৃহ সাধু কি আছেন?

সাধু-সন্তদের নিয়ে এরকম ইয়ার্কি মারা তো ঠিক নয়।

সকলেই কি আর ফেরেববাজ! সাচ্চাও বহুতই আছেন। Exception proves the rule। তবে অধিকাংশই আমার মতন সাধু।

মাধুকরী করে খেতে পারব না? শুনেছি, সাধুরা সবাই মাধুকরী করেই খান।

"মাধুকরী" শব্দটির মানে জানেন কি?

কে না জানে!

অত সোজা নয় মানেটা। সকলেই ভাবেন যে, জানেন।

বলেই, পাটন সিঁড়ি থেকে উঠে ঐ রামজির চাতালের উলটোদিকে একটি সরু চড়াই-এর দিকেই এগোতে এগোতে বলল, সুধীরবাবুর ওই "সদর-মফস্বল" বইয়েতে 'মাধুকরী'র কথাও আছে।

কি কথা?

চলুন। ওখানে ধুনীর পাশে বসেই বলব।

সেই চড়াই উঠেই দেখা গেল গাছ নেই বটে কিন্তু একটি পাঁচিলের আড়ালে একটা চাতাল। এখানে রামজির মূর্তি নয়, মহাদেবের মূর্তি আছে ছোট মন্দিরে। ধুনীর চারপাশে নানা ধরনের সাধু সন্ত বসেছিলেন। একজনই শুধু কথা বলছিলেন। খুবই নিচু স্বরে। এক জটাজুটসম্বলিত সাধুর সঙ্গে। সেই সাধুর দাড়িগোঁফের অবস্থাও তাঁর দেহাতি কম্বলটিরই মতন। কতদিন যে ধোওয়া হয়নি, কে জানে। সংসার-বৈরাগ্যের সঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিরোধ থাকাটা খুব জরুরি কি? কে জানে? ভাবছিল, চারণ।

Security Page@MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com

অন্যেরা সকলেই হয়তো নিজ নিজ 'নির্জৌষধি'র গুণেই মৌনী হয়ে আছেন। নিমীলিত অথবা অর্ধনিমীলিত চোখ। যাঁদের চোখ খোলা আছে সেই সব অধিকারীর চোখ ঘোরতর রক্তবর্ণ। চারণের গা গুলিয়ে উঠল ওই সব দাড়ি-গোঁফ এবং কম্বলে যে কত রোগের অদৃশ্য জীবাণু এবং কত হাজার ছারপোকা আছে তা ঈশ্বরই জানেন ! কেন জানে না, হঠাৎই ছারপোকার বৈজ্ঞানিক নামটা মনে পড়ে গেল ওর। "হেটোরোপটেরা"। তারপরই মনে হল যে, বৈজ্ঞানিক নাম জানলেও ছারপোকার কামড়ে পশ্চাৎদেশ-এ যতখানি জ্বলন হবে, অবশ্য না জানলেও তাইই হবে।

ছিলিমটা পায়ের কাছে নামিয়ে তার হাইওয়াইয়ান চপ্পল-পরা খালি পা দুটি আগুনের দিকে একটু এগিয়ে দিয়ে পাটন বলল, একটা মজার গল্প বলেছেন সুধীরবাবু তাঁর বইয়ে, মাধুকরী সম্পর্কে।

বলোই না শুনি।

চারণ বলল।

সুধীরবাবুর মতে, 'গিরি' একটা পার্সী প্রত্যয়। আপনি যে সন্ন্যাসীগিরি করে 'মাধুকরী' করে খাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তার আগে একটু ভাবনা-চিন্তা করবেন। বাবুগিরি, মিস্ত্রীগিরি, কুলিগিরির সঙ্গে সন্ন্যাসীগিরি শব্দটি কি আদৌ মানানসই ? তা ছাড়া, সাচ্চা সাধুও বেশি দেখতে পাবেন না। সাচ্চা যাঁরা, তাঁরা মিরগেল মাছেরই মতন। শান্ত কালো জলের গহিনে তাঁরা কাদার মধ্যে থাকেন। জলের উপরিভাগের স্তরে অথবা আমাদের দৃশ্যমান সমাজে তাঁদের চিহ্নবাহী বুড়বুড়িটুকুই তল থেকে উঠে বুঝিয়ে দেয় যে তাঁরা আছেন।

'মাধুকরী'র কথা বলছিলে যে।

হ্যাঁ। বলি। গাঁজা আমার জ্ঞান গুলিয়ে দিয়েছে। "সদর মফস্বলে" সুধীরবাবু বলছেন যে "গেরুয়া হল একটা ইন্টারন্যাশানাল পাসপোর্ট আর কমণ্ডলু হল পরজীবী পরিশ্রমহীন জীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়।"

এটা কি তোমারও মত পাটন ?

আমি কে এসেছি মাকড়া ? আমার মতটা ইরেলিভেন্ট।

কমণ্ডলু "অত্যন্তই সর্বনেশে বস্তু"।

কেন ?

যে একবার কমণ্ডলু থেকে খাওয়ার অভ্যেস করেছে, তাকে আর জীবনে কিছুই করে খেতে হবে না। কমণ্ডলু বলতে আমরা বোঝাই পেতলের বা তামার ছোট্ট একটি জিনিস। কিন্তু সাধুদের কমণ্ডলু কাঠের তৈরি হয়। অনেকই বড়। আর সেইটেই হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে সাধুরা 'মাধুকরী'তে বেরোন। তারই মধ্যে নানান খাওয়ার জিনিস তুলে দেন গৃহীরা। 'মাধুকরী' করে খাওয়া আর "ভিক্ষা" করে খাওয়া এক নয়। সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা চান না। ভিক্ষা চাইতে তাদের ইগোতে বাধে।

আহা। তুমি যে দেখি আমাদের অনন্ত বিশ্বাসের মতন বললে। কথা বলতে বলতে দেড় মিনিট বাদে বাদে বলেন, "হ্যাঁ। কী যেন বলছিলুম ?" 'মাধুকরী'র গল্পটা শেষই করো না।

একদিন এক সাধু, কমণ্ডলু হাতে গ্রীষ্মদুপুরের নির্জন পথ বেয়ে চলেছেন। এক মোটা-সোটা শেঠ গিন্নী…শেঠানি…

শেঠানি মাত্রই যে মোটা হন না এটা তোমার জানা উচিত। বহুত শেঠ-শেঠানি দেখেছি আমি। এই সব Wrong notions থেকে জনগণকে মুক্ত কর।

জনগণের মুক্তি তো রাজনৈতিক নেতা আর আমেরিকান এনআরআই-দেরই হাতে। আমার কি শক্তি আছে যে ভুবনের ভার হাতে নেব ? যাকগে। শেঠানি তো সাধুকে ডেকে পুরী-হালুয়া ইত্যাদি ইত্যাদিতে কমণ্ডলু ভরে দিলেন। পুণ্যপ্রত্যাশী তিনি বাকিটা সম্ভবত রাখলেন কোনও আনমনা গরু বা একমনা ষাঁড়ের জন্যে।

তারপর ?

তারপর সাধুর তো দিল খুশ। ভাবলেন, আজ দুপুরের খাওয়াটা জব্বর হবে। যা গরম ! আর-একবার চানটা করেই নেওয়া যাক।

এই মনস্থ করে পথপাশের এক সুন্দর টলটলে দীঘির সামনে দাঁড়ালেন। এদিকে সুস্বাদু খাবার ভর্তি কমণ্ডুলু নিয়ে কি করেন ? মাটিতে রাখলে কাক-কুকুরে সাবড়ে দেবে। পাখ-পাখালিও ছোঁ মারতে পারে। তাই তিনি বুদ্ধি করে দীঘির পাশের একটি গাছের ডালে, যত উঁচুতে তাঁর হাত পৌঁছয় আর কী, কমণ্ডুলুটি ঝুলিয়ে দিলেন। পাতাপুতার জন্যে পথচারীদের চোখের আড়ালে থাকল আর দ্বিপদ-চতুষ্পদেরও নাগালের বাইরে থাকল।

তারপর ?

তারপর ধরাচূড়া খুলে ফেলে নাগা-সন্ন্যাসী হয়ে অনেকক্ষণ জলক্রীড়া করলেন। তারপর ব্রীড়াবনত বধূর মতন সলজ্জে জামাকাপড় পরে নিলেন।

সলজ্জে কেন ?

একটা মদনটাকি পাকি চোখ টেইর‍্যে দেইকতেচেল তেনাকে দীঘির পাশের পার থেইকি। আঙ্গাপাঙ্গা হয়ে চান করচিলেন তো। লজ্জা পাওয়া স্বাবাবিক।

চারণের চোখের সামনে একজন শালপ্রাংশু দামড়া সন্নিসীর ন্যাংটো রূপ ভেসে উঠতেই গা গুলিয়ে উঠল। নারীরা কোন চোখে দেখেন তা বলতে পারবে না, কিন্তু রোমশ পুরুষের নগ্নরূপ সম্ভবত পৃথিবীর অন্যতম প্রধান কুৎসিৎ দৃশ্য।

ব্যোম শংকর।

হঠাৎ বলে উঠল পাটন।

ব্যোম শংকর।

রিফ্লেক্স অ্যাকশানে বলে উঠল চারণ।

চান সেরে, পরিধেয় পরিধান করে, খুশি-খুশি মনে যখন কমণ্ডুলু যে-গাছে ঝোলানো ছিল সে গাছের দিকে ফিরলেন সাধুজী, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল। দেখলেন, একটা উট, চার পা মাটিতে জম্পেস করে গেঁথে, জমিয়ে পুরী-হালুয়া খাচ্ছে। খাচ্ছে মানে, ততক্ষণে খেয়ে সাবড়ে দিয়েছে।

বল কি ? উট ?

উট কোথা থেকে এল ?

চারণ জিগ্যেস করল অবিশ্বাসের গলাতে। গল্পের গরু গাছে চড়ে বলে শুনেছি কিন্তু গল্পের উটও যে না-চড়েও মজা মারে এমন তো শুনিনি।

পারে। বিলক্ষণ পারে।

পাটন বলল।

উটটা কি তোমারই কবি-কল্পনা ?

আজ্ঞে না স্যার।

উটটা সুধীরবাবুর "বইয়েতেই ছেল।" তবে আমি একটু icing দিয়েছি মাত্র। কেক যদি ভাল baked হয় তবে তার উপরে icing না থাকলে কেকেরই বে-ইজ্জৎ। যে কোনও ভাল গল্প পুনর্বার বলার সময়ে তা যদি পল্লবিত না হয়, তবে গুণী ওরিজিনাল গল্পকারের প্রতি "অচ্ছেদ্দা" প্রদর্শন করা হয়।

তারপর ?

দাঁড়ান, ছিলিমটা ভরে নিই।

ছিলিম না ভরেই তো দিব্বি চালাচ্ছ।

সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের "দেশে বিদেশেতে" পড়েছিলাম, "স্বপ্নেই যখন পোলাও রাঁধবে (নিশ্চয়ই বিরিয়ানির কথাই বলেছিলেন। আহা কতদিন খাই না গো। "কেচ্ছাসাধনে মুক্তি সে মুক্তি আমার নয়।") তখন ঘি ঢালতে কঞ্জুষী করবে কেন ?" সুধীরবাবুর গল্প মেরেই যখন চালাচ্ছি তখন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতই সে সব একটু পল্লবিত করছি মাত্র।

তারপর বলো, উটকে আমদানি করলে কোত্থেকে ?

আ মলো যা। আমি আনতে যাব কোন দুঃখে। সে তো গল্পতেই চরছিল। উটটা ধোপার। জায়গাটা যে রাজস্থান ! সেখানে উটেরা গাধার কাজ করে আর সেখানের মানুষেরা যখন কলকাতাতে বাণিজ্য করতে আসে তখন বাঙালিরা তাদের গাধার কাজ করে। অর্থাৎ ভার বয়। তা উটের মালিক তো কাপড় শুকুতে-দেওয়া বাঁশের খোঁটা হাতে করে দৌড়ে এসে উটকে দে-দমাদ্দম ! দে-দমাদ্দম। সন্ন্যাসীর খাবার খেয়ে ফেলে এমন অধার্মিক উট !

তারপর ?

তারপর সাধুজি ঐ নৃশংস প্রহার দেখে দৌড়ে এসে বললেন, করো কি হে, করো কি ? অবোলা জীব, না হয় না জেনে অপরাধ করেই ফেলেছে, তাই বলে, তুমি কি তাকে মারতে মারতে মেরেই ফেলবে ? আমার 'মাধুকরী'র খাবারও না হয় ও খেলেই। কেষ্টর জীবই তো !

ধোপা কাঁদতে কাঁদতে বলল, মারছি আমি সে জন্যে নয় বাবাজি।

তবে কি জন্যে মারছ ?

মারছি, কারণ আমি গরীব মানুষ, খেটে খাই। এই রোদের মধ্যে শীতে, গ্রীষ্মে ডাঁই-ডাঁই কাপড় কাচি। ওকে তো কিনেছিলাম আমার মোট বইবারই জন্যে। কিন্তু আজ যে ব্যাটা কমণ্ডুলু থেকে খাওয়ার অভ্যেসটি রপ্ত করে ফেলল, আর কি কোনওদিন সে খেটে খাবে ? কেষ্টর এই জীবটিও সাধুদেরই মতন আরামি, হারামি হয়ে গেল। আমার কি হবে এখন ? হায় ! হায় ! হায় !

চারণ জোরে হেসে উঠল।

নিমীলিত ও অর্ধ-নিমীলিত কিছু রক্তবর্ণ আধ-ফোঁটা চোখ চারণের বিব্রত মুখে ল্যাসার বিম-এর মতন ঝলক-ঝলক আলো ফেলেই আবারও মুদিত হয়ে গেল।

পাটন আবারও কলকে ভরে নিয়ে টিকেতে আগুন দিয়ে এক জোর টান লাগাল তাতে।

মুখে বলল, ব্যোম শংকর।

চারণও আবার রিফ্লেক্স অ্যাকশানে বলে ফেলল, 'ব্যোওওম্ শংকর।

ধ্বনি হলে প্রতিধ্বনি তো হতেই হয় ! "সাবাবিক"।

আজ দেওয়ালি।

চারণ, দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা আর গঙ্গার সঙ্গমস্থলের সোজা উপরে কালো পাথরের মধ্যে খোদিত যে সব আশ্রয়স্থল আছে, যাদের দূর থেকে বৌদ্ধ গুম্ফার মতন দেখায়, তারই একটিতে বসে ছিল। বেশ ঠাণ্ডা। আর তেমনই হাওয়া। নানা মন্দির থেকে ঘণ্টাধ্বনি, মন্ত্রোচ্চারণ হচ্ছে। প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বলছে দিকে দিকে। হাওয়াতে তাদের শিখা সতত আন্দোলিত।

স্থানভেদেও শিশু ও কিশোরদের স্বভাবের কোনও তারতম্য হয় না। তারা পটকা ফাটাচ্ছে। তারাবাজি। রংমশাল। তবে সামান্যই। মেয়েরা সুন্দর আবরণে আভরণে সেজেছে। রাতভর পুজো হবে ঘরে ঘরে। মন্দিরে মন্দিরেও।

আজকে চন্দ্রবদনীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিল চারণের হৃষীকেশ-এ। মনের মধ্যে অনেক স্বপ্ন গড়ে তুলেছিল তাকে নিয়ে। জানে না, সত্যি সত্যি দেখা হলে, আলাপিত হলে, তারপর কেমন লাগত। তবে একটা কথা ঠিক যে, চারণ যে পাটনের সঙ্গে ত্রিবেণী ঘাটে, ভীমগিরি ও ধিয়ানগিরির সঙ্গ ছেড়ে এমন না বলে-কয়ে হৃষীকেশ ছেড়ে চলে আসতে পেরেছে, এই মস্ত কথা। এতবছর কলকাতাতে শত বন্ধনের মধ্যে অজানিতেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল। কোনও বাঁধনই যে ছিন্ন করা যাবে আদৌ, তা ভাবার মতন সাহস পর্যন্ত ছিল না ওর। অথচ দিব্যি তো পারছে।

ভীমগির, ধিয়ানগিরি, মাদ্রী এবং অদেখা চন্দ্রবদনীদের নিয়ে হৃষীকেশে এই নতুন করে বিনিসুতোর সংসার পাততে পাততেও যে সদ্য-নামানো শিকড় উপড়ে নিয়ে এমন করে চলে আসতে পেরেছে তাতে ওর ভেতরের ছেড়ে-আসার ক্ষমতা সম্বন্ধে ও ক্রমশই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। এবারে ও পারবে। আগুন যেমন হাতে একটু একটু করে সওয়াতে হয়, অভ্যেস এবং অনুষঙ্গ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতেও বোধহয় তেমনই একটু একটু করে নিজেকে অভ্যস্ত করতে হয়। একটু সইতে সইতেই অনেক সয়।

কোথায় কতদূরে পড়ে রইল কলকাতার উচ্চকিত, তারস্বরে টিভি ও রেডিও চালানো, মিউজিক সিস্টেমস-এর গগন-নিনাদি শব্দময় জগৎ। ট্রাম-বাস, মিনিবাস, অকারণে হর্ন-বাজানো সারি-সারি গাড়ি। আর কোথায় এসে পৌঁছেছে সে! সিনিবালি অমাবস্যার অন্ধকারের মধ্যে বহু নীচ দিয়ে তীব্র বেগে বয়ে-যাওয়া গঙ্গা আর অলকানন্দার ঝর-ঝরানি আর সঙ্গমের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর সাধু সন্নিসীদের অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণ, ঘণ্টাধ্বনি, নারী ও শিশু কণ্ঠের নিক্কণ।

এক অবিশ্বাস্য, অনাবিল, নতুন জগৎ। চারণ ভাবছিল, এইরকম সব জায়গাতেই প্রাচীন ভারতবর্ষের অবস্থান, হিন্দু ভারতবর্ষ। ঈশ্বর-বিশ্বাসী। একশভাগ দিশি। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষাতে ঋদ্ধ কিছু ভারতবাসীর বাস এখানে। এখানে হাফ-গেরস্তর মতন পণ্ডিতম্মন্য হাফ-আঁতেলদের ভিড় নেই। মিডিয়ারও কোনও ভূমিকা নেই। এখানের ভারতবর্ষ তার নিজের আত্মিক জোরে, নিজের মধ্যের উৎসারিত জ্ঞানগম্যি নিয়ে, ধ্যান-ধারণা নিয়ে, মহানন্দে ঈশ্বর-ভজনা করে কালাতিপাত করে। কোনওরকম ঐহিক ও জাগতিক বাসনা-কামনাই নেই এখানে বাস-করা মানুষদের। দিনান্তে দুমুঠো জুটবে কি জুটবে না, সেই চিন্তাও নেই।

আনন্দের এবং সুখের সংজ্ঞাই যেন চারণের কাছে পুরোপুরি পালটে যাচ্ছে। তবে সবই কি আর অনাবিল? সাদা থাকলে কালো থাকবেই। আর কালো না থাকলে সাদার ভূমিকাই বা পরিস্ফুট হবে কী করে! এই তো "কীওরোস্কিওরো" (chiaroscuro) রেমব্রান্ট-এর জমিদারি।

গতকাল পাটনের গুরুর আশ্রমে বসেছিল সে এই সময়েই। আশ্রমটি দেবপ্রয়াগের ওপারে তো বটেই, অলকানন্দারও ওপারে। পুরনো পায়ে-চলা যে পাথুরে পথটি আছে ভিয়াসি থেকে দেবপ্রয়াগের, তারই পাশে পাহাড়ের উপরের এক কন্দরের অভ্যন্তরে সেই আশ্রম। সেই কন্দরের চাতাল থেকে পুরো দেবপ্রয়াগ, অলকানন্দা, গঙ্গা এবং সঙ্গমও ছবির মতন দেখা যায়। অলকানন্দার উপরের একটি সরু ঝুলোনো সেতু পেরিয়ে আসতে হয় দেবপ্রয়াগে ওদিক থেকে। এদিকটা আজকাল শান্ত। কারণ, একেবারেই জনমানবহীন। পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে যেসব গ্রাম আছে সেইসব গ্রামের দুএকজন মানুষ ছাড়া বড় কেউই ঐ পথ আর ব্যবহার করে না। আশ্রমের উপযুক্ততম জায়গা। তবে আজ দিওয়ালি তাই ঘোর কমলা-রঙা সিঁদুর পরে রং-চঙে নতুন শাড়ি পরে পেতলের এবং সোনার গয়না পরে ফর্সা ও দোহারা গাড়োয়ালি মেয়েরা চারদিক থেকেই পায়ে হেঁটে আসছে দেবপ্রয়াগে। কেউ কেউ হয়তো থেকেও যাবে। কেউ কেউ কলকল করে কথা বলতে বলতে নিস্তব্ধ পাহাড় নদী আর গাছ-গাছালিকে চমকে দিয়ে, হ্যাজাক অথবা টর্চ-এর আলোতে আলো-ছায়ায় হেঁয়ালি সৃষ্টি করে নদীর পাশের সুউচ্চ পাহাড়ি পথে ফিরে যাবে যে যার গ্রামে।

তবে সন্ধের পরে নানারকম দেহধারী ও বিদেহীদের ভয়ে কেউই বড় একটা ঘরের বাইরে যায় না এসব অঞ্চলে। বহু যুগের সংস্কার। তবে আজ দিওয়ালি। আজ সব সংস্কার এবং ভয়েরও বোধহয় ছুটি।

পাটনের গুরুর আসল নাম ভোলানন্দ। ওঁর সঙ্গে কিন্তু ভোলানন্দগিরি মহারাজের কোনও সম্পর্ক নেই। ওঁর, মানে, ভোলানন্দজির কোনও গুরু আদৌ ছিল না কি না তাও জানে না চারণ। হয়তো পাটনও জানে না। শিষ্য তো নেইই! চামচেগিরিতে ওর বিশ্বাস নেই। অনেকেই আকৃষ্ট হয়ে আসে ওঁর কাছে। আবার চলেও যায়। কেন যে আকৃষ্ট হয়, তা ওঁকে না দেখলে, ওঁর সঙ্গে কথা না বললে, কেউই বুঝবেন না। নইলে পাটনের মতো "রাবণ" বধ হয়ে যায় ওঁর হাতে!

ওঁর ব্যবহার একেবারেই সাধু-সন্নিসীর মতন নয়। সত্যিই মুখখিস্তিও করেন। তবে অত্যন্ত

উচ্চস্তরের সাধক যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভোলানন্দ কারওকে আসতেও বলেন না, যেতেও বলেন না।

'মাধুকরী' করে খাওয়া কাকে বলে, তা ওই সাধুকে না দেখলে চারণ জানতেও পারত না।

এই তিন-চারদিনেই চারণ তাঁর পাণ্ডিত্যে এবং নিরভিমান সাধারণ মানুষের মতন ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছে। তবে কথা বড় একটা বলেন না। সপ্তাহের মধ্যে পাঁচদিন মৌনী থাকেন। যে দুদিন কথাবার্তা বলেন, সেই দুদিন অবশ্য সাধারণ মানুষের মতনই বলেন। জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নর জবাব দেন।

তবে ইনকামট্যাক্সের ঝামেলা মিটবে কি না ? সন্তান হবে কি না ? ভায়ের সঙ্গে মামলাতে হার হবে না জিত ? নির্বাচনে জিতবেন কি না, এই সব প্রার্থী এবং প্রশ্নকারীর ঢোকা বারণ আছে তাঁর এই আগলহীন ছোট্ট আশ্রমে। কেউ উদ্দেশ্য ভাঁড়িয়ে ঢুকে যদি-বা পড়েনও তবেও তাঁর মুখের তোড়ে কুটোর মতন ভেসে যান নিজেদের মান-সম্মান নিয়ে। যার যত পয়সা তার মান তো তত বেশি ! অন্তত তাঁদের নিজেদের কাছে !

মৌনী থাকাটা বোধহয় সকলের পক্ষেই ভাল। আত্মা তাতে শান্ত হয়। চিন্তার ক্ষমতা বাড়ে। সমুদ্রে দিশেহারা নাবিকের মতন যখন অবস্থা হয়, চারণেরই মতন অনেকেই গৃহীর, তা তার স্ত্রী-পুত্র থাক আর নাই-ই থাক, তখন "To correct his own bearings"—সঠিক দিক নির্ণয়ের জন্যে মৌনতা অবশ্যই ওষুধের মতন কাজ করে। করে যে, তা চারণ দেবপ্রয়াগে আসার পরে এই তিনদিনেই বুঝতে পারছে।

চারণ যেখানে বসেছিল সেখান থেকে ভোলানন্দ মহারাজের আশ্রমটি দেখা যায় না। আশ্রমের সামনে ঘন রডোডেনড্রনের ঝোপ আছে আর বড় বড় হর্স চেস্ট-নাট গাছের সারি। আরও নানা গাছের জটলা আছে। সিলভার-ওক। কিছু প্রাচীন ওক গাছও আছে। অনেক শীত-বসন্তর সাক্ষী। বার্চ। অর্কিড ঝোলে অনেক গাছে গাছে। কী কী অর্কিড আছে এখানে তার সন্ধান করতে বেরোবে একদিন। চারণ ঠিক করেছে।

আশ্রমটিকে ও এখন যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে দেখা যায় না, কারণ, মানুষের চোখের দৃষ্টি শুধু সোজাই যায়, ট্যানজেন্ট-এ যাবার ক্ষমতা নেই তার। অথচ আশ্রমের সামনের চাতালে বসে পুরো দেবপ্রয়াগকেই ছবির মতন দেখা যায় দিনে এবং রাতেও।

কথা না-বলার স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথের একটি লেখার কথা মনে পড়ে গেল চারণের। মাদ্রাজের আদিয়ার থেকে সাবিত্রী দেবীকে (কৃষ্ণান) সংগ্রহ করে নিয়ে আসার আগে শ্রীঅরবিন্দর কাছে গেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ফিরে এসে, পুত্রবধূ মীরাদেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

"ঠিক করেছি এখন থেকে দীর্ঘকাল প্রচ্ছন্ন থাকব। কারও সঙ্গে কোনো কারণেই দেখা করব না। কেবল বুধবার দিনে নিজেকে প্রকাশ করা যাবে। আত্মীয়দের চিঠি ছাড়া পড়ব না।"

এখানে আত্মীয় বলতে সাধক রবীন্দ্রনাথ কাকে বা কাদের বোঝাচ্ছেন তা জানে না চারণ, কারণ রবীন্দ্রনাথ তো মধ্যজীবনে এসে এই সার কথাটি বুঝেছিলেন যে, রক্তসূত্রর আত্মীয়তাটা আসল আত্মীয়তা নয়।

তারপর লিখেছিলেন, "গভীরভাবে, সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়ে থাকব। যদি লেখা জমে আসে তো লিখব। পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দর সঙ্গে দেখা করে আমার মনে হল আমারো কিছুদিন এইরকম তপস্যার খুবই দরকার। নইলে ভিতরকার আলো ক্রমশই কমে আসবে। প্রতিদিন যাতা কাজ করে যাতা কথা বলে মনটা বাজে আবর্জনায় চাপা পড়ে যায়। নিজেকে দেখতে পাইনে।"

ভোলানন্দ গিরির আশ্রমটির সঙ্গেও এই নিজের ভিতর থেকে বাইরে এসে নিজেকে দেখার মধ্যে যে একধরনের নৈর্ব্যক্তিক মুক্তি থাকে তার মিল আছে। আশ্রমটি দেবপ্রয়াগে অবস্থিত হয়েও দেবপ্রয়াগে নয়। এই জন্যেই ভাল লেগে গেছে চারণের এতখানি। আর ভোলানন্দবাবাকে তো লেগেছেই।

এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এরই কিছুদিন আগে বিদেশ থেকে লিখেছিলেন,

"দেশে গিয়ে সম্পূর্ণ নির্জনবাসের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে দীর্ঘকাল বাক্য ও কর্ম থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেব ঠিক করেছি।"

নিষ্কৃতি "পাওয়ার" কথাই জানত চারণ। তাই রবীন্দ্রনাথের মতন শব্দের নির্ভুলতা সম্বন্ধে শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষ কেন নিষ্কৃতি "নেব" বললেন, তা জানা নেই ওর।

তারও পরে লিখেছিলেন, "ছোট ছোট দাবীর শিলাবৃষ্টিতে আমার দেহমনের সমস্ত ডাঁটাগুলো একেবারে আলগা হয়ে গেছে। ডাক্তার বলছে স্থির হয়ে থাকা ছাড়া আর ওষুধ নেই। অন্তরের মধ্যে তার একান্ত প্রয়োজনও বোধ করচি।"

এই নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতার মধ্যে এসে পড়ে সত্যিই বড় ভাল লাগছে চারণের। ত্রিবেণী ঘাটে হয়তো সৎসঙ্গ আছে, কলকাতাকে সেখানে পৌঁছে ভোলা সহজ। কিন্তু দেবপ্রয়াগের মতন ঘোর লাগানো নির্জনতা সেখানে নেই।

এই নির্জনতার প্রসঙ্গে কত কথাই যে মনে ভিড় করে আসছে। এই নির্জনতার মধ্যে না এলে, নিজের মন নির্জন না হলে তো এসব ভাবনা ভাবতেও পারত না। এইসব কথা, বড় মানুষদের এইসব চিঠির কথা তো সে ডাইরিতে লিখেই রেখেছিল। বার বার পড়তে পড়তে তা মুখস্থও হয়ে গেছিল। কিন্তু এমন জায়গাতে না এলে সেইসব কথা তো মনেই আসত না।

ও ভাবছিল হৃষ্টপুষ্ট গাভীরই মতন এতদিন মনে মনে খেল অনেকই। গলকম্বলের নীচে আর খাদ্যনালীতে এবং পেটেও তো খাবার সব ভরাট হয়েই আছে। কিন্তু জাবর না কাটতে পারলে তো সে খাদ্য মনের পুষ্টিবর্ধন করবে না। আঁতেলদের মতন জ্ঞানের বুকনি ছুটোনো যাবে তাতেই কিন্তু নিজের মনের মধ্যে গভীর প্রশান্তি, যে পরম গন্তব্যর কারণেই মানুষের সমস্ত জ্ঞানার্জন, তা তো আসবে না।

অন্ধ শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের খুবই ভক্ত চারণ। সত্যজিৎ রায়ের মাস্টারমশাই ছিলেন তিনি, নন্দলাল বসুরই মতন। এইসব বড় মানুষদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই যখন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন তখন কোনও কোনও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তা নিয়ে মাথা ঘামাতে আদৌ রাজি নয় ও।

সেদিন হৃষীকেশ-এ ভীমগিরি মহারাজের সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়েছিল যে ও সে কথা সত্যি। কিন্তু ভীমগিরি মহারাজ তাকে ভাবতে বলেছিলেন। অনেকই ভেবেছেও চারণ সেদিন থেকে। ভাবাভাবির শেষে ভীমগিরি মহারাজের মতামতকে যে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পেরেছে ও এমনও নয়। 'আবিষ্কার' আর 'উদ্ভাবন' এই দুটি শব্দ তার মনোজগতে এক বিস্ফোরণ অবশ্যই ঘটিয়েছে।

ভীমগিরি মহারাজই কি তাহলে ঠিক ? না, ওই ঠিক ?

এই প্রশ্নের উত্তর বোধহয় এত সহজে মিলবে না।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় একটি চিঠিতে ঈশ্বর এবং নির্জনতা প্রসঙ্গেই লিখেছিলেন, "যাঁরা আমাদের চেয়ে সকল বিষয়ে বড় তাঁরা সকলেই ঈশ্বর এবং মঙ্গল এক করে উপলব্ধি করেছেন। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ মেন্টাল-ওয়ার্ল্ড-এর গণ্ডির বাইরে প্রায়ই যেতে পারে না। এ বিষয়ে আমি ছবি আঁকতে গিয়ে বুঝেছি।"

এখানে "মেন্টাল-ওয়ার্ল্ড" বলতে বিনোদবিহারী কী বুঝিয়েছিলেন ঠিক বোঝেনি চারণ।

"Extreme mental shock (লাঞ্ছনা, অপমান, কাম ইত্যাদি)-এর প্রভাবে আমাদের মনের যেরকম বৈরাগ্যভাব জন্মে বা তীব্রভাবে আমরা কোনও কোনও বিষয়বস্তুতে আকৃষ্ট হই, তখন একরকমের মুক্তি অনুভব করি। সৃষ্টিক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে এই অবস্থা থেকেই আমরা একটা অন্ধকার জগতে গিয়ে পৌঁছই, মানসিক নরক।"

"অলৌকিক অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে। আসলে নির্জনতা ও জনতার মধ্যে বাস করার মধ্যে অভিজ্ঞতার পথে জমিন-আসমান তফাৎ রাখে। আপনি ঠিকই লিখেছিলেন, "নির্জনতা কখনও আমাদের শূন্যহাতে ফেরায় না।"

"লেখাপড়া, ছবি সবই নির্জনতার অবদান। বাইরে নির্জনতা থাকলেও মনের মধ্যে ভিড় জমে

ওঠে। বাইরেও নির্জন, মনের ভেতরেও নির্জন—একেই বোধহয় বলে শান্তি, বা Peace। একই সঙ্গে ধ্যানের কথা উল্লেখ করতে হয়। এর পরই ঈশ্বর আছেন না নেই, সৌন্দর্য আছে না নেই এ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগতে পারে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, সর্বশক্তিমান আমাদের ভালমন্দর হর্তাকর্তা ভগবানকে আমি ঠিক দেখিওনি, বুঝিওনি। আমি অলৌকিকে বিশ্বাস করি।...মুক্তির পথ, উপলব্ধির পথ ভিন্ন। যুক্তির পথে ছবি আঁকতে পারিনি। ছবি আঁকার জন্যই উপলব্ধির পথ অনুসরণ করতে হয়েছে।"

চারণ ভাবছিল, রবীন্দ্রনাথ হলেও কি এই কথাই বলতেন ? লেখার জন্যই উপলব্ধির পথ অনুসরণ করতে হয়েছে ?

কী সব গভীর উপলব্ধির চিঠি। আরেকটি চিঠিতে বিনোদবিহারী লিখছেন,

"তলায় পাঁক, মাঝখানে জল, ওপরে পানা, এই হল মোটামুটি আমাদের জীবন। কোনওরকম করে পানা সরাতে পারলে একটু সূর্যের আলো পড়ে। সেই হল ঈশ্বরের আশীর্বাদ। পাহাড়, সমুদ্র, তারায় ভরা অন্ধকার রাতের কথা মনে হলে পানা পুকুর থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। মুক্তি হয়তো হবে না, তবু বৃদ্ধবয়সের পরম সম্পদ এই অভিজ্ঞতা : যা আমাদের মুহূর্তে মুহূর্তে জানিয়ে দিচ্ছে যে আরও কিছু আছে।"

"যৌবন হল অ্যাকশন আর বার্ধক্য হল কনটেমপ্লেশান। এই সত্যটি জানতে অনেকদিন লাগল।"

গত রাতেই পাটনের গুরু ভোলানন্দ মহারাজ বলছিলেন, এই পুরো পৃথিবীটাই মানুষের মনের সৃষ্টি। জুলিয়ান হাক্সলিকে quote করে বলেছিলেন :

"There is only one substance which possesses not only material properties but also properties for which the word 'mental' is the nearest approach."

আবার PLATO-র কথা উল্লেখ করে ভোলানন্দ বলছিলেন "Mind is the sum total of other vibrations. So, if the mind *is* made still and subtle, the union of protons and electrons in an atom of an element in suitable proportion becomes possible. When it is done, one element is changed into another because a gross element is nothing but the aggregrate of its' subtlest particles."

বাণিজ্য আর আইনের ছাত্র চারণের কাছে ইলেকট্রন প্রোটন, অ্যাটম, ইথার এইসব শব্দগুলো মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছিল। পাটন তাকে পরে বুঝিয়েছিল।

বলেছিল যে, যে-কোনও বস্তুর 'অ্যাটম'ই অনেক 'প্রোটন' আর 'ইলেকট্রন' নিয়ে গঠিত। একটি অ্যাটম-এর মধ্যে ইলেকট্রন আর প্রোটনের ভাগ হচ্ছে ১-১০৪ আর ১-২৪৫। একটি ইলেকট্রন একটি প্রোটনের চারদিকে প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশ হাজার মাইল থেকে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিতে (যা, আলোর গতি) আবর্তিত হচ্ছে। প্রোটন আর ইলেকট্রনের উপাদানের তারতম্যই বিভিন্ন উপাদানের জন্ম দেয়।

পাটন চারণকে বোঝাবার জন্য বলেছিল, মনে করুন, রুপোর মধ্যের অ্যাটমে প্রোটন আর ইলেকট্রনের মধ্যে যদি সোনার অ্যাটমের মধ্যে প্রোটন আর ইলেকট্রনের যে সাযুজ্য তা আনা যায়, তবে রুপোকে সোনা করা কিছুমাত্রই অসুবিধের নয়।

এই ইংরেজি ইলেকট্রনকেই আমাদের সংস্কৃতে বলে "মরুৎ"। "মরুৎ", "ব্যোম", "ক্ষিতি", "অপ" ইত্যাদিই সৃষ্টির মূল উপাদান। রবীন্দ্রনাথের 'ঘোড়া' শীর্ষক একটি ছোট গল্প আছে। পড়েছিলেন কি ?

চারণ বলল, না।

এ কদিনে তার অশিক্ষিত ক্রিমিন্যাল ট্রিলিয়নিয়র মক্কেলের ছেলেকে কাছ থেকে দেখে চারণের ভিরমি খাবার অবস্থা হয়েছে।

মিস্টার ব্রহ্মার এইসব তো Raw meterial। এইসব দিয়েই তো "সৃষ্টি" তাঁর। অপ হচ্ছে জল,

আগুন হচ্ছে "তেজ", হাওয়া হচ্ছে "মরুৎ", আর গুরুজি যে বললেন ETHER সেই ইথারই হচ্ছে "ব্যোম"।

"ব্যোম শংকরের" ব্যোম বলছ ?

হেসে বলল চারণ।

পাটন উত্তরে বলল, ব্যোমশংকরের ব্যোমকে নিয়ে ঠাট্টা করবেন না। শংকর ভগবানই একমাত্র ভগবান যিনি ব্রহ্মার ক্রিয়েশনকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারেন প্রলয়-নাচন নেচে।

চারণ বলল, তাহলে ইলেকট্রন কি ?

ইলেকট্রন হচ্ছে মরুৎ। বুঝলেন না এছাড়া আর একরকম বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে বহুদিন হল। তাকে বলে Positron। Gamma Rays-এর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। একটি Positron এবং একটি Electron-এর মিলনই গাম্মা রশ্মির জন্ম দেয়। আবার গাম্মা রশ্মিকে বিভক্ত করে তার মধ্যে Positron আর Electron-কেও আলাদা করা যায়। তবে মনে হচ্ছে matter আর Energy মূলত আলাদা কিছু নয়। একের মধ্যে অন্য ওতপ্রোতভাবে, অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে।

চারণ বলেছিলে, এবার ক্ষ্যামা দাও। ঈশ্বর বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের সঙ্গে নির্জনতার অনুভূতির সঙ্গে যে এতসব গোলমেলে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার জড়িয়ে অছে তা ঘুণাক্ষরেও জানা ছিল না। এর চেয়ে তো রবিঠাকুরের সেই গানই অনেক ভাল ছিল।

কোন গান ?

"ওদের কথায় ধাঁধাঁ লাগে তোমার কথা আমি বুঝি।

তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসুজি।"

সে কথা ঠিক। তাই তো আলটিমেট সিনথেসিস। কিন্তু সবাই তো রবিঠাকুর নন। তাছাড়া, অবিশ্বাসীদের ভিড়ও তো কিছু কম নয়। বিজ্ঞানই তো মানুষকে সব সত্যকেই যাচাই করে নিতে শিখিয়েছে। সেই গুণ অথবা দোষ আসলে বিজ্ঞানের নয়, মানুষেরই।

কেন, মানুষের কেন ?

বিজ্ঞান-মনস্ক হয়ে পড়ে মানুষ বিজ্ঞানের উৎস সম্বন্ধেই অনবহিত হয়ে উঠছে। জ্ঞান থেকেই যে বিজ্ঞানের জন্ম। আমাদের দেশের এই আধ-ন্যাংটো সাধু-সন্নিসীদের অনেকেই যে, যে-কমণ্ডুলু থেকে উট খাবার খেয়েছিল, সেই কমণ্ডুলুতেই বিজ্ঞান গুলে খেয়েছেন সে খবর উদ্ধত পশ্চিমীরা আর তাদের অন্ধ অনুকরণ-করা কিছু প্রকৃতার্থে অশিক্ষিত এনআরআই আর দিশি সাহেবেরা আর কম্যুনিস্টরা জানতে চান না। না চান, তো না চান। জ্ঞানের সীমা তো চিরদিনই ছিল, অজ্ঞতার, সীমা কোনওদিনও ছিল না। যাঁরা বিজ্ঞানের জয়গান করতে গিয়ে নিরীশ্বরবাদী হয়ে ওঠেন তাঁদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। কারণ "It is the dream of science that all the recognised chemical elements will one day be found to be modifications of a single element."

জ্ঞানীরা যা ইতিমধ্যেই জানেন, তাই অধুনা বিজ্ঞান-মনস্ক মানুষেরা প্রমাণ-সাবুদের সঙ্গে জানবার জন্যে ইলাহি কাণ্ড কারখানা করে চলেছেন। গতরাতে ভোলানন্দ মহারাজ বিজ্ঞান এবং ঈশ্বরবোধ এর মধ্যে যে কোনও বিরোধ নেই এই কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন কিছু কথা।

সেইসব কথা স্বামী বিবেকানন্দরই কথা। সখ করে সাধু-সঙ্গ করতে এসে, মনের অশান্তি নির্বাপিত করতে এসে যে এমন সাংঘাতিক আবর্তে নিক্ষিপ্ত হবে তা চারণ একবারও ভাবেনি।

কত কী জানার আছে, বোঝার আছে, পড়াশুনো করার আছে। এই সব দীনহীন সাধুসন্নিসীদের বাইরে থেকে দেখে এঁদের জ্ঞানের সীমা, গভীরতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণাও করা যায় না। কিন্তু চারণের হাতে যে সময় খুব বেশি নেই। পাটন ছেলেমানুষ, ওর হয়তো আছে। এত দেরি করে এই মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে, এই অলীক জ্ঞানভাণ্ডারের কতটুকুই বা ও করায়ত্ত করতে পারবে ?

নিজের জন্য ভারী কষ্ট হল চারণের। হৃষীকেশ-এ আসার পর থেকেই হচ্ছিল। সেই কষ্টটা বহুগুণ বেড়ে গেছে দেবপ্রয়াগে এসে।

ভোলানন্দ মহারাজকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে মিশে, (মানে যখন তিনি মৌনী থাকেন না) একবারও মনে হয় না যে, তিনি একজন অসাধারণ মানুষ, এতবড় পণ্ডিত, জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ধারক ও বাহক। পণ্ডিতম্মণ্য মানুষ মাত্ররই উচিত তাঁর কাছে এসে জেনে যাওয়া যে পণ্ডিতম্মণ্যতা আর মূর্খামি সমার্থক।

অন্ধকারের পর ওপারের পথ দিয়ে ট্রাক বাস বা গাড়ি যাতায়াতও বন্ধ হয়ে যায়। কখনও কখনও আর্মির ট্রাক বা জিপ যায়। বা, কনভয়। অন্ধকারে দুই নদীর সঙ্গমের শব্দের দিকে মুখ করে বসে সেই শব্দের প্রতি মনোনিবেশ করে নিজের মধ্যে স্থিতি আনবার চেষ্টা করছিল চারণ। সেখানে বসে ওর মনে পড়ছিল যে, ওর দাদুর শোবার ঘরের খাটের উপরে শ্রীরামকৃষ্ণ আর স্বামী বিবেকানন্দর দুটি বাণী বাঁধানো ছিল। কিন্তু ইংরেজিতে লেখা বাণী। ইংরেজিতে কেন? তা ও বলতে পারবে না। দাদু বাংলা তো অবশ্যই, সংস্কৃতও অত্যন্ত ভাল জানতেন।

লেখা ছিল "He is born to no purpose, who having the privilage of being born a man, is unable to realise God in this life." শ্রীরামকৃষ্ণ।

আর স্বামী বিবেকানন্দর বাণীটি ছিল এইরকম "Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divine within by controlling nature external and internal."

কে জানে! ওর মধ্যে দাদুর জিন ছিল কি না! চারণের বাবা ঘোর নাস্তিক ছিলেন। চারণের মনের মধ্যে সবসময়ে কি যেন নেই, কি যেন পাওয়া হল না, জানা হল না, সে যে কোন পরম ধন? সে সম্বন্ধে এক আশ্চর্য ও গভীর আকুতি যে কেন জন্মাল, তা কে জানে!

হঠাৎ তার ভাবনার জাল ছিঁড়ে দিয়ে পাটন, পেছন থেকে তাকে চমকে দিয়ে ডেকে উঠল, এই যে, স্যার। চলুন। আশ্রমে, চন্দ্রবদনী নাম্নী এক সাংঘাতিক সাইকেডিলিক মাল এসেছে। সাঁটুলি দ্য গ্রেট। যাচ্চলে! আমার আর এ জন্মে সাধু হওয়া হল না। আমার যখন হলই না তখন আপনার কেসটাও যাতে কেঁচে যায় তা তো দেখতে হবে। গুরু-মোটা আপনাকে ডাকতে বললেন। গান-টান হবে নাকি। দিওয়ালির দিন বলে কতা।

গুরু-মোটা মানে?

চারণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

মানে, ভোলাগিরি। তিনি কি মোটা নন?

তা মোটা। তবে গুরু কে কি এমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা উচিত?

চারণ ডান হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে চারণের বক্তব্যকে ডিসমিস করে দিয়ে হঠাৎই গেয়ে উঠল,

"দেখা হ্যায় পহেলি বার,
সজনকে আঁখোমে পেয়ার,
ঝিংকু চিকুর! ঝিংকু ঝিংকুর! ঝিংকু চিকুর!"

ঐ পাথরে-খোদিত গুম্ফাদের সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে প্রায় পুরো দেবপ্রয়াগের এলাকা পেরিয়ে অনেকখানি উতরাই নেমে অলকানন্দার উপরের সরু সাসপেনশন ব্রিজ পেরিয়ে আবার অনেকখানি চড়াই উঠে যখন আশ্রমে পৌঁছল ওরা তখন দেখল প্রায়, জনাদশেক সাধু-অসাধু চেহারার মানুষ জমায়েত হয়েছেন আশ্রমে।

বেলা থাকতে থাকতেই বেরিয়েছিল চারণ আশ্রম থেকে। ভোলানন্দ তখন কন্দরের অভ্যন্তরে ছিলেন। সেই জনমণ্ডলীর মধ্যে একজন মাত্র নারী। এবং পুরুষদের মধ্যে দুজন শ্বেতাঙ্গ।

সেই নারীর রূপ-বর্ণনা করবে তেমন ক্ষমতা চারণের নেই। তার মুখের রং ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার মতন। কিন্তু লজ্জা পেলেই তা রডোডেনড্রনের মতন লালচে হয়ে যাচ্ছে। ধুনির আগুন যখন তার দীপশিখার মতন মুখে নাচানাচি করছে তখন মনে হচ্ছে একমুঠো আলোর প্রজাপতিকে কে যেন ছেড়ে দিয়েছে তার মুখে। কিছুক্ষণ নাচানাচি করে তারপরই আবার সরে যাচ্ছে তারা। ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা আবার তার শুভ্রতা ফিরে পাচ্ছে।

রূপসী এ জীবনে অনেকই দেখেছে চারণ। কলকাতার যে-সমাজে তার ঘোরাফেরা ছিল তা পুরনো রাজা-মহারাজা থেকে শিল্পপতি রাজা-মহারাজা সকলেরই খাস দরবার ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র রূপে রূপসী হলেই কারওকে রূপসী বলে মানতে রাজি হয়নি সে কোনওদিনই। যতক্ষণ কথা না বলছে এবং শুনছে, ততক্ষণ রূপসী শুধু রূপেই রূপসী। কিন্তু গুণের গরিমা ছাড়া পৃথিবীর সব রূপই যে ব্যর্থ। মুখ খুললেই যে কত সুন্দরী কদর্য হয়ে ওঠে, কত রূপবান পুরুষ মর্কট-শ্রেষ্ঠ, তা যাঁরা না জানেন, তাঁদের বোঝানো যাবে না।

চন্দ্রবদনী!

এই নারীই নিশ্চয়ই চন্দ্রবদনী হবে।

একটি সাদা-রেশমের ফুলহাতা ব্লাউজের সঙ্গে পোড়ামাটি-লাল জমি আর কচি-কলাপাতা রঙা পাড় ও আঁচলের একটি গাদোয়াল শাড়ি পড়েছে। চোখে ও চোখের পাতাতে কাজল। কপালে কালো টিপ। গলাতে পীত পোখরাজের মালা। একটি বড় পোখরাজকে লকেট করা হয়েছে। কানে, পীত পোখরাজের ইয়ার-টপ। হাতেও পীত পোখরাজের বালা। সোনা দিয়ে বাঁধানো। পায়ে সোনার পায়জোর। ঘন কালো কুঞ্চিত চুল। র‍্যাকেট-টেইলড ড্রঙ্গো পাখির ডানার মতন, উজ্জ্বল কালো চেকনাই সেই চুলে। কী তেল এবং কী সুগন্ধ সে মেখেছে তা জানা নেই চারণের কিন্তু গুহামুখ থেকেই তার সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। অথচ কোনও বিদেশি পারফ্যুম নয়। এই দেবভূমিরই কোন ফুল বা আরক মেখেছে, কে জানে। মুখ খুললেই সুন্দর যুঁইফুলের মতন সাদা দুপাটি দাঁত ঝিকমিক করে উঠছে।

চারণ চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল গুহামুখে।

ভিতর থেকে ভোলাগিরি মহারাজ বললেন, এসো এসো চারণবাবু আমরা সকলে তোমারই জন্য অপেক্ষা করছি।

কানের পাশে ফিসফিস করে পাটন বলল, শাল্লা। মেনকা আর রম্ভাকে এক হামানদিস্তেতে কমলালেবুর মধু আর যত গুষ্টির যষ্টিমধু একসঙ্গে মেরেছে র‍্যা! আমার এখন কি হবে গা?

বলেই, নিজৌষধি গান গেয়ে উঠল, প্রায় চারণের কানে কানে,

"দেখা হ্যায় পহেলি বার
সজন কি আঁখোমে পেয়ার
ঝিংকু চিকুর! ঝিংকু চিকুর! ঝিংকু চিকুর।"

ভোলানন্দজি বললেন, তুই আবার কি গাইতাছস পাটন?

পাটন, দাগী মিথ্যুক আসামীর মতন দুকানে দুহাতের দুশ আঙুল ঠেকিয়ে বলল, কই? কিছু না তো।

ভোলানন্দ বললেন, চন্দ্রবদনী, এরই নাম পাটন। যার সঙ্গে তোকে আলাপ করানো হয়নি অথচ যার কথা তোকে বলেছিলাম। এক নম্বরের বিচ্ছু। কিন্তু ও যেদিন পুরো সাধক হবে সেদিন অনেকই বড় বড় সাধু-সন্তকে লুঙি-ল্যাঙোট আর বাঘছাল গুটিয়ে তুলে উদ্বাস্তু হতে হবে। এখানে ওকে পুঁতে দিলে নর্থ চায়নার হিমালয়ে, যেখানে আমাদের স্বর্গ, সেখানে কোনও বদবৃ গাছ হয়ে ও জন্মাবে।

সকলেই ভোলানন্দজির কথাতে হেসে উঠলেন।

শুধু অবাক হল চারণ।

এই ভোলানন্দজিকে দেখে কে বলবে যে, ইনিই যখন মৌনী অবস্থাতে ঋজু হয়ে ধ্যানে বসে থাকেন এবং মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হন তখন এঁর মনের ভাব কেমন হয়।

প্রসন্নতার প্রতিমূর্তির মতন ভোলানন্দজি বললেন, নেশা-ভাঙ করে, মহা ট্যাঁটোন, কিন্তু হলে কি হয়, পাটনের আত্মা মুক্ত হবার জন্য পাখা মেলে রয়েছে। ও আমার দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে। সেই যে আছে না? রবিবাবুর গানটা। আঃ তোমরা বল না কেউ?

কেউই যখন কিছু বললেন না তখন বিরক্ত হলেও হাসিমুখে বললেন সেই যে গো!

"আমি তারে শুধাই যবে কী তোমারে দিব আনি
সে শুধু কয়, আর কিছু নয়, তোমার গলার মালাখানি।
দিই যদি তো কী দাম দেবে
ফিরে এসে দেখি ধুলায় বাঁশিটি তার গেছে ফেলে।
দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে।"

তারপরই সকলকে চমকে দিয়ে বললেন, গা তো পাটন, যে গানটা গাইছিলি এখুনি।

কোন গানটা ?

চমকে উঠে এবং ভয় পেয়ে পাটন বলল।

আরে ওই যে রে! দেখা হ্যায় পহেলি বার সজনকে আঁখোমে পেয়ার।'

সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

চন্দ্রবদনীও।

কিন্তু সেই হাসি দেখে চারণের বুক হু হু করে কেঁপে উঠল। নানারকম মিশ্র ভয়ে।

এই চন্দ্রবদনীই সেই চন্দ্রবদনী! ভীমগিরি আর মাত্রীর কাছে যার কথা শুনেছিল ?

পাটন মুখ গোঁজ করে বসেছিল। ভোলানন্দ ধমক দিয়ে বললেন, হইল কি রে। ফাইজলামি রাইখ্যা এহনে গানখান শোনা দেহি।

এইরকম সময়ে বোঝা যায় যে, ভোলানন্দ পুব বাংলার মানুষ। বাংলায় যখন কাছের মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন তখন এই ভাষাতেই কথা বলেন। এই মানুষই যখন আবার বদ্রীবিশাল বা কেদারনাথের বরফের গুহা থেকে নেমে-আসা কোনও সাধু-সন্নিসীর সঙ্গে চোস্ত হিন্দিতে অথবা প্রয়াগ (ইলাহাবাদ) বা কাশী থেকে উঠে আসা কোনও পণ্ডিতের সঙ্গে শুদ্ধ সংস্কৃতে কথা বলেন তখন বোঝারই উপায় থাকে না যে ইনিই তিনি!

সাদা চামড়ার কোনও মানুষের সঙ্গেও এই তিনদিনে কথা বলতে শোনেনি চারণ ভোলানন্দ মহারাজকে। কিন্তু ওঁর মুখে ইংরেজি উচ্চারণ শুনে এবং শব্দচয়নে দেখে সহজেই বুঝতে পেরেছে যে, ইংরেজিও অত্যন্ত ভালই জানেন তিনি। হয়তো অন্য বিদেশী ভাষাও জানতে পারেন। আশ্চর্য নয় কিছু। প্রথম দর্শনেই বুঝতে পেরেছিল চারণ যে, উনি একজন ক্ষণজন্মা মানুষ। ক্ষণজন্মা না হলে পাটনও এমন উৎপাটিত হয়! পাটন মুখে ওকে কিছুই বলেনি বা বলবেও না। কিন্তু চারণের সন্দেহ হয় যে পাটন সম্ভবত ভোলানন্দর দেখা পায় ইউনাইটেড স্টেটস এই। নইলে, সেখানের পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ এমন করে দেশে ফিরে এসে কোটি-কোটি টাকার সম্পত্তিকে দূর-ছাই করে, পরিবারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে যে সে সন্নিসী হয়ে যাবে এবং হঠাৎই ভোলানন্দ মহারাজের দর্শন পাবে দেবপ্রয়াগে এসে, এমন বিশ্বাস করাও শক্ত। এবার ভোলানন্দ বাবা বললেন, সময় নষ্ট হইতাছে পাটন। তুই জানস যে আজ এখানে এতজন সাধুসন্ত জমায়েৎ হইছেন নানা বিষয়ে আলোচনার জইন্য। নষ্ট করার মতন সময় নাই আইজ। গা গানটা।

পাটন গুহার ছাদের দিকে মুখ করে হঠাৎই ধরে দিল,

"দেখা হ্যায় পহেলি বার
সজনকি আঁখোমে পেয়ার।"

গানটা শেষ হলে ভোলাগিরি বললেন, আর ঝিংকু চিকুর! ঝিংকু চিকুর! ঝিংকু চিকুরটা। গাইব কেডা ?

পাটন গান থামিয়ে বলল, ওটা তো গানের বডি নয়। ওটা তো মিউজিক।

ভোলানন্দজি বললেন, তা হউক গা। আমাগো হক্কলের বডি যখন ওই মিউজিকই শুনতা চাইতাছে তুই শোনা আমাগো।

পাটন অগত্যা ঝিংকু চিকুর! ঝিংকু চিকুর। ঝিংকু চিকুর! গাইল।

চারণ ভাবছিল, পাটন চারণের কানের মধ্যে একেবারে Earful of Whisper এরই মতন করে গানটা গেয়েছিল। ভোলাগিরির শোনার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। ওরা তার থেকে অনেকখানি

দূরেও ছিল। এই ব্যাপারটাতেই বড় আন-নার্ভড বোধ করে চারণ। দূরে বসে কে কি ভাবছে, কমোডে বসে, (এখানে যদি কমোড থাকত) কে কোন গান গুণগুনাচ্ছে সবই যদি Sensor-র এ ধরা পড়ে, কমপ্যুটার-এ স্টোরড হয়ে যায়, তাহলে বেচারা পাটন কমপ্যুটার-সর্বস্ব স্টেটস ছেড়ে মরতে এখানে এল কেন ?

রিয়্যালি !

বেচারি।

একজন রোগা টিংটিং-এ কিন্তু লম্বা সাধু বসেছিলেন ভোলানন্দজির ঠিক বাঁপাশে। খালি গা। তাঁর মাথা, বুক আর পেটময় কাঁচাপাকা চুল। বললেন, অব বেটিকি গানা শুনা যায়।

জি হাঁ।

ভোলানন্দজি বললেন।

তারপর চন্দ্রবদনীর দিকে ফিরে বললেন, অব গাও বেটি।

কওনসি গানা গাঁউ ?

চন্দ্রবদনী গুরুজির দিকে চেয়ে বললেন।

তোমার গলায় যে গান শুনতে আমি ভালবাসি, ধিয়ানগিরি ভালবাসে, সেই রবীন্দ্রসঙ্গীতই গাও বেটি।

তারপরই অন্যদের দিকে ফিরে বললেন, হিঁয়াতো বহতই কিসিমকি গানা হামে শুননে মিলতাই হ্যায়। ক্যা ভাইলোগ ? রভীন্দরনাথভিতো ইক বহত বড়া সন্তহি থে। উনকি গানা আজ দিওয়ালিকি রাতমে জারা শুন লেনে সে হরজ ক্যা ?

তারপরই বললেন, আজ মামুলি দিওয়ালিভি নেহি না হ্যায়। আজ সিনিবালি দিওয়ালি। দেওয়ালির রাতে 'দীপাবলী' রাগ শোনাবি মা আমাদের ?

'দীপাবলী' ?

এই রাগের কথা তো শুনিনি।

আমরা সকলে কতটুকুই বা জানি ! আমাদের জানার বাহিরে তো কত কিছুই আছে। 'দীপাবলী' আমিও অবশ্য কারও কণ্ঠে শুনিনি, শুনেছি বাঁশিতে। আলি আকবর খাঁ সাহেবের রেকর্ডও আছে এই রাগে।

কেমন রাগটি যদি বলেন একটু।

চন্দ্রবদনী আবদারের গলাতে বলল।

রাতের বেলাতে গাওয়ার রাগ, বুঝতেই পারছিস। দিনে নাম দীপাবলী হত না। কল্যাণ ঠাটের অন্তর্ভুক্ত রাগ। মা মধ্যম বাদী, মা সমবাদী। হাতি ঔরসার। ক্ষা, শুদ্ধ মা কোমল মা দুইই লাগে কিন্তু এই রাগ পা বর্জিত।

মানে, পদবিহীন ?

পাটন মাঝে একটু ফক্কুরি করল। রাত দশটার পরে গাওয়া হয়।

আরোহণ অবরোহণটা কেমন ?

চন্দ্রবদনী বলল।

আরোহণ

সা রা গা মা ক্ষা মা ধা নি সা।

অবরোহণ

সা না ধা মা মা গা মা গা রে সা। বলেই বললেন, গলায় তোলার চেষ্টা করিস তো মা। আর যদি তুলতে পারিস তো শুনিয়ে যাস আমাকে একদিন !

হর্জ কওন চি ক্যা ?

জরুর। জরুর।

কাহে নেহি ?

ইত্যাদি ধ্বনি উঠল।

ধিয়ানগিরিকে ভোলানন্দজি যে চেনেন তা বোঝা গেল। তাহলে চন্দ্রবদনীও চেনে। তাহলে এই চন্দ্রবদনীই সেই চন্দ্রবদনী ? দিওয়ালির দিনে দেখা হবে বলে আশা করেছিল চারণ খুবই। দেখা হয়েও গেল। তবে হৃষীকেশ-এ নয়, দেবপ্রয়াগে। একেই বলে, সাধু সন্তদের ভাষায় "সনযোগ"।

কোনওরকম ন্যাকামি বা ভান-ভড়ং না করেই চন্দ্রবদনী একবার গলাটা পরিষ্কার করে নিয়েই হংসধ্বনির মতন গানটা ধরে দিল।

কী গলা ! আর কী গান !

কে বলবে যে এ, মেয়ে পর্বতদুহিতা, হিমালয়চারিণী। শান্তিনিকেতন, দক্ষিণী, গীতবিতান, রবিতীর্থ, সৌরভ সব কিছুকে বেটে বড়ি বানালে যা হত না, এই কন্যে সেই অঘটন-ঘটন পটিয়সী বটিকা।

সহজ সোজা গান। কিন্তু এই আশ্চর্য সুন্দর গম্ভীর পরিবেশে সেই গানের বাণী যেন অমরাবতীর বার্তা বহন করে আনল। গানটির বাণী শুনলে প্রেমের গান বলেও অনভিজ্ঞর মনে হতেও পারে কিন্তু এ গান যে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করেই বাঁধা তা চন্দ্রবদনীর গলাতে শুনলে, কারওই সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিতে কোনও অসুবিধে থাকবে না।

"তুমি হঠাৎ হওয়ায় ভেসে আসা ধন—
তাই হঠাৎ পাওয়ায় চমকে ওঠে মন।
গোপন পথে আপন-মনে বাহির হও যে কোন লগনে
হঠাৎ গন্ধে মাতাও সমীরণ
নিত্য যেথায় আনাগোনা হয় না সেথায় চেনাশোনা,
উড়িয়ে ধুলো আসছে কতই জন।
কখন পথের বাহির থেকে হঠাৎ বাঁশি যায় যে ডেকে
পথহারাকে করে সচেতন।"

গান শেষ হলে সকলেই বাক্যহারা। গুহাভ্যন্তরে এবং বাইরের চাতালেও পূর্ণ নিস্তব্ধতা নেমে এল। চাতালের মুখে ধুনি জ্বলছিল। শুধু তারই ফুট-ফাট অস্ফুট শব্দ শোনা যাচ্ছিল। গানের চেয়েও গানের রেশ যে অনেকই বেশি আনন্দ-বেদনাবাহী হয়, তা যাঁরা গান প্রায়ই শোনেন, তাঁরাই জানেন।

অনেকক্ষণ পরে ভোলানন্দজি বললেন, তোর আত্মদর্শন হোক মা। যাই চাস, তুই তাই যেন পাস জীবনে। এই আশীর্বাদ করি।

যা, না যাকে ?

দুঃসাহসী পাটন অতজনের সামনেই বলল, ফুট কেটে।

ভোলানন্দ, মনে হল সামান্য বিরক্ত হলেন। কিন্তু মুখে সেই বিরক্তি প্রকাশ না করে বললেন, "যা" বা "যাই"-এর মধ্যে "যে"ও পড়ে।

বলেই, চারণকে বললেন, তোমার সঙ্গে তো চন্দ্রবদনীর আলাপ নেই। এর নাম চন্দ্রবদনী। আর এ চারণ চ্যাটার্জি।

চারণ সাহস করে বলে ফেলল, আপনার তো আজ হৃষীকেশে থাকার কথা ছিল। ভীমগিরি মহারাজ আর যাত্রীদের কাছে যাবার কথা ছিল, তাই না ?

চন্দ্রবদনী অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল।

বলল, চেনেন নাকি আপনি হৃষীকেশের ওঁদের ?

তারপরই বলল, হ্যাঁ। কথা তাই ছিল বৈকি। তবে, এখানে এসেই আটকে গেলাম। নামতে পারলাম না। বদ্রীবিশাল যা করবেন তাইই তো হবে।

আপনি নামতে পারলেন না বলেই হয়তো, আমি উঠে এলাম। দিওয়ালির দিনে দেখা হওয়ার কথা ছিল, তাই হয়ে গেল।

তারপর চারণ চন্দ্রবদনীকে জিজ্ঞেস করল, হৃষীকেশ থেকে ঠিক কতদূর দেবপ্রয়াগ ?

চন্দ্রবদনী উত্তর দেওয়ার আগেই ভোলানন্দজি চারণকে বললেন, আরে ! বেটি কি করে জানবে ? ও কি অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশনের রুট-চার্ট বানায় ?

তারপরেই ওঁর পাশে বসা সেই দীর্ঘাঙ্গি, রোগা, সল্ট-অ্যান্ড-পেপার চুল-দাড়ির সাধুকে শুধোলেন কিঁউ শ্যামানন্দজি ? দেবপ্রয়াগ সে হৃষীকেশ কিতনি দূর পড়েগি ?

শ্যামানন্দজি একটু হাসলেন। ঋষিসুলভ হাসি। তারপর বললেন, হৃষীকেশ সে দেবপ্রয়াগ যিতনি দূর পড়তি হ্যায়, দেবপ্রয়াগ সে হৃষীকেশ ইতনাহি দূর পড়না চাহিয়ে ভোলানন্দজি।

সমবেত সাধুদের মধ্যে থেকে কে যেন বললেন, ওয়াহ্ ! ওয়াহ ! বহুতই আচ্ছা বোলা আপনে।

তারপরই বললেন, বাবা বদ্রীবিশালকি প্যায়ের সে তুমারা শর যিতনা দূর, তুমহারা শর সে বাবা বন্দরীবিশালকি প্যায়েরভি উতনাহি দূর ! ক্যা শ্যামানন্দ ? ঠিক কি নেহি ?

যো বোলা তুম।

বলেই, সল্ট-অ্যান্ড-পেপার শ্যামানন্দজি তাঁর দিকে ছোঁড়া খোঁটাটাকে না ছুঁয়েই অদৃশ্য হাতে উপড়ে নিয়ে প্রশ্নকারীর দিকেই ছুঁড়ে দিলেন।

চন্দ্রবদনী উঠে দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে দুহাত দিয়ে ভোলানন্দজির দুপা ছুঁয়ে প্রণাম করল। সে যখন প্রণাম করার জন্যে অবনতা হল, তার শারীরিক সৌন্দর্য যেন পূর্ণ মহিমাতে পূর্ণচন্দ্রর মতন বিকশিত হল। খোঁপাতে পোড়ামাটি-রঙা একগুচ্ছ নাম-না-জানা পাহাড়ি ফুল গুঁজেছিল। শ্বেতপদ্মর মতন মুখমণ্ডলে সেই ফুলের আভা লাগল।

আভভি আভভি চল পড়েগি বেটি ? ইতনা জলদি ?

সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন তাকে ভোলানন্দজি।

জি হাঁ চাচাজি। রাওয়ালজিকি ঘরমে যানা আভভি। খনা ভি হুঁয়াই খানা।

বলেই, অন্য সকলকে কোমর ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করল। বলল, নমস্তে আপ সব লোঁগোকি। মুঝপর দোয়া রাখিয়েগা।

ভোলানন্দ মহারাজ বললেন, আমরা মাধুকরী বৃত্তি করে খাই, তোকে আমরা কি দেব মা ? শুধু মনের শান্তি ছাড়া আমাদের তোকে দেবার মতন কিছুই তো নেই।

তার চেয়ে, বড় দান আর কি আছে চাচাজি ?

চন্দ্রবদনী চলে যাচ্ছে শুনে চারণের মনটা যতখানি খারাপ হবে ভেবেছিল ততখানি খারাপ হল না দেখে নিজেই অবাক হল। চলে যাচ্ছে মানে কি, দেবপ্রয়াগ ছেড়েই চলে যাচ্ছে ? এখানে কতদিন থাকবে ও তাই বা কে জানে। সে যদি নেমে হৃষীকেশে যায়, তবে চারণও নেমে যাবে কি ? ওঠার চেয়ে নামাটা তো চিরকালই সোজা।

ভোলানন্দজি পাটনকে ডেকে বললেন, এই বাঁদর ! চন্দ্রবদনীকে সাবধানে রাওয়ালজিদের বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া আয়। অন্ধকার রাত। সঙ্গে আলো লইয়া যা।

হুঁঃ।

পাটন বলল,

হুঁ ক্যান ? কী ব্যাপার ? তুই তো দেখতাছি দিনে দিনে আমার ইয়ার হইয়া উঠতাছস। হারামজাদা !

চন্দ্রবদনী, তার সামনেই পাটনের এরকম হেনস্থা দেখে অপ্রতিভ হয়ে উঠল।

কিন্তু পাটন বলল, সঙ্গে চন্দ্রবদনী থাকলে তো অমাবস্যার রাতের পথ এমনিতেই আলো হয়ে যাবে। আপনারই গুরুজি বুদ্ধি-শুদ্ধি দিনে দিনে লোপ পাচ্ছে। কত বলি যে শীর্ষাসন বেশি করবেন না। তা, কথা শোনেন কই ?

সমবেত সাধু-সন্ত মণ্ডলী পাটনের সাহস দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু হেসেও উঠলেন। সবচেয়ে অবাক হল এবং মজা পেল চন্দ্রবদনী নিজে। সে ফিক করে হেসে দিল।

পাটন বলল চারণকে, স্যার আপনি ?

ভোলানন্দজিই বললেন, পাটনের কথার পিঠে, না ! চারণবাবু এখানেই থাকবেন। নষ্ট করার মতন সময় ওঁর নেই। তোর তো আর কিছুই হবে না। এই সব ডিউটিই কর। ইচ্ছে করলে, রাজনীতিও করতে পারিস। আজ আমরা সৃষ্টি-রহস্য নিয়ে আলোচনা করব। যা তুই। পালা এখন। তারপর চন্দ্রবদনীর দিকে ফিরে বললেন, আয় মা। আবার আসিস।

এসে কি লাভ ? আপনি তো মৌনীই থাকবেন।

আরে আসিসই না। আমি যখন মৌনী থাকি তখনই তো অন্য অনেকে মুখর হয়। আমরা কাছে নাই বা এলি, এখানে এসে তোর ভক্তর অভাব তো কখনই হবে না। তুই নিজেকে জানিস না। নিজেকে জানা উচিত।

আত্মানং বিদ্ধি।

পাটন বলল।

বাঁদরামি না কহর‍্যা অরে লইয়া যা হনুমান।

তাও একটু প্রোমোশন হল।

পাটন বলল, বিনয়ের সঙ্গে, মুখটি অধোবদন করে।

কিসের প্রমোশান ?

এই ! বাঁদর থেকে হনুমান।

আস্ত মর্কট একখান।

ভোলানন্দজি বললেন।

পাটন বলল, আচ্ছা। বাঙালদের ভাষা কিন্তু রত্নগর্ভা। এক বাঁদরকে নিয়েই কতরকম শব্দ আছে আপনাদের তূণে।

যা, যা, পালা।

ভোলানন্দজি বললেন।

পাটন চলে গেলে আবারও মৃদু হাসির রোল উঠল। কম সন্নিসীই বাংলা বোঝেন। যাঁরা বা একটু বোঝেন, তাঁরাও পূর্ববঙ্গীয় ভাষা একেবারেই বোঝেন না। হাসিটা ওরা হাসলেন আন্দাজেই। বিদেশি দুজন তো বোঝেনই না। হিন্দিও ভাঙা ভাঙা বলেন। তিন-চতুর্থাংশ বোঝেন।

চারণ বুঝল যে, চন্দ্রবদনী এই সন্নিসীদের কারও কাছেই নবাগন্তুক নয়। বিদেশিদের কথা বলতে পারবে না। অন্যরা সকলেই ওঁর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

আপনি যদি পাটনের সঙ্গে যেতে চান তো যেতে পারেন চারণবাবু। ওরা সামান্য পথই গেছে।

না, না।

বলল চারণ।

এই "না" কিন্তু মন থেকেই বলল ও। যদিও নিজের কানেই যেন প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি জোর শোনাল।

এখানে এসে অবধি এবং বিশেষ করে বিভিন্ন মহারাজের সংস্পর্শে আসা অবধি ওর মনোজগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে যেতে শুরু যে করেছে তা ও বুঝতে পারছে। এ এক বিশাল আদি-অন্তহীন জ্ঞানের জগৎ। সে জগৎ যে আদৌ ছিল, সে সম্বন্ধে ওর কোনও ধারণাই ছিল না। সত্যিই জানে না চারণ তার জীবন তাকে কোন দিকে নিয়ে যাবে। সন্নিসী মাত্রই যে ধান্দাবাজ নন, স্বার্থান্বেষী নন, এই সব স্বল্পাহারী, অনাহারী গিরিকন্দর-মরুভূমি এবং নদীপ্রান্তে বসবাসকারী মানুষগুলির মধ্যে অনেকেই যে এক একটি চলমান এনসাইক্লোপিডিয়া, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের সংজ্ঞা, সে বিষয়ে ওর কোনও সন্দেহই নেই। এখন জানছে যে, গৃহীদের সাধু-সন্তদের সম্বন্ধে অনেকেই ভ্রান্ত ধারণা থাকে। গৃহীদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের বিদ্রূপের চোখে দেখেন যে একথা তাঁরা জানেন বলেই হয়তো যাচাই করতেও দেন না, নিজেদের ঔদাসীন্যর মুখোসও খোলেন না।

পাটন কাল সকালেই বলছিল, বাবারও বাবা আছে স্যার। এহ বাহ্য আগে কহ আর। এ গুরু, আমার যোগ্য হয়তো। কিন্তু এই দেবপ্রয়াগ এক সাংঘাতিক জায়গা। এই বাঙাল 'ভোলা'কেও

সহজে ঘোল খাওয়াতে পারেন এমন বহুত সাধুসন্ত এই জায়গার আনাচে-কানাচেতে ছড়িয়ে আছেন। সব সন্তই তো আর রক্তচন্দন-রঙা সিল্ক বা টেরিকটের পোশাক পরে বিদেশী পারফ্যুম মেখে মহিলা ও অর্থ বেষ্টিত হয়ে মোক্ষর পথপ্রদর্শক হন না। যার প্রার্থনা যত বড়, তার সাধনাও তত কঠোর। আপনার হয়তো এঁর চেয়েও অনেক বেশি উচ্চমার্গের কোনও গুরু মিলবে। কেরিয়ারিস্টরা যেমন নানাজনকে নানাভাবে ব্যবহার করার পরে মইয়ের মতনই জোড়া পায়ে লাথি মেরে ঠেলে ফেলে দেন, তেমনই গুরুদেরও 'স্টেপিং-স্টোন' হিসেবে ব্যবহার করে আপনি ত্যাগ করে যেতে পারেন। তবে ওঁরা তাতে একটুও রাগ করবেন না। একের কাছে পাওয়া শেষ হয়েছে তো অন্যের কাছে যান, এঁর কাছে পাওয়া শেষ তো এঁকে ত্যাগ করে ওঁর কাছে চলে যান। আপনাকে ঠেকাচ্ছেটা কে ? সত্যজিৎ রায়ের ছবির রাজকন্যারই মতন গুরুও তো আর কম পড়ে নাই।

মা ভৈঃ।

চারণ বলেছিল, আমাকে স্যার স্যার কোরো না তো। দাদা বলবে।

মাত্থা খারাপ ! আমার জন্মদাতা পিতা যাঁকে "স্যার" বলে অ্যাড্রেস করতেন, রামভক্ত হনুমানের মতন হাত জোড় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন যাঁর সামনে, তাঁকে আমি 'দাদা' বলে মহাপাতকের কাজ করতে পারি ! আপনি আবার বাবার 'স্যার', আমারও স্যার। ওয়ানস আ স্যার অলওয়েজ আ স্যার।

শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণ করল যে 'স্যার' না 'ষাঁড়' ঠিক বুঝতে পারল না চারণ।

ছেলেটা সত্যিই বাঁদর। শুধু বাঁদরই নয়, বাঁদর 'টু দ্য পাওয়ার এন'।

ভোলানন্দজি কি যে দেখেছেন এর মধ্যে তা তিনিই জানেন।

শ্যামানন্দজি বললেন, হ্যাঁ ! কোথায় যেন ছিলাম আমরা ?

অ্যানি বেসান্ট-এর কথা বলছিলাম আমি সেদিন।

একজন শ্বেতাঙ্গ অবাক হয়ে বললেন, অ্যানি বেসান্ট ?

হ্যাঁ। উনি লিখেছিলেন...

"No particles of matter is in contact with any other particles but each swings in a field of ether."

চারণ বুঝল, সেদিন ভোলানন্দজি যে আলোচনা করেছিলেন তারই সূত্র ধরে ঐ কথা বললেন শ্যামানন্দজি।

শ্যামানন্দজি বললেন, শুধু উনি একা কেন ? বেদান্ত সম্বন্ধে যাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল সেই জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের কথাতে বলতে গেলেও বলতে হয় যে...

"The cosmic presents itself to us objectivly under the form of great natural forces.Gravitation, heat, light, electricity, chemical affinity etc. then as the organising power in vegetables and animals; finally as human self-consciousness and sociabillty."

ছান্দোগ্যোপনিষদও বলছে যে এই ইথারই জন্মদাতা এবং প্রকাশক, সব কিছুরই। এক উপাদানই অন্য উপাদানে রূপান্তরিত হয়ে যায় নানা ক্রিয়া-বিক্রিয়ায়। কোনও উপাদানই নষ্ট হয় না, আত্মারই মতন। এই ইথারই জীবিত বা মৃত যা-কিছুকেই আমরা জানি বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতিতে, বা জানতাম, তার সব কিছুরই জন্মদাতা।

গীতাতে বলছে :

"নৈন্যং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈন্যং দহতি পাবক।
ন চেনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ "

অর্থাৎ, শস্ত্রসমূহ ইহাকে (আত্মাকে) ছেদন করতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, জল আর্দ্র

করতে পারে না এবং বায়ুও ইহাকে দগ্ধ করতে পারে না।

একজন বিদেশী জিজ্ঞেস করলেন, আত্মা কি ? সত্যিই কি আত্মার বিনাশ নেই ? হিন্দু ধর্মে যে বলা হয় পরজন্ম আছে, পরলোক আছে। তার প্রমাণ কি ?

শ্যামানন্দজি বললেন, সব কিছুর অস্তিত্বরই প্রমাণ দাবি করার গভীর বদভ্যাস আছে তোমাদের, মানে পশ্চিমীদের। তোমরা বাইবেল আর কোরান বা হাদিসকে অকাট্য প্রমাণ বলে অবলীলায় মেনে নেবে আর হিন্দুধর্মের যে সব মূল শাস্ত্র আছে, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বেদ, উপনিষদ, শুধুমাত্র এদেরই "প্রামাণ্য নয়" বলে সহজে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দেবে, তা কি করে হয় ? তাছাড়া তুমি আমাদের পুরাণে, শাস্ত্রে, বেদ-বেদান্তে বিশ্বাসই না-করো এবং সেই অবিশ্বাস আমাদেরই সামনে, যারা এই সব শাস্ত্রে বিশ্বাস করি বলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি, এমন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের জীবন যাপন করছি, প্রকাশ করছ ? তা করতে অবশ্যই পারো। সব মতই এখানে গ্রাহ্য। কিন্তু বলতে পারো, পৃথিবীর আর কোনও ধর্মাবলম্বীদের সাধু-সন্ত বা পীর বা ফাদার এইরকম কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ব্রত নেন ? তোমার কি ধারণা ভারতের হাজার হাজার বছরের এই সাধনা সবই শূন্য কুম্ভে গেছে ? এবং যাবে ?

তাই যদি মনে করব, তাহলে এতদূরে কিসের খোঁজে এলাম। আমিও তো এখানে ফাইভ-স্টার হোটেলে নেই। কায়মনোবাক্যে আপনাদেরই তো অনুগমন করার চেষ্টা করছি অনুক্ষণ।

শ্বেতাঙ্গ যুবকটি বলল।

সেই শ্বেতাঙ্গ যুবকটির নাম স্টিভেন্স, তার বয়স হবে, বেশি হলে তিরিশ।

ভোলানন্দজি তারপর বললেন, তুমি জার্মানি কম্পোজার বিঠোভেন-এর কোনও কম্পোজিশান কি শুনেছ ?

স্টিভেন্স হেসে বললেন, বিঠোভেন শোনেননি এমন শিক্ষিত পশ্চিমী হয়তো ভবিষ্যত প্রজন্মে কেউ কেউ থাকবে কিন্তু আমাদের প্রজন্ম অবধি কেউই নেই অন্তত।

চারণ বলল, শুধু পশ্চিমেই বা কেন, পুবেও হয়তো কেউ নেই।

চারণ ভাবছিল যে, যেমন আমাদের বাঙলার রবীন্দ্রসংগীত। এমন প্রজন্মও পরে হয়তো আসছে বাঙালিদের মধ্যেও 'রবীন্দ্রনাথের গান' যে কি তাই জানবে না। 'জীবনমুখী গান', 'মরণমুখী গান', নীল ব্যানার্জি, লাল সেন, হলুদ ভৌমিকদের গানকেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া বলে জেনে তারা আহ্লাদবোধ করবে।

তা বিঠোভেনের কথা কেন ওঠালেন মহারাজ ?

গর্ডন প্রশ্ন করলেন।

বিঠোভেন-এর last quartet-এর movement তিনটি motifs-এর উপরে ভর করা।

কি ? কি motifs? সেগুলি নিশ্চয়ই জার্মানি ভাষাতেই।

obviously!

যেমন ?

স্টিভেন্স শুধোল।

Muss es Sein?

Es Muss Sein!

Es muss Sein!

মানে ?

চারণ প্রশ্ন করল এবারে।

চারণের প্রশ্নে স্টিভেন্স-এর মুখে স্মিতহাসি ফুটে উঠল।

স্টিভেন্স বলল, Must it be?

It must be!

It must be!

ভোলানন্দজি বললেন, তুমি জানো কি না জানি না স্টিভেন্স—এই বাক্যবন্ধের অর্থ সম্বন্ধে যাতে

শ্রোতাদের মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা না থাকে সেই জন্যেই Beethoven introduced the movement with a phrase "DER SCHEWER GEFFASSTE ENTS CHLUSS."

স্টিভেন্স-এর মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল।

এই ফ্রেজ-এর মানে ?

চারণ ভোলানন্দজিকে জিজ্ঞেস করল।

উনি হেসে বললেন, মানে হচ্ছে, "দ্য ডিফিকাল্ট রেজল্যুশান।"

তারপরই স্টিভেন্স-এর দিকে ফিরে বললেন, কি ? ঠিক বলেছি ?

কন্দরের মধ্যে যে স্বল্প কজন মানুষ বসে ছিলেন তাঁরা চুপ করেই রইলেন। সব চেয়ে বেশি অবাক হলেন সেই দুই বিদেশি, গর্ডন আর স্টিভেন্স। দেবপ্রয়াগের অলকানন্দা আর গঙ্গার তীরের এই সুউচ্চ শিবালিক পর্বতমালার গায়ের গুহাভ্যন্তরের বাসিন্দা এই লুঙি-পরা বাঙালি সন্ন্যাসীর জ্ঞানের বহরে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যেন। ভারতীয়রা তো ইংরেজরই চাকর ছিল। ইংরেজি ভাষাটা শিক্ষিত ভারতীয়রা ভাল জানতেই পারেন। কিন্তু জার্মান ?

চারণের মনে হচ্ছিল, পাটন তার একটি মস্ত বড় উপকার করেছে। তার এই "মুখখিস্ত্যানন্দ" বাবা অচিরেই চারণের মনে যে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন নিজেকে, বিনা চেষ্টাতে, বিনা আড়ম্বরে, সেই আসন টলানো কোনওমতেই হয়তো সম্ভব হবে না। ভাবছিল ও যে, যে-কোনও সম্পর্কেই শ্রদ্ধাই হচ্ছে আসল। সিমেন্টিং ফ্যাক্টর। সে সম্পর্ক প্রেমেরই হোক, দাম্পত্যেরই হোক, আর ভক্তিরই হোক। শ্রদ্ধাই বেঁধে দেয় বিনিসুতোর মালা, দুজনের মধ্যের সম্পর্ককে।

এমন সময় পাটন ফিরে এল।

ভোলানন্দজি বললেন, আস্ত পৌঁছাইছে তো আমার বন্ধুর মাইয়াডা ? না কি পথেই বর্ষার দিনে শিয়ালে যেমনে কইমাছের মাথা চিবাইয়া ক্ষ্যাত-এর আল-এর উপরে ফ্যালাইয়া থোয়, তেমনি কইর‍্যা তারে চিবাইয়া চিৎ-কইর‍্যা ফেইল্যা আইছস ? বদনাম হইব অনে এই বুড়ারই।

আপনাকে কেউ বদনাম দেবেই না। আর আপনি যদি বুড়ো হন তো ছোঁড়া কে ?

ক্যান ? বদনাম হইব না ক্যান ?

আপনি তো এই প্রকারের কইমাছ কখনও খানইনি। তার মাথা আর লেজ। যদি কোনওদিন খেয়ে থাকেনও তবুও কী করে খেতে হয় তা এখন নিশ্চয়ই পুরোপুরি ভুলেই গেছেন। আপনার কোনওই ভয় নেই। বদনাম করলে, কি খুন করলে, লোকে আমাকেই করবে।

চারণ, পাটনের ধৃষ্টতা ও সাহসে হতবাক হয়ে গেল। তাছাড়া, যদি ভোলানন্দজি একা থাকতেন তাও না হয় অন্য কথা ছিল। এতজন মানুষের সামনে।

কিন্তু ভোলানন্দ মহারাজ তো নন, যেন বাঙাল শ্রীরামকৃষ্ণ। আশ্চর্য শিশুসুলভ হাসি হেসে বললেন, হারামজাদা। তরে আমি একদিন মাইর‍্যাই ফ্যালাইমু।

আনডন্টেড রাসকেল, রাসকেল অফ দ্য ফারস্ট ডিগ্রি, পাটন, হেসে বলল, কইমাছই খেতে পারেন না তার আমাকে খাবেন। ফুঃ! আমাকে হজম করতে আপনার পঞ্চাশবার জন্মে আসতে হবে। আমার বাবা হারামি টু দ্য পাওয়ার ওয়ান মিলিয়ান আর আমি হলাম হারামি টু দ্য পাওয়ার এন। আমাকে খেলে, সারাটা জীবন আপনি কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগে মরবেন।

সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেল পাটনের এক্তিয়ার-বহির্ভূত তাচ্ছিল্যময় বাগাড়ম্বরে।

কিন্তু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ভোলানন্দ মহারাজই সবচেয়ে আগে হাসলেন। আর সে কি হাসি! রামকৃষ্ণদেবকে চারণ তো চোখে দেখেনি। দেখলে, হয়তো তাঁর হাসিও এমনই দেখাত।

হাসি থামলে উনি বললেন, কোনও সার্কাসই যেমন একজন জোকার ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকে তেমনই আমাদের এই দেবপ্রয়াগের ছোট্ট সার্কাসও পাটন না থাকলে অসম্পূর্ণ থাকত।

কথাটা বললেন ইংরেজিতেই, যাতে গর্ডন এবং স্টিভেন্স নামক দুই বিদেশি বুঝতে পারেন।

ভোলানন্দজি এবারে পাটনকে বললেন, ধুনির আগুনটা একটু নেড়েচেড়ে দিয়ে এসে বোস। বাইরে ঠাণ্ডাটা কি বাড়ল ?

পাটনের সঙ্গে ভোলানন্দজি অনেক সময়েই বাঙাল ভাষাতে কথা বলেন দেখে চারণ ভেবেছিল পাটনদের আদি বাড়িও বোধ হয় পুব-বাংলায়। ওকে জিজ্ঞেস করাতে বলেছিল আমার ঠাকুর্দা হাওড়া জেলার ডাকাত ছেল। বাবা, প্রথম জীবনে ওয়াগান ব্রেকার। তারপরে ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্ট। সাতজম্মেও আমরা কেউ যাইনি পুব-বাংলাতে।

শুনে অবাক হয়েছিল চারণ।

ঐ রকমই।

পাটনের হাবভাব কথাবার্তা শুনলে কে বলবে যে ও ন-দশ বছর স্টেটসে ছিল। দেশে হা-ভাতে এবং বিদেশে গিয়ে অ্যাফ্লুয়েন্ট প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই দিশি বাঙালিদের মানুষ-প্রজাতির মধ্যেই গণ্য করেন না। সেখানে যাঁরা বিরাট বাড়ি ও ঢাউস গাড়ি নিয়ে গরিব বাঙালি-পাঁঠার মতনই নিরীহ এবং কূপমণ্ডুক দিশি আত্মীয়-বন্ধুদের "ঈর্ষান্বিত" করেন বলে ভাবেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই দেশেই যদি থাকতেন তাহলে হয়তো মাসে পাঁচ হাজার টাকাও রোজগার করতে পারতেন না। টাকার অঙ্কের পরিমাণের উপরেই মানুষের মনুষ্যত্বর দীপ্তি বাড়ে না বরং অনেকক্ষেত্রেই তা জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশানে হ্রাসই পায়, এই সরল সত্যটি অনেক এনআরআই-ই কনভিনিয়েন্টলি ভুলে যান।

শ্যামানন্দজি বললেন, গর্ডনকেই উদ্দেশ্য করে, এবার আমরা সকলে মিলে একটু ভজন করি? আজ দিওয়ালির রাত। কী বলুন।

আমাদের তো রোজই দিওয়ালি।

ভোলানন্দ মহারাজ বললেন, আজ যে সিনিবালি।

তা বটে।

ভজন শুরু করার আগে যদি গর্ডন আর স্টিভেন্স-এর আর কোনও প্রশ্ন থাকে তো তারা করে নিতে পারে। আজ আমি একটু পরেই ধ্যানে বসব। তোমরা অবশ্য এখানেই থাকতে পারো। আমি বাইরে যাব।

স্টিভেন্স বললেন, একটা প্রশ্ন, গোড়ার প্রশ্ন, আমার মন তোলপাড় করছে বহুদিনই হল কিন্তু কারওকে জিজ্ঞেস করেই স্যাটিসফ্যাক্টরি উত্তর পাইনি আজও।

কী প্রশ্ন?

ধর্ম কি?

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

ভোলানন্দ মহারাজ হিন্দিতে বললেন, ভাল দিনে ভাল প্রশ্নই করেছে স্টিভেন্স। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে তো এক রাতে কুলোবে না। তারপরেও কত রাত কত দিন যে কেটে যাবে কে বলতে পারে।

শ্যামানন্দজি বললেন,

"যতহোভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম"

গর্ডন বোধহয় একটু সংস্কৃত জানেন। তাঁর বাঁ কানটা দুবার নড়ে উঠল। কিন্তু শ্লোকটি পুরোপুরিই চারণের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। লজ্জাতে দুকানই লাল হয়ে গেল ওর।

মানেটা বুঝিয়ে দাও শ্যামানন্দজি।

ভোলানন্দ বললেন।

হ্যাঁ। তারপর বললেন, ধর্ম যে কি? তা তো এক কথাতে বলা মুশকিল। যে কাজে ইহলোক এবং পরলোকের সুখ নির্বিঘ্ন হয়, ঈশ্বরের সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, যে পথ ও পন্থাতে চললে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুখ সমৃদ্ধি লাভ করে এবং যে সব কাজ করলে, পরলোকের সুখের পথের বাধা আসতে পারে, সেই সব কাজ ও পন্থা পরিত্যাগ করে যা-কিছুই ইহলোক এবং পরলোকের মঙ্গলসাধক, তেমন কর্ম করাই মানুষের ধর্ম। তাই ধর্ম।

ঠিক পরিষ্কার হল না।

স্টিভেন্স বললেন।
অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় "ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্মেণ বিধৃতা প্রজাঃ।"
এই শ্লোকটির মানে কি ?
এবারে চারণ বলল।
শ্যামানন্দজি বললেন, এর মানে হচ্ছে, যা না হলে সংসার চলতে পারে না বা স্থির থাকতে পারে না এবং যা পৃথিবী এবং ব্রহ্মাণ্ডর অন্যান্য সকল লোককে ধারণ করে থাকে, তাই ধর্ম। এবং যা-কিছুই এর বিপরীত অথবা এর বিপরীত ফল উৎপন্ন করে, তাই অধর্ম।
বাঃ।
ভোলানন্দজি স্বগতোক্তি করলেন।
তারপরে ভোলানন্দজি বললেন, রবীন্দ্রনাথ সোজা করে বলেছিলেন এক কথায়, "যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম।" A force which binds together.
তারপরই বললেন, কী অবস্থা হল বলুন তো। বিদেশে, বিশেষ করে জার্মানিতে সংস্কৃত চর্চা হচ্ছে এত, আর স্বদেশেই সেই ভাষার কোনও কদর নেই। শুধু সংস্কৃতই নয়, আরবি এবং ফারসিরও সেই একই অবস্থা। আমরা আমাদের ছেলেবেলাতে দেখেছি যে, অনেক শিক্ষিত বাঙালিই বাংলার উপরে ইংরেজি যেমন জানতেন, তেমন সংস্কৃত ও আরবি অথবা ফারসিও জানতেন। দুই থ্রি-পিস-স্যুট পরা সাহেব, মানে, নেহরু আর জিন্না সাহেব, বিভাজিত দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী বনে গিয়ে ফারসি, আরবি আর সংস্কৃতর সর্বনাশ করে দিলেন। অথচ দেখো, ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানের মূল সংস্কৃতি, ধর্ম, সামাজিকতা সব কিছুরই গোড়া হচ্ছে ওই সব ভাষাই। উর্দু তো এই সেদিনের ভাষা। খিচুড়ি ভাষা। Commoner-এর ভাষা। অবশ্য খুবই সুললিত ভাষা। কিন্তু মুসলমানেরা নামাজ পড়েন বা মোল্লারা আজান দেন কি উর্দুতে ?
চারণ বলল, সে কথা ঠিক। সংস্কৃতর মতন ভাষাও হয় না। কী ঝংকৃত। কী তার সাহিত্য, কাব্য।
পাটন মাঝে পড়ে বলল, আমার এক বন্ধুর বিয়েতে পার্ট-টাইম, গাঁট-কাটা এক পুরুত "পুরোহিত-দর্পণ" বই দেখে বিয়ের মন্ত্র পড়তে গিয়ে বিয়ের মন্ত্রর বদলে শ্রাদ্ধর মন্ত্র পড়ে দেওয়াতে তার স্ত্রীর সঙ্গে অনুক্ষণ মারামারি-কাটাকাটি লেগেই আছে সেই ফুলশয্যার রাত থেকেই। শিগগির হয়তো ছাড়াছাড়িই হয়ে যাবে। নেহাতই লোকভয়ের ভয়েই এখনও জুড়ে রয়েছে। কী ব্যাপার একবার ভাবুন তো দেখি !
ভোলানন্দজি হেসে ফেললেন।
শ্যামানন্দজিকে বললেন, দেখছ তো ! আমি যা বলে আসছি এতদিন তা ঠিক কি না ! সংস্কৃতভাষা থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে টিভি-র "হমে শোচনা হ্যায়" মার্কা হিন্দির পত্তন করে এত বড় একটা মহান দেশকে তার মূল ধার্মিক, সাহিত্যিক, লৌকিক, সাঙ্গীতিক উৎস থেকে জবরদস্তি করে দূরে সরিয়ে এনে দেশটার সর্বনাশ করে দিলেন ওঁরা।
চারণ অবাক হয়ে ভোলানন্দজির দিকে চেয়ে বলল, আপনি যে এতসব বিষয় নিয়ে ভাবেন এবং নিজেকে উত্তেজিতও করেন তাতে আপনার মনের শান্তি, চিন্তার স্বচ্ছতা বিঘ্নিত ও আলোড়িত হয় না ?
ভোলানন্দজি হাসলেন।
বললেন, মানুষের মন কি আর পানা-পুকুর চারণবাবু ? মন হচ্ছে সমুদ্র। তার কত গভীরতা, তার গভীরে কত পাহাড়, রাজপথ, ফুল, জীবজন্তু বাস করে। সমুদ্রের গভীরে কতরকমের তাপ ও শৈত্য, কতরকমের প্রবাহ, প্রস্রবণ, আগ্নেয়গিরি, হিমবাহ। মানুষের মনে যা আঁটে, তা পৃথিবীতেও আঁটে। শান্তি বা মনোসংযোগ যদি একবার আয়ত্ত করে ফেলা যায় তবে কোনও চিন্তাই আর সেই শান্তি এবং মনোসংযোগকে একটুও বিঘ্নিত করতে পারে না।
তাই তো দেখছি।

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

মুগ্ধ চারণ বলল।

পরলোক কি সত্যিই আছে ?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকা গর্ডন নামের বিদেশি জিজ্ঞেস করলেন।

মনে হয়, মানুষটি আমেরিকান।

ভোলানন্দ মহারাজ বললেন, ভূলোক ছাড়াও যখন অন্য অনেক লোক আছে তখন পরলোকও আছে। দেবতাশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার সৃষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডর মধ্যে অনেকই "লোক" আঁটে।

তারপর বললেন, এই তোমরা যাকে বল UNIVERSE আমরা তাকেই বলি "ব্রহ্মাণ্ড"। "অণ্ড" মানে EGG। ব্রহ্মাণ্ডর অবয়ব অনেকটা ডিমের মতন তাই তার নাম ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ভুবর্লোক, স্বরলোক, মহার্লোক এবং ব্রহ্মলোকও আছে। পৃথিবীর চারদিকে ঘিরে আছে সুউচ্চ সব পর্বতমালা, যাদের নাম লোক ও অলোকা। আমাদের শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-এ আছে মৃত্যুর পরে "ব্রহ্মরন্ধ্র" দিয়ে, দেবতা ইন্দ্র, যাঁর পরলোকে যাওয়ার বাধা আছে তার শরীর আছে বলে, সেই সব বিদেহী আত্মাদের নিরন্তর পরলোকের পথে পাঠান। পৃথিবী আর ব্রহ্মলোকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে আছে এক মৃদু এবং প্রায় অনুপস্থিত হাওয়া। প্রাণ হচ্ছে একক সত্তা আর হিরণ্যগর্ভ হচ্ছে বহু প্রাণের সমষ্টি। সম্মিলিত প্রাণ। এই পৃথিবী, এই প্রাণ, এই হিরণ্যগর্ভ সবই ব্রহ্মারই মধ্যে লীন।

শ্যামানন্দজি বললেন, মহাভারতে পাণ্ডবদের স্বর্গবাসের কথা আছে। অনেকেরই মতে, স্বর্গ এই পৃথিবীতেই আছে।

ভোলানন্দজি বললেন, ঋগ্বেদে "ইলাস্বর্গর" কথা আছে। অনেকের ধারণা এই "ইলা" হচ্ছে চীনদেশের উত্তরভাগের "অলতাই" পর্বতমালা। স্বর্গ পৃথিবীতেই আছে। পরলোক আর স্বর্গ এক নয়। ওই অঞ্চলে যেসব মানুষের বাস তাঁদের বলে "দেব", তাঁদের আবাসস্থলকে বলে "দেবভূমি", তাদের ভাষা, সংস্কৃতকে বলে "দেবভাষা"। আমরা যাঁদের ব্রাহ্মণ বলি, তাঁদের নাম ভূদেব।

শ্যামানন্দজি বললেন, ভাল কাজ করলে মানুষের যে স্বর্গবাস হয়, এই ভাবনার মধ্যে তো কোনও দোষ নেই। এই ভাবনা ভুল হলেও দোষ নেই। আমি অন্তত দোষ দেখি না।

গর্ডন বলল, আর একটু বুঝিয়ে বলুন।

"ধর্মবোধ"-এর সঙ্গে অনাদিকাল থেকেই ভারতের মানুষদের কাছে শুভাশুভ বোধ, ন্যায়-অন্যায় বোধ ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে আছে। কেউ ঈশ্বরকে স্বীকার করলেন কি না ("কম্যুনিজম"-এর থিওরির মধ্যে আমি কোনও দোষ দেখি না) বা তথাকথিত ভারতীয় "ইনটেলেকচুয়ালরা" ঈশ্বর বা ধর্ম মানলেন কি না মানলেন, তাতে ভারতের এবং বাংলাদেশের এমন কি পাকিস্তানেরও মূল সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ধার্মিক প্রবাহের কিছুমাত্র যায় আসেনি। আসবে না। তবে সর্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই যাঁরা প্রকৃত শিক্ষিত তাঁদেরই নিজের নিজের ধর্মর "গোঁড়া" জনসাধারণের সঠিক পথে চালিত করতে হবে। মুশকিল হচ্ছে এই, গর্ডন যে, তোমাদের সব পশ্চিমী দেশও এখন ভারতীয় ইনটেলেকচুয়ালদেরই মতন ছদ্ম আঁতেলকচুয়ালস-এ ভরে গেছে।

গুরু, ধর্ম, ঈশ্বর, ঈশ্বরবোধ, প্রকৃত বুদ্ধিজীবী, পরলোক, এই সব ব্যাপার অত্যন্তই গোলমেলে গর্ডন। আজ থাক। পরে হবে। আজ দিওয়ালির দিনে কথা কম বলে, এসো আমরা কৃষ্ণা উলঙ্গিনীর ভজনা করি।

পাটনের সঙ্গেই গুহার ভিতর থেকে বেরোল চারণ। তারপর চাতাল পেরিয়ে ধুনির পাশ কাটিয়ে বাইরে এসে পড়ল। বাইরে আসতেই বুঝতে পারল ঠাণ্ডার বহর। গুহার ভিতরে অনেকে থাকায় মানুষের শরীরের উত্তাপ তো ছিলই, তার উপরে গুহামুখে ধুনি জ্বলাতে ভিতরটা গরমও হয়ে ছিল বেশ।

পাটন বলল, মাথা ধরেনি আপনার চারণদা ?

বাবা। হঠাৎ চারণদা ?

নাঃ। পরীক্ষাতে পাশ করিয়ে দিলাম আপনাকে। বাবার "স্যার" ছিলেন এখন আমার দাদাতে প্রমোশন দিলাম। এবারে বলুন, মাথা গরম হয়েছে কি না ?

তা একটু হয়েছে বই কী ।

উঃ রিঃ ফাদার । এক সঙ্গে এত জ্ঞান কি সহ্য হয় ? গাঁজা খেলেও মাথা এত গরম হয় না ! আর ঐ অ্যামেরিকান দুটোও কেমন আদেখলাপনা করছিল লক্ষ করেছেন ? ওদের জন্য সিম্পল ইংরেজিতে "মোক্ষ মেড ইজি" বলে একটা বই লিখব আমি ! ভাবছি, সিরিয়াসলি । মোক্ষলাভের জন্য কোনও ট্যাবলেট বানানো গেলেও বানানো যেত । ইনস্ট্যান্ট কফিরই মতন ইনস্ট্যান্ট মোক্ষ । আধ-গেলাস জলের সঙ্গে গিলে ফেললেই বাসস । ও ব্যাটাদের কি অত ধৈর্য আছে যে আমাদের সাধু-সন্নিসীদের কাছ থেকে জ্ঞান নিয়ে মোক্ষলাভ করবে ? যারা নিজেরা হাত দিয়ে দাঁত মাজে না, ছুছু করে না, গাড়ির গিয়ার চেঞ্জ করে না, গ্যারাজের গেট খোলে না, ঘরের দরজাও, যে মহৎ ও ব্যস্ত মানুষদের সময়ের এতই দাম, তারা করবে এত সময় নষ্ট !

তা করছে বলেই তো মনে হল ।

চারণ বলল ।

ওরা দুজনে করছে । কিন্তু ওরা একসেপশান । একসেপশান প্রুভস দ্য রুল । দশ দশটা বছর ওদের মধ্যে থেকে ওই নিজেদের স্বাস্থ্য আর অর্থ-সর্বস্ব মোটা-মাথা, ঘোর তামসিক জাতটা সম্বন্ধে আমার ঘেন্না জন্মে গেছে । সারা পৃথিবীকে অর্থলোভী, মুনাফাসর্বস্ব-বিজ্ঞাপনসর্বস্ব করে তোলার পেছনে ওদের যা অবদান তা বলার নয় । সমস্ত পৃথিবীকেই নষ্ট করে দেওয়ার মূলে ওরা । ওদের বিচার একদিন করবে সারা পৃথিবীর মানুষে ।

ওদের নাম কি ?

কাদের ?

আরে । ওই যে ! ওই অ্যামেরিকানদের ।

একটার নাম রনাল্ড গর্ডন । হুস্টনে বাড়ি । আর অন্যটার নাম জিম স্টিভেন্স, সেটার বাড়ি কেচাম-এ ।

কোনজন স্টিভেন্স ? দুজনের মধ্যে যে বয়সে বড় ?

না, দেখতেই বড় । কিন্তু গর্ডনটাই ধাড়ি আর স্টিভেন্সটা ছোট ।

তাই ? তা কেচাপটা কোথায় ?

চারণ শুধোল ।

কেচাপ নয়, স্যার, থুরি চারণদা, কেচাম । আপনি কি টোম্যাটো কেচাপ ভাবলেন না কি ? কেচাম হল গিয়ে আইডাহো স্টেট-এর একটি জায়গা ।

আইডাহো ! নামটা যেন চেনা চেনা লাগছে ।

লাগতেই পারে । আর্নেস্ট হেমিংওয়েতো আইডাহোর কেচাম-এই আত্মহত্যা করেছিলেন ।

পাখি শিকারে গিয়ে । না ?

না না । ওঁর বাড়িতেই । আমি দেখে এসেছি সেই বাড়ি ।

ইনকামট্যাক্সওয়ালারা বহতই তংক করেছিল । আইনস্টাইন আর হেমিংওয়ে দুজনেই ইনকামট্যাক্সওয়ালাদের ভীষণই ভয় পেতেন । আর রঙ্গই বটে ! চোর-বদমাস গাঁটকাটা-স্মাগলার সকলকে বগলের তলা দিয়ে পার করে দিয়ে, ধরত ধর গরীব কবি-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী-গায়ককে !

তুমি নিজে গেছ হেমিংওয়ার সেই বাড়িতে ?

গেছি মানে, ঢুকিনি । বাইরে থেকে দেখেছি । স্কুলে পড়ার সময়ে SNOWS OF KILLIMANZARO...দেখেছিলাম । তখন থেকেই আমি ওঁর ভক্ত ।

তারপর বলল, ভারী চমৎকার বাড়ি চারণদা । গভীর জঙ্গলের মধ্যে । বাড়িটা একটা টিলার উপরে । নীচ দিয়ে সাপের মত এঁকে বেঁকে একটা রূপোলি নদী বয়ে গেছে । তার নামও SNAKE RIVER.

খুব সুন্দর নদী ? নামটাও সুন্দর তো !

হ্যাঁ । খুবই সুন্দর ।

তারপরে একটু চুপ করে থেকে বলল, তবে ওরা আর অলকানন্দা, মন্দাকিনী, গঙ্গা, ইউওল...কোথায় পাবে বলুন ? আমাদের যে "দেবভূমি" ! "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।"

তারপরই বলল, স্বগতোক্তির মতন, আশ্চর্য। সারা পৃথিবীর মানুষে এ কথাটা বুঝল, বুঝলাম না শুধু আমরাই !

শুধু নদী আর পর্বতমালা দিয়ে তো একটা দেশ হয় না পাটন। দেশের মানুষ দিয়েই দেশ হয়। মানুষ হিসেবে যে আমরা বড়ই খারাপ হয়ে গেছি। এত মূল্যহ্রাস তো আর কোনও কিছুরই হয়নি।

অন্য দেশের মানুষও কি খুব ভাল আছে চারণদা ? অন্য কোনও দেশে ভোলানন্দ বা শ্যামানন্দজিদের মতন বেশি মানুষ পাবেন ? আপনার অনেক পূর্বজন্মের সুকৃতি ছিল যে ওঁদের দেখা পেয়েছেন। আপনি যদি গাড্ডুবাবা বা ভোঁদাইবাবার খোঁজ না করতে আসতেন, মানে, আপনার মনে যদি ভোঁদাইবাবা সম্বন্ধে জেনুইন ইন্টারেস্ট না জন্মাত, তবে আপনাকে আমি এখানে আনতামই না।

তুমি হৃষীকেশে এসেছিলে কেন ? এবারে ?

চারণ জিগ্যেস করল, পাটনকে।

আপনাকেই টুঁড়তে।

সত্যি ?

সত্যি।

কেন ?

বললামই তো। তাছাড়া স্বামীজিকে আপনার ভোঁদাইবাবা-গাড্ডুবাবা এক্সপিডিশান-এর কথা বলেছিলাম। হেসে গড়াগড়ি গেলেন। তারপর বললেন, লইয়া আয় তারে। দেহি,কোন মালে স্যা তৈরি।

কথাবার্তার ফাঁকে হঠাৎ মাথার উপরে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল চারণ।

কী হল ? খুব ঠাণ্ডা লাগছে না কি ? এখনই কী। সবে তো দীপাবলী এল। জানুয়ারির শেষ অবধি শনৈঃ শনৈঃ এগোন তবে তো বুঝবেন ঠাণ্ডা কাকে বলে ! তবে এসব জায়গাতে আপনার মস্তিষ্ক সবসময়ে এমনই সজাগ থাকে, এমনই চিন্তাক্লিষ্ট যে আপনার মস্তিষ্কর আগুনই আপনার শরীরে ওম ধরাবে। শীত-গ্রীষ্মের বোধই চলে যাবে। আগুন পোড়ায় শরীরকে, চিন্তা পোড়ায় মনকে।

চারণের ভীমগিরি মহারাজের কথা মনে পড়ে গেল।

না। সেজন্যে নয়। মানে, শীত লাগছে বলে নয়। তারা দেখছি। হৃষীকেশ-এও আকাশ পরিষ্কারই ছিল। কিন্তু এমন নয় ! সত্যিই বোধহয় এসব দেবভূমিই।

হৃষীকেশে প্রতিদিন কয়েক হাজার ভটভটিয়া ডিজেলের কালো ধোঁয়া আর কান-ফাটানো আওয়াজ তুলে যাওয়া-আসা করে হরিদ্বার থেকে। সকাল থেকে রাত নটা দশটা অবধি। সেখানেও পল্যুশান আছে। রামঝুলা-লছমনঝুলা পেরিয়ে আসার পরই শুধু সেসবের হাত থেকে বাঁচোয়া।

মন্ত্রমুগ্ধের মতন চারণ স্বগতোক্তি করল, এত তারা !

বুকের মধ্যে গুনগুন করে উঠল সেই গানটা।

জয়িতা ভারী ভাল গাইত।

"আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নিজ্বলে।
নিদ্রাবিহীন গগনতলে।
ওই আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন
হোথায় ছিল কোন যুগে মোর নিমন্ত্রণ॥"

হ্যাঁ চারণদা। একেই বলে ব্রহ্মাণ্ড। দ্য উনিভার্স। কে যে একে ধারণ পালন করছেন, কে যে যুগযুগান্ত ধরে এদের আবর্তিত করছেন, লক্ষ লক্ষ প্রজাতির ফুলের গায়ে, পাখির গায়ে, প্রজাপতির গায়ে, তুলি বুলিয়ে এমন বিচিত্রারঙা করেছেন তাদের প্রত্যেককে, তাদের প্রত্যেকের গলাতে আলাদা

আলাদা গান দিয়েছেন, ছন্দ দিয়েছেন, ওড়ার ঋতি দিয়েছেন, চলার, এ এক আশ্চর্য কাণ্ডমাণ্ড চারণদা।

তারপর একটু থেমে বলল, ভাবলেও আমার গা শিউরে ওঠে বিস্ময়ে।

সাধে কি আর গর্ডন, হুস্টনের NASA থেকে এখানে এসে আছে। এখন NAUSEA-র সঙ্গে NASA-কে নাসা করে উগরে দিয়েছে পুরোপুরি। রকেট উৎক্ষেপণ করে আর ব্রহ্মাণ্ডর মধ্যে সাঁতরে বেড়াবার জন্যে কিছু ছারপোকার মতন স্যাটালাইট ছেড়ে দিয়ে ইমিটেশান জুয়েলারিরই মতন নিজেদের ইমিটেশান-ব্রহ্মা মনে করে গর্বে আর শ্লাঘাতে বেঁচে না থেকে তাইতো ORIGINAL MR ব্রহ্মার খোঁজে চলে এসেছে সে স্বামীজির পায়ে পায়ে।

তারপর বলল, রনাল্ড গর্ডন কত বড়লোক পরিবারের ছেলে জানেন ? ট্রিলিনিয়র বললেও ওর বাবা মিকি গর্ডনকে কিছুই বলা হয় না। আর রনাল্ডই একমাত্র সন্তান ওদের মা-বাবার। তবে বাঙালি মা-বাবা তো নন! তাদের নিজেদের জীবন আছে বাঁচা-মরার জন্যে। ছেলের দুঃখে কেঁদে কেঁদে রুমাল ভেজাননি তাঁরা। তবে গত ক্রিসমাসের সময় রনাল্ডকে দেখতে এসেছিলেন ওঁরা দুজনে। মানে একমাত্র সন্তানের বকে-যাওয়ার রকম সম্বন্ধে সরেজমিনে তদন্ত করতে। এই আশ্রমেও এসেছিলেন।

কী করলেন ? কান্নাকাটি ?

তা নয় দাদা। উলটে এতই অভিভূত হয়ে গেছিলেন যে, তা বলার নয়। স্বামীজীকে BLANK CHEQUE-ও দিয়েছিলেন সই করে একটা। বলেছিলেন, সাত অঙ্ক আট অঙ্ক যা খুশি অঙ্ক বসিয়ে নিতে।

কী করলেন উনি ?

স্বামীজি ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, ইচ্ছে করলে কিছু টাকা কালিকমলি বাবার আশ্রমে দিয়ে দিন অথবা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। ওঁরা সত্যিই ভাল কাজ করেন। আমি নিয়ে কী করব ? আমি তো কারও সেবা করি না। আর নিজের টাকার প্রয়োজন, শুধু টাকাই বা কেন, অন্য সব কিছু জাগতিক জিনিসের প্রয়োজনই আমার মিটে গেছে।

রনাল্ডের বাবা বলেছিলেন, আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করুন স্বামীজি, বড়লোক হওয়ার আশীর্বাদ নয়, বড় মানুষ হওয়ার আশীর্বাদ। টাকার সাধনাতেই তো আমরা বুঁদ হয়ে আছি। সাফল্য আর টাকা SYNONYMUS হয়ে গেছে আমাদের কাছে। আমাদের ছেলে টাকাকে কাগজ মনে করার সাফল্য অর্জন করুক। তাই হবে তার দিগ্বিজয়। আমরা জল খেতে আসা হাতিরই মতন কাদাতে আটকে গেছি। আমাদের না জলে যাওয়া হল, না হল বাঁচা, মানে, বাঁচার মতন বাঁচা।

চারণ জিজ্ঞেস করল, শুধুই কালি কমলি বাবা আর ভারত সেবাশ্রম কেন, রামকৃষ্ণ মিশনের নাম বললেন না কেন ভোলানন্দজি ?

রামকৃষ্ণ মিশন তো কোটিপতি।

পাটন বলল। তারপর বলল, তেলা মাথাতে তেল ঢালা হবে ভেবেছিলেন হয়তো। তাছাড়া, কথাবার্তাতে বুঝেছি যে, উনি রামকৃষ্ণ মিশনের TOP HEAVY ব্যাপার-স্যাপার বোধহয় বিশেষ পছন্দ করেন না। তাছাড়া, একদিন শ্যামানন্দজির সঙ্গে আলোচনা করতেও শুনেছিলাম স্বামীজিকে যে, অনেকই দিন হল রামকৃষ্ণ মিশন হিন্দুধর্মের প্রচার আর প্রসারের চেয়ে সাংস্কৃতিক ব্যাপার-স্যাপারের দিকেই নাকি বেশি ঝুঁকেছেন। POMP AND SPLENDOUR-এর দিকে। তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষতাটা এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, যেখানে ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হিন্দুধর্মের নাকি এখন আর বিশেষ যোগই নেই। অথচ হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রসারেরই জন্য ওই মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একদিন।

সত্যি ?

আমি কী করে জানব ? স্বামীজি এবং শ্যামানন্দজিরই মতামত এসব।

ওঁরা ভ্রান্তও তো হতে পারেন।

চারণ বলল।

হতেও পারেন। নিজেদের অভ্রান্ত বলে দাবি তো ওঁরা কখনওই করেন না। আমি দুদিনের চিড়িয়া কতটুকুই বা জানি! অত বেশি জ্ঞানগম্যি হলে আমার মাথা চুঁইয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়ে যাবে যে। "ছুছুন্দরকা শরপর চামেলিকা তেল"-এর মতন আনওয়ানটেড সিচুয়েশান হবে।

চারণ মুগ্ধ গলাতে বলল, বাঃ দ্যাখো! দ্যাখো। ওই গাছগুলোকে তারার আলোতেও কী সুন্দর দেখাচ্ছে। না?

হ্যাঁ। ওগুলো তো সিলভার-ওক। দেখাবেই তো! আর পূর্ণিমার রাতে যা দেখায় না!

একটু বসি এখানে পাথরে। একটু আকাশ দেখি পাটন। তোমার আপত্তি আছে? আহা! মনটা জুড়িয়ে গেল যেন।

আপনি তারা চেনেন?

পাটন জিজ্ঞেস করল।

কিছু কিছু চিনি। একটা সময়ে প্ল্যানেটোরিয়াম-এ নিয়মিত যেতাম। আমাদের কলকাতার কলেজের অবসার্ভেটরির টেলিস্কোপও বিখ্যাত ছিল।

কোন কলেজে পড়তেন আপনি?

সেইন্ট জেভিয়ার্স।

তাই? আমিও তো ওই কলেজেরই ছাত্র। তাহলে আমরা দুজনেই জ্যাভেরিয়ানস!

বলেই বলল, আপনি তারাদের ভারতীয় নাম জানেন? ভারতীয়রা যে সময়ে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করেছিলেন এবং আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যা কিছু আবিষ্কার করেছিলেন সে-সম্বন্ধে পশ্চিমীরা কিছুই জানে না। দুশো বছর পরাধীন থাকাতেই ইংরেজদের দেওয়া চশমা পরে সবই ইংরেজিতে পড়েছি, জেনেছি। নিজেদের কোনও কিছু সম্বন্ধেই আমরা সচেতন বা অবহিত ছিলাম না। বিশেষ করে বাঙালিরা। খুবই লজ্জার কথা। আর ইংরেজ তাড়িয়ে স্বাধীন হওয়ার পরে, বিলিতি পোশাক, বিলিতি পণ্য পুড়িয়ে, তারা নিষ্ক্রান্ত হবার পরে দাঁতে দাঁত চেপে পুরোদস্তুর সাহেব হয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

তারপর বলল, একটা কথা কি লক্ষ করেছেন চারণদা? স্বাধীনতা আসার পঞ্চাশ বছর পরেও আমাদের একটা NATIONAL IDENTITY ডেভালাপ করল না, "ভারতীয়" বলে আমরা এখনও পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করি।—আমরা এখনও বাঙালি, বিহারি, অসমিয়া, ওড়িয়া বা পাঞ্জাবি মাড়োয়ারিই রয়ে গেলাম। ভারতীয় হয়ে উঠতে পারলাম না।

তা ঠিক।

চারণ বলল।

ওই স্তব্ধ শীতার্ত অন্ধকারের মধ্যে বসে মাথার উপরের তারা-ভরা আকাশের দিকে এবং নদীপথের সিনিবালি দীপাবলীর রাতের দীপান্বিতা দেবপ্রয়াগের দিকে চেয়ে চারণের মনে এক আশ্চর্য মুগ্ধতা এসেছিল। কথা, কোনওরকম কথাই ভাল লাগছে না ওর। এ মুগ্ধতা, অনুষঙ্গর মুগ্ধতা। স্থান-মাহাত্ম্য।

একটা বড় পাথরের উপরে বসল ওরা পাশাপাশি। শিশিরে বৃষ্টির জলের মতন ভিজে ছিল পাথরটি। শিবালিক পর্বতমালার গা থেকে রাতের গন্ধ উঠছে। হাওয়াতে আন্দোলিত হওয়া পার্বত্য গাছ-গাছালি, আর ঘাসে, সেই গন্ধ। নাম-না-জানা রাত-চরা পাখির আর পাহাড়ি ঝিঁঝির ডাক এবং অনেক নীচের অলকানন্দার শব্দ সেই নিস্তব্ধতার গাম্ভীর্য ছিদ্রিত করছিল শুধু। কত হাজার বছর ধরে হাওয়া, এই নদী, দুই সুউচ্চ গিরির মধ্যবর্তী খাদ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কে জানে তা!

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল ওরা পাশাপাশি। নৈঃশব্দ্যর মতন শব্দময়তা যে আর নেই সেই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে বুঝল চারণ আবার। ভীমগিরি মহারাজের কথা হঠাৎই মনে পড়ল ওর। পড়তেই, মনটা খারাপ হয়ে গেল। পরক্ষণেই মনে হল, এসব বৈকল্য তো গৃহীদেরই মানায়। সন্নিসী হবার যার সাধ আছে, তার তো অন্য সন্নিসীর জন্যও মন খারাপ হওয়ার কথা নয়।

অনেকক্ষণ পরে চারণ বলল, তুমি তারাদের সংস্কৃত নাম জানো কি পাটন ?

পাটন বলল, সব তারাদের দিশি নাম তো জানি না তবে কিছু কিছুর জানি।

চিনিয়ে দাও তো আমাকে। আমি জানি কিছু ইংরেজি নামই। তাও সামান্যরই।

বলেই, উপরে মুখ করে সোজা হয়ে বসল চারণ।

পাটন ওর পাশে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, এটা কার্তিক মাস তো ?

হ্যাঁ। এ বছরে পুজো তো একেবারে শেষে ছিল আশ্বিনের। তাই না ?

তারপরই পাটন স্বগতোক্তি করল, কী লজ্জার কথা! আমরা আমাদের দিশি ক্যালেন্ডারের খোঁজ পর্যন্ত রাখি না আজকাল। আমার এক পিসতুতো দিদির সাত বছরের ছেলে, লা মার্টিনিয়রে পড়ে, সেদিন আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, "একলা বৈশাখটা আর দুইরা জ্যৈষ্ঠটা কি ব্যাপার বলো তো গো পাটু মামা।"

শুনুন কথা।

একলা বৈশাখ মানে ?

আরে পয়লা বৈশাখকে ১লা বৈশাখ আর দোসরাকে ২রা লেখে না বাংলায় ?

চারণ হো হো করে হেসে উঠল।

একটু পরে চারণ বলল, তবে এটা মানতেই হবে যে, এসব জায়গাতে সত্যিই ভারতীয়ত্ব এখনও পুরোপুরি বেঁচে। সব ব্যাপারেই। দেখলেও ভাল লাগে। জওহরলাল নেহরু 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' লিখেছিলেন। আমিও ভাবছি একটি বই লিখব। তার নাম দেব "ভেরি বিলেটেড ডিসকভারি অফ মাই মাদার ল্যান্ড।"

পাটন বলল, উত্তরে তাকান, উপরে। দেখুন। ওই যে ধ্রুবতারা। ড্য কান্ট মিস ইট।

তারপরই বলল, জানেন, প্রত্যেকটি তারার দিশি নাম শিখে নিয়েছে জিম।

জিম কে ?

আরে জিম স্টিভেন্স। ওর সাবজেক্টই তো ছিল অ্যাস্ট্রনমি। ইংরিজি নাম তো সব ও জানতই। এখানে আসার পরে হামলে পড়ে সব সংস্কৃত বা ভারতীয় নামগুলি শিখে নিয়েছে। খুব পছন্দ ওর নামগুলো। প্রায়ই বলে, কী সুন্দর সব নাম। কী রোম্যান্টিক। গায়ে কাঁটা দেয়।

আরে বলই না নামগুলো। কেবলই যে এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছ তুমি।

হ্যাঁ জানি। আই হ্যাভ আ গ্রাসহপার মাইন্ড।

বলেই বলল, ওই দেখুন ধ্রুবতারার নীচে একগুচ্ছ তারা। দেখতে পাচ্ছেন ? আ ক্লাস্টার। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত। সাতটা তারা। দেখতে পাচ্ছেন ? ওই হল গিয়ে শিশুমার। তারপরে পুবে দেখুন। দেখছেন ? উত্তর-পূবে অ্যাবাউট টেন-ও-ক্লক এ একটি একলা তারা দেখতে পাচ্ছেন ? তার নাম ব্রহ্মহৃদয়।

কি নাম বললে ?

ব্রহ্মহৃদয়।

বাঃ।

তারপর দেখুন। উত্তর-পশ্চিমে অ্যাবাউট টু-থার্টিতে, অভিজিৎ। ব্রহ্মহৃদয় আর অভিজিৎ-এর পায়ের তলায় পুব থেকে পশ্চিমে টেন-ও-ক্লক থেকে ফোর-ও-ক্লক এর মধ্যে রয়ে গেছে একটি ছায়াপথ।

নাম কি ?

জানতাম কিন্তু, ভুলে গেছি।

তারপরে বলল, এরপরে পুব থেকে পশ্চিমে দেখুন। আগে তাকান উত্তর পুবে, একেবারে দিগন্তের দিকে।

রাতে কি দিগন্ত দেখা যায় নাকি ?

চারণ বলল।

কী যে বলেন না চারণ দা ! দিক থাকলেই দিগন্ত থাকবে। তার রাত আর দিন কি ?

তা বলছি না। এই পার্বত্য জায়গাতে কি দিনেও দিগন্ত দেখা যায় ? এ তো আর মরুভূমি বা সমুদ্র নয়, কী প্রেইরি-বা সাভান্নাহ্ ল্যান্ডস !

তা অবশ্য ঠিক। তবে আপনার দিগন্ত দেখার দরকারটাই বা কি ? দেখছেন তো তারাই ! দিগন্তে গিয়ে হোঁচট খাবার কোনও দরকার তো নেই। তারারা তো গরু-ছাগল নয় যে দিগন্তে দাঁড়িয়ে বসে ঘাস খাচ্ছে বা জাবর কাটছে। দিগন্তের দিকেই দেখতে বলেছি আমি আপনাকে, দিগন্তে নয়।

বলো এবারে।

চারণ বলল। এত কথা ভাল লাগছিল না ওর।

দেখুন। একেবারে পুবে আছে কৃত্তিকা, ক্রান্তিবৃত্তর একটু উপরের দিকে। কৃত্তিকার বাঁদিকে, একটু নিচেই বৃষরাশি।

জ্যোতিষীরা যেসব রাশিটাশির কথা বলেন তা কি এইসব তারাদেরই কথা ?

ইয়েস স্যার। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর ছবি "তাহাদের কথা" দেখতে দৌড়লেন আর 'তারাদের কথা' শোনার সময় পেলেন না ? 'সত্যই সেলুকাস। কী বিচিত্র দ্যাশ এই ভারতবর্ষ'।

তারপরে বল। আবারও উড়লে তুমি অন্য গ্রহের দিকে। আশ্চর্য ছটফটে মানুষ তুমি। তোমাকে নিয়ে সত্যিই পারা যায় না।

হাঃ। আমার জন্মদাতা খসসর-চূড়ামণি বাপ পারল না, শিক্ষাদাতা পাল-পাল গুরুরা পারলেন না, আর আপনি যে পারবেন তা ভাবলেন কী করে।

বলো।

হ্যাঁ। ওই দেখুন বৃষরাশির ডানদিকে, প্রায় প্যারালালে, অশ্বিনী। অশ্বিনীর উপরে মেষরাশি। কি ? পাচ্ছেন দেখতে ?

দাঁড়াও। দাঁড়াও। অত হড়বড় করলে কি হয় !

তবে এই দাঁড়ালাম।

বলল পাটন, দেখুন অশ্বিনীর প্রায় প্যারালালে, তবে ডানদিকে, মীনরাশি। "MEAN" রাশি নয় কিন্তু। "মীন" মানে সংস্কৃতে মাছ তা জানেন তো ? মহামুশকিলেই পড়লাম এই কালো সাহেবকে নিয়ে। সাদা সাহেবরা ফটাফট শিখে ফেলল, দেশ-কূলের যত কুলাঙ্গার সব আমারই ঘাড়ে এসে পড়ে ! ছিঃ !

একটু চুপ করে থেকে বলল পাটন, মীন রাশির প্রায় পায়ের কাছে রেবতী। রেবতীর ডানদিকে শতভিষা, নিচে কুম্ভরাশি, ডানদিকে শ্রবণা। শতভিষার নিচে এবং পশ্চিমে মকররাশি। তার পশ্চিম-উত্তরে উত্তরআষাঢ়া।

তারপরই বলল, ও চারণদা দেখুন ! দেখাতে ভুলে গেছিলাম, কুম্ভরাশির পশ্চিমে এবং একটু নীচে মকররাশি। উত্তর আষাঢ়ারার নীচে এবং পুবে বৃশ্চিকরাশি এবং পশ্চিমে মূলা।

কী সব মূলা, তুলা, বৃশ্চিক, মকর ইত্যাদির নামই শুধু বলছ, তারাদের সেইসব সুন্দর নামগুলো সব কোথায় গেল ?

যায়নি কোথাওই। এক একটি CLUSTER-এর মধ্যে বহুতই তারা আছে।

যেমন ?

যেমন ক্রতু, মরীচি, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা এবং বশিষ্ঠ। এঁরা হলেন সাত ঋষি। জানেন তো ? এঁদের স্ত্রীদের নাম হল সম্ভূতি, অনসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সন্নতি, অরুন্ধতী এবং লজ্জা। রেসপেক্টিভলি।

লজ্জা কি তারার নাম ?

শুধু তারাই নয়। ঋষিপত্নীও বটেন তিনি।

তারপর ?

তারওপর যদি এই "গপ্পেদের"র দেশের একটি গল্প শুনতে চান, তা তাও বলতে পারি।

আমার আর কাজ কি ? এখানে তো অকাজ করতেই আসা। কাজ তো এতদিন অনেকই করলাম। বাকি জীবনটা এবারে অকাজই করব।

ফাস কেলাস।

পাটন বলল।

তারপর বলল, গল্পটা কি ?

আমি গুরুমারা কাজ কখনও করি না। অন্য কারও কৃতিত্ব নিজের বলে চালাই না। চালাইনি কোনওদিনই। এই গল্পটি, ভুলভাল হয়ে যাবে হয়তো এতদিন পরে বলতে বসে। অনেকদিন আগে পড়েছিলাম অরূপরতন ভট্টাচার্য মশায়ের "আকাশ চেনো" বইয়েতে।

কে তিনি ? জ্যোতির্বিদ ?

তা বলতে পারব না। শুনেছি যে অধ্যাপক এবং শান্তিনিকেতনবাসী।

কোন বিষয়ে অধ্যাপনা করেন ? জ্যোতির্বিদ্যা ?

তাও জানি না। সম্ভবত নয়। বঙ্গভূমে তো ঋষিরা গোস্ত-বিরিয়ানি খায় আর মোচলমান কসাই একাদশী পালন করে। অরূপরতনবাবু বাংলার বা ইংরেজির অধ্যাপক হওয়াটাই মোস্ট প্রব্যাবল। ক্ষণজন্মাদের রাজ্য তো আমাদের। তবে যে বিষয়েই অধ্যাপনা করুন না কেন, একথা বলতেই হবে যে, সহজ ভাষায় ছোটদের জন্যে একটি চমৎকার বই লিখেছেন। ছোটরা এবং তাদের মা-বাবারাও সমান উপকৃত হবে ওই বই পড়ে।

পাবলিশার কে ?

দে'জ পাবলিশিং। কলকাতার।

ও। তা গল্পটা বলো এবারে।

শোনেননি ? কোষাকুষি থেকে যজ্ঞে ঘি ছিটোবার সময়ে পুরোহিতরা বলেন ওঁ স্বাহা। ওঁ স্বাহা। তা কি অগ্নিদেবকে তাঁর স্ত্রীর দ্বারা উজ্জীবিত করার জন্য ?

তা জানি না। যত উদ্ভট প্রশ্ন।

চারণ বলল।

শাস্ত্রে আছে, অগ্নিদেব একা, তাঁর পরিবার পরিজন কেউ নেই, তিনি আকাশে আপন মনে ঘুরে বেড়ান। হঠাৎ একদিন আকাশে তিনি সপ্তর্ষির সাত স্ত্রীকে দেখতে পেলেন। ভাবলেন, এঁদের বিয়ে করতে পারলে বেশ হয়। সেই মতন তিনি প্রস্তাব পাঠালেন ঋষিপত্নীদের কাছে।

কিন্তু ঋষিপত্নীরা বড় বড় ঋষির স্ত্রী, তাঁরা রাজি হলেন না অগ্নিদেবের কথায়।

ভয়ানক অপমানিত হয়ে তখন লজ্জায় প্রাণত্যাগের জন্যে গভীর জঙ্গলে বসে অগ্নিদেব কঠিন ধ্যান করতে লাগলেন।

দক্ষের এক কন্যার নাম স্বাহা। তিনি আকাশ থেকে অগ্নিদেবের এই কাণ্ড দেখে দুঃখ পেলেন, তাঁর মনে দয়াও হল। কিন্তু কি করতে পারেন তিনি ? স্বাহার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। নিজের চেহারা বদলে অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধরে অগ্নিদেবের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

স্বাহাকে পেয়ে তো অগ্নিদেব খুবই খুশি। তিনি স্বাহাকে বিয়ে করলেন আর সেই থেকে স্বাহা হয়ে গেলেন অগ্নিদেবের স্ত্রী।

দিন কাটতে লাগল।

সপ্তর্ষির অন্যান্য স্ত্রীদেরও পাবার গোঁ অগ্নিদেবের কিন্তু গেল না। ঋষিদের ঝোঁক যখন চাপে তখন তা মানুষের ঝোঁকের উপর দিয়ে যায়।

স্বাহা কি করেন ! একে অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধারণ করে তিনি অন্যায় করেছেন। তার উপরে অন্যান্য ঋষিপত্নীদের রূপ ধরতে তাঁর আর ইচ্ছে করল না। স্বাহা ঠিক করলেন পাখি হয়ে তিনি বাইরেই উড়ে যাবেন। তাই সবচেয়ে ভাল হবে। করলেনও তাই। স্বাহা পাখি হয়ে বনের বাইরেই উড়ে গিয়ে এক পাহাড়ের চুড়োয় বাসা বাঁধলেন।

কিন্তু অগ্নিদেবকে ছেড়ে স্বাহার বেশিদিন থাকা হল না। স্বাহা নেই, অগ্নিদেব অস্থির, দিশেহারা। অগ্নিদেবের সেই অবস্থা দেখে ফিরে এলেন স্বাহা।

আগে স্বাহা শুধু অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপই ধরেছিলেন। এখন তিনি ছয় ঋষিপত্নীর রূপ ধরে অগ্নিদেবকে তুষ্ট করতে লাগলেন। সকলের রূপই ধরলেন। কিন্তু ধরলে কী হয়, বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীর রূপ তিনি ধরতে পারলেন না। বশিষ্ঠ যেমন মহাজ্ঞানী ও তপস্বী ছিলেন, অরুন্ধতীও ছিলেন ঠিক সেইরকম মহাবিদুষী ও তাপসী। ফলে, অরুন্ধতীর রূপ ধরতে স্বাহা সাহসই পেলেন না।

দিন কাটতে লাগল। স্বাহা একটি পুত্রের মা হলেন। অদ্ভুত দেখতে ছেলেটি। ছেলেটিকে কিন্তু তিনি অগ্নিদেবের কাছে রাখলেন না। যে পাহাড়ে স্বাহা পাখি হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই পাহাড়েরই একটি গুহাতে ছেলেটি বড় হতে লাগল। তার নাম রাখলেন স্বাহা, স্কন্দ।

এদিকে কেলেঙ্কারি হল। সপ্তর্ষির ছয় ঋষিই শুনতে পেলেন যে, তাঁদের স্ত্রীরা অগ্নিদেবের দাসী হয়েছেন। খুবই রুষ্ট হলেন ঋষিরা। কী, এত বড় সাহস! আমাদের স্ত্রীরা করবেন দাসীপনা।

তাঁরা স্ত্রীদের খুবই ভর্ৎসনা করলেন আর বললেন, যাও, আমাদের সঙ্গে আর তোমরা থাকতে পারবে না।

বেচারি, অসহায় ঋষিপত্নীরা! তাঁদের আর কোথাওই থাকবার জায়গা নেই।

তাঁরা সকলে স্বাহার ছেলে স্কন্দের কাছে এসে সব বললেন। স্কন্দ বলল, চিন্তার কি আছে! আকাশে ছটি তারা হয়ে একসঙ্গে আপনারা থাকুন। তাঁরা তাই থাকলেন। ঐ দেখুন। 'কৃত্তিকা'য় চোখে দেখা যায় যে ছটি তারকা, ওই ছটি তারকাই ছয় ঋষিরই ছয় স্ত্রী।

আর অরুন্ধতী?

তিনি রইলেন বশিষ্ঠের সঙ্গে "সপ্তর্ষি" তারকামণ্ডলে।

বৃষরাশির ওই যে উজ্জ্বল তারা রোহিণী ওটি শুধু একটি তারা নয়।

কৃত্তিকার তারারা তো ছিলেন ঋষিপত্নী। আর রোহিণী?

রোহিণী ছিলেন চাঁদের পত্নী।

চাঁদের নাকি অনেকই বৌ? শুনেছিলাম।

চারণ বলল।

ঠিকই শুনেছেন। কোনও পুরুষ ভাগ্যবান হলে অন্যের বুক তো ফাটেই।

তারপর পাটন বলল, প্রজাপতি দক্ষ, তাঁর ছিল সাতাশটি কন্যা। দক্ষ, তাঁর সবকটি মেয়েকেই চাঁদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। চাঁদ যেমন রূপবান, চাঁদের পত্নীরাও ছিলেন তেমনই সুন্দরী। কিন্তু রোহিণীর মতন এমন সুন্দরী আর কেউই ছিলেন না। চাঁদ তাই রোহিণীকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। চাঁদের প্রত্যেক স্ত্রীর নামগুলি সত্যিই ভারি সুন্দর।

যেমন?

যেমন, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব আষাঢ়া, উত্তর আষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব ভাদ্রপদা, উত্তর ভাদ্রপদা এবং রেবতী।

বাবাঃ। চাঁদ এতো বউয়ের নাম মনে রাখতেন কী করে।

চাঁদের স্ত্রীরা কিন্তু সকলেই আকাশের নক্ষত্র। এক একটি নক্ষত্রে সাধারণভাবে একের চেয়ে বেশি তারা আছে, রোহিণীতেও তাই। রোহিণী নক্ষত্রে আছে পাঁচটি তারা। প্রতিটি নক্ষত্রের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটিকে প্রাচীন কালের জ্যোতিষীরা বলতেন "যোগতারা"। আর নক্ষত্রের নামে সেটিরও নামকরণ করতেন। তাই যে-তারাটিকে রোহিণী বলা হয়, সেটিও আসলে রোহিণী নক্ষত্র নয়, ওটি হল রোহিণী নক্ষত্রের "যোগতারা"। আর রোহিণী নামেই তার পরিচয়।

তাই?

হ্যাঁ। কৃত্তিকার নাম যোগতারা। নাম ALCYONE, স্টিভেন্স শিখিয়েছে আমাকে। তার নামও

কৃত্তিকা। আদ্রায় একটিই তারা। ফলে তার যোগতারা আর নক্ষত্রের একই নাম, একই পরিচয়।

পাটন তারপরে বলল, আকাশে চাঁদের স্ত্রীরা চাঁদের কক্ষপথে এমনইভাবে সমান দূরে আছে যে মনে হয় যেন চাঁদ একদিন করে একএক স্ত্রীকে দেখা দিয়ে প্রায় সাতাশ দিনে আকাশকে চক্র দিয়ে আসেন।

বাঃ। কত কি জানবার শোনবার আছে, না ?

চারণ বলল, পাটনের চন্দ্রচর্চা শেষ হলে।

আছেই তো ! তবে এবারে ওঠো। চলো। আজ দেবপ্রয়াগের দিওয়ালির রাতে দীপজ্বালানো বাড়ি ঘর দোকান-পাট ঘেরা পথে পথে ঘুরে বেড়াই।

পাটন বলল, আজ কেন জানি না, খুব পুরী-হালুয়া খেতে ইচ্ছে করছে গরম গরম। সঙ্গে একটু রাবড়িও।

চলো।

বলল, চারণ।

বলেই উঠল সেই শিলাসন ছেড়ে।

আরও একটা জিনিস খেতে ইচ্ছে করছে।

আপনার করছে না ?

কি ?

আগে বলুন, করছে কি না।

আরে। জিনিসটা কি তা বলবে তো ?

চন্দ্রবদনী।

বলেই, পাটন চুপ করে গেল।

ঝুলোনো ব্রিজের উপর দিয়ে অলকানন্দা পেরিয়ে দেবপ্রয়াগে গিয়ে যখন ওরা ঢুকল তখন দেবপ্রয়াগের চেহারাটাই পালটে গেল। দূর থেকে যে-কোনও জায়গাকেই, বিশেষ করে উঁচু জায়গা থেকে, একরকম মনে হয়, আর সেই জায়গার অভ্যন্তরে পৌঁছলে একেবারেই অন্যরকম। স্থান বা জায়গারই মতন হয়তো মানুষের বেলাতেও এই একই কথা খাটে।

ঘরে ঘরে ঘণ্টা বাজছে, মন্ত্রোচ্চারণ করা হচ্ছে, প্রদীপ জ্বলছে। ধূপ ধুনোর গন্ধ ভাসছে বাতাসে। ভারী সুন্দর লাগছে দেখতে। নিজেদের কোনওরকম চেষ্টা ব্যতিরেকেই এই আলোকিত, পবিত্র পার্বত্যগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল যেন ও। এমনই মনে হচ্ছে চারণের।

রাওয়ালদের বাড়িতে যাবেন নাকি ?

কেন ?

বাঃ। চন্দ্রবদনীকে দেখতে। আমার কোনও কেস নেই চারণদা। আমি ওয়াক-ওভার দিচ্ছি।

চারণ হাসল। তারপর বলল, তোমার সঙ্গে কি পরিচয় আছে ?

এখুনি পৌঁছে দিয়ে এলাম তো চন্দ্রবদনীকে। এইটুকুই তো যথেষ্ট পরিচয়।

তারপর বলল, পাটন যেখানে সুঁচ হয়ে ঢোকে, সেখানেই ফাল হয়ে বেরোয়।

এই গুণ তোমার বাবারও ছিল।

সেই শালার কোনও গুণই ছিল না ! কার সঙ্গে কার তুলনা !

তারপর বলল, এখন বলুন, যাবেন কি না।

বয়সের এবং অন্য নানা ব্যবধান ভেঙে বলল, থ্যাঙ্ক উ্য। বাট, নো।

বলেই বলল, কিন্তু মেয়েটি কে ? মানে, চন্দ্রবদনী ?

অত সহজেই কি চন্দ্রবদনী কে তা জানা যাবে চারণদা ? এ তো আর অ্যামেরিকান মেয়ে নয়। সে যে ভারতীয়। সে-বেটিদের বুঝতে মোটামুটি একটি ডেট পেলেই যথেষ্ট। দিশি মেয়েরা তো এই অলকানন্দারই মতন গভীর। বোঝা অত সহজ নয়।

আরে বোঝার কথা কে বলছে ? সে কে ? শুধু তাই তো জানতে চাইছি।

সব আমি জানি না। শনৈঃ শনৈঃ জানা যাবে হয়তো। তবে এটুকু জেনেছি যে, চন্দ্রবদনীর মা বাঙালি। শান্তিনিকেতনে পড়াশুনো করেছেন। সংগীতভবনের ডিগ্রিও ছিল। ওয়াঝালকার সাহেব এবং সাবিত্রী দেবী কৃষ্ণানের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্রী ছিলেন না কি।

আর বাবা?

বাবা হচ্ছেন গাড়োয়ালি। আর্মির ফুল কর্নেল ছিলেন। চন্দ্রবদনীর মায়ের পরিবার দিল্লি প্রবাসী। বাবা রুদ্রপ্রয়াগের মানুষ।

চন্দ্রবদনীর বয়স যখন আট কী নয়, তখন তার মা এক অ্যামেরিকান বিজনেস টাইকুন-এর সঙ্গে চলে যান স্টেটস-এ।

আবার অ্যামেরিকা!

চারণ বলল, স্বগতোক্তির মতন।

ইয়েস।

চন্দ্রবদনী কি এখন পার্মানেন্টলি রুদ্রপ্রয়াগেই থাকেন?

না। ও তো পড়াশুনো করেছিল ল্যান্সডাউনের পাবলিক স্কুলে। তারপর দিল্লিতে জওহরলাল নেহরু ঊ্যনিভার্সিটিতে। তারও পরে শান্তিনিকেতনে গিয়ে সংগীতভবনের ডিগ্রি নেয়। খুব ভাল বিয়ে দিয়েছিলেন কর্নেল কেশর সিং তার। এয়ারফোর্সের এক টেস্ট পাইলটের সঙ্গে। অজানা অচেনা ছেলেও নয়, দুজনে দুজনকে চিনতও। পছন্দেরই বিয়ে। উইং কম্যান্ডার নরেশ নেগি ছিল তাঁর স্বামীর নাম। কিন্তু প্রথম বিবাহবার্ষিকীর আগের দিন নরেশ নেগি প্লেন ক্র্যাশে মারা যায়। একবছর তিন মাস হয়ে গেছে তাঁর মৃত্যুর। চন্দ্রবদনী এখন দেরাদুনেই থাকে বাবার সঙ্গে। চাকরি অথবা ব্যবসা করবে ঠিক করতে পারছে না। পুজোর সময়ে রুদ্রপ্রয়াগে এসেছিল ওঁর ঠাকুর্দা ও বড় পিসির কাছে। ক্ষেতি-জমিন আছে। ভারী শান্তি পায় নাকি রুদ্রপ্রয়াগে থাকতে।

তোমাকে এত কথা বলল কে?

কে আবার? ভোলানন্দজির কাছেই শুনেছি।

তা, তোমাদের ভোলানন্দজির সঙ্গে চন্দ্রবদনীর বাবার আলাপ হল কী করে।

ঠিক বলতে পারব না। তবে শুনেছি, একজন বাঙালি মেজর-জেনারেল খুব ভক্ত ছিলেন ভোলানন্দজির। চন্দ্রবদনীর বাবার বড় সাহেব। তিনি যখন এই সেক্টরে পোস্টেড ছিলেন তখন প্রায়ই আসতেন ভোলানন্দজির কাছে। সেই সূত্রেই...

এদিকে আর্মির লোকজন থাকেন নাকি?

আর্মির লোকজন?

হেসে উঠল পাটন।

বলল, এই যে গঙ্গার বাঁ পাড়ের চওড়া রাস্তা, এই যে সব ব্রিজ, কিসের জন্যে বানানো? বদ্রীবিশাল-এর মন্দিরের থেকে আরও অনেক অনেক পেছনে আমাদের মাউনটেইন রেজিমেন্টস, এয়ার ফোর্স-এর ইউনিট, আর্টিলারি রেজিমেন্ট সব আছে। চীনেরা কি বরাবর নাকে ঝামা ঘষবে আমাদের?

তাহলে 'ইলা স্বর্গে' যেতে হলে ইন্ডিয়ান আর্মি, চাইনিজ আর্মি দুপক্ষকেই তুষ্ট করে যেতে হবে বলো?

তা যা বলেছ।

তারপর যা বলছিলে বলো।

অলকানন্দা কি পুরোটাই এমনই গিরিখাদের মধ্যে দিয়েই বয়ে আসছে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে? অথবা আরও উঁচু থেকে?

চারণ শুধাল।

না, না। দেবপ্রয়াগে এসে পৌঁছবার আগেই তো অলকানন্দার রূপ খুলেছে। সেখানে নদী অনেক চওড়া। সেখানে নদীর বালির সৌন্দর্য দেখবে, না নুড়ির, না জলের? শ্রীনগরের কাছাকাছি

অলকানন্দা যেন আরও সুন্দরী।

শ্রীনগর তো কাশ্মীরে!

হ্যাঃ।

বলল পাটন।

তারপর বলল, ভুলে গেলে চলবে কেন যে, দেশটার নাম ভারতবর্ষ চারণদা। এই দেশের বিভিন্ন এলাকাতে হুবহু একই নামের জায়গা কম করে শ-খানেক করে পাবে। শ্রীনগর মস্ত জায়গা। উপত্যকা তো! সেখানে ভুরু প্লাক-করা, বগল-কামানো, নাভি-দেখানো বিস্তর সাঁটুলি থেকে, ডিশ-অ্যান্টেনা, চাইনিজ রেস্তোরাঁ সবই পাবে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, অফিস, কাছারি সবই আছে। শ্রীনগর থেকে যেমন রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথে যাওয়া যায়, তেমনই আবার যাওয়া যায় পউরি।

পউরি মানে কি?

পউরি মানে পদচিহ্ন। হরিদ্বারকে "হর কি পউরি"ও বলে। জানেন না?

আমি আর কী জানি বলো। সাহেবরা অবশ্য বলতেন পাউরি। তা, পউরিতে কার পদচিহ্ন?

তা আমি বলতে পারব না।

জিম করবেট-এর লেখাতে পউরির কথা পড়েছি বটে। ডিভিশনাল কমিশনার মিস্টার ইব্বটসন-এর হেডকোয়ার্টার ছিল এখানে। জিম করবেট সাহেবের খুব বন্ধু ছিলেন ইব্বটসন আর তাঁর স্ত্রী জীন ইব্বটসন।

তাই? হবে হয়তো।

পাটন বলল। জিম করবেট-এর বই আমি পড়িনি।

বলেই বলল, এই যে! তিরলোকনাথের দোকান। এমন পুরী-হালুয়া আলুর চোকা আপনি ভূ-ভারতে পাবেন না। আর রাবড়ি যা করে না! কোথায় লাগে চন্দ্রবদনী। যাই বলুন আর তাই বলুন চারণদা, চন্দ্রবদনীকে দেখার পর থেকে আমার স্তন্যপায়ীবাবা হবার ভারী সাধ জেগেছে মনে।

তুমি একটি বর্বর জানোয়ার!

চারণ স্তম্ভিত হয়ে বলল।

জানোয়ারের ছেলে, অন্যরকম হই কি করে। তবে আমার বাবার খাদ্য বলুন, পানীয় বলুন, সবই হচ্ছে কারেন্সি নোট। আমার খাদ্য-পানীয়তে ভ্যারাইটি আছে। তাছাড়া আমি জানি যে, আমি Beast। এবং Beast-দেরই তো চিরদিন Beauty-রা পছন্দ করে এসেছে। থাক পড়ে আমার ভোলানন্দ, থাক পড়ে তেত্রিশ কোটি দেবতা, আমি ওই দেবীটি পেলেই মোক্ষ লাভ করব! অবশ্যই করব।

দুধ পায় কোথা থেকে?

চারণ বলল।

আঁজ্ঞে?

চমকে উঠে বলল পাটন।

ভাল রাবড়ি যে করে, দুধ পায় কোথা থেকে?

কী অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স। সত্যি! আপনি না···:

তারপর বলল, সবই জুটে যায়। আপনার মতন কালো কোট-পরা নশ্বরী পাপী এসে জুটতে পারলেন এখানে আর দেবভূমিতে গোমাতার দুধ পাওয়া যাবে না!

ঠাট্টার স্বরে বলল পাটন। তারপরে দোকানের মস্ত বড় কাঠের উনুনের সামনের কাঠের বেঞ্চে বসল অন্য আরও অনেকের গা ঘেঁষে।

জয় বদ্রীবিশালজিকি।

পাটন বলল।

জয় বদ্রীবিশালজিকি।

হালুইকর তিরলোকনাথ বলল।

রোগা টিঙটিঙে চেহারা তিরলোকনাথের। তবে খুব লম্বা। মাথায় সিঁদুরের টিপ, কপালের নীচের ভাগে চন্দন, মাদ্রাজী ব্রাহ্মণদের মতন পাথালি করে লেপা।

চারণের অর্ডার অনুযায়ী গরম গরম পুরী আর হালুয়া দিতে বলল ওদেরকে। অল্পবয়সী যে দুটি ছেলে খিদমদগারী করছিল তাদেরই একজন স্টেনলেস স্টিলের প্লেটে করে খাবার এগিয়ে দিল।

খিদেও পেয়েছিল। সকালে আশ্রমে দুটি হাতে-গড়া রুটি আর আলুর চোকা খেয়েছিল। পাটন আটা মেখেছিল, চারণ আর জুগনু সেই রুটি সেঁকেছিল আর আলুর চোকা বানিয়েছিল।

এই জুগনুও আশ্রমেই থাকে। বারো-তেরো বছরের ছেলে। শ্যামানন্দজি হরিদ্বার থেকে মরে-যাওয়া ভিখিরি-মায়ের সন্তানকে তুলে এনেছিলেন দুবছর বয়সে। জুগনু Errand Boy-এর কাজ করে কিন্তু কোনও মাইনে নেয় না। দেবেই বা কে ? সকলের সঙ্গে সেও প্রাণায়ম করে, সকাল-সন্ধেতে ভজন গায়। তার মুখে সবসময়ে হাসি লেগেই থাকে। কোনওরকম দুঃখ, জামাকাপড়ের, খাওয়া-দাওয়ার, তার যে আদৌ আছে, তা মনে হয় না। এই জমিতে, ভোলানন্দ প্রেমানন্দদের সান্নিধ্যে থাকলে কোনওওরকম দুঃখবোধই সম্ভবত জন্মায় না। আর থেকে থাকলেও, মরে যায়।

পাটনের পাশে, সেই দীপাবলীর রাতের দেবপ্রয়াগের তিরলোকনাথের দোকানে কাঠের আগুনের সামনে বিবর্ণ, কাঁটা-ওঠা বেঞ্চে বসে পুরী-হালুয়া খেতে খেতে চারণ ভাবছিল যে, এখন কলকাতাতে তার বাড়ি দিওয়ালির ডালিতে ডালিতে ভরে গেছে। স্কচ-হুইস্কি, ফ্রেঞ্চ-ওয়াইন, নানারকম শুকনো ফল, মেওয়া, বেলজিয়ান কাট-গ্লাসের অ্যাশ-ট্রে, ক্যাসারোল, ফ্লাস্ক, আইস-বাকেট আরও কত কী ! প্রফুল্ল, বীরেন, আর রাম সিং হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে জবাবদিহি করতে করতে। পুলিশও জেরা করে থাকতে পারে। তবে ওদের মাইনে পত্তর ইত্যাদি নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। অফিসে গোপালকে বেয়ারার চেক দিয়ে এসেছে। এক বছর না ফিরলেও কারওই অসুবিধা তো নেইই বরং মজাই হবে।

হু-হু করে হাওয়া আসছে নীচের গিরিখাত থেকে। না কি উত্তরের বরফ ঢাকা সারসার শৃঙ্গগুলি থেকে ? কে জানে ! এই পরিবেশে, এমন দোকানে চারণ চ্যাটার্জিকে কোনওও মক্কেল, উকিল বা হাকিম হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললে হয়তো হার্ট-অ্যাটাকেই ফওত হয়ে যাবেন। নিছক SHOCK-এই।

ভাবছিল ও, মানুষ ইচ্ছে করলে কত সহজে নিজের অনুষঙ্গ, পরিবেশ এবং প্রতিবেশকে বদলাতে পারে !

পরমুহূর্তেই ভাবল, ও কি করতে এসেছে এখানে ? হৃষীকেশে বেশ কদিন কাটিয়ে দিল। এখন এসেছে দেবপ্রয়াগে। পাটনের গাধাবোট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর চন্দ্রবদনী। এক নতুন ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে।

আশ্চর্য ! গর্ডন আর স্টিভেন্স কিন্তু সেই যে গর্তে ঢুকেছে আর বেরোবার নামটিও নেই।

চারণ বলল, পাটনকে।

ওরা তো কনডেন্সড-কোর্স করতে এসেছে। আপনার তাড়াটা কিসের ? হাতে অনন্ত সময়। সব কিছুই শনৈ শনৈ হবে। তবে এখানে আপনি আর বেশি থাকুন তা আমার ইচ্ছে নয় চারণদা।

কেন ?

অবাক হয়ে বলল চারণ।

কেন ?

কেন আবার ? চন্দ্রবদনী।

চন্দ্রবদনী তোমার চেয়ে বয়সে বড়ও হতে পারে। বেশি ইয়ার্কি কোরও না। চারণ বলল।

হাঃ। এখন তো নিজের চেয়ে বড় মেয়ে বিয়ে করাটাই VOGUE। গরু-মোষ কুকুর-মেকুরের মধ্যে তো এই সিসটেম সৃষ্টির আদি থেকেই চালু আছে। মানুষই বা পেছিয়ে থাকবে কেন ?

তাই ?

ইয়েস স্যার। আপনি মানে মানে অন্যত্র কাটুন।

তাই যাব ভাবছি।

প্লেটটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল ও।

চায়ে নেহি পিজিয়েগা বাবু ?

জরুর। দো চায়ে। এক মে শক্কর আর মালাই কমতি দেনা।

পাটন বলল।

মালাইমেহিতো চায়েকা পাত্তি উবালতা হ্যায়।

ও হো। ভুল গায়া থা। ঠিক হ্যায়।

কোথায় যাবেন ভাবছেন ?

ঘুরব। একা একা না ঘুরলে এসব হয় না। তুমি আমার সঙ্গ ছাড়ো।

আমি ? হাঃ। আপনিই তো এঁটুলির মতন আমার পেছু পেছু উঠে এলেন এখানে হৃষীকেশ থেকে।

সে তো ভোঁদাইবাবা, থুড়ি, ভোলানন্দ বাবার জন্যে।

এসেছেন যখন তখন দিনকতক থাকুন। চোখ দুটি শুধু চন্দ্রবদনীর দিকে না ধায়। নইলে এখানে থাকলে আমার আপত্তি কি ? সমুদ্র এত স্বল্পসময়ে কি পুরনো হয় চারণদা ? তীর থেকে ঢেউগুলোকে একইরকম লাগে বটে, দূরের সমুদ্রকে মনে হয় সবুজ, নীল, খয়েরি, কালো সমতল মাঠ। কিন্তু আসলে তো তা নয় ! থাকুন। আপশোষ করবেন না। আপনি গভীর মানুষ, আমার চেয়ে পড়াশোনা এবং অধীত-বিদ্যে হজম করার ক্ষমতা বেশি। আপনার মতন, স্টিভেন্স আর গর্ডনের মতন মানুষদেরই তো দরকার ভোলানন্দজির। আমি তো একটা মর্কট। Total Waster in all Spheres of Life! যার বাপই বেঠিক তার সবই বেঠিক।

চারণ চুপ করে রইল।

দেব-দেবী, ধর্ম, শাস্ত্রর কথা ও জানে না বটে কিন্তু নিজের এই বিশাল দেশের প্রাচীনত্ব, কোটি-কোটি মানুষে অবশ্যই কোনও কিছুর টানে যে হাজার হাজার বছর থেকে এই দেবভূমিতে আসে, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিল ও। এক ধরনের ভারতীয়ত্বে সম্পৃক্ত হচ্ছিল চারণ খুব ধীরে ধীরে, উগ্র বিড়ির গন্ধে, দিশি, হাতে-বোনা কম্বলের বোঁটকা গন্ধে, এই দুধের মধ্যে সেদ্ধ করা চায়ের পাতার চা-এর মধ্যে, এই মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে, ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে, ধূপধুনোর গন্ধের মধ্যে, গাঁজার ধোঁয়ার মধ্যে। কলকাতাতে ও ইংল্যান্ডে পড়াশুনো করার সময়ে এবং কলকাতা ও বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করার সময়ে এই সাধারণ, গরীব, গভীর ঈশ্বরবিশ্বাসী, জাগতিক কামনা ও লোভহীন, ঐতিহ্যপূর্ণ আসল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওর কোনও ধারণাই ছিল না। 'দেশমাতৃকা' শব্দটা বঙ্কিমচন্দ্রর লেখাতে পড়েছিল। "দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই" একথা পড়েছিল বিবেকানন্দর লেখাতে। "দেশপ্রেম" কাকে বলে তা নেহরু বা জিন্নার চেয়েও অনেক বড় ভারতপ্রেমী জিম করবেট-এর "My India"-র মুখবন্ধ পড়ে জেনেছিল।

এই ভারতবর্ষকে চারণ জানতেও পারত না হঠাৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে এই দেবভূমিতে এসে উপস্থিত না হলে। পাটনের পাশে গায়ে গা লাগিয়ে শীতের মধ্যে বসে ওর মন হঠাৎই এক তীব্র দুঃখমিশ্রিত সুখে ছেয়ে গেল।

তিরলোকনাথের দোকানে একটি ছবি ছিল মহাদেবের। যেমন ছবি সর্বত্রই দেখা যায়। মাথাতে সাপ জড়ানো, হাতে ত্রিশূল। মাথার পেছনে একটি "ওঁ" চিহ্ন। এই ওঁ চিহ্নটি প্রায় সব ধর্মস্থানেই দেখেছে চারণ। অনেককে চিঠি লেখবার সময়েও চিঠির উপরে "ওঁ" লিখতে দেখেছে।

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের খুব ভক্ত চারণ। তাঁর 'পার্থিব' উপন্যাস পড়ে তাঁকে একটি চিঠি লিখেছিল ও। তার উত্তরে পোস্টকার্ডে ছোট্ট উত্তর দিয়েছিলেন সাহিত্যিক। সেই চিঠির উপরে উনি লিখেছিলেন "রা"। "ওঁ" এরই মতন। "রা" মানেই বা কি, তা কে জানে ?

পাটনকে শুধোল চারণ, "ওঁ"-এর মানে জানো ?

জানতাম না। ভোলানন্দজির কাছ থেকেই জেনেছি। শ্যামানন্দজি বলেছিলেন যে এই "ওঁ"-কেই দার্শনিক কার্লাইল নাকি বলেছিলেন : "The Everlasting Yeah" —মানে 'হ্যাঁ'। অনন্তকালের হ্যাঁ। একটা মস্ত হ্যাঁ।

ওঁ মানে, হ্যাঁ ?

অবাক হয়ে প্রশ্ন করল চারণ।

ইয়েস। হ্যাঁ। পরে কখনও ভাল করে শুনে নেবেন ভোলানন্দজি বা শ্যামানন্দজির কাছ থেকে। গর্ডন আর স্টিভেন্সও শিখে গেছে ওঁ-এর মানে। ওরাও আপনারই মতন একদিন এই প্রশ্ন করেছিল আমাকে। আমি আর কতটুকু জানি বলুন ? ওদের ইনকুইজিটিভনেস-এর জন্যেই এই প্রশ্নের উত্তর ওদেরই সঙ্গে আমিও পেয়ে গেছিলাম।

তারপর বলল, একটা কথা মনে প্রায়ই হয়। জানেন, চারণদা।

কি ?

শিক্ষা আর ইকুইজিটিভনেস বোধহয় সমার্থক। যে-মানুষ প্রকৃত শিক্ষিত তার জিজ্ঞাসার কোনও শেষ নেই। আর যার কোনও জিজ্ঞাসাই নেই, সে সর্বার্থেই অশিক্ষিত। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়।

তা উত্তর পেলে কার কাছ থেকে ?

মোটার কাছ থেকেই।

মোটা মানে ?

আঃ ! কতবার যে বলব আপনাকে ! মোটা মানে ভোলা ইজ ইকুয়াল টু ভোলানন্দজি।

চারণ, পাটনের এই অকারণের বাঁদরামিতে চুপ করে রইল।

সিনিবালি দিওয়ালির হইচই শেষ হয়ে গেছে এই দেবভূমি দেবপ্রয়াগে। আবার সেই শান্ত নির্লিপ্ত জীবন। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দুপাশ থেকে কিছু বাস, ট্রাক এবং গাড়ি যাতায়াত করে। আর্মির কনভয়ও যায়-আসে মাঝে মাঝে। কনভয়-এর সামনের গাড়িতে লাল আর পেছনের শেষ গাড়িতে সবুজ পতাকা লাগানো থাকে।

এখন শেষ বিকেল। এই সময়টাতেই এই সব জায়গাতে মন বড্ড বিধুর হয়ে ওঠে। দিনান্তবেলায় নানারকম পাখি ডাকে নীচের নদীর পাশের পর্বত-গাত্র থেকে। তাড় বা তোন গাছের পাতাগুলিও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে মাথা উঁচিয়ে থাকে অন্য গাছেদের মাথার উপরে। কতরকম গাছ যে আছে এখানে ! তার সামান্যই চেনে চারণ। এই দিকের পর্বতমালার বেশিটাই রুক্ষ ও ন্যাড়া। জঙ্গল গভীর, পর্বতের পাদদেশে।

চুপ করে বসেছিল চারণ অলকানন্দার এপারে পশ্চিমের পাড় আর আকাশে চেয়ে। জোড়াসনে বা শবাসনে মেরুদণ্ড সোজা করে বসলেও মনের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন আসে। প্রাণায়াম করলে যেমন আসে। এসব একটু একটু করে শিখছে চারণ।

বেশ কদিন হল, এক বেলাই খাচ্ছে আশ্রমের অন্যদেরই মতন। একচড়া। আশ্চর্য। সারাদিনে ওই খাওয়াটুকুকেই যথেষ্ট বলে মনে হয় এখন। গেরুয়া পরে না অবশ্য। পরলে, 'ভেক ধরেছে' বলে মনে হতে পারত হয়তো নিজেরই কাছে। অন্যের কাছে তো অবশ্যই। এখনও সাদাই পরে। ধুতি। তবে, পরে হয়তো পরবে কখনও গেরুয়া।

ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই জানে।

পাটন বলেছিল, যদি মিলিটারিতে জয়েন করতেন তবে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে থাকলে কি আপনার কাজের সুবিধা হত ? না, আপনাকে তা পরতে দেওয়া হত ? রেজিমেন্টাশেন-এর দরকার আছে চারণদা।

চারণ বলল, আর তুমি যে এই পরিবেশে, এই আশ্রমে দিব্যি জিনস পরেই চালিয়ে যাচ্ছ। সে বেলা কি ?

আমি তো সন্নিসীগিরির অ্যাপ্রেনটিসশিপ নিইনি।

তুমি তাহলে কি ? শাখামৃগ ? রিয়্যাল মর্কট ? ভোলানন্দজি ঠিকই বলেন। এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে পড়ে দোল খাচ্ছ।

চোখ নাচিয়ে পাটন বলল, খাব খাব। আমার আসল গাছে গিয়ে উঠি আগে। একটু সবুর করুন।

আলো ক্রমশই কমে আসছে। ঠাণ্ডাটাও বাড়ছে। দিনের বেলা একটা জোর হাওয়া সমতল থেকে পাহাড়ে উঠে আসে নদীর পথের বিপরীতে, আর রাত নামলে পাহাড় থেকে কনকনে হাওয়া নদীখাত ধরে বয়ে যায় সমতলের দিকে। হৃষীকেশ বা হরিদ্বারে বছরের এই সময়ে সেই হাওয়ার স্বরূপ খুবই বোঝা যায়।

মাথার বাঁদুরে টুপিটা টেনে দিল চারণ নীচে, কান ঢেকে। প্রহরে প্রহরে শীত বাড়বে এখন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই চারণের আবারও হঠাৎই মনে হল কি করছে ও এখানে বসে ? সাধু-সন্তদের অনুকরণ করে কি পাবে ও ? অনুকরণ করে জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই কেউই কি কিছু পায় ? কিসের জন্যে এসেছে ও এখানে ? কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য যদি নাই থাকে, তাহলে তা সাধন হবেই বা কী করে।

গতকালই গর্ডন আর স্টিভেন্স-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করছিল ও। ওরা বলছিল, উদ্দেশ্যহীনতাই নাকি ওদের এখানে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য। কোনও উদ্দেশ্যর হাত ধরেই ওরা বাঁচতে চায় না। "উদ্দেশ্য" ব্যাপারটার মধ্যেই একধরনের স্বার্থপরায়ণতার গন্ধ জড়ানো থাকে। সব পশ্চিমী দেশেই শিশুকাল থেকেই প্রতিটি মানুষই তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপই এক বা একাধিক বিশেষ উদ্দেশ্যেই নিয়ন্ত্রিত করে। এবং সেই সব উদ্দেশ্যর মধ্যে প্রধানত হচ্ছে অর্থোপার্জন। জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা, অর্থবান, আরও অর্থবান হওয়া। মিলিয়নিয়র থেকে বিলিয়নিয়র, বিলিয়নিয়র থেকে ট্রিলিয়নিয়র। একমাত্র উদ্দেশ্যই এই, জীবনের, To Get Rich. By Hook or By Crook! অর্থই ইউনাইটেড স্টেটস এবং তার প্রভাবে প্রভাবিত সব দেশেই সমস্ত উদ্দেশ্যর শেষ উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যকে ধাওয়া করে করে ওরা ক্লান্ত। সত্যি সত্যিই ক্লান্ত।

গর্ডন বলেছিল, তাইতো তোমাদের দেশে এসেছি অতদূর থেকে। আমরা নিজেরা পুরোপুরি নিরুদ্দেশ হয়ে উদ্দেশ্যহীনতার মজাতেই চিরদিনের মতন মজতে এসেছি। আর তুমি এই মহান, প্রাচীন এক দেশের নাগরিক হয়েও তোমার নিজের দেশের ঐতিহ্যে গৌরব বোধ করো না ? নিজেদের উদ্দেশ্য এবং বিধেয় সম্বন্ধে তুমি নিজেই অবহিত নও ? ভারী আশ্চর্য তো।

চারণ লজ্জা পেয়েছিল।

স্টিভেন্স বলেছিল, মক্কেলের হয়ে ওকালতি তো অনেকেই করলে জীবনের অর্ধেকের চেয়েও বেশি সময়। এবারে নিজের জন্যে কিছু ওকালতি করো উপরওয়ালার কাছে। এই ওকালতির ফিস মোহরে গণ্য নয়। গণ্য, মনের শান্তি আর অর্থ-বাসনাহীন আনন্দে। যা, আসল সুখ। নইলে আমরা সবই ছেড়েছুড়ে এলাম কী করে। আর চলে এলামই শুধু নয় ! এসে, সর্বক্ষণ এত আনন্দেই বা থাকি কেন ?

বিদেশিদের কাছে এই 'জ্ঞান' নিতে ভাল লাগেনি চারণের। কিন্তু নিয়েছিল। নিতে হয়েছিল। কারণ, এ কথা তো সত্যিই যে ওরা সবই ছেড়ে এসেছে। রাজ্য-পাট, চোখ-ঝলসানো সাচ্ছল্য। চারণের মতন দুনৌকোতে পা তো নেই ওদের ! গর্ডন এসেছে তিনবছর। পাটনেরই মতন। আর

স্টিভেন্স এসেছে আড়াই বছর।

নির্জনে একা থাকা, একা ভাবা, এক ভাবনা থেকে অন্য ভাবনাতে আদৌ তাড়াহুড়ো না করে পর্বতারোহীদের মতন একের পর এক পায়ের পরে পা ফেলে ভাবনা-চিন্তার পাহাড়চুড়োর দিকে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে এক গভীর জাগতিক-লাভ-শূন্য প্রশান্তি যে আছেই, তা এই কদিনেই বেশ বুঝতে পেরেছে চারণ। যে-পর্বতারোহী পর্বত শৃঙ্গে ওঠেন তিনি সমতলে দাঁড়িয়ে একবার শৃঙ্গের দিকে তাকালে কোনওদিন সেখানে আদৌ পৌঁছতে পারতেন না। অসাধ্য-সাধন তাঁর দ্বারা কোনওদিনও হবে না ভেবে হতোদ্যম হয়ে যেতেন। তা তো নয়। যিনি পর্বতারোহী, তিনি শুধুই দেখেন পরের পদক্ষেপটি কোথায় করবেন।

গতকাল সকালে অবাক করেছিল পাটন, চারণকে। চন্দ্রবদনীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেবপ্রয়াগের কার বাড়ি থেকে যোগাড় করেছিল তা বলতে পারবে না, কিন্তু ছেঁড়াখোঁড়া প্রায় ভূর্জপত্রের মতন অবস্থা হয়ে যাওয়া একটি বই এনে ওকে দিয়েছিল।

এটা কি বই?

পাটন হেসে বলেছিল, ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের। উপনিষদের উপরে লেখা আছে এতে। আপনার "ওঁ"-এর উত্তরও পাবেন।

এখানে এই বই কোথায় পেলে তুমি?

সবখানেই সব কিছু পাওয়া যায় চারণদা, যদি তেমন করে চাওয়া যায়।

বলেই বলল, আপনি তেমন করে চাইলেন না বলেই চন্দ্রবদনীকে পেতে পেতেও পেলেন না। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, বেড়ালের ভাগ্যেই হয়তো শিকে ছিঁড়বে।

তাই?

পাটন চারণের ভাবনা ছিঁড়েখুঁড়ে হঠাৎই গেয়ে উঠল

"বড়লোকের বিটিলো লম্বা লম্বা চুল
এমন মাথা বেন্ধে দেব লাল গেন্দা ফুল।"

পাটনের এই হঠাৎ উচ্ছল হয়ে ওঠা দেখে খুশি হয়েছিল চারণ। কিন্তু ওর মনে সেই খুশির রং পুরোপুরি লাগার আগেই পাটন আবারও গেয়ে উঠেছিল :

"ও রাঙা বাবুরে শিমুল ফুলে রঙ লেগেচে
সত্যি কথা বলতে কি তুকে আমার মইনে ধইরেচে
তুকে আমার মইনে ধইরেচে।"

এ আবার কি?

আরে আমার সম্পর্কে চন্দ্রবদনীর মনের কথাটা যদি এইরকম হত তাহলে বুঝতাম কেসটা পেকেছে। কিন্তু এখনও বহত বাঁও পানি। আমার পেরেমের শিমুল গাছে ফুল ফুটতে এখনও বহতই দেরি। তোমরা আমার কাঁচা পিরীত পাকতে দেবে কি না তাই বা কে জানে!

চারণ হেসেছিল। তারপর বলেছিল, এই সব গান শিখলে কোথায়?

আঃ। আপনি যে দেখি কোনও খোঁজই রাখেন না। স্বপ্না চক্রবর্তীর গান। ক্যাসেট শোনেননি? দারুণ করেন, এইসব গান, মহিলা।

নাঃ।

গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিল চারণ।

জীবনটা বড় ছোট। ভুল পথে ঘোরাঘুরি করেই যে জীবনের অনেকখানিই নষ্ট করে ফেলেছে। বুঝতে পারে। প্রতি মুহূর্তেই বুঝতে পারে।

সকালে এত ঠাণ্ডা থাকে যে এখনও সূর্যোদয়ের আগে ওঠা রপ্ত করতে পারেনি ও। ভোলানন্দজির এই ছোট্ট আশ্রমে জেসুইট ব্রাদারদের ডর্মিটরির বা মসজিদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা নেই। সকালের 'প্রেয়ারে' বা ফজিরের আজান-এ সকলকেই সামিল হতে হয় না। মঠ বা বড়

আশ্রমে হয়তো নানা রেজিমেন্টেশান আছে। কিন্তু এখান কারওই রক্তচক্ষু বা খবরদারী নেই। পড়াশুনো, ভাবনাচিন্তা, লেখালেখি যা করার এদের মধ্যে অনেকেই তা করেন গভীর রাত অবধি। ধুনি বা লণ্ঠনের বা প্রদীপের আলোতেই। তবে কিছুদিনের মধ্যেই ভোরে-ওঠার অভ্যেস হয়ে যাবে হয়তো ওরও। সকলেই যখন ওঠে তখন ওই বা পারবে না কেন ?

ওই ঠাণ্ডাতেও অনেক নীচের নদীতীরে কুয়াশার মধ্যে অগণ্য সুঠাম খালি-গা মানুষের মূর্তি নদীর দুদিকের ঘাটেই দেখতে পায়। কুয়াশারই সঙ্গে তাদের মুখনিঃসৃত গরম বাষ্প মিশে যায়। ঊষাকালে উপরের দেবপ্রয়াগ এবং সংলগ্ন এলাকার প্রতিটি মন্দিরেই ঘণ্টা বাজে। সূর্যস্তবে গমগম করে খরস্রোতা, প্রভাতগন্ধী নদীতীর। সদ্যস্নাতা, যোগীদের, নারীদের শরীরের গন্ধ ওঠে।

সূর্যপ্রণামের সেই মন্ত্র, খরস্রোতা অতল নদীর স্রোতের শব্দে মিশে গিয়ে, বাহিত হয়ে, দেবভূমি থেকে সমতলের নানা তীর্থক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হয়ে যায়।

"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বন্তারিংসর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং।"

কেউ-বা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন :

"আদিত্যায় বিদ্মহে সহস্রকিরণায় ধীমহি তন্ন সর্যঃ প্রচোদয়াৎ।"

এই ভারতবর্ষ !! ভারতবর্ষের এই আশ্চর্য, শাশ্বত, উদাত্ত রূপ সম্বন্ধে চারণের আগে কোনও ধারণাই ছিল না।

দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে এল। শিলাসন ছেড়ে উঠে পড়ল চারণ। নির্জনতার এক আশ্চর্য নিজস্ব আচ্ছন্নতা আছে। প্রকৃতির বুকের কোরক থেকে সেই নির্জনতা যে-কোনও মানুষেরই বুকের মধ্যে উঠে আসে।

এবারে আশ্রমের দিকে ফিরবে, না কি দেবপ্রয়াগ বাজারের দিকেই যাবে ঠিক করতে পারল না। পথ চলতে চলতে ভাবছিল যে, জীর্ণ বইটি দিয়েছিল পাটন, সেইটিই বরং আজ পড়বে ফিরে গিয়ে।

ভোলানন্দজির আশ্রমের আরও কিছুটা উপরে একটি ছোট্ট গুহা আছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে। সেখানেই থাকেন ভোলানন্দজি, যখন মৌনী থাকেন, একেবারে একা। এখন উনি মৌনী।

কিছু খাবেনও না। জল খাবেন শুধু এবং একটু দুধ। আশ্রমেরই কেউ গিয়ে খাইয়ে আসবেন। পাটনও যায় কখনও কখনও।

শ্যামানন্দজি হৃষীকেশে গেছেন শিবানন্দগিরি মহারাজের আশ্রমে কোনও কাজে। বই-টই-এর জন্যেও হতেও পারে। গর্ডন গেছে মুনিকা-রেতিতে, হৃষীকেশ-এর একটু আগে। ওর দেশ থেকে এক বান্ধবী এসেছে নাকি। তারই সঙ্গে দেখা করতে গেছে। তাই আজ গুহাতে স্টিভেন্স আর চারণ বলতে গেলে একাই। কে যে কখন কোথায় থাকে, অন্যে জানে না। কোনও হাজিরা খাতা নেই এখানে, কাজের দিন, ছুটির দিন নেই, দেরি করে অফিসে পৌঁছলে লেট মার্ক দেওয়া হয় না। ক্যাজুয়াল-লিভ, সিক-লিভ, বাৎসরিক ছুটি, কিছুই নেই। রোজই ছুটির দিন, রোজই কাজের দিন। অন্যদের কারও সম্বন্ধেই অবশ্য ওর তেমন উৎসাহ নেই। আর ওর প্রতি তো কারও উৎসাহ নেই-ই। তবে সাম্প্রতিক অতীতে চন্দ্রবদনী সম্বন্ধে ওর উৎসাহটা অত্যন্তই তীব্র হয়েছিল। হয়েছিল যে, সে কথা পাটন বুঝতে পেরেছিল এবং পেরেছিল বলেই যখন তখন চন্দ্রবদনীর প্রসঙ্গ ওঠাত ও চারণকে একা পেলেই।

যেই চানে যায় নদীতে, সেই জল বয়ে আনে। কেউ ঘড়াতে, কেউ বা বড় ঘটিতে, কেউ কমণ্ডলুতে। এক ঘড়া, খাবার জন্যে আনে কেউ, আচমনের জন্যে আনে অন্য কেউ। হাত মুখ পা ধুয়ে, গুহার ভিতরে ঢুকে ওর গুটিয়ে-রাখা কম্বল-শয্যাখানি খুলে, তার উপরে বসে, ঝোলা থেকে সেই বইটি বের করল চারণ। স্টিভেন্স বাঁদিকে কাত হয়ে শুয়ে হেনরি ডেভিড থোরোর Walden পড়ছিল। তার শরীরের ছায়া পড়েছিল গুহার দেওয়ালে। প্রদীপের আলোর বিপরীতে। বাঁকানো কনুইয়ের ছায়াটিকে মনে হচ্ছিল একটি বাঁকানো ধনুক যেন।

চারণকে আসতে দেখেই ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে 'থাম্বস আপ' করল স্টিভেন্স।

তারপর আবার বইয়ের মধ্যে ডুবে গেল।

স্টেটস-এ যখন প্রথমবার যায় চারণ, সেবারে ইস্টকোস্ট-এর বস্টন থেকে হীরকদার সঙ্গে গেছিল "Walden Pool" দেখতে। কী যে রাগ হয়েছিল দেখে! হেনরি ডেভিড থোরোর "Walden" শেষ কৈশোরে পড়ে, মনের মধ্যে যে ছবিটিকে লালিত-পালিত করে রেখেছিল, সেই ছবিটি শুধু নড়ে-চড়েই যায়নি, ছিন্নভিন্নও হয়ে গেছিল। সেই মুহূর্তেই ইউনাইটেড স্টেটস-এর মানুষদের আত্মিক এবং নান্দনিক অবক্ষয় সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়েছিল ওর। সেই ধারণা, পরে দৃঢ়তর হয়েছে নানা ধরনের কিছু এন আর আই-দের দেখে। মনে হয়েছে, কলকাতা চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে, কিছু খাঁচা খোলা থাকলে তাদের মধ্যে কারও কারওকে ভরে দেবে। শিক্ষা, সহবৎ বা সংস্কৃতির খামতি থাকাটা দুঃখজনক হতে পারে কিন্তু দোষের নয়। কিন্তু শূন্যপাত্রর টংটং আওয়াজ অসহ্য। গভীরতা ব্যাপারটা এই এন আর আইদের মধ্যের এক শ্রেণীকে ইমপোর্ট করার জন্যে অনুরোধ করা উচিত। ভারত থেকে ম্যানহোল কভার এবং কনডোম যদি ওঁর ইমপোর্ট করতে পারেন তাহলে গভীরতা নিতেই বা লজ্জা কিসের? তবে এন আর আইদের মধ্যে গর্ব করার মতন মানুষ কি নেই? অবশ্যই আছেন।

কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রম।

একটি ভাল বই পড়ার আগে এন আর আই প্রসঙ্গ উঠিয়ে মনকে আবিল করে ফেলাতে খারাপ লাগল চারণের। মুখটাও যেন তেতো হয়ে গেল।

বইটা খুলল, "ঔপনিষদ ব্রহ্ম"। তারপর ডুবে গেল বইয়ের মধ্যে।

বইটি ছোটই। তবু বই পড়া যখন শেষ হল তখন রাত গভীর। কত যে গভীর তা জানে না। স্টিভেন্সও শুয়ে পড়েছে ততক্ষণে কম্বলের নীচে কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে। বাইরে গিয়ে দাঁড়াল চারণ।

এই পর্বতরাজিতে এক ধরনের ঝিঁ ঝিঁ আছে তারা দিনে ডাকে না। রাতেই ডাকে শুধু। তাদের 'ঝিনিঝিনি' শব্দ 'E' Sharp-এ মিলিয়ে-বাঁধা হাজার তানপুরার নিক্বনের শব্দর মতন বাজছে। যে-শব্দ দুকান ভরে দিয়ে মস্তিষ্ককেও অবশ করে ফেলে। মাথার উপরে তারা-ভরা আকাশ। পাটন চিনিয়েছিল তারাদের। কিন্তু এরই মধ্যে ভুলে গেছে ও। বড় ভুলো হয়েছে আজকাল।

অলকানন্দার ওপারে হেমন্তের মধ্য-রাতের ঘুমন্ত দেবপ্রয়াগ। কোনও সাড়াশব্দ নেই, নীচের নদীর শব্দ ছাড়া। কত হাজার বছর ধরে দুপাশের পর্বতরাজিকে সাক্ষী রেখে যে তারা প্রবল গর্জনে বয়ে যাচ্ছে, তা কে জানে! ভাগীরথী আর অলকানন্দার সঙ্গমের কাছ থেকে উচ্চগ্রামে শব্দ উঠছে। আর সেই রাতচরা হাওয়াটা বেগে ধেয়ে যাচ্ছে নদীর জলকে সাদা, দুরন্ত মেষপাল-এর মতন তাড়িয়ে নিয়ে।

ধিয়ানগিরি মহারাজের কথা মনে পড়ে গেল, ভেড়ার কথা মনে হওয়ায়।

"ভেড়চাল"।

কে জানে কেমন আছেন ওঁরা।

ফিরে এসে, কম্বলের নীচে টানটান হয়ে শুয়ে যে বইটি এখুনি পড়ে শেষ করল, সেই বইটির কথাই ভাবছিল ও। রবীন্দ্রনাথ এতে উপনিষদ এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বলেছেন, ব্রহ্মকে জানা না হলে এই মানবজন্মই বৃথা।

'ঈশোপনিষদে' লেখা আছে :

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।"

মানে হচ্ছে, ঈশ্বরই এই জগৎকে লালন পালন করছেন, তাঁর দ্বারাই সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হয়ে আছে (কেন ভোলো? মনে কর তাঁরে।) তিনি যা দিয়েছেন, যা দেন, যা কিছু দিয়েছে, তাই ভোগ করো। পরের ধন লোভ করো না।

এই যে লোভ, অন্যের যা আছে আমারও তা চাই, যে-কোনও ভাবেই চাই, চুরি করে ডাকাতি

করে, টি এ বিল ইনফ্লেট করে, গরীব আত্মীয়র বাড়ি জমি বিক্রি করিয়ে দেওয়ার সময়েও আড়ালে দালালি নিয়ে, ঘুষ খেয়ে, স্মাগলিং করে, চুরি করে, জালিয়াতি করে পড়শী বা আত্মীয়র মতন বড়লোক হবার যে সাধনা সারা পৃথিবীকে গ্রাস করেছে সেই তাপ গ্রিন-হাউস এফেক্টের তাপের চেয়েও বেশি। এই সরল সত্যটি যদি নাই বুঝবে তবে আর গর্ডন এবং স্টিভেন্স সাচ্ছল্যের উচ্চতম সোপানে বসবাস করা সত্ত্বেও সেখান থেকে নেমে এই ভারতীয় দেবভূমিতে গঞ্জিকা-সেবী আধ-ন্যাংটো সন্নিসীদের আখড়াতে কেন দৌড়ে আসবে এত সমুদ্র পেরিয়ে?

ভাবনা একই।

তরঙ্গ খেলে যায় ইথারের মতন।

সেই Wave-Length-এ যারা একীভূত করতে পারে নিজেদের, তারাই ভাগ্যবান।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, তারপরই আসতে হয় "ওঁ"-এর কথাতে। "ওঁ" একটি ধ্বনিমাত্র। এর কোনও বিশেষ মানে নেই। "ওঁ" ব্রহ্মের ধারণাকে কোনও অংশেই সীমাবদ্ধ করে না। সাধনার মাধ্যমে আমরা ব্রহ্মকে যতদূর জেনেছি, যেমন করে পেয়েছি, এই "ওঁ" ধ্বনি তার সবটুকুই ব্যক্ত করে। কিন্তু ব্যক্ত করেও সেখানেই সেই প্রাপ্তির প্রকাশকে সীমিত করে না। সংগীতের স্বর যেমন গানের বাণীর মধ্যে এক অনির্বচনীয়তার সঞ্চার করে, তেমনি "ওঁ" ধ্বনি তার পরিপূর্ণ মাহাত্ম্যে ব্রহ্মধ্যান বা ধারণার মধ্যে এক অনির্বচনীয়তার অবতারণা করে। "বাহ্য প্রতিমা" দ্বারা আমাদের মনের ভাবকে খর্ব ও আবদ্ধ করে। কিন্তু এই "ওঁ" ধ্বনি মানুষের মনের ভাবকে উন্মুক্ত ও পরিব্যাপ্ত করে দেয়। হয়তো সেইজন্যই উপনিষদ বলেছেন 'ওমিতি ব্রহ্ম'। 'ওম' শব্দ তো ব্রহ্মকেই বোঝায়। "ওমিদীতং সর্বং", এসব যা কিছু সমস্তই ওঁ। এখন সমস্ত ভারতীয় ভাষাতে আমরা 'হ্যাঁ' বা 'হাঁ' দিয়ে যা বোঝাই।

প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে 'ওঁ' ধ্বনিটি ব্রহ্মকে নির্দেশ করে কিন্তু 'ওঁ' শব্দের অর্থও তো আছে একটি। আছে, কিন্তু সেই মানে এতই উদার ও বিস্তৃত যে, তা মনকে অসীম মুক্তি দান করে। "ওঁ" শব্দ অনুকৃতিবাচক। মানে, এটা কর এই আদেশ করলে আমরা যেমন বলি, হ্যাঁ, "ওঁ"-ও সেইরকমই হ্যাঁ। "ওঁ" স্বীকারোক্তিও।

সংস্কৃত 'শাশ্বত'-র তো ইংরেজি হয় না। Eternal বা অন্য কোনও ইংরেজি প্রতিশব্দ দিয়ে আমরা শাশ্বত বলতে যা বুঝি তাকে কখনই বোঝানো যায় না। কার্লাইল সাহেব everlasting yeah বলে 'ওঁ'কে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে ব্যাখ্যাটা রবীন্দ্রনাথের হয়তো মনঃপূত হয়েছিল, কিন্তু চারণের হয়নি। সব ভাষাতেই এমন এমন বহু শব্দ থাকে তার সমার্থক কোনও শব্দই অন্যভাষাতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমরা কে কাকে স্বীকার করি তারই উপরে আমাদের একেকজনের আত্মার মহত্ত্ব। কেউ জগতের মধ্যে একমাত্র বিত্তকেই স্বীকার করি, কেউ বা মানকে, কেউ বা আবার করি, খ্যাতিকে, ফলকে।

আদিম আর্যরা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণকে "ওঁ" বলে স্বীকার করতেন। তাই সেই সব দেবতার অস্তিত্বই তাঁদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হত। উপনিষদের ঋষিদের মতে, জগতে ও জগতের বাইরে ব্রহ্মই একমাত্র "ওঁ"। তিনিই চিরন্তন "হ্যাঁ"। তিনিই 'everlasting yeah'।"

প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের কোনও প্রতিমা ছিল না। কোনও প্রতীক অথবা চিহ্নও ছিল না। শুধু ছিল এই একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত অথবা দিগ্বিদিক মন্ত্রিত করা ধ্বনি, "ওঁ"। এই ধ্বনির সাহায্যেই ঋষিরা তাঁদের "উপাসনানিশিত" আত্মাকে জ্যা-মুক্ত একাগ্রগামী তীরের মতন ব্রহ্মের মধ্যে পশিয়ে দিতেন। বিদ্ধ করতেন। নিমগ্ন করে দিতেন। এই ধ্বনির মাধ্যমেই ব্রহ্মবাদী সংসারীরা বিশ্বজগতের যা-কিছু সমস্তকেই ব্রহ্মের অনুক্ষণ এবং আদিগন্ত উপস্থিতি দিয়ে সমাবৃত করে রাখতেন।

"ওমিতি সামানি গায়ন্তি
ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি"

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

মানে "ওঁ" উচ্চরণেই সমস্ত সামগান গীত হয়। "ওঁ"ই আনন্দধ্বনি।

"ওঁ" ধ্বনি আদেশবাচকও বটে। ঋত্বিক যখন আজ্ঞা প্রদান করেন, যখন দীক্ষা দেন, তখনও "ওঁ" উচ্চারণ করেই তা দেন। সমস্ত জগৎ-সংসারের উপরে, আমাদের সার্বিক ক্রিয়া-কাণ্ডর উপরে মহৎ আদেশরূপে নিত্যকাল এই "ওঁ" ধ্বনিই ধ্বনিত হয়ে আসছে। জগতের অভ্যন্তরে এবং জগৎকে অতিক্রম করে গিয়ে যিনি সব সত্যের চরম এবং পরম, যিনি চিরকালীন, যিনি আমাদের মতন প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের ধ্রুবতারা, যিনি সর্ব আনন্দের পরমানন্দ, বোধের ভিতরকার বোধ, আমাদের মানব জীবনের সব ক্রিয়া-কর্মতে যিনি সমস্ত আদেশের পরমাদেশ, তিনিই "ওঁ"।

এই প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হঠাৎই মনে পড়ে গেল চারণের। সেই প্রকৃতি-পাগল, অরণ্য ও ঈশ্বর-সাধক, অথচ সাধারণ গৃহী মানুষটির কথা। বিভূতিভূষণ, চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রী সুরমা দেবীকে (যিনি বিভূতিভূষণের আত্মীয়া হতেন) একটি চিঠিতে একসময়ে লিখেছিলেন,

"দেশে ফিরে এসেছি। ঘেঁটুফুল আর নেই। তবে পানকলম শেওলার সুগন্ধি কুচো কুচো সাদা ফুল ফুটেছে নদীজলে। আর শিরিষ ফুল ফুটেছে আমাদের আমবাগানের পেছনে। নক্ষত্রমালা ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পুঞ্জে পুঞ্জে নব নবরূপে যিনি বিদ্যমান, তিনিই কখনো ঘেঁটুফুলের শুভ্রদলে, কখনো কুঁচকাটার সোনালি ফুলে ঘরের পেছনে এসে ধরা দেন। নিতে পারলেই হল।

'তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।'

তিনি আছেন, তাই সব কিছু আছে, তাঁর আলোতেই জগৎ আলো।"

চারণ ভাবছিল, বিনোদবিহারী মুখার্জির কথারই অনুরণন তুলে যে, "আমাদের চেয়ে যাঁরা সবদিক দিয়েই বড় তাঁরা সকলেই ঈশ্বরকে জেনেছেন, ঈশ্বর এবং মঙ্গলকে এক করে উপলব্ধি করেছেন।"

চারণ ভাবছিল, একেই বোধহয় বলে, "সনযোগ"। দেবপ্রয়াগের বাজারে হালুইকর তিরলোকনাথের (ত্রিলোকনাথ) দোকানে পুরী হালুয়া খেতে খেতে যদি মহাদেবের ছবির সাপ জড়ানো মাথার উপরে 'ওঁ' চিহ্নটি দেখে পাটনকে প্রশ্ন না করত, তবে কত কীই না জানা থেকে বঞ্চিত হতো।

সেই নক্ষত্র-খচিত রাতে ক্ষীণকটি, লাজুক চাঁদও উঠল। যেন, শেষ রাতে দয়িতর সঙ্গে মিলিত হবে বলে অভিসারে বেরিয়েছে চুপিসারে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ শেষ রাতের দিকেই ওঠে। প্রতি রাতেই সে সন্ধ্যাকালের দিকে একটু একটু করে হেঁটে এগিয়ে আসে। এখন রাত কত কে জানে। চারণের হাতঘড়িটা পুঁটুলির মধ্যেই ভরা আছে। ঘড়ির দাসত্ব আর করে না ও। করবে না। সময়কে, উরুগুয়ের টুপামারো সন্ত্রাসবাদীদের মতন waylaid করে, সাবড়ে দিয়েছে সে। ঘড়ির নিজের মধ্যে, কোনও "নিজস্ব" দোষ নেই। কিন্তু নিয়মানুবর্তিতা আর সময়ের বিভাজন যদি শুধুমাত্র অর্থ, আর জাগতিক সাফল্য এবং আরও অর্থ একত্রিত করার সাধনাতেই নিয়োজিত হয়, তবে সেই নিয়ম বা সেই নিয়মে একনিষ্ঠ হবার প্রয়োজন কি আদৌ আছে?

মনে হয় না আর চারণের। এখন অবশ্যই মনে হয় না।

ভারী ভাল লাগছিল ওর ওই মধ্যরাতে একা দাঁড়িয়ে থাকতে কালের প্রহরীর মতন, নীচের অলকানন্দা আর গঙ্গার শব্দের মধ্যে তারা-ভরা আকাশ আর কিশোরী চাঁদের আলোতে সিঞ্চিত হয়ে, হু-হু করে বয়ে-যাওয়া সুগন্ধি, নির্মল কলুষহীন হিমেল হাওয়ার মধ্যে ওপারের দেবপ্রয়াগের মিটিমিটি প্রদীপের আলো আর নিভু নিভু ধুনির আগুনের দিকে চেয়ে।

এতদিন পরে, এতগুলো বছর ভুল করে, ভুল পথে চলে, ও যেন হঠাৎই শাশ্বত ভারতবর্ষের সন্ধান পেয়েছে। হৃষীকেশে এসে ভাল তো করেছিলই কিন্তু মর্কট, শ্রীমান পাটন চন্দ্রর সঙ্গে দেখা না হলে তো এই ভোলানন্দজি বা শ্যামানন্দজিদের সংস্পর্শে আসতে পারত না। পৃথিবীর সবচেয়ে বিত্তশালী "উন্নত" দেশের গর্ডন আর স্টিভেন্স-এর চোখ দিয়ে তো নিজের গরিব "অনুন্নত" দেশকে

দেখতে শিখত না ! ইউনাইটেড স্টেটস আর অন্য পশ্চিমী দেশ এবং তেলের দৌলতে হঠাৎ ফুলে-ফেঁপে ওঠা মধ্যপ্রাচ্যর কোনও কোনও দেশের দুর্গন্ধ, অশিক্ষিত, গোঁড়া, ধর্মান্ধ, অনুদার কিছু অমানুষদের কাছে "উন্নতি" বলতে যা বোঝায় তা যে আদৌ "মানুষের উন্নতি" নয় এই কথাটা হয়তো সারাজীবনেও বুঝে উঠতে পারত না চারণ, যদি এই সাধু-সঙ্গে এখানে জীবনের বিকেল বেলাতে এসে না পৌঁছত। টাকা, আরও টাকার জন্যে মধ্যপ্রাচ্যেও তো কম ভারতীয় গিয়ে জোটেনি। আশ্চর্য আমাদের এই চারিত্রিক দেউলেপনা।

সেই নিস্তব্ধ, প্রায় অলৌকিক এবং হয়তো আধিভৌতিক পরিবেশে দিগন্তব্যাপী রোমশ কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের মতন, আকাশের কালপুরুষের মতন, লক্ষ বছর ধরে অতন্দ্র প্রহরাতে ঋজু দাঁড়িয়ে-থাকা নিথর শিবালিক পর্বতমালার দিকে চেয়ে হঠাৎই ওর দুচোখ ছলছল করে উঠল। এই দ্রবভাব, কোনওরকম ব্যক্তিগত আনন্দ-বিষাদের বোধশূন্য। কোনওরকম ব্যক্তিগত স্বার্থশূন্য। ও যে ভারতবাসী, ও যে এই বিরাট, স্বরাট, মহিমাময় এক সুপ্রাচীন দেশের "নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানের" মানুষদের মধ্যের মূল সূত্রটি খুঁজে পেয়েছে, খুঁজে পেয়েছে ওর শিকড়, জেনেছে যে, ও এই শাশ্বত ভারতের এক কীটাণুকীট।

এই বসুধা-বিস্তৃত গভীর দুঃখমিশ্রিত আনন্দেরই কারণে আজ রাতে সে এতখানি দ্রব হল।

ফিরে এসে, ওর প্রদীপটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে চারণও শুয়ে পড়ল। বাইরে গিয়ে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাতেই শীতের প্রকোপ বুঝতে পারল। ভাবছিল, এই হেমন্তেই এই, তো শীতের শেষে কি হবে ?

বাইরে ধুনির আগুনও নিভু নিভু হয়ে এসেছে। আশ্রমে যখন ফেরে চারণ, তখন জুগনুকে দেখেনি। বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে গুহার ভিতরে ঢোকার সময়েই লক্ষ করল যে জুগনু ধুনির দিকে পা দিয়ে গুহার দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে, গুঁড়িসুড়ি মেরে শুয়ে আছে।

পাটন কোথায়, তা পাটনই জানে।

চরৈবেতি ! চরৈবেতি !

বাসটা ঘুরে ঘুরে নামছে নীচে। পাশে পাশে, অলকানন্দা।

পাটন যেমন বলেছিল, সত্যিই সেই রূপের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। কতরকম যে গেরুয়া, কমলা, কোরা, সাদা, কালচে-সাদা আর কতরকম যে নীল-সবুজ তা বলার নয়।

পাটন বলল, দেখো চারণদা, এই শ্রীনগর উপত্যকা। সমান। শ্রীনগর পেরিয়ে গিয়ে আবার আমরা উপরে চড়ব। চড়ব, তো চড়বই।

তাই ?

চারণ অন্যমনস্ক স্বগতোক্তি করল।

হঠাৎ যে এমনি করে পাটনের লেজুড় হয়ে দেবপ্রয়াগ ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে তা গতকাল রাতেও ভাবেনি একবারও। পাটন ঠিকই বলেছিল। বলেছিল, এখানে কিসের আঠা পেলে তুমি ?

বলেই, বলেছিল, আড়কাঠি দেখেছ কখনও ?

না।

না দেখলে, আঠার মহিমা বুঝবে কি করে ? থিতু, শুধু তারাই হতে পারে, যারা তপস্যাকারী, সত্যিকারের জ্ঞানপিয়াসী। যারা সাধক। তুমি আমি তা নই। আমাদের গোড়ালি জুড়িয়ে এলেই আবার চলা শুরু করে দেওয়া উচিত। থেমে পড়লেই সেই জায়গার স্থবির গাছ পাথর ফুল পোকা বা

ঘাস হয়ে যাবে।

তারপর বলল, জোনাথন লিভিংস্টোন এর সীগাল বইটা পড়েছ কি চারণদা ?

হুঁ।

চারণ বলল। তার মনে হল, এই প্রশ্ন পাটন যেন এর আগেও তাকে কখনও করেছিল।

পাটনের এই জ্ঞানভাণ্ডারের বহরে ক্রমশই বিস্মিত হতে হতে ছেলেটা সম্বন্ধে চারণের মনে দার্জিলিং-এর সূর্যাস্ত অথবা পুরীর সূর্যোদয়ের ফোটোর মতন ক্লিশে হয়ে-যাওয়া-ধারণা, যা ফ্রেম-বন্ধ হয়ে গেছিল, তা ফুটিফাটা হয়ে যাচ্ছিল ক্রমাগত।

চারণ ভাবছিল, কোনও মানুষ সম্বন্ধেই কোনও পাকা ধারণা কখনওই করতে নেই। সব রংই ধুয়ে যেতে পারে। এক রং-এর আড়াল থেকে কখন যে অন্য রং-এর বেরিয়ে পড়ে, তা কে বলতে পারে।

নিজেকে ভাসিয়ে দিতে হবে চারণদা, বুঝলে। যার পা আটকে গেছে জীবনের কাদাতে, নুড়িতে, ঘাসে, তার সাহসও ক্রমশই কমে আসতে থাকবে। চারপাশের পরিবেশ আর প্রতিবেশ এর সব বদ্ধতা ছিঁড়েছুঁড়ে উৎসারিত উৎক্ষিপ্ত হতে না পারলে তোমার মানুষ জন্মই বৃথা। বুঝেছ চারণদা। "ছিড়ে ফেল, ছেড়ে চলো" এই হওয়া উচিত প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুর জীবনের মূল মন্ত্র। কয়েকদিন ধরেই আমি লক্ষ করছিলাম তোমার হাবভাব দেখে যে, তুমি যেন মোটার মোহজালে ধরা পড়ে গেছ। অথচ মোটা কিন্তু ধরতে চায় না কারওকেই। তার অজান্তেই তার ব্যক্তিত্ব অন্যকে অজগরের শীতল চোখের মতন আকর্ষণ করে। অজানিতেই অনেকে আটকে যায়। কিন্তু আমার ভোঁদাই বাবা আর অন্যান্য যাঁদের দেখো ওঁর চারপাশে তাঁরা সবাই সিদ্ধ পুরুষ। জর্ডন আর স্টিভেন্সও সিদ্ধ হবে বলে পণ করেছে। হোক গে তারা। তোমার বা আমার পক্ষে অত সহজে সিদ্ধি আসবে না। আমাদের পক্ষে আধ-সেদ্ধ থাকাই ভাল। হাফ-বয়েলড। হাফ-বয়েলড ডিমই বা খারাপ কিসে।

বলেই বলল, ইসস কতদিন হাফ-বয়েলড ডিম খাই না।

কেন ? একথা কেন বলছ ?

কি কথা ?

আমাদের পক্ষে আধ-সেদ্ধ থাকাই ভাল।

চারণদা, বলছি, কারণ, আমাদের ভোগ সম্পূর্ণ হয়নি বলে। আমরা রজনীশ আশ্রমে গিয়ে ভিড়লেও না হয় একটা কথা ছিল। 'ভোগের মধ্যে দিয়ে ত্যাগ' ব্যাপারটা বেশ মসৃণভাবে এসে যেত। ভোগী যে কখন ত্যাগীতে রূপান্তরিত হয়ে যায় কোন পন্থাতে, তা উপরওয়ালাই জানেন। কিন্তু অনেকে বলেন সেটা একটা মান্য-পন্থা, নান্য-পন্থা না হলেও। কিন্তু এতরকম অপূর্ণ কামনা বাসনা নিয়ে ভোঁদাইবাবার পদতলে বেশিদিন পড়ে থাকলে কবে কোন স্নানরতা বা সিক্তবসনা যুবতীকে বলাৎকার করে এই পবিত্র স্থানকে অপবিত্র করে নিজেও প্যাঁদানি খেয়ে অক্কা পেত। এইসব ভেবেই, তোমার ভালর জন্যেই তোমাকে সময়ে সরিয়ে আনলাম। you should not indulge in more greatness than you can possibly contain. বুঝলে না।

একটু চুপ করে থেকে বলল, পরে, ইচ্ছে হলে, যেও আবার। অথবা কলকাতা বা অন্য জায়গা থেকে ফিরে এসো দেবপ্রয়াগে। কে মানা করেছে। স্কুলে যেমন ভাল ছাত্ররা ডাবল প্রমোশন পায়, তেমন এই ইস্কুলে তুমিও তো ডাবল প্রমোশন পেতেও পারো। ভোগ সম্পূর্ণ না হতেই যদি উপরওয়ালা অন্যতর কোনও যজ্ঞে তোমাকে সামিল হতে বলেন, তবে না হয় তখন তাই হয়ো। কিন্তু সবচেয়ে আগে, নিজেকে জানো। নিজেকে জানাটাই এই পথের সর্বপ্রথম পাঠ। 'আত্মানাং বিদ্ধি'। শুনেছ কি কথাটা ?

শুনেছি, মানে, পড়েছি।

চারণ বলল।

শুনেছ বা পড়েছ বলেই যে মানেও বুঝেছ তার তো কোনও মানে নেই। শুনলে আর পড়লেই যদি পণ্ডিত তৈরি হত তবে তো যত শিক্ষক, অধ্যাপক, উপাচার্য আমরা দেখি আমাদের চারধারে

সকলেই তাই হতেন। পড়াশোনার উপরেও একটা অন্য জ্ঞানের পরত থাকে। কেউ কেউ সেই পরতের আশীর্বাদ সঙ্গে করে জন্মান অথবা তার যোগ্য করে তোলেন নিজেকে পরবর্তী সময়ে। শুধু তাঁরাই আসল পণ্ডিত। তা নইলে তো টিকি রাখলে আর ডিগ্রির মোট বয়ে কাঁধ ঝুঁকে গেলেই সকলেই পণ্ডিত হয়ে যেতেন।

তারপর বলল, নিজেকে জানা হোক আর নাই হোক, জানার ইচ্ছেটাও যদি নিজের মনের মধ্যে সবসময় জাগরুক রাখতে পারো চারণদা, তাহলেও জানবে যে, মাউন্ট এভারেস্ট-এর চুড়ো দেখা যাচ্ছে।

অলকানন্দার উপরের কংক্রিটের নয়া সেতু পেরিয়েছিল চারণেরা দেবপ্রয়াগ ছাড়বার পরেই। শ্রীনগরে পৌঁছে এবারে বাঁয়ে মোড় নিয়ে চলেছে বাস।

ডানদিকে পথ কোথায় গেল ?

জিগ্যেস করল চারণ পাটনকে।

সেই যে বলেছিলাম না। পউরি !

দারুণ জায়গা। না ?

চারণ, অদেখা পউরি প্রসঙ্গে শুধোল।

সব জায়গাই দারুণ চারণদা। কোনও জায়গাই অন্য জায়গা থেকে ভাল নয়। তেমন সব মুহূর্তও দারুণ। সবসময়ে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির কথা মনে রাখবে। "You must live from moment to moment", আমাদের মধ্যে নিরানব্বুই ভাগ মানুষই হয় ভবিষ্যতে বাঁচি নয়, অতীতে। অথচ এই যে এই মুহূর্তটি, ধরো না কেন এই মুহূর্তটিই, মানে This very মুহূর্তটিই, এই যে আমরা চলেছি শ্রীনগর ছাড়িয়ে রুদ্রপ্রয়াগের পথে, পথের দুধারের এই সুন্দর দৃশ্য, এই শান্তি, এই মুহূর্তটিকেও কি আমি অথবা তুমি পরিপূর্ণভাবে নিংড়ে নিতে পারছি বা পারার চেষ্টা করছি ? বলো ? জীবনের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত, প্রতিটি সপ্তাহ, মাস, বছরকে নিবিড়ভাবে পাওয়াটাই দার্শনিকের পাওয়া। সে দর্শন ত্যাগের আর দান ধ্যানেরই হোক কি চার্বাকের মতানুযায়ী "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ"-এরই হোক।

চারণ চুপ করেই রইল। ও ভাবছিল, পাটনটা এই সাধুসন্তদের সঙ্গে থাকতে থাকতে নিজের অজানিতেই বোধহয় সাধু হয়ে গেছে। নইলে, অমন বাবার এমন ছেলে হয় কি করে। তাছাড়া, একটা বহুশ্রুত কথা আছে না উদ্ভিদদের জীবনে ? যাকে, উদ্ভিদবিজ্ঞানের ভাষাতে Symbiosis বলা হয়ে থাকে, এক গাছের কোটরে অন্য গাছের বীজ বা ফল পড়ে সেখানেই এক গাছের মধ্যে অন্য গাছের জন্ম হয়। পাটনের জীবনে হয়তো এই Symbiosis-ই কাজ করছে।

বাসটা বেশ উপরে উঠেছে আবার। ঠাণ্ডাটা কনকনে। গলার বোতামগুলো তো আটকেছিল আগেই এবারে মাফলারটাও জড়িয়ে নিল। মাথায় বাঁদুরে টুপি। নিজের চেহারা নিজে দেখতে পারছিল না ভাগ্যিস ! যদি পেত, তবে ও নিজে তো দূরস্থান ওর পাওনাদার অথবা টেঁটিয়া মক্কেলদের কেউও ওকে চিনতে পারত না শত চেষ্টাতেও। একেই বলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ এর প্রভাব।

"ব্যোম শংকর।"

কানের কাছেই এক সহযাত্রী আওয়াজ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সারা বাস জুড়ে রব উঠল "ব্যোম শংকর।" "ব্যোম শংকর।"

বাসের পেছন থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল "বোলো বাবা বদ্রীবিশালজিকি-ই-ই-ই-ই"

সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা সমস্বরে বলে উঠল, "জয়।"

কিছু বুঝতে পারার আগেই চারণ স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, হাইকোর্টের একজন বিলেত-ফেরৎ, দুনিয়াদারী-করা ব্যারিস্টার যে, একটু ইচ্ছে ও চেষ্টা করলেই শেরিফ হতে পারত কিংবা নির্বাচনের টিকিট পেতে পারত এ বছরেই, তার এমন অধঃপতন হয়েছে যে, সে আর বলার নয়।

লজ্জাতে, মরমে একেবারে মরে গেল যেন। ছিঃ। কলকাতার আঁতেলরা জানতে পারলে কি ভাববেন !

পাটন বলল, কেমন বুঝছ গো চারণ দাদা। এ নিছক কেলো নয়, একেরে ক্যা-ক্যা-ক্যা-ক্যালামিটি। এ ক্যালিমিটি থেকে উদ্ধার পাবে তেমন ক্যা-ক্যা-ক্যা-ক্যাপাকাইটি তোমার নেই। তরীর বৈঠাটিও আমারই হাতে। আমি যে পাটন ! বলেই, গান ধরে দিল,

"কে যাবি পারি তোরা কে ?
আমি লৌকা লিয়ে বসে আচ্চি
লদী কিলারে..."

পাটনের বহুমুখী প্রতিভাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়ে চারণ বলল, ক্যাপাকাইটিটা আবার কি জিনিস ?

মনোজ মিত্রর Coinage।

মানে ?

গেঁয়ো, ইংরেজি-অ-নবিশ লোকে capacity-র উচ্চারণ কি করবে ? ক্যাপাকাইটি নয় ?

হেসে ফেলল চারণ।

বলল, তোমার স্টকে কিছু আছে বটে !

হুঁ। হুঁ। এ তো Tip of the Iceberg.

বলেই বলল, একটা গুলি সেবন করবে না কি ? ঠাণ্ডাতে যেন এখনই এই সকাল নটাতেই নিভে গেলে ! আর আজ তো মোটে তিন তারিখ নভেম্বরের। এরই মধ্যে।

চারণ চমকে উঠল। দুমাসের মতন হয়ে গেছে ওর কলকাতা ছেড়ে আসার। কই ? তেমন কিছুই তো ঘটেনি, জয়িতা তো লোক পাঠায়নি খোঁজ করতে। কোনও মক্কেল, এমনকি চন্দ্র বা সরকার অথবা জালান অথবা নেগি বা খারবান্ধারাও দিল্লির অফিসকে বলেনি তাকে "লিটারালি অ্যারেস্ট" করে নিয়ে আসতে। ও না গেলে তাদের রাজ্যপাট সব নীলামে বিকোবে। ভেবেছিল কি চারণ ?

ভেবেছিল। ও এসব ভেবেছিল। ওসব idiotic wishful thinking। কারও জন্যেই কারও ঠেকে থাকে না। কোনও ডাক্তার, উকিল, ব্যারিস্টার, স্বামী, প্রেমিক। না কারও জন্যেই নয়। "ঠেকে থাকে" এই ভাবনাটাই নিজের নিজের আত্মম্ভরিতা বই আর কিছুই নয়। কারওই যদি তাকে দরকার সত্যিই নাই থাকল তবে সে আবার ফিরতে যাবেই বা কেন ? কিসের জন্যে ?

কি হল ? বললে না যে ! খাবে গুলি ? বলো তো বের করি। ঝোলাতে আছে।

নাঃ।

বলল, চারণ।

বিরক্তিটা গুলির প্রতি, না পাটনের প্রতি, না তার নিজেরই প্রতি তা বুঝতে না পেরে।

এরপরে দুজনেই বেশ অনেকক্ষণ নিজের নিজের ভাবনাতে বুঁদ হয়ে চুপ করে রইল।

আসলে চুপ করে থাকলেই কোনও মানুষ প্রকৃতই চুপ হয়ে যায় না। মস্তিষ্কের মধ্যে কথার চাবিগুলো অর্গানের চাবিরই মতন ওঠে আর পড়ে, কিন্তু mute হয়ে থাকে। অন্যে শুনতে পায় না। নিজের কান ঠিকই শোনে।

এ পথে অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য জায়গা নেই। ছোট ছোট গ্রাম আছে অলকানন্দার দুপারেই। ভিতরে ভিতরে, বিভিন্ন উচ্চতাতে। আর পায়ে-চলা পাথর-বাঁধানো পথ। যেসব পথের অনেকই বর্ণনা চারণ পড়েছিল জিম করবেট-এর বইয়েতে। নানা গাছ। দেবদারু, তোন, তাড়, ওক, মেপল, বার্চ, চেস্টনাট, হর্স-চেস্টনাট, আরও কত তৃণ গুল্ম। চারণ আর কটা গাছের নাম জানে ! দেখতে দেখতে চলেছে চোখে কিশোরের ঔৎসুক্য নিয়ে।

হঠাৎ পাটন বলল, এদিকে যখন এলেই তখন একটা বই লেখো না তুমি চারণদা।

বই ? আমি ? কী বই ?

অবাক হয়ে বলল চারণ।

ট্র্যাভেলোগ। আবার কি বই ? এইসব অঞ্চলে দুমাস রইলে, এত রকমের মানুষকে দেখলে কাছ থেকে হৃষীকেশে, দেবপ্রয়াগে। দেখবে আরও রুদ্রপ্রয়াগে। সেখান থেকে আরও কত দিকে যেতে পারো। ইচ্ছে করলেই। আচ্ছা তুমি এতদিন আছো, পুরো গ্রীষ্মটাই বলতে গেলে থাকলে, তোমার নাকের উপর দিয়ে হাওড়ার ঘুসুরীর বেন্দাবন, মালিপাঁচঘড়ার নটে, বালিগঞ্জের নেকি সুতনুকা, নিউ আলিপুরের দাম্ভিক সেন সাহেবরা, সল্টলেক-এর চালিয়াত বোসেরা, ঘোষেরা, চাটুজ্যেরা, ডায়মণ্ডহারবড়ার ছিকান্ত আর সৌদামিনী, সকলেই কেদার-বদ্রীতে গিয়ে পুণ্য সেরে ফেলল আর তুমি "ন যযৌ ন তস্থৌ" হয়ে দেবপ্রয়াগেই পড়ে রইলে কেন বলত ? তোমার কি পুণ্য করতে ইচ্ছে হল না একটুও ? নাকি তোমার পাপ জমেনি তেমন, তাই পুণ্য করে তা কাটাকুটি করতে চাও না ?

ঠিক তা নয়।

চারণ বলল।

তবে কি ? ঠিক-বেঠিক জানি না। ব্যাপারটা কি ?

জানি না, বুঝিয়ে বলতে পারব কি না। সকলেই যা করে তা করতে আমার কোনওদিনই রুচি ছিল না। জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই নয়। এরা যে প্রবল বেগে গেল দেবদর্শনে যুদ্ধের রথের মতন দ্রুতগামী বাসে করে, ব্যস্ততার ধুলো উড়িয়ে, হাজার হাজার মানুষ, যেমন করে প্রতিবছর মক্কা-মদিনাতে যায় "হাজী" হতে, সেলাইবিহীন বস্ত্র পরে পৃথিবীর সব মুসলমানেরা, জেরুজালেমে যায় ইহুদিরা, মরুভূমির মধ্যের হিংলাজে যায় হিন্দুরা, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে সর্দারজিরা—তাদের কারও সঙ্গেই আমার তো কোনওই মিল নেই।

কেন ? মিল নেই কেন ? তুমি কি হেলিকপ্টার থেকে থ্রি-পিস-স্যুট পরা অবস্থাতে এখানে আছড়ে পড়েছ ? তুমি এদেশের কেউ নও ?

সে কথা নয়। আমি হিন্দু মা-বাবার সন্তান কিন্তু আমি নিজে কোনও বিশেষ ধর্মাবলম্বী নই। তা বলে ধর্মের ভূমিকা, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আমি অস্বীকারও করি না। কিন্তু যে ধর্ম সম্বন্ধে এখনও পৃথিবীর মানুষ অবহিত নয় আমি তেমনই এক ধর্মে বিশ্বাসী। যে ধর্ম আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয়েও অন্য কোনও ধর্মেরই সঙ্গে কোনও বিরোধ রাখে না। রাখবে না। এই ধর্ম আমার শিক্ষা, আমার শিক্ষা-বিকীরিত ঔদার্য, আমার আধুনিকতা। যে-আধুনিকতা প্রাচীনত্বর প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল হয়েও উগ্র অশিক্ষিত সবজান্তা বড়লোকদের বা বুদ্ধিজীবীদের তথাকথিত আধুনিকতা থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র।

বলেই বলল, যাক সেসব কথা। বাসের মধ্যে বসে এত গভীর আলোচনা করতে গেলে চিন্তা নড়ে যাবে, মগজ ঘুলিয়ে উঠবে।

বেশ। তা নয় মানলাম কিন্তু তোমার বই লিখতে বাধা কোথায় ?

কী যে বলো পাটন। এইসব অঞ্চল নিয়ে কত ভাল ভাল বই লেখা হয়েছে তা কি তুমি জান ? কত মানুষ, এবং তাঁরা সকলেই আমার চেয়ে অনেকই জ্ঞানী, গুণী, অভিজ্ঞ, সারাজীবন এই কুমায়ূঁ আর গাড়োয়াল হিমালয়ের আনাচ-কানাচ ঘুরে কত সুন্দর সব বই আমাদের উপহার দিয়েছেন।

বাংলা বই ?

পাটন অবিশ্বাসীর গলাতে বলল।

হ্যাঁ বাংলা বই। কেন তোমার কি ধারণা ভাল বই বলতে যা বোঝায় তার সবই ইংরেজিতেই লেখা হয় ? আমার তো ধারণা ইংরেজিতে প্রকাশিত আশিভাগ বইই উনুনে দিয়ে দেওয়া উচিত। এই হীনম্মন্য মানুষদের দেশে কেউ ইংরেজি বললে বা ইংরেজি জানলেই আমরা তাকে দেবতা জ্ঞান করি। লজ্জাকর।

আঃ। তুমি এই মেজাজ নিয়ে হাইকোর্টে সওয়াল করে জিততে কি করে ভেবে পাই না। সত্যি!

সেই আমি এই আমি নই।

তুমি নও ?

নাঃ।

তবে সে কে ? তুমি কতজন তুমি ? আচ্ছা হেঁয়ালি করো তো !

সে একজন মুখোশধারী। আমার চেম্বারের দেওয়ালে যে-হ্যাঙ্গারে গাউন টাঙানো থাকে, যেটা গায়ে আলতো করে চাপিয়ে, যে শামলা গায়ে দিয়ে কোর্টে অ্যাপিয়ার করি আমি, তারই পাশে একটি অদৃশ্য হ্যাঙ্গারে ঝোলানো থাকে আমার উকিলের মুখোশ। যে-আমি কথায় কথায় মাথা নিচু করে, হাসি মুখে, বিনয়ের পরাকাষ্ঠা করে কোনও কোনও হাকিমকে বলি, 'মী লর্ড' আর যার মুখোশের আড়াল থেকে আমার আসল আমি নিরুচ্চারে বলে, "ওরে ছাগল, যা বলি, তা কান খুলে শোন।" সেই আমি আসল আমি নই। সে তো একটা বিক্রি হয়ে-যাওয়া সত্তা। সে-আমি ছাগলকে ছাগল বললে, অশিক্ষিতকে অশিক্ষিত বললে আমার মক্কেলদের যে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আদালত অবমাননা হয়ে যাবে। আদালত কি কখনও অবমাননা করার মতো কাজ করেন ? ছিঃ। মক্কেলদের কাছ থেকে স্বর্ণমুদ্রা হিসেবে সম্মানী নেব আর তাদের সর্বনাশ করব তা তো হতে পারে না। তবে যখন ওই পাড়া ছেড়ে বাইরে চলে আসি, চলে আসি আমার চেম্বার ছেড়ে, তখন আমি আসল আমি হয়ে যাই। মুখোশটা সারা রাত, সারা গ্রীষ্মাবকাশ, পুজোবকাশ, চেম্বারের দেওয়ালেই ঝোলে। তাতে ধুলো পড়ে।

তোমাকে নিয়ে আর পারি না। আনতে বললাম গোবর আর ঠেলে আনলে গাই। এইসব অঞ্চল নিয়ে লেখা কয়েকটি বইয়ের নাম বল তো শুনি। আশ্চর্য। আমি একটাও পড়িনি।

পাটন সম্ভবত চরতে বেরুনো চারণকে ফিরিয়ে আনার জন্যে বলল।

প্রথমেই বলতে হয়, 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ'।

চারণ বলল।

কার লেখা ?

প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। শুধু এই অঞ্চলই নয়, আরও অনেক জায়গা নিয়ে লেখা। কৈলাশ, মানস সরোবরও আছে। নিজের আঁকা ছবি। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখাও আছে। প্রবোধ সান্যাল মশায়ের "মহাপ্রস্থানের পথে"র সিনেমা দেখেই তো সাধারণ বাঙালির টনক নড়ে। ওই ছবিতেই বাঙালি আবিষ্কার করে অরুন্ধতী গুহ ঠাকুরতা এবং বসন্ত চৌধুরীকে।

তাই ?

তাই বৎস।

আর কার কার বই আছে ?

শঙ্কু মহারাজের। অনেক বই। সারা জীবনই বলতে গেলে এই অদম্য জীবনীশক্তির মানুষটি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে সাধারণ বাঙালিদের জন্যে এইসব পুণ্যভূমির খবর জোগালেন। এছাড়াও আরও অনেকে আছেন। সকলের নাম বলতে গেলে তুমিই Bored হয়ে যাবে।

তা ঠিক।

তারপর আবার দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে নিজের ভাবনাতে বুঁদ হয়ে রইল।

হঠাৎই পাটন বলল, চন্দ্রবদনীকে তুমি ধরে রাখতে পারলে না চারণদা ? কাজটা ভাল করলে না কিন্তু। সোনাকে অবহেলা করলে অমন করে !

চারণ হেসে বলল, ফাজিল ! এক নম্বরের !

তারপর বলল, সত্যি। সে গেল কোথায় বলো তো ? আর তো তারপরে দেখলামই না।

তুমি না দেখলে কি হয়, সে তোমাকে দেখেছে ঠিকই।

বাজে কথা। মোটেই নয়। তুমিও ভাল করেই জানো যে, সে তোমাকে দেখেছে। "কথা পড়ে হাটের মাঝে/যার কথা তার বুকে বাজে।" হেঃ হেঃ।

তারপরই বলল, তোমার সঙ্গে দেখা না-হতে পারে, আমার সঙ্গে হয়েছে। সে নীচে গেছিল, হৃষীকেশেও। তোমার সেই সব বাবা ধিয়ানগিরি, বাবা ভীমগিরি আর কৃষ্ণা বহীনদের সঙ্গে দেখা করতে।

তারপর কোথায় গেছে ?

তা কি করে বলব। মেয়েরা নদীরই মতন। তারা কোথায় বাঁক নিয়ে কোন অচেনা বনের মধ্যে কখন হারিয়ে যায় তা কি আগে থাকতে বলা যায় ? পাখিরাই শুধু খোঁজ রাখতে পারে, রাখে তাদের। তারা যে জলের গন্ধ চেনে। এবং চেনে বলেই, দূরের নদীর গন্ধ পেয়ে কাক-উড়ান এ উড়ে গিয়ে তাদের ঠিক খুঁজে বের করে।

বাবা, এ যে কবিতা একেবারে।

চারণ বলল।

পাটন হেসে বলল, আমরা প্রত্যেকেই কম-বেশি কবি। এবং ভগ্নদূতও।

ভগ্নদূত মানে ?

ভগ্নদূত, কারণ অন্যের জন্যে ভাল খবর আমি প্রায় কখনওই নিয়ে যেতে পারিনি। যেমন তোমার জন্যেও পারলাম না।

মানে ?

মানে, চন্দ্রবদনী রুদ্রপ্রয়াগ ছেড়ে সেই যে নেমে গেছিল দীপাবলীর আগে দেবপ্রয়াগে, যখন আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারপর থেকে তার কোনও খোঁজই নেই।

খোঁজ নেই মানে ?

মানে, নিরুদ্দেশ।

হতেই পারে না।

চারণ জোরের সঙ্গে বলল।

কেন ? হতে পারে না কেন ? প্রতিদিন আমাদের কলকেতার খবরের কাগজগুলোতে পাতা জুড়ে হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ এর যে সব খবর বেরোয় সেগুলো কি সব মিথ্যে ?

না, তা নয়।

নয় কেন ? তোমার নিজের পায়ের আঙুলে চাপ পড়েছে বলেই তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আর অন্যদের বেলা সহজেই বিশ্বাস হয়।

বিরক্ত হয়ে চারণ বলল, আঃ পাটন। থামো এবারে। সে আছে না গেছে, বেঁচে আছে না মরে গেছে তা জানতে আমার বিন্দুমাত্রই ঔৎসুক্য নেই। তুমিই একটি Myth তৈরি করলে অকারণ তাকে নিয়ে, আবার তুমিই তাকে হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ-এর পাতার খবর করে দিলে।

তারপর বলল, তুমিই খুন টুন করো নি তো ?

করতেও পারি। করলেও বা জানছে কে ? দেবভূমির এই মস্ত সুবিধে। প্রতিমুহূর্তেই এখানে জন্ম হচ্ছে অগণ্য মানুষের, আক্ষরিকার্থে নয়, ভাবার্থে। তেমন প্রতিনিয়ত মৃত্যুও হচ্ছে। সবরকম মৃত্যু। তাই নিয়ে কেউ উল্লাসও করছে না আবার চোখের জলও ফেলছে না।

সব ব্যাপারেই তোমার এই দার্শনিকতা আমার ভাল লাগে না পাটন। তোমার এই ছদ্ম-দার্শনিকতা।

পাটন হেসে বলল, আমার দার্শনিকতাটা ছদ্ম নয়, যতটুকু পেয়েছি, মোটারই অশেষ দয়াতে। কিন্তু তুমি যে পেলে না কিছুই, তোমার আধার ভাল হওয়া সত্ত্বেও। হয়তো তেমন করে নিতেও চাওনি।

চমকে উঠে চারণ বলল, হয়তো তাই সত্যি ! কিন্তু কেন বলো তো ?

বললাম তো ! পেতে চাওনি তাই। সময় হয়নি। জীবনে প্রতিটি ঘটিতব্য ঘটনারই একটি বিশেষ সময় থাকে। সেই সময় উপস্থিত না হলে কিছুই ঘটবে না। এইসব ঘটনা পেঁপে বা কলা পাকানো নয়, যে, কারবাইডের সাহায্যে তোমার ইচ্ছে মতন পাকাবে। সময়কে তার প্রাপ্য দিতেই হবে।

বলেই বলল, চারণদা, "What will be, will be well, for what is is well, To take interest is well, and not to take interest shall be well".

চমকে উঠল চারণ। বলল, কার ?

Walt Whitman, আমেরিকার রবীন্দ্রনাথ।

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে চারণ বলল, হুঁ। সময়কে সময় না দিয়ে কোনও উপায়ই নেই। না দিলেও সে আদায় করে নেবে।

বলল, স্বগতোক্তিরই মতন।

হুঁ বলল, না "ওঁ" বলল ঠিক বুঝল না।

"ওঁ" শব্দটির মানে ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠার পর থেকে মাঝে মাঝেই ওর এমনই নির্জনে ওঁ বলে উঠতে ইচ্ছা করছে। নিজের মনের নির্জনতা বোধ করলেই মানুষে নির্জন হতে পারে। তা বাসের মধ্যে বা ট্রেনের মধ্যে বা যেখানেই তিনি থাকুন না কেন ! পাটনের নিরন্তর বুকনি না থাকলে বাসের মধ্যে বসেই ও হয়তো সেই নির্জনতা বোধ করত। কিন্তু তা কি হতে দেবে পাটন।

প্রথম-দুপুরে যাত্রীদের খাওয়ার সময়ে, সাহেবি লাঞ্চ-আওয়ারে নয়, বাসটা এসে দাঁড়াল রুদ্রপ্রয়াগে। তার আগে অলকানন্দার উপরের মস্ত ব্রিজ পেরিয়ে এসেছিল। এখান থেকে সোজা গেলে কেদারনাথের পথ চলে গেছে আর মন্দাকিনীর উপরের সেতু পেরিয়ে নদীর ওপারের পথ ধরে গেলে বদ্রীবিশাল। এইখানেই মন্দাকিনী আর অলকানন্দার সঙ্গম। সঙ্গমে যেতে হলে বাস যেখানে থামল সেখান থেকে আরও এগিয়ে যেতে হবে।

সত্যি সত্যিই এসে পৌঁছল তাহলে। চারণ ভাবছিল, প্রত্যেক মানুষেরই স্বপ্নে আর কল্পনাতে অনেকই জায়গা থাকে। সেইসব জায়গাতে বোধহয় কোনওদিনও না যাওয়াই ভাল। গেলে, 'ইয়ারো ভিজিটেড'-এর মতো স্বপ্ন ভঙ্গ হয় হয়তো। প্রেমেন্দ্র মিত্রর বিখ্যাত গল্প "তেলেনিপোতা আবিষ্কারে"র মতন।

কিন্তু খুব একটা স্বপ্ন ভঙ্গ হল কি ? নাঃ। যেমন পড়েছিল, যেমন ছবি দেখেছিল তার, তেমনই তো দেখছে। পঞ্চাশ ষাট বছর পরেও তো খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। জিম করবেট-এর "ম্যান-ইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ" বইতেও নদীর উপরের সেই ঝুলন্ত লোহার ব্রিজটার ছবি দেখেছিল। যার স্তম্ভের উপরে জিম করবেট দুরাত কাটিয়েছিলেন চিতাটি যদি রাতে নদী পার হয়, তবে তখন তাকে মারবেন এই আশাতে। ওই সব নদীতে এতই বেগ এবং জল এতই হিমশীতল যে বেড়ালের মাসির মতো চামড়া-সচেতন প্রাণী চিতা, নদী সাঁতরে পেরুনোর চেষ্টাই করবে না তাই। অলিখিত কার্ফু ঘোষিত হয়ে গেছিল পুরো এলাকাতে, বছরের পর বছর। সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানের নীরবতা নেমে আসত তখন গাড়োয়ালের এই সব অঞ্চলে বছরের পর বছর ওই একটি মানুষ-খেকো চিতার ভয়ে।

ওদের নামিয়ে দিয়ে বাসটা চলে গেল নীচে। সেখানে বাজারে গিয়ে দাঁড়াবে। যাত্রীরা মধ্যাহ্নের খাওয়া সারবেন। যার যা অভিরুচি। রুটি, ফুলকা, সবজি, ডাল, কাড়হি, দই। যে যা ভালবাসেন। গরম চা। বোতলের পানীয়ও। থামস-আপ, ফান্টা, লিমকা, কোক ইত্যাদি।

বাসটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জায়গাটাকে যেন নির্জন বোঝাল। একপাশে, বাঁয়ে, খাড়া নেমে গেছে নীচে নদীপথ। মন্দাকিনী আর অলকানন্দা মিশে যাওয়ার পরে মন্দাকিনীর আর কোনও আলাদা অস্তিত্ব রইল না। অলকানন্দার নামেই তখন সে পরিচিত। আবার অলকানন্দা যখন দেবপ্রয়াগে গঙ্গার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হল তখন থেকে সেও লীন হয়ে গেল গঙ্গাতেই। হৃষীকেশ-এ পৌঁছে যখন সমতলে ছড়িয়ে গেল ভগীরথের মর্তো-আনীত গঙ্গা, তখন সে শুধু গঙ্গা বলেই পরিচিত হল।

একপাশে নদী আর অন্যপাশে একেবারে খাড়া পাহাড়। ওরা যেখানে নামল তার কাছেই পাহাড়ের গায়ে দুটি হোটেল আছে পরপর। তারওপরে আর্মির ক্যাম্প। ট্রান্সপোর্ট ডিপো। বাজারের দিকে নিশ্চয়ই অনেকই হোটেল, ধর্মশালা আর চট্টি আছে।

এরপর ? এবারে কি ?

গলার বোতামটা ঢিলে করে, মাফলারটা খুলে ফেলে চারণ জিগ্যেস করল তার লোকাল গার্জেন

পাটনকে।

এখন হাওয়া আছে কিন্তু বাস চলাকালীন যেমন লাগছিল তেমন ঠাণ্ডা তো নেই। রোদ ঝকঝক করছে চারদিকে। নীল আকাশ, সবুজ নদী, গাঢ় সবুজ জঙ্গল। রোদের কুচি উড়ছে হাওয়াতে।

চারণ পা চালিয়ে বলল, এরপর আর একদিন তুমি আমার সাধুসঙ্গ পাবে। জাস্ট একটি দিন।

মানে?

মানে আর কী। একরাত তোমার সঙ্গে কাটিয়ে তোমার একটা গতি করে দিয়ে আমি চলে যাব।

অবাক হয়ে চারণ বলল, ব্যাপারটা কি? তোমাকে তো আমি আমার অগতির গতি হতে বলিনি। দেবপ্রয়াগ থেকে বেরোলে আমাকে ট্যাকে করে আর রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছেই Jettison করছ আমায়, তোমার এই হরকৎ এর উদ্দেশ্যটা কি? আর তুমি যাবেটা কোথায়?

বদ্রীনাথ। সেখান থেকে আরও উপরে।

সেখানে কি?

দুধাহারীবাবা আছেন।

তাই?

হ্যাঁ। সারা শীতকালটাই উনি বরফের মধ্যে বসে সাধনা করেন।

সত্যি?

না তো কি মিথ্যা? শুধু উনিই কেন! কত সাধুসন্ত আছেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। সমতলের মানুষেরা তো দূরস্থান, আমরাই বা তাঁদের কজনকে চিনি। তাঁদের কজনেরই বা আশ্রম বা সংগঠন আছে? এমন সন্ন্যাসীও অনেক আছেন যাঁর একজনও চেলা নেই। তাঁরা স্বয়ম্ভু কিনা জানি না। তবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্য, পানীয়, ভীতি, দয়ামায়া, ভক্তি এসব ব্যাতিরেকেই শীত গ্রীষ্মের বোধরহিত হয়েই একা একা বেঁচে থাকেন যুগের পর যুগ। সময়, Eternal time, জার্মান শেফার্ড ডগদেরই মতো বরফ মেখে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে এসে সেইসব সন্নিসীদের দুপায়ের উপরে মাথা নামিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে। আসল দেবভূমি তো ওইসব জায়গাতেই চারণদা! কেদারবদ্রী, গোমুখ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স তো তোমার মতো সাধারণ তীর্থযাত্রীদেরই জন্যে। কলকাতাতে ফিরে পাড়ার রকে আর শ্বশুরবাড়িতে হিরোগিরিতেই এইসব অধিকাংশ যাত্রীদেরই তীর্থযাত্রার সার্থকতা। এসবই বাহ্য। আগে চলো আর। আগে কহো আর।

তা তুমি কি পথেই দাঁড়িয়ে জ্ঞান বিতরণ করবে, না খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত কিছু করবে? রাতটা যেখানে কাটাবে বলে মনস্থ করেছ, সেই ডেরাতেই তো আস্তানা গাড়লে হয় দিনে দিনে। এখনই যা হাওয়া ছেড়েছে। রাতে তো মালুম দেবে।

হ্যাঁ, চলো। তাই তো যাচ্ছি। চলছি দেখছ না। দাঁড়িয়ে আছি, থোড়িই।

বলেই, পাটন একটু এগিয়ে গেল আমাকে নিয়ে। একটা বাঁক নিয়েই একটি চারতলা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। চারতলা বটে কিন্তু হোটেলটির আদৌ depth নেই। দিল্লির জনপথে জনপথ হোটেলের এক একটি উয়িং যেমন, সেরকম। লম্বা টানা বারান্দা আর তার সামনে পাশাপাশি ঘরের সারি।

সামনে গাড়ি রাখারও জায়গা আছে।

ম্যানেজার পাটনকে দেখেই দৌড়ে এল। চারণ বুঝল যে, পাটনের যাওয়া আসা আছে এখানে।

পাটন বলল, জয় বদ্রীবিশালজিকি।

অল্পবয়সী ম্যানেজারও বলল, জয় বদ্রীবিশালজিকি!

তারপরই গুরুমুখীতে বলল, "উত্তে? ইয়া থল্লে?"

পাটন আঙুল দিয়ে উপরে দেখিয়ে বলল, উত্তে। উত্তে।

ম্যানেজার আমাদের নিয়ে সিঁড়ি চড়তে লাগল। লাগল তো লাগলই। পাটন বলল, ঘর আর ফালি বারান্দাটুকু নিয়ে যতখানি জায়গা, হোটেলের depth-ও ততখানিই। ওইটুকু জায়গাও যে বের করেছে এই খাড়া পাহাড়ে এই যথেষ্ট। তবে আমাদের দেশের সমস্ত পাহাড়ি এলাকাতেই যেমন

আনপ্ল্যানড, আনরেস্ট্রিক্টেড কনস্ট্রাকশন হয়ে চলেছে যুগের পর যুগ ধরে, তাতে দেখবে, খেপে খেপে ধ্বস নেমে সব পাহাড়ি শহরই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে একদিন। টাউন-প্ল্যানিং-ট্যানিং, সুয়্যারেজ, পিলারিং এসবের বালাই নেই গত পঞ্চাশ বছর। এই তো সেদিনই ভূমিকম্প হয়ে গেল না যোশীমঠ থেকে শুরু করে সর্বত্র? তুমি যে হোটেলে ছিলে হৃষীকেশে, সেই হোটেলের লিফটটার অ্যালাইনমেন্ট পর্যন্ত নড়ে গেছে। উঠতে নামতে ঢকঢক শব্দ করে। লক্ষ করেছিলে চারণদা?

হুঁ।

চারণ বলল।

অথচ তুমি সুইটজারল্যান্ডে যাও, দেখবে ছবির মতন সব কিছু। তুমি গেছ নিশ্চয়ই?

গেছি একাধিকবার। কিন্তু আমাদের কুমায়ুঁ আর গাড়োয়াল হিমালয়ের সঙ্গে সুইটজারল্যান্ডের তুলনা? শিবের সঙ্গে বাঁদরের? কোনও তুলনাই হয় না। ওদের ঘরবাড়ি পথ সবই ভাল হতে পারে কিন্তু এমন দেশ ওরা কোথায় পাবে। শুধু আমাদের দেশের নেতাগুলো যদি মানুষ হত!

পাটন বলল, সবে সিম্পটমস দেখা দিতে শুরু করেছে। প্রকৃতিকে বহু হাজার বছর ধরে ধর্ষণ করছি আমরা। প্রকৃতি যখন প্রতিশোধ নিতে শুরু করবে তখন...।

চারণ বলল, শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।

ঠিক তাই।

এই হোটেলের মালিক কিন্তু সাহারানপুরের মানুষ। বুঝলে চারণদা। উত্তরপ্রদেশীয়। ম্যানেজার যদিও পাঞ্জাবি। এদের মস্ত বড় দুগ্ধজাত সামগ্রীর কারখানা আছে সাহারানপুরে। পাউডার মিল্ক, কনডেনসড মিল্ক, ঘি, আচার, রুটি ইত্যাদি নানা কিছু তৈরি হয়। মালিক মার্সিডিস গাড়ি নিয়ে বছরে একবার আসেন শ্বশুর শাশুড়ি এবং স্ত্রীকে নিয়ে। বদ্রীনাথ কেদারনাথ যেতে এখানে পথে থাকতে অসুবিধে হত আগে আগে, তাই এখানে এই হোটেলটিই বানিয়ে রেখেছেন।

বাঃ। আমার একজন এমন জামাই থাকলে বেশ হত।

বে-থা করো। বউই আগে আসুক। তারপরে তো মেয়ে জামাই। গাছে না উঠতেই এক কাঁদির আশা?

যে-ঘরটিতে ওদের নিয়ে ওঠাল ম্যানেজার সেটি ছোট হলেও cosy। অ্যাটাচড বাথও আছে।

আরেকটা ঘর লাগবে, চারণ বলল।

ম্যানেজার বলল, দোনো একসাথমে নেহি রহিয়ে গা? ঠিক হ্যায়। বগলওয়ালা কামরাভি খুল দে রহা হ্যায়।

পাটন বাংলাতে বলল, কেন বাবা! তুমি কি বাবুকে "হোমো" ঠাওরালে নাকি?

হেসে ফেলল চারণ। কিন্তু আশ্বস্তও হল। অন্য কারও সঙ্গেই একঘরে শোওয়ার অভ্যেস ওর ছিল না। রাতের ঘুম এবং বিশ্রাম ব্যাপারটা এতই ব্যক্তিগত এবং নিভৃত যে, তাতে প্রিয়তম বন্ধুকে নিয়েও একঘরে শোওয়া অসম্ভব। বান্ধবী হলে কি করত জানে না অবশ্য। তবে সে সব কল্পনাতেই ছিল। কখনও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখিনি। শোওয়ার সময়ে একা ঘরই ভাল। বেশ কিছুদিন তো দেবপ্রয়াগে ভোলানন্দজির গুহাতে অতজনের সঙ্গে কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েই কাটল। তখন কিন্তু কোনও অসুবিধা হয়নি। যেখানে বাহুল্য করা যায় সেখানে কম-সম করার অভ্যেস চারণের নেই। যেখানে বাহুল্যবর্জন অবশ্যকর্তব্য সেখানে বর্জন করতে আপত্তি নেই।

পাটন পাশের ঘরটিও খুলিয়ে দুটি ঘর থেকেই চেয়ার বের করে বারান্দাতে পাতাল। রোদ এসে পড়েছে বারান্দাতে। সামনে সোজা দেখা যাচ্ছে অলকানন্দার ওপরের প্রায় আকাশছোঁয়া পাহাড়। তার মাঝে মাঝে গাছগাছালি, বস্তি। ওইটিই কি রুদ্রপ্রয়াগের মূল বস্তী? কে জানে! গৃহপালিত গাছগাছালির ভিড়ে বাড়ি ঘর তেমন দেখা যাচ্ছে না কিন্তু লোকজন যে যাতায়াত করছে তা উঁচু পাহাড়ের ridge-এর উপরে গাছগাছালির ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

কি দেখছ?

ওখানে গ্রাম আছে।

অত উঁচু পাহাড়ের উপরে ?

নিশ্চয়ই ! হাসালে তুমি বঙ্গনন্দন। তিব্বতেও কি ঘর বাড়ি নেই ? আর এ-তো রুদ্রপ্রয়াগ। কেদারনাথ বদ্রীনাথ হলেও না হয় কথা ছিল।

অত উপরে, মানুষে যায় কি করে ! থাকে কি করে !

ওরা যে পাহাড়ি। পাহাড়িরা পাহাড়ে থাকবে না ! ওদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ তো থাকবেই। তা ছাড়া, মানুষে যখন চাঁদ এবং সমুদ্রর নীচে থাকার তোড়জোড় করছে তখন পর্বতের উপরে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

তবু ভারী কষ্ট ওদের ! অবশ্যই।

কেন ?

বাজার দোকান করতেও যদি বান্দরপুঞ্ছে উঠতে আর সেখান থেকে নামতে হয়, তবে কষ্ট হবে না !

পাটন ঐ গ্রামের বাসিন্দাদের কষ্ট কল্পনা করে সহানুভূতি দেখাল।

আমাদের কাছে যেটা কষ্ট সেটাই হয়তো ওদের কাছে আনন্দ। তাছাড়া চারণদা, শৃঙ্গ বলতেই তোমার শুধু বান্দরপুঞ্ছ-এর কথাই বা মনে হল কেন ? চন্দ্রবদনীও তো শৃঙ্গ। মানুষ চন্দ্রবদনীর মুখটি একবার মনে করলে তো আমি নাঙ্গা হয়েই নাঙ্গাপর্বতে চড়ে যেতে পারি।

তোমার কথা আলাদা। তুমি পবনপুত্র মারুতি।

চারণ হেসে বলল।

ম্যানেজারকে বেল বাজিয়ে ডেকে এনে কষে খাবার অর্ডার করল চারণ। বলল, ঠিক দুটোর সময় এখানেই পাঠাবে। আমরা রোদে বসে খাব।

চারণ বলল, এ কি মামাবাড়ির আবদার নাকি ? তোমার পুরী, কাড়হি, রাজমা-তড়কা, পালক—পনীর, ক্ষীর, হরিমির্চ, পেঁয়াজরসুন গাজর এত সব বয়ে আনতে চারতলাতে তো খচ্চর লাগবে।

পাটন ম্যানেজারের দুচোখে তার দুচোখ রেখে মুখ একটুও না ঘুরিয়ে বলল, তোমার কি ধারণা এ খচ্চর নয় ? না, এর মালিক খচ্চর নয় ?

তারপরই বলল, সত্যি চারণদা ! ভেবে দেখো ! জীবজগতে এত ভাল ভাল জানোয়ার থাকতে এই মানুষ হারামজাদারা সবচেয়ে বেশি emulate করল খচ্চরকেই। মানুষের মধ্যে তুমি যত সংখ্যক ছুপা-খচ্চর পাবে তার একাংশও পাবে না বাঘ বা সিংহ তো দূরস্থান, বাঁদর হনুমানে পর্যন্তও। হিন্দুস্থান ক্রমশ খচ্চরেরই আস্তানা হয়ে উঠছে।

আবারও চারণ হেসে উঠল জোরে চারণের কথাতে যতটা নয়, বলার ভঙ্গিতে।

ম্যানেজার কি করবে, না বুঝতে পেরে, প্রয়োজনে বেল বাজাবেন বলে, নীচে নেমে গেল।

মোটার গুহাতে চামচিকের মতন থেকে থেকে না-খেয়ে না-দেয়ে আমার সাত কেজি ওজন কমে গেছে। তা ছাড়া আমি খুব কেয়ারফুলি হিসেব করে দেখেছি চারণদা যে, মানুষের জ্ঞান অ্যারিথমেটিকাল প্রোগ্রেসানে বাড়লে, মানুষের ওজন জিওমেট্রিকাল প্রোগ্রেসান কমে।

চারণ আবার হেসে উঠল ওর কথায়।

পাটন যে একটি ওরিজিনাল মানুষ, তার যে একটিও প্রোটোটাইপ নেই এই দুনিয়াতে, সে বিষয়ে চারণ অনেক আগেই নিশ্চিত হয়েছিল। যতই দেখছে ওকে, ততই পাটনের চরিত্রের আনপ্রেডিটেবিলিটিতে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে।

চারণ বলল, এবার হাত মুখ ধুয়ে এসো। একটা জিনিসকে প্রসাদ করে দাও। স্বাদও ভুলে গেছি গো দাদা। আমি যদি আরও কিছুদিন এমন সব্বো-বিষয়ে বমবোচযয পালন করি, তো হয় পাগল হয়ে যাব, নয়তো আমার অণ্ডকোষদ্বয় মস্তিষ্ক ভেদ করে ব্রহ্মলোককে বিদ্ধ করবে। অকারণে এতরকম কৃচ্ছ্রসাধনের কোনও মানেই হয় না। ধুসস্স্।

ছিঃ। তোমার মুখ তো নয়, আস্তাকুঁড় পাটন।

চারণ বলল।

পাটন বলল, উঁ।

বলেই, নিজের ঘরে চলে গেল।

চারণও ওর ঘরে গেল হাত মুখ ধুতে।

একটু পরেই পাটন চারণের ঘরের বন্ধ দরজাতে নক করল।

দরজা খুলতেই চারণ দেখল পাটনের হাতে একটি প্যাকেট। চারণের হাতে দিয়ে বলল, সাহেবরা যদিও বলে, "স্কচ আফটার সান ডাউন" কিন্তু এই দেবভূমিতে অন্য নিয়ম। দিল্লি থেকে আনিয়েছি। এখন তো দেশেই হচ্ছে। ব্ল্যাক-ডগ। শালা স্বাদই ভুলে গেছি। লাগাতার ধর্মঘট তাও সহ্য করা যায়, বসা-ধর্মঘট, শোওয়া-ধর্মঘট, দাঁড়ানো-ধর্মঘট ইজি-চেয়ারে আধশোয়া-ধর্মঘট কিন্তু লাগাতার সাধুগিরি অসাধুদের পক্ষে হাইলি-ডেঞ্জারাস এক্সারসাইজ।

তা হোক। এক্সারসাইজ ইন ফিউটিলিটি না হলেই হল।

চারণ বলল।

তার মানে ? তুমি খাবে না বলছ ?

বিশ্বাস করো পাটন, না খেয়ে দারুণ আছি। ছাড়াটা যে কত কঠিন তা তুমি জানো কি না জানি না কিন্তু আমি জানি। আবার ধরাটা খুবই সোজা। কিন্তু...

পাটন বলল, তুমি একটা যা তা ! এতটুকু উইল-পাওয়ার নেই তোমার ! আর তুমি সাধুসঙ্গ করতে এসেছিলে এখানে ! তুমি বয়সে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে বড় হতে পারো কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলে দিচ্ছে এই অধম পাটন, মনে রেখো সবসময়ে।

কি ?

যার উইল-পাওয়ার নেই তার সাধুসঙ্গ তো দূরস্থান নারীসঙ্গও কপালে নেই। আগে নিজের মালিক হও তারপর দ্যুলোক-ভূলোক জয় করবে। নাও। আর বেশি বাতেল্লা কোরো না, একটা বড় করে ঢেলে দিচ্ছি। নীট খাও। বেড়ে ঠাণ্ডা আছে। খাবার আগে আরও একটা করে মারব। আর বাকিটা রাতে।

চারণ চুপ করে রইল।

পাটন বড় যত্ন করে বানাল, যেমন যত্ন করে ভোলানন্দজিকে গাঁজা বানিয়ে দিত, তারপর আগেকার দিনের জমিদারের খাস বেয়ারারা যেমন বাঁ হাতের পাঁচ আঙুল ডান হাতের কনুইয়ের গোড়াতে ঠেকিয়ে পরম বিনয়ের সঙ্গে ডান হাতে ধরে গড়গড়ার আলবোলা বা হুইস্কির গেলাস মনিবের দিকে তুলে দিত ঠিক তেমনি করে চারণের দিকে গ্লাসটি এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও, একটু প্রসাদ করে দাও। তোমার এঁটোটা আমি নেব, অন্য গেলাসটা তুমি নাও।

পাটন বলল, বারান্দাতে তো গ্রিল বা রেলিং নেই, সিমেন্ট বাঁধানো পথ থেকে কেউই দেখতে পাবে না। পেলেও ভাববে, তুলসীপাতা আদা, মকরধ্বজের সঙ্গে মধু দিয়ে খলনোড়াতে মেরে খাচ্ছি। কেউ সন্দ করবে না।

একটা ঈগল উড়ছিল ঘুরে ঘুরে নীল আকাশে। অনেক উপরে। তার শ্যেনদৃষ্টিতে কী যে খুঁজছে তা সেই জানে। সাপ, ইঁদুর, কাকার এর বাচ্চা ?

তার ছায়াটাও ঘুরছে সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকায়, নদীর বুকে।

পাটন এক চুমুকে আধ পেগ নীট ব্ল্যাক-ডগ গিলে ফেলে বলল, বুঝলে চারণদা। ফর আ চেঞ্জ, আজকে আমরা ভোগী। কাল থেকে ফিন যোগী।

চারণ কিছুই না বলে পাটনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। রুদ্রপ্রয়াগের সেই উজ্জ্বল, রৌদ্রস্নাত, crisp দুপুরটিতে উঁচু পাহাড়ের পায়ের কাছ দিয়ে বয়ে-যাওয়া অলকানন্দার দিকে চেয়ে মস্তিষ্কে, ব্ল্যাক-ডগ-এর নেশার সঙ্গে আরও অনেক কিছু বয়ে নিয়ে এল—জিম করবেট-এর মানুষখেকো চিতা, হেমিংওয়ে আর ওয়াল্ট হুইটম্যান আর রবার্ট ফ্রস্ট-এর লেখাও।

চারণ বলল, হেমিংওয়ের একটি লেখা আছে "A very well lighted place" পড়েছ ?

নাঃ। "Men without women" পড়েছি।

তারপর বলল, তুমি বুঝি Hemingway-এর খুব ভক্ত।

চারণ নড করল। বলল শুধু Hemingwayরই নয়, Whitman, Robert Frost, Jim Corbett, Che Guevara, চারু মজুমদার ইত্যাদি সকলেরই। যাঁরাই মাটি ছেনেছেন, অথবা ফোটা-কার্তুজের গন্ধ নিয়েছেন নাকে, তাঁদের সকলেরই ভক্ত আমি।

ভাল।

জিম করবেট মানুষখেকো চিতাটাকে এই সামনের পথের উপরেই মেরেছিলেন একটা ঝুপড়ি আমগাছের নীচে। কেউ কি বলতে পারবে জায়গাটা ঠিক কোথায় ?

কারও বলার দরকার নেই। একটা সাইনবোর্ড আছে। অখাদ্য ছবিও আছে একটা চিতাবাঘের। আর লেখা আছে যে এইখানেই রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতাকে পটকে দিয়েছিলেন করবেট।

অখাদ্য বলছ কেন ? চিতা কি খাদ্য ?

না সে জন্যে নয়। কলকাতা হলে চিতার ছবিটা এমন হলুদ-রঙা খাটাশের মতন হত না অন্তত। কলকাতার দোষের শেষ নেই কিন্তু গুণও কিছু আছে। এটাও তো একটা Shrine। অথচ কী অযত্ন। আমার তো মনে হয় জিম করবেট এই অঙ্কন কর্মটা দেখার পরই ভারত ছেড়ে যাবার সঙ্কল্প করেছিলেন।

চারণ বলল, তবুও বলব যে, জিম করবেট ভাগ্যবান।

কেন ?

চারণ শুধোল।

আমি এখানে আসার কিছুদিন আগে বিখ্যাত কবি শান্ত চট্টোপাধ্যায় কলকাতাতে মারা গেলেন। তাঁর শোকসভাতে বামপন্থী চিত্রী পরাণ পাখী তাঁর একটা ছবি এঁকেছিলেন। সেই মস্ত ছবিটি সামনে রেখেই শোকসভা হল। কিন্তু কী বলব! সেই ছবির সঙ্গে শান্তবাবুর উলটোদিকের বাড়ির উত্তমর্ণ গগন দাড়িপার চেহারার মিল ছিল কিন্তু তার. নিজের চেহারার বিন্দুমাত্র মিল ছিল না। তার ছেলেবেলার কৈশোরের বা যৌবনের চেহারারও নয়। তা আমি পরাণ পাখী মশায়কে ভাল করে চিনতাম। ওঁকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, পাখীদা, এই ছবিটি শান্তবাবুর কোন বয়সের ছবি ?

পরাণ পাখী আমার দিকে ঘৃণা ভরে একটু তাকিয়ে বললেন, এটা "চিরকালীন শান্তর ছবি।"

কেন ?

চারণ বলল।

ছবিটা দেখে যদি মৃত ব্যক্তি বলে চেনাই না গেল তবে সেই ছবি দিয়ে শোকসভা করা হল কেন ? ফোটো দিয়েও তো করা যেত!

করা হল, কারণ পাখীদা আর আমাদের পাড়ার গেঁড়েদা "কখনওই" ভুল করেন না। করতে পারেনই না। তাঁদের একসপ্লানেশানেরও কোনওদিন ঘাটতি বা সত্যজিৎ রায়ের ভাষায় বললে বলতে হয় "খামতি" হয় না। দে আর অলওয়েজ রাইট। এতএব রুদ্রপ্রয়াগের চিতার ওই "চিরকালীন" ছবিটিই তোমাকে মেনে নিতে হবে।

হুঁ।

চারণ বলল।

নাও শেষ কর।

পাটন আদেশ করল।

চারণ বড় এক ঢোঁক খেল।

বলল, আমি আস্তে আস্তেই খাই।

তা ভাল। মানে ধীর-স্থির হওয়াটা গুণেরই কথা কিন্তু তা বলে চিরকালীন শান্ত চ্যাটার্জির ছবির মতন ধীর হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বেশি আস্তে করতে গেলে অনেক সময়ে গা গরম করতে করতে বিবিই পাইল্যে যাবে।

উঃ পাটন !

আমি খুবই মুখ খারাপ করি, না চারণদা ?

পাটন বলল।

চারণ চুপ করে রইল।

পাটন বলল, আমি কিন্তু শুধু মুখই খারাপ করি। তোমার মতো খারাপ কাজ কিন্তু আমি কখনওই করতে পারব না।

কি খারাপ কাজ ?

চারণ ভ্রূ কুঞ্চন করে তাকাল পাটনের দিকে।

তারপর আবারও বলল, কি খারাপ কাজ ?

পাটন এবারে এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে বড় একটা, প্রায় পাতিয়ালা ঢালল ওর গ্লাসে। তারপর ছিপিটা বন্ধ করে চারণকে বলল, ড্য মে টেক ইওর ওন টাইম। বাট আই লাইক টু গাল্প ডাউন মাইন।

চারণ বলল, বললে না কি খারাপ কাজ ?

পাটন তার সদ্য-ঢালা হুইস্কিতে একটি বড় চুমুক দিয়ে বলল, কিছু কথা থাকে চারণদা যা বাংলাতে, মানে মাতৃভাষাতে বলতে ভারী লজ্জা করে। বিশেষ করে কথাটা যখন, মাতৃসংক্রান্তই। মানে, নিজের মা সংক্রান্ত।

কার মা ?

চারণ অবাক হয়ে বলল।

আমার মা।

পাটন বলল।

কি বলছ তুমি, আমি বুঝতে পারছি না পাটন।

পারবে। বললেই পারবে।

স্থির, নিষ্কম্প গলাতে বলল পাটন।

কি ?

চারণের জিভ জড়িয়ে গেল। হুইস্কির জন্যে না পাটনের চোখের দৃষ্টির জন্যে তা নিজেও ঠিক বুঝতে পারল না।

পাটন বলল, ড্য ফাকড মাই মাদার।

চারণ সর্পদ্রংষ্টের মতন চমকে উঠল।

পাটন বলল, ডিড নট ড্য ? চারণদা ?

চারণ চুপ করে রইল।

পাটন বলল, বাখরাবাদে, কটকে আমার মামাবাড়িতে ? অবশ্য আমার মা চেয়েছিলেন। শী ওজ ডাইং ফর ইট। অ্যান আটারলি সেক্সস্টার্ভড লেডি। আমার হারামজাদা অর্থপিশাচ বাবার বয়স তখন বাহান্ন, মায়ের বত্রিশ, আর তোমার, কত হবে তখন ? তুমিই জানো। আমার বারো। আমি পাশের ঘরে তখন জেগেই ছিলাম।

চারণের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল।

পাটন গ্লাসটা শেষ করে বলল, ওকি ! তুমি শেষ করো চারণদা। চিয়ার্স।

তারপর গলা নামিয়ে বলল, আই থ্যাঙ্ক য়্যু অন বিহাফ অব মাই মাদার। মাই পুওর মাদার। একমাত্র তোমার কাছ থেকেই সেই মানুষটা যতটুকু আনন্দ পাবার তা পেয়েছিল জীবনে। শী ইজ ডেড অ্যান্ড গান। আমি ছাড়া এই কৃতজ্ঞতা জানাতে পারে তোমাকে তেমন তো কেউই আর নেই। আমি, মানে আই অ্যাম ডিপলি গ্রেটফুল ট্যু ড্য চারণদা ফর হোয়াট ড্য গেভ হার।

চারণ কিছু বলতে গেল। এ এক অন্য চারণ।

তুতলে বলল, তোমার বাবা কি জানেন ? মানে জানতেন ?

না। তবে সন্দেহ করত। জানলে, মানে শিওর হলে, তোমার লাশ কবে পড়ে যেত। তুমি আমার বাবাকে চেনো না চারণদা, আমি চিনি। আই নো দ্যাট বাস্টার্ড।

চারণ-এর খালি-হওয়া গ্লাসে বোতল থেকে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে পাটন বলল, নাও, খাও।

চারণ বলল, মুখ নিচু করে, তোমার বাবা না জানতে পারেন, তুমি তো জানো পাটন। তুমি কি আমাকে শাস্তি দেবার জন্যেই এখানে নিয়ে এসেছ ?

তারপর গলা আরও নামিয়ে বলল, শাস্তি দেওয়ার জন্যে এতদূরে আনলে কেন ? দেবপ্রয়াগেই তো উপর থেকে নদীতে ঠেলে ফেলে দিতে পারতে।

হয়তো পারতাম। কিন্তু আমি তো শাস্তি দিতে আনিনি তোমাকে। পুরস্কার দিতেই এনেছি। ব্ল্যাক-ডগ এর বোতল তাহলে নিয়ে আসব কেন এখানে ?

পুরস্কার ?

স্তম্ভিত হয়ে বলল চারণ।

প্রিসাইসলি !

তারপরেই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল পাটন।

চারণের মনে হল ও এক উন্মাদের খপ্পরে পড়েছে। বড় ভয় করতে লাগল চারণের। অনেক এবং সব পুরনো কথাই মনে পড়ে যেতে লাগল একে একে।

চারণ পাটনের মুখের দিকে চেয়ে তাকে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

ওকি আজই খুন করবে চারণকে ?

পাটন, আবার হাসল। বলল, হুইস্কিটা কিন্তু ভাল। কি বল ? দাম করেছে অবশ্য একটু বেশিই। বারোশ পঞ্চাশ। বুট-লেগারের কাছ থেকে নিলে সাড়ে সাতশোতেই পাওয়া যেত। বাট জেনুইন স্টাফ। হাউ ক্যান আই বী আ মাইজার হোয়েন আই অ্যাম গিভিং আ ট্রিট টু দ্য গ্রেট ওয়ান হু ফাকড মাই মাদার ? এটুকু বলেই, আবার হাসল পাটন।

চারণের বুকের মধ্যে কষ্ট হতে লাগল। ভীষণই কষ্ট। মুখটা নামিয়ে নিল ও।

পাটন বলল, তোমাকে জল মিশিয়ে দেব কি চারণদা ? না, নীটই খাও। উ্য নীড ইট নাউ। জীবনও এমন করেই খাবে। "Drink it to the lees" তলানি পর্যন্ত খাবে। Ulysses-এর মতন। জীবনে অথবা হুইস্কিতে জল মেশায় Half-wits রা।

তারপর বলল, দ্যাখো, দুজন প্রাপ্তবয়স্কর মধ্যে কোনও ঘটনা একদিন ঘটেছিল। একবার নয়, একাধিকবার। কয়েক বছর ধরে। তাতে মাইনর পাটনের কিছু বলার অধিকার অথবা প্রয়োজনও ছিল না। ইট মাইট হ্যাভ বীন এন এপিসোড অফ স্প্যারোজ। অর ফর দ্যাট ম্যাটার, অফ লায়নস। আই ক্যুড নট কেয়ার লেস। আমি আমার মাকে খুব ভালবাসতাম চারণদা। পরে, কলকাতাতে তুমি এলে, তুমি আমাদের বাড়ি, একবার এলে, তুমি মায়ের সঙ্গে শুলে, মা কতদিন যে কী আনন্দে থাকত, তা তুমি জানো না। দেখেই আমার ভাল লাগত খুব। বিশ্বাস কর তুমি। আই রিয়্যালি অ্যাম গ্রেটফুল ট্যু উ্য। সারাজীবনই কৃতজ্ঞ থাকব।

চারণ স্তম্ভিত হয়ে পাটনের মুখে চেয়েছিল।

পাটন বলল, কি হল ? এতদিনেও আমাকে চিনতে পারলে না চারণদা ! আমি, আমি ! আমি পাটন। আমি অন্য কেউই যে নই ! আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জানতেই তো এসেছি এখানে চারণদা। আমি নিজেকে এখনও পুরোপুরি জানিনি। তবে মনে হচ্ছে, জানছি আস্তে আস্তে। তুমি জানবে না নিজেকে ? নিজের ভিতরের নিজেকে ?

চারণ পাটনের দিকে স্তব্ধ, মুগ্ধ চোখে চেয়েছিল। লজ্জা করছিল খুব। অপরাধবোধে ভরে যাচ্ছিল, কিন্তু পাটন তাকে...

চারণের মাথার মধ্যে Walt Whitman কথা বলছিলেন।

"He puts things in their attitudes.

He puts to-day out of himself with plasticity and love.

He places his own times, reminiscenses, parents, brothers and sisters, associations, employment, politics, so that the rest never share them afterward, nor assume to command them."

ভাবছিল, আশ্চর্য ছেলে এই চারণ ! জিনস পরা, গাঁজা-গুলি-খাওয়া, মদ-খাওয়া "বকা-ছোকরা" হলেও ওই অনেক 'সন্ত'-এর চেয়ে বড় সন্ত। অনেক তপস্যালব্ধ ফলই ও হয়তো সঙ্গে করেই জন্মেছে, ঈশ্বরের দান হিসেবে। অনেক গায়ক-হতে-চাওয়া মানুষ যেমন দশজন শিক্ষক রেখেও, হারমনিয়ম ভেঙে ফেলেও গলাতে সুর লাগাতে পারেন না, টপ্পার দানা গজাতে পারেন না আবার অনেক আনপড়ও যখন স্বরগম বলেন তখন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে শ্রোতার, স্বরবিদ্ধ হয়ে যান তৎক্ষণাৎ, এও বোধ হয় তেমনই কোনও দৈবী ঘটনা ! পাটন জন্ম-সাধক। সাধক হওয়ার জন্যে ওকে কোনও সাধনাই হয়তো করতে হত না। ভোলানন্দজি তাঁকে নিশ্চয়ই সম্যক বুঝেছেন। নইলে এই "বাঁদরকে" এত প্রশ্রয় দেন কেন ? ওঁর মতন মানুষ।

চারণ চুপ করে সামনের ছড়িয়ে-যাওয়া নীল সবুজ-জলের অলকানন্দা আর আকাশ-ছোঁওয়া শিবালিক পর্বতমালার কাছিম-পেঠা পাহাড়টির দিকে চেয়েছিল। পাটনও চুপ করেই ছিল।

বুকের মধ্যে যখন অনেক কথা টগবগ করে, উথলে-ওঠা ভাতের ফ্যান-এর মতন, তখন বোধ হয় মুখ, কারও মুখই, কোনও কথাই বলতে চায় না।

ঈগলটা উড়ছে, উড়ছে, উড়ছেই তার নিঃশব্দ ঘূর্ণায়মান ছায়াটিকে একবার নদীর জল আরেকবার পাহাড়ের রোমশ সবুজ গায়ে বুলিয়ে, বুলিয়ে, বুলিয়ে উড়ছে।

একটু পরে পাটন বলল, আরেকটা খাবে ?

চারণ নিরুত্তর রইল।

খাও, খাও। আধ বোতল রাখব রাতের জন্যে। কাল আমাকে খুব ভোরে উঠতে হবে তো। বদ্রীনাথের প্রথম বাস-এই আমি চলে যাব।

আর আমি ?

তুমি এখানে থাকবে।

মানে ? তাহলে তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন ?

আমি থোড়াই এনেছি চারণদা। কে কাকে কোথায় আনে, কেই বা পাঠায় ? সবই Predestined।

অন্যসময় হলে চারণ বলত পাটনকে, সব ব্যাপারে তোমার এই ছদ্ম-দার্শনিকতা ভাল লাগে না। কিন্তু আজ আর সে কথা বলতে পারল না। পারল না, কারণ এই মুহূর্তে চারণের মতন এতখানি আর কেউই জানে না যে, পাটন ছদ্ম-দার্শনিক নয়।

পাটনই বলল, তুমি ভাগ্যবান মানুষ। বড় মাপের মানুষ। তুমি কোন দুঃখে যাবে কারও কাছে ? মহম্মদের কাছে পর্বতই হেঁটে আসবে।

ঠাট্টা করছ পাটন ?

ঠাট্টা ? তোমাকে ?

তারপর বলল, তুমি আমাকে একটুও বুঝতে পারোনি চারণদা। তুমিই আমার আইডল ছিলে প্রথম কৈশোর থেকে। তোমাকে আমি সত্যি অ্যাডমায়ার করি, করেছি চিরদিন। এবং বিশ্বাস করো, আজও করি। সকলের চোখ সমান নয়। আর কে যে কার মধ্যে কি দেখে তা শুধু সেই জানে। যেমন ভোলানন্দজি আমার মধ্যে দেখেছেন। নইলে হৃষীকেশ থেকে তোমাকে টেনে প্রথমে দেবপ্রয়াগে এবং পরে এখানে আনলাম কেন ? বলো ? আবার যেমন আমার মা তোমার মধ্যে দেখেছিলেন ! কে যে কার মধ্যে কী দেখে তা অন্যের পক্ষে বোঝা কি সম্ভব ?

চারণ চুপ করে চেয়ে রইল পাটনের চোখে।

তারপর বলল, তোমাকে আমারও কিছু বলার ছিল পাটন।

বলবে। তাড়া কি ? বিতর্কমূলক বিষয়ের চিঠি যেমন লেখার পরে দুতিনদিন ড্রয়ারে ফেলে

রাখতে হয়, বিতর্কমূলক কথাও জিভের গোড়াতে ধরে রাখতে হয়। জ্যা-মুক্ত তীর আর মুখ-মুক্ত কথা একবার বেরিয়ে গেলে আর তো ফিরে আসে না। তাড়া কি চারণদা ? আমি ক্রিসমাস-এর আগেই ফিরে আসব।

হিন্দুদের ধর্মস্থান এই দেবভূমিতে বসে "ক্রিসমাস" শব্দটা কানে লাগল খট করে। অথচ কলকাতাতে কেউ ক্রিসমাস বললে একটুও বেমানান লাগত না।

ক্রিসমাসের আগে আমি নিজে কোথায় থাকব তার ঠিক কি ? তুমি খুঁজে পাবে কি করে ?

সব ঠিক আছে। মন যদি চায় তবে দেখা হবেই।

কী যে হেঁয়ালি কর সবসময়ে বুঝি না।

জীবনটাই তো হেঁয়ালি চারণদা। হেঁয়ালিটাই জীবন।

পাটন চেয়ার ছেড়ে উঠে কলিংবেল টিপল। একজন বেয়ারা প্রায় উড়ে এল বলতে গেলে চারতলাতে। বলল, বলিয়ে বাবু।

পাটন বলল, খানা বন গ্যয়া হোগা তো থোড়া বাদমে লেতে আনা। ঔর শুনো, ইয়ে সাবকা রোটি বহুতই হালকা ঔর কড়ক্ হোগা।

রোটি খাইয়েগা আপলোগোনে দোপেরহমে ?

চাউল ভি খায়েঙ্গে। রোটি স্রেফ দো-দোহি করকে লানা। ম্যানেজার সাবকি বাতানা যো বরাদি সব চিজে বেশক্ পেশ করনা। উরতকি ডালকি তড়কা বনা তো ? নেহি কোঈ দুসরি ডালকি ?

বলেই বলল, দহি হোগা ?

হানজি। হোগা জি !

তো দহিভি লেতে আনা।

চারণ বলল, হুইস্কির পরে দই ! আমার অম্বল হবে। আমি খাবো না।

সত্যি। এই বাঙালি জাতটাকে বাঘে বা কুমীরে বা আলস্যেও খেতে পারল না কিন্তু স্রেফ অম্বলেই খেল। সকালে উঠে একটা সিঙ্গাড়া আর দুটি জিলিপি খেয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে ফেলো, ব্যাস। সারাদিন আর খাবার খরচ নেই। অম্বলেই পেট ভর্তি হয়ে থাকবে। দেখো না, ভেক-ধরা সন্নিসীগুলো কেমন মুঠো-মুঠো জেলুসেল এম পি এস খায় ? আমি হলে কপি-রাইটারকে বলতাম, "আপ সাচমুচ সন্ত বননে চাহতা তো জেলুসেল এম পি এস ইস্তেমাল কিজিয়ে ! দুনিয়াকি সবসে পুণ দাঁবাইয়া।"

চারণ হাসল। কিন্তু কথা বলল না কোনও।

আজ পাটনেরই দিন, তারই ইনিংস। স্ট্রেইট ব্যাটে ব্লক করবে, না কাট করবে, না গ্ল্যান্স করবে না হুক করবে এ সমস্ত ওরই ডিসিশান। ওর একার। চারণ প্যাভিলিয়নে প্যাড পরে বসে আছে, বসে থাকবে, আর হাততালি দেবে।

পাটন বলল, দুপুরের আগে দই অমৃত। পরে বিষ। তবে থাক। নাই বা খেলে তুমি যদি ইচ্ছে না করে।

তারপর বেয়ারার দিকে ফিরে বলল, একহি লানা দহি।

জি হাঁ।

বেয়ারা চলে গেলে পাটন বলল, আমাদের অবস্থা যেন উপোসী ছারপোকার মতন। না খেয়ে খেয়ে যখন পেটের সাইজ ছোট হয়ে গেছে তখন হঠাৎ করে এরকম গাণ্ডে-পিণ্ডে "Cat-jumping rice" খাওয়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

CAT JUMPING RICE মানে কী ?

চারণ শুধোল।

মানে, থালাতে এই পরিমাণ ভাত থাকবে, পাহাড় প্রমাণ, যে বেড়ালও লাফ দিয়ে ডিঙোতে পারবে না। তাকেই বলে Cat Jumping Rice !

চারণ হেসে ফেলল পাটনের কথা শুনে। হাসতে যে পারল, স্বাভাবিক মানুষের মতন, সেটা

উপলব্ধি করে খুশি হল খুব। অবচেতনে ভেবেছিল, ওর চোয়াল বুঝি চিরদিনেরই মতো বন্ধ করে দেবে পাটনের ওই কথা। হাসি তো দূরস্থান, কথা যে বলতে পারবে তাই সাহস করে ভাবতে পারেনি।

পাটন বলল, খাওয়া-দাওয়ার পর আমি কিন্তু ঘুম লাগাব চারণদা। তুমি ইচ্ছে করলে জিম করবেট যেখানে চিতাটি মেরেছিলেন সে জায়গাটি এবং সেই দুর্দান্ত Art Workটি দেখে আসতে পারো। নইলে, হেঁটে নীচেও নেমে যেতে পারো অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গম দেখতে। সেই লোহার ঝুলোনো সেতু, যার কথা Man Eating Leopard of Rudraprayag-এ আছে, তুমি বলে ছিলে, তাও দেখে আসতে পারো। তবে দেবপ্রয়াগের মতন নয় এই সঙ্গম। দেখে মন ভরবে না।

বলেই বলল, সঙ্গম মানেই সুদৃশ্য। দেখাশুনোর তুমি আমার চেয়ে ভাল বুঝবে।

বলেই, এক কলি গেয়ে উঠল,

"তেরে মনকা গঙ্গা/আর মেরে মনকা যমুনা কা
বোল রাধে বোল/সঙ্গম হোগা কি নেহি/সঙ্গম হোগা কি নেহি ?"

উত্তর দিকটা, যে দিকে হবে বলে অনুমান করেছিল হাওয়াটা সম্ভবত সেদিক দিয়ে আসছিল না। যেদিকে গৌরীর ছাই মাখা, ত্রিশূল হাতে, বাঘছাল পরা সিদ্ধি-সেবন করা ভুঁড়িয়াল স্বামীর বাস সেই দিকটা চারণ রাতে যেদিকে মাথা দিয়ে শুনেছিল তার ঠিক কোন দিকে সে বিষয়ে চারণের কোনওই আন্দাজ ছিল না। তবে দিক তো মাত্র চারটি নয়। দশ দিক। শহরবাসী চারণেরা চারদিক ছাড়া অন্য কোনও দিকের খোঁজই রাখে না। মাথাটা তার যেদিকেই থাকুক না কেন, মনে হচ্ছিল দেওয়াল ফুটো করে বরফের কুঁচি থেকে উঠে আসা হাওয়া যেন মস্তিষ্কের অলিগলিতে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

গতরাতে বারান্দাতে বসে হুইস্কি খাবে বলেছিল পাটন। বারান্দাতে বসা আদৌ গেলে তো! ঘরের মধ্যেই বসে খেয়ে তারপর জমিয়ে খিচুড়ি খেয়েছিল বহুদিন পর। হোটেলের বাবুর্চি মুগ আর মসুর ডাল মিশিয়ে ঘি ঢেলে ভারী স্বাদু খিচুড়ি বানিয়েছিল। সঙ্গে আলুকা ভাত্তা, সেঁকা পাঁপর, কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজ ভাজা। কলকাতার বাগবাজারের মতো পেঁয়াজি এরা বানাতে জানবে কোত্থেকে।

পাটন বলেছিল, এরা পেঁয়াজি মারতেও জানে না, পেঁয়াজি বানাতেও জানে না।

খাওয়া-দাওয়ার পরেই পাটন বলেছিল, আমি খুব ভোরে উঠে চলে যাব। তুমি যতক্ষণ খুশি শুয়ে থেকো লেপের নীচে। তারপর ঘুম ভাঙলে বেল বাজালেই বেয়ারা চা নিয়ে আসবে।

বিল-এর কি হবে ? এরা কি কার্ড অ্যাকসেপ্ট করবে ? সিটিব্যাঙ্ক এবং গ্রিন্ডলেজ দুই কার্ডই আছে।

করবে। করবে। "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ" বলে গেছিলেন চার্বাক। এইসব কার্ড-এর মাধ্যমে পুরো দেশের মানুষকে দেউলে বানিয়ে দেবে ওরা। আমার মা বলতেন, পকেটে পয়সা থাকলে খাবি, নইলে না খেয়ে থাকবি তাও ভাল। কখনও ধার করবি না কারও কাছে এক পয়সাও। আমার মা এই শিক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু স্বামী দেবতা শুধু ধার করা নয়, তোমার আমার মতন কত অগণ্য মানুষের কষ্টার্জিত আয়ের উপর ট্যাক্স দেওয়ার পর যে টাকা থাকে তা ব্যাঙ্কের থেকে ধার নিয়ে মেরে দিল। চারদিকে যত বড়লোক দেখো না দিল্লি, বম্বে, বাঙ্গালোরে, জানবে তার একটা বড় অংশই ব্যাঙ্ক-মারা টাকাতে বড়লোক।

তারপর বলল, আমার মামা বাড়ির কাছেই, মানে বাখরাবাদেই (ও। তুমি তো গেছই! ভুলেই গেছিলাম) একজন বড়লোক ছিলেন সীতাকান্ত পারিদা। তিনি ব্যাঙের ঠ্যাং এক্সপোর্ট করেই বড়লোক হয়েছিলেন। আমরা ছেলেমানুষরা তাঁকে দূর থেকে দেখে বলতাম ব্যাঙ-মারা বড়লোক। তখন কি আর জানতাম যে ব্যাঙ-মারা বড়লোকেরা ব্যাঙ্ক-মারা বড়লোকদের চেয়ে কত ইনোসেন্ট!

সকালে ঘুম যখন ভাঙল চারণের তখন বন্ধ দরজার তলা দিয়ে একটু আলোর আভাস আসছিল, রাতে সেই ফাঁক দিয়েই হুড়মুড়িয়ে হাওয়া ঢুকছিল। দু-একটা বাস ও গাড়ির আওয়াজ আসছে

নীচের পথ দিয়ে। এদিকটা এমনিতে নির্জন। কটা বাজল কে জানে। জানার ইচ্ছেও নেই। ঘড়িটা স্যুটকেসের পেছনে বহুদিনই হল নির্বাসিত করেছে। আর সেই ঢাউস স্যুটকেসও তো পড়ে আছে হৃষীকেশেই। সময়ের কোনও দামই যার কাছে নেই সে সময় দিয়ে করবেই বা কি ?

লেপের তলা থেকে উঠতে উঠতে ভাবল, চারমাস পরে এত আরামে আবার গোবর হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। যা কিছু অর্জিত হয়েছিল এই ক-মাসে সবই গেল বোধহয়। এই পাটন ছেলেটির গূঢ় উদ্দেশ্যটা যে কি, তা কে বলবে ? কেনই বা নিয়ে এল এখানে আর কেনই বা তাকে ফেলে নিরুদ্দেশ হল।

বেলটা টিপে দিয়ে দরজার ছিটকিনিটা নামিয়ে দিয়ে বাথরুমে গেল। এক পট চা না খেলে মনে হচ্ছে বাইরে বেরোতে পারবে না, অথচ গতকাল সকালেও ভোলানাথজির গুহাতে ধুনির পাশে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে ঘুম থেকে উঠে সূর্যস্তবের সঙ্গে বন্দিত নন্দিত স্পন্দিত নদী-পার থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসে তারপরে পেতলের লোটাতে দুধের মধ্যে চায়ের পাতা আর চিনি ফেলে দিয়ে সকলের জন্যে চা করেছে। কোনওদিন পাটন, কোনওদিন স্টিভেন্স, কোনওদিন চারণ।

ভাবছিল যে, সুঅভ্যাস বা কৃচ্ছ্রসাধনের পথ ছাড়াটা যত সোজা, ধরাটা তার চেয়ে অনেকই কঠিন। সত্যিই অনেকই কঠিন। যে পথ বেয়ে চলছিল গত চার মাস সেইপথে আবার ফিরে যেতে অনেকই কষ্ট হবে। পাটন কি এই ভাবেই শাস্তি দিল তাকে ?

দরজা খুলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই বেয়ারা বলল, বারান্দামে আকর বৈঠিয়ে না বাবু। ধুপ ছা গ্যায়া হ্যায়। বৈঠ-কে গরম গরম চায়ে পীজিয়ে।

তাঁর বাঁদুরে টুপি, মাফলার এবং অন্যান্য শীতবস্ত্র গায়ে চাপিয়ে সে বারান্দায় এসে বসল যখন তখন তেপায়ার উপরে ট্রে, তার উপরে টি-কোজি মোড়া কেটলি এবং গরম জলে-ধোওয়া পেয়ালা পিরিচ এবং গরম-করা প্লেটে হাফ অ্যান্ড হাফ বিস্কিট সাজিয়ে দিল বেয়ারা।

চারণ দেখল, কেটলির পাশে একটি পুরু খাম। উপরে তার নাম লেখা। অপরিচিত হাতের লেখাতে।

এটা কি ?

চারণ শুধোল।

খত হ্যায় বাবু।

কি দিয়েছে ?

আপকি দোস্ত। উনোনেতো একদ্দম সুবেবহি সুবে চল দিয়া বদ্রীবিশালজিকি তরফ। ইয়ে খত আপকি লিয়ে ছোড়কর গ্যায়ে। সুবেবকি চায়েকি সাথই দেনে কি লিয়ে বোলকে গ্যয়া।

চারণ অনেকক্ষণ পাটনের হাতের লেখার দিকে চেয়ে রইল। চেনে না। দেখেনি তো কোনওদিন আগে। হাতের লেখা চেনে না, পাটনকেই কি চেনে ?

সকালের প্রথম কাপে চুমুক দিয়ে চিঠিটা একবার তুলে আবারও রেখে দিল। ভাবল, চা শেষ করে নিজের শরীরে যথেষ্ট উত্তাপ সঞ্চার করে তারপরই খুলবে এ চিঠি। কে জানে! কি আছে এই চিঠিতে।

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল, চারণ ডেকে শুধোল, বিল-উল বানাকে রাখনা। নাহানেকো বাদ নাস্তা করকে ম্যায় দেবপ্রয়াগ চল দুঙ্গা।

বিল কওনচি কি বাবু ? উ বাবু ম্যানেজার সাবকো সব কহকে গ্যয়া। আপ আজ দিনভর হিয়াঁ আরাম কিজিয়েগা। কাল হৃষীকেশ সে আপকি লিয়ে গাড়ি আয়েগি।

হৃষীকেশ সে ?

অবাক হয়ে বলল চারণ।

জি হাঁ।

কাঁহা যানেকো লিয়ে ?

মুঝে ক্যা মালুম বাবু। সায়েদ উও খাতমে সব লিখকর গ্যায়া হোগা উনোনে। চায়ে লেনেকো

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

বাদ ইতমিনানসে পড়িয়ে উও খত। জলদি কওন চি কি ? সুরজত আব্‌ভি আব্‌ভি নিকলা। দিন বিলকুল নওজওয়ান হ্যায়।

বলেই, সেও ঘরে দাঁড়িয়ে দার্শনিকেরই মতন বলল, দিন ঔর রাতমে কিতনি ফরাক হোতা হ্যায়, নেহি বাবু ? কাল রাতমে, আপলোগ যব খিচুড়ি খা রহেতে তব ওহি পিপ্পলকে পেড়কে নীচে সে এক বাঘ চলা গ্যয়া নদীকে তরফ।

বাঘ ?

জি বাবু। বড়া বাঘ। চিতা-উতা নেহি।

আয়া কাঁহাসে ?

হোটেল কি পিছুসে উত্থারকে আয়া থা। আরে বাপ রে বাপ। কিতনা ডাবল বাঘ থা ?

তুম দিখা ক্যায়সে ?

গেটকে সামনা দো দো বড়কা বাত্তি না হ্যায় হুজৌর। রাত ভর জ্বলতা রহ্‌তা হ্যায়। হামলোগোঁভি সামকি বাদ কবভি বেগ্গর হ্যাজাক-ইয়া লানটান রাতমে নিকালতা নেহি না হ্যায়।

তারপর বলল, রাত মে কিতনা ডর, কিতনা কিসিমকি ডর। ঔর দেখিয়ে সুরজ নিকাল গিয়া। চারোতরফ কিতনা উজলা। কোই চিজ কি ডর নেহি, না বাহার কি, না অন্দর কি।

চায়ের কাপ হাতে ধরে চারণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। পাটনের মা তুলি ঠিক এই কথাই বলেছিল তাকে বাঘমুণ্ডার বাংলোতে। একই কথা। কিন্তু, অন্যভাবে। অন্য পরিবেশে। অন্য প্রতিবেশে।

চিঠিটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে চারণ কাপটা ট্রেতে নামিয়ে রাখল। আরও চা ঢালবে। তবে, তার আগে সামনের কাছিমপেঠা পাহাড়টার দিকে তাকাল। সূর্য পাহাড়ের ওপারে আছে। পাহাড় টপকে ওপারে তার আলো পৌঁছতে বেলা দশটা এগারোটা হয়ে যাবে।

ঈগলটা তখনও উড়ছে। কালকের মতন।

ওটা কি ঈগল, না, শকুন ?

পরপর দু কাপ চা খাওয়ার পর চিঠিটা তুলে নিল হাতে। বেশ ভারী চিঠি।

ওঁ,

রুদ্রপ্রয়াগ

চারণদা,

তোমাকে কাল বলেছিলাম যে কিছু শব্দ থাকে যা বাংলায় উচ্চারণ না করে ইংরেজিতে করলে যে তা করে এবং যে শোনে দুজনের পক্ষেই সহনীয় হয়।

সেই বাক্যটিকেই একটু বিস্তার করে বলব যে, অনেক বাক্য থাকে, যা মুখে বলা যায় না কিন্তু লিখে বললে বলা সহজ হয়। অনেক সময়ে, অনেক কথা মুখে বলাই যায় না, অথচ লিখে বলা যায়।

গতকাল আমি যে শব্দটি উচ্চারণ করে তোমাকে স্তম্ভিত করেছিলাম তার SHOCK তুমি হয়তো কাটিয়ে উঠতে পারোনি এখনও। কিন্তু তোমার SHOCKED হবার মতন কিছু তো আমি বলিনি।

তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড় অবশ্যই। কিন্তু এমন বড়ও নও যে তোমার আমার মধ্যে Communication অসম্ভব।

আমার জন্মদাতা বাবার সঙ্গে অগণ্য কারণে আমার পক্ষে কোনওরকম Communicationই সম্ভব নয়। তাই জীবনের কোনও ব্যাপারেই তার সঙ্গে কোনও যোগসূত্র নেই। রাখিনি। রাখবও না।

তুমি তোমার বর্তমান বয়সে পৌঁছে যা জেনেছ, আমার পক্ষে আমার বর্তমান বয়সে দাঁড়িয়ে তা পুরোপুরি বোঝা আদৌ সম্ভব নয়। কারো পক্ষেই সম্ভব নয় তা। সম্ভব নয় যে, সেটা আমি বুঝি। জীবনের অধিকাংশ বোঝাবুঝিতেই নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পৌঁছতে হয়।

অপ্রত্যাশিতভাবে তোমাকে গতকাল যেমন গভীর দুঃখ দিয়েছি আজ তেমন গভীর আনন্দও দেব। তবে আনন্দের সঙ্গে আদেশও থাকবে আমার। হ্যাঁ। আদেশই বলছি। কারণ, আমার

ভূমিকা এখন ঋত্বিকের। এরপর যা বলছি, তা মনোযোগ সহকারে শোনো এবং যা বলছি তা অবশ্যই কোরো।

চোখের সামনে যে সব ঘটনা ঘটে, তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক যাই হোক না কেন, তার কোনও অভিঘাত যদি আমার উপরে না পড়ে, তবে বলতে হবে আমার সব শিক্ষাই বিফলে গেছে। সমতলভূমি যেমন আমার স্বদেশ, উত্তরাখণ্ডও তেমনই স্বদেশ। ভারতীয় পাহাড়িদের সমতলভূমির উপরে যতটুকু অধিকার, সমতলভূমির বাসিন্দাদেরও পাহাড় পর্বতাঞ্চলের উপরে ততটুকুই অধিকার। উত্তরাখণ্ডে বসে ঈশ্বর-চর্চা করছে বলেই যে কেউ উত্তরাখণ্ডের মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের হতাশার সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে না, তা আমি মনে করি না। তাছাড়া গ্রেট ব্রিটেইন-এর আইরিশরা যদি এত যুগ ধরে আয়ারল্যান্ডকে পৃথক রাজ্য বলে দাবি করে আসতে পারে, তবে কুমায়ুনি-গাড়োয়ালিদের দাবিকেই বা অস্বীকার করা হবে কেন? I.R.A.-র আন্দোলন যখন নাটক, নাচ আর গানের মাধ্যমেই শুধু তাদের দাবি পেশ করত সারা পৃথিবীর কাছে, তখন তো ইংল্যান্ডে কেউই তাদের পাত্তা দেয়নি। তাদের সিরিয়াসলি নেয়নি। যখন থেকে বোমা ছোঁড়া শুরু হয়েছে, নিরপরাধ মানুষদের মারা হয়েছে, শুধুমাত্র তখন থেকেই সেই দাবি একটি স্বীকৃতি পেয়েছে। তার আগে কি কেউ তাদের কথাতে কান দিয়েছিল? দার্জিলিং-এও যখন সুভাষ ঘিসিং আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন তাঁকে নিয়ে সবাই হাসি-ঠাট্টা করেছে। কেউ কেউ বলতেন, যেমন, 'দ্য টেলিগ্রাফ' কাগজের সম্পাদক এম. জে. আকবর যে, "প্রেমের গল্প লেখা এক গুর্খা সাহিত্যিক পৃথক দার্জিলিং রাজ্যের স্বপ্ন দেখছেন।" যেন, প্রেমের গল্প লেখাটা পৃথিবীর জঘন্যতম পাপেরই একটি।

না, কেউই শোনেনি। অহিংসার পথ ছেড়ে যখন হিংসার পথে নামলেন আন্দোলনকারীরা তখনই প্রথমে তাঁদের কথাও প্রণিধানযোগ্য বলে গণ্য হতে শুরু হয়েছিল।

হিংসার পথই একমাত্র পথ চারণদা। পৃথিবীর কোথাওই কোনও কিছুই অর্জিত হয়নি অহিংসার দ্বারা আজ অবধি। হয়নি, কারণ মানুষের মতন জানোয়ার বিধাতা আর দ্বিতীয় সৃষ্টি করেননি। তারা শক্তের ভক্ত নরমের যম।

তোমাকে আমি লিখে দিতে পারি (যদিও সেই লেখা মিলিয়ে নেবার জন্যে সেদিন তুমি বেঁচে নাও থাকতে পারো) যে, নেলসন ম্যান্ডেলার আনা দক্ষিণ আফ্রিকার (গান্ধীজির আনা ভারতীয় স্বাধীনতারই মতন) স্বাধীনতার অবস্থা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে ঠিক ভারতীয় স্বরাজেরই মতন হবে। অবশ্যই হবে।

একটা প্রকৃত স্বাধীন দেশ গড়ে তুলতে শুধু আবেগ থাকলেই চলে না। মেরুদণ্ড লাগে, সততা লাগে, স্থির লক্ষ্যর দরকার হয়। এবং যে-জনগণের সাহায্যে নেতারা গদিতে আসীন হন সেই জনগণের জন্যে প্রকৃত দরদ লাগে। কুম্ভীরাশ্রু ফেলা দরদ নয়। চরিত্রবান বলতে একাধিক পুরুষ বা নারী সঙ্গ না-করা মানুষী বা মানুষকে বোঝায় না। "চরিত্র" শব্দটির মানে কজন বোঝে বল? আমার বিচারে তুমি একজন পয়লা নম্বরী চরিত্রবান মানুষ। যদিও তুমি আমার মায়ের সঙ্গে সহবাস করেছ।

আচ্ছা এবারে এই শীতের জায়গায় সাতসকালে তোমাকে এমন out of the context দীর্ঘ বক্তৃতা করার কৈফিয়ত হিসেবে বলি যে, তাড়াতাড়ি চান করে টেরি বাগিয়ে তোমার সবচেয়ে Smart ঝিং-চ্যাক পোশাকটি পরে গায়ে সুগন্ধ মেখে "সম্ভ্রান্ত" তুমি তৈরি হয়ে নাও। ব্রেকফাস্টও করে নাও। ঠিক দশটায় চন্দ্রবদনী এসে তোমাকে তাদের গ্রামে নিয়ে যাবে।

তুমি গতকাল বারান্দাতে বসে সামনের উঁচু কাছিম-পেঠা পাহাড়ের পিঠের উপরের যে গ্রাম দেখে যুগপৎ মোহিত এবং ভীত হয়েছিলে ওইটিই চন্দ্রবদনীদের গ্রাম। এক দিন এক রাত তুমি ওদের আতিথেয়তা স্বীকার করে নিও। তোমার খারাপ লাগবে না। চন্দ্রবদনীরও খারাপ লাগবে না যে, সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

বুঝতেই পারো। তার সঙ্গে অনেক আগে থাকতে এই ষড়যন্ত্রটি না করে রাখলে তো তোমাকে গাড়োয়াল হিমালয়ের রুদ্রপ্রয়াগের এক গ্রামে থাকার সুযোগটি করে দেওয়া যেত না। ওদের বাড়ি

থাকলেই তুমি আমার উত্তরাখণ্ড-এর প্রীতির কারণ বুঝতে পারবে। চন্দ্রবদনীও তোমারই মতন সম্ভ্রান্ত বলেই তোমাকেই তার পছন্দ, এই চালচুলোহীন আমাকে নয়। ভাগ্যিস নয়! পছন্দ হলে, তাকে নিয়ে সমস্যাতে পড়তাম।

আবারও চন্দ্রবদনীর প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে কটি কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। তাকে তো তোমাকেই দান করে গেলাম। চন্দ্রবদনীর যে আমাকে পছন্দ হল না, তার কারণ সংসারের নিরানব্বইভাগ মানুষেরই মতন Apparent-কেই ও real বলে ভেবে নিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর (তখন অবশ্য চৌধুরাণী হননি!) একটি চিঠির কথা মনে এল। প্রমথ চৌধুরী, যাঁর ছদ্মনাম ছিল বীরবল অত্যন্ত রসিক মানুষ ছিলেন। বাংলাও তো লিখতেন অতি চমৎকার। কাগজ সম্পাদনাও করেছেন, যে কাগজে রবীন্দ্রনাথের মতন মানুষও লিখেছিলেন। তুমি হয়তো এসব জানোই।

যাই হোক, সেই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "True to oneself" হবার প্রধান বিপদ হচ্ছে অপর লোকে ভুল বোঝে। বহুরূপী মনে করে। একটিমাত্র "Pose" অবলম্বন করে সেইটেই আর পাঁচজনের চোখের সমুখে দিনরাত ধরে রাখতে পারলেই মানুষের চরিত্রটা সহজ সরল ঠেকে। অন্তত আমার মতো লোকের পক্ষে তাই।

আমাদের সরল নাম লাভ করতে হলে অসরল হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আজকাল দিন পড়েছে এমনি যে, আমাদের লোকে অযথারূপে মন্দ লোক মনে করলেও সহ্য হয় কিন্তু Hypocrite বলে মনে করলে কিছুতেই সহ্য হয় না। তবে আমাদের সকল চাঞ্চল্য, সকল চপলতার মধ্যেও একটি সুনির্দিষ্ট জিনিস অবশ্যই আছে সেটা ধরতে পারলেই আমাদের পুরোরকম ধরতে পারা যায়।"

আমারও মনে হয় চারণদা যে, চন্দ্রবদনী আমার মধ্যে 'সুনির্দিষ্ট জিনিস', মানে আমার "আসল আমি", সক্রেতিস যাকে বলেছিলেন "Me! Me! The real me" তাকে ধরতে পারেনি। পারেনি যে, সেটা ওর যেমন দুর্ভাগ্য, হয়তো আমারও। আবার অন্যভাবে বললে বলতে পারি, ভালই হয়েছে। "আধেক ধরা পড়েছি গো আধেক আছে বাকি।"

কী বলো তুমি ?

আসলে আন্দোলনকারী ছেলেদের কয়েকজন নেতা যে শিগগিরি পুলিশের হাতে কাল খুন হবে সে কথা ভেবেই মন বড় ভারাক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রের সরকারের দীর্ঘদিনের নিষ্ক্রিয়তা আর নীচ স্বার্থপরতা এদের এই আন্দোলনকে এমন এক অগ্নিগর্ভ situation-এ ঠেলে দিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার জানেও না যে, পরে কেন্দ্রকেই হাত কামড়াতে হবে।

মায়নামারের নোবেল প্রাইজ পাওয়া প্রকৃত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশপ্রেমী Aung Saan Suu Kyi কিছুদিন আগেই খুব একটা দামি কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, "It is not power that corrupts but fear. Fear of losing power corrupts those who wield it. And fear of the scourage of power corrupts those who are subject to it."

এবারে শেষ করি।

আমায় এখন বেরোতেই হবে। আজ এখানেই শেষ করি। চন্দ্রবদনী এলেই তার কাছে সব জানতে পারবে।

খুশি তো ? চারণদা, তুমি খুশি তো ?

তুমি আমার মাকে এত খুশি করেছিলে! তোমাকে একটু খুশি করা কি আমার কর্তব্য নয় ? আমার মা ছাড়া জন্মাবধি আমি আর কোনও নারীকেই ভালবাসিনি। কারও ভালবাসাও পাইনি এই স্বার্থমগ্ন দুনিয়াতে। এসব ব্যাপার তোমাকে যতখানি মানায় আমাকে ততখানি কখনওই নয়। তোমার প্রতিযোগী হতে চাইনি এই জন্যে যে, চন্দ্রবদনী জয় করা গাড়োয়াল হিমালয়ের সেই শৃঙ্গ জয় করার চেয়ে কিছু সহজ কাজ নয়। আর when defeat is unavoidable why not take it

philosophically?" তাছাড়া ভাবলাম যে, বাঁদরের গলায় কি মুক্তোর মালা আদৌ মানাত ?

সব শুভেচ্ছা রইল।

—ইতি—পাটন

পুনশ্চ

চন্দ্রবদনীর সহোদরও (একমাত্র) এই আন্দোলনে জড়িয়ে আছে। ঠিক কতখানি যে জড়িয়েছে তা চন্দ্রবদনী জানেন না। আমিও সঠিক জানি না। তবে তুমি এ প্রসঙ্গে কোনও কথা নিজ থেকে উঠিও না। উনি আদৌ কিছু নাও জানতে পারেন!

চিঠিটা হাতে নিয়ে চারণ অনেকক্ষণ বসে থাকল। তারপর বেল বাজাল। বেয়ারা এলে বলল, ঠিক সাড়ে আটটাতে নাস্তা দিতে। যাতে ও চানটান করে তৈরি হয়ে নিতে পারে।

বড়ই অস্বস্তিতে ফেলে গেল পাটন ওকে।

ইচ্ছে করলে চারণ যে দশটা বাজার আগেই উপরের অথবা নীচের দিকে রওয়ানা হতে এখনও পারে না এমন নয়। কিন্তু হৃষীকেশে চন্দ্রবদনীর নাম শোনার পর থেকেই যে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিল সেই অদেখা মানুষটির প্রতি সেই আকর্ষণ বহুগুণ বেড়ে গেছে দেবপ্রয়াগে তাকে দেখার পর এবং তার গান শোনার পর। তার নৈকট্য যে কী বয়ে আনবে তা জানে না চারণ। পৃথিবীর প্রতিটি নারীই কোনও মনস্ক পুরুষের কাছে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। most unpredictable! তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারছে যে, তার প্রি-ম্যাচিওর বানপ্রস্থ এবার শেষ হতে চলেছে।

জয়িতাকে চারণ ভালবেসেছিল, কিন্তু সেই অনুভূতি যে, ঠিক যাকে প্রেম বলে, তা নয়, তা ও চন্দ্রবদনীকে প্রথমবার দেখা মাত্রই বুঝতে পেরেছিল। ও যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিল। সর্পদ্রংষ্ট। চন্দ্রবদনীর ব্যক্তিত্ব তাকে বিবশ করেছিল। ঠিক ওই ধরনের অনুভূতি এর আগে অন্য কোনও নারীকে দেখেই হয়নি ওর। বড়ই কষ্ট পেয়েছে ও পাচ্ছে সেইক্ষণ থেকে, অথচ কারওকেই বলতে পারেনি।

তুলির সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল অবশ্যই। মানে, চারণের মায়ের সঙ্গে। কিন্তু সেই সম্পর্কে তুলির দিক দিয়ে মন যতখানি নিমগ্ন ছিল চারণের দিক দিয়ে শরীর থাকলেও, মন ততখানি ছিল না। চারণের জীবনে তুলিই প্রথম এবং আজ অবধি শেষ নারী যার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল।

জয়িতা তার শরীরের লোভ দেখিয়ে ওর কাছ থেকে অনেক কিছুই বাগিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু বদলে দেয়নি কিছুই। না শরীর, না মন। জয়িতার মানসিকতা যেমন ছিল, তেমন বোধহয় দেহোপজীবিনীদেরই হয়। শেষোক্তদের না জেনেই এ কথা মনে হয়েছে ওর। জানলে, তুলনা করতে পারত সঠিক ভাবে। উঁচুমহলের ইংরেজি-ফুটোনো জয়িতাদের মতন মেয়েদের চেয়ে সাধারণ, গরিব প্রস্টিট্যুটেরাও সম্ভবত ভাল। তাদের মধ্যেও ভান-ভণ্ডামি থাকলেও লেনদেন সম্বন্ধে কোনও ভণ্ডামি থাকে না হয়তো। মনে হয়।

বেয়ারা এলে, তাকে ব্রেকফাস্টের কথা বলে বাথরুমে গিয়ে, গিজারটার সুইচ টিপে দিল। ঠিক করল, ভাল করে চান করবে আজ বহুদিন পরে।

চান করে প্রাতরাশ সেরেও ঘড়িতে দেখল যে, চন্দ্রবদনীর আসতে এখনও দেড় ঘন্টা দেরি আছে। এই মধ্যান্তরের ভার তখন থেকেই তাকে ভারী করে তুলল। কী করবে তা ঠিক করে উঠতে পারল না। তারপর সিদ্ধান্ত নিল পাটনকে একটা চিঠিই লেখে। চন্দ্রবদনীর সঙ্গে সে কোন চক্রান্ত করে রেখেছে তা সেই জানে। তাই চন্দ্রবদনীর আসার পরে চিঠি লেখার সময় পাবে কি না তা অজানা।

বেল বাজিয়ে কাগজ চাইল। একটি বলপেন সঙ্গে তখনও ছিল সভ্যতার শেষ যোগসূত্র হিসেবে

যে ছেলেটি ব্রেকফাস্ট দিয়েছিল সেই প্যাড নিয়ে এল। কিন্তু তখুনি চিঠি লেখা আর হল না। মানুষ, চারণকে চিরদিনই পুঁথির চেয়ে অনেকই বেশি আকৃষ্ট করেছে। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মিশে যেমন করে ও সেই স্থানের নাড়ি বোঝে, তেমন দশটি বই পড়েও কখনওই বোঝা সম্ভব নয় বলেই ও হেসেছে।

তোমার নাম কি ভাই ?

অমিতাভ ।

বচ্চন নয় তো ?

হেসে সে বলল, উনিশ-কুড়ি বছরের এক গাড়োয়ালি ছেলে, ভারি মিষ্টি হাসি ।

বলল, তা নয়, তবে আমার মা অমিতাভ বচ্চনের খুব ভক্ত তাই নাম দিয়েছিল অমিতাভ। অমিতাভ বচ্চন কোড়োরো কোড়োরো পতি আর আমি রুদ্রপ্রয়াগের এই হোটেলের খিদমদগার ।

তোমার দেশ কোথায় ? এখানেই ?

না । উত্তরকাশীতে ।

ও ! ভূমিকম্পে তোমাদের বাড়ির ক্ষতি হয়েছিল ?

হয়নি ! সেই জন্যেই তো পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এই নোকরিতে ঢুকেছি। বাড়িটা নতুন করে করতে হবে। সব ফেটেফুটে গেছে। শীতে ভারী কষ্ট। আর শীত তো এসেই গেছে। এবারে আমাকেও ফিরে যেতে হবে। ট্যুরিস্ট সিজনও শেষ হয়ে গেল ।

ট্যুরিস্ট সিজন-এ বকশিস তো ভালই পাও ।

বকশিসই তো সার । মাইনে যা, তা লোককে বলতে লজ্জা করে ।

তাই ?

হ্যাঁ। অধিকাংশ হোটেলেই তাই। আমাদের আসল রোজগার তো বকশিসই ।

তোমাদের মতো অল্পবয়সীদের সকলের নামই কি এমন আধুনিক ?

আধুনিক মানে ?

মানে, এই অমিতাভ, ধর্মেন্দ্র, সঞ্জীবকুমার, রাকেশ...

অমিতাভ হেসে ফেলে বলল, প্রায় তাই। উত্তরের বরফি হাওয়া থেকে বাঁচা সহজ কিন্তু যুগের হাওয়া সব উড়িয়ে নিয়ে যায় ।

সব মানে ?

মানে, এই যাকে আপনারা ইংরেজিতে বলেন, ট্র্যাডিশন ।

বাঃ। তুমি তো ইংরেজি জানো বেশ ।

আমি পড়তাম তো শ্রীনগরের কলেজে ।

তাই ?

কি পড়তে ?

ইংরেজি নিয়ে পড়তাম। ইচ্ছে ছিল দিল্লিতে গিয়ে ইংরেজিতে এম এ করব। কিন্তু পাস করেই বা কি হবে। চাকরি কই ?

চাকরিই যে করতে হবে তার মানে কি ?

ক্যাপিটাল ছাড়া তো ব্যবসা হয় না ।

ভুল কথা। ইচ্ছে থাকলেই হয়। ব্যবসা মানেই যদি ভাব প্রথম দিন থেকেই এয়ারকন্ডিশানড অফিস, সুন্দরী সেক্রেটারি, পাঁচ লক্ষ টাকা ইনিশিয়াল ক্যাপিটাল, সেটা ভুল। আমি অনেক কোটিপতিকে জানি যারা সৎপথে অতি ছোট্ট ব্যবসা থেকে অমন হয়েছেন। কি কাকে বেচা যায় আর কোথা থেকে কত কম দামে সেই জিনিস যোগাড় করা যায়, এইটা যদি একবার বুঝে ফেলতে পার তবেই ব্যবসাদার হয়ে উঠবে। তুমি যাই দেবে, খদ্দের তাই মাথায় করে কিনে নিয়ে যাবে ।

মাথায় করে মানে ?

মানে, আদর করে। বাংলাতে আমরা যাকে বলি, শিরোধার্য করে ।

খদ্দের এসে চাইবে আম আর তুমি তাকে দেবে তেঁতুল। খদ্দের কি জানবে তার আসলে কোন জিনিসটি দরকার ! বিক্রেতা হয়ে তুমি যদি খদ্দেরের স্বার্থ তার নিজের চেয়েও ভাল বুঝতে পারো, সে তুমি মোমফুলিই বেচো আর নারাঙ্গি, তুমিও একদিন কোড়োরোপতি হবেই হবে ।

দেখা যাক। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ-ই জানে ।

বলল, অমিতাভ।

তোমার বাবার নাম কি ? মানে, তোমাদের বাবা মায়েদের সময়ে ওঁদের কী রকম নাম রাখতেন তোমাদের নানা-দাদারা ?

অমিতাভ হাসল।

বলল, আপ তো অজীব অজীব কোশ্চেন পুছ রহা হ্যায় সাব।

জি। ম্যায় এক অজীব আদমিভি হুঁ। ইস্ লিয়ে।

বাবা-মায়েদের নাম হত এইরকম, বাবাদের ধরুন জবারু, গেন্দা, ছিপাড়া এইরকম আর কী !

মায়েদের ?

কুশলা, মুর্তি, এই···

গাড়োয়ালে কি অনেক জাত ?

অনেক না হলেও, আছে কিছু।

কী রকম ? নাম বল না কয়েকটা ?

এই ধরুন, নেগি, পাঁওয়ার। পাঁওয়ার তেহরিতে বেশি পাবেন।

মানে ? তেহরি গাড়োয়াল তো ?

জি হাঁ।

চারণের মনে পড়ে গেল, কুঞ্জাপুরী থেকে দেখেছিল ঘোরানো পার্বত্য পথে বাস চলেছে তেহরি গাড়োয়ালের দিকে।

ভাবছিল পাটন, সত্যি। আমাদের দেশটা কত বড়। কত বিচিত্র। ইউরোপে তিন-চারটি দেশ পেরিয়ে যাওয়া যায় সকালে বেরিয়ে বিকেলে। আমাদের দেশে একটি জেলা একদিনে পেরুনো যায় না। বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, হল্যান্ড, কতটুকুটুকু সব দেশ। জার্মানিই বা কতটুকু ? অথচ সে সব দেশ মানুষদের দেশ বলে তাদের কী দাপট ! জনসংখ্যা দিয়ে দেশের মহত্ত্ব বা বিরাটত্ব নিরূপিত হয় না, মানুষের উপাদান দিয়ে হয়, জাতের গুণ দিয়ে হয়। আমাদের দেশ নিয়ে কীই না করতে পারতাম আমরা। অথচ পঞ্চাশটা বছর নষ্ট হয়ে গেল। পাটন ঠিকই বলে। একটা হেস্তনেস্ত করার সময় এসেছে। করলে ঐ পাটনেরাই করবে একদিন।

পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে চারণ অমিতাভকে জিগ্যেস করল, আর কি জাত বললে না ?

শর্মা আছে। তারা পণ্ডিত। ভরদ্বাজ।

আর ?

শেমোয়াল আছে। রাওয়াল, মানে, পুরোহিত। বদ্রীনাথের রাওয়ালদের বাড়ি দেবপ্রয়াগে। চন্দ্রবদনীজি তাঁদের রিস্তাদার।

তুমি চন্দ্রবদনীকে চেনো না কি ?

চিনব না ? তাঁর বাবা পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে···

তোমার তখন জন্ম হয়েছিল ?

অমিতাভ হেসে ফেলল। বলল, শুনেছি তো সব। আমাদের গাড়োয়াল রেজিমেন্ট বাহাদুর। তবে চন্দ্রবদনীজির বাবা অন্য রেজিমেন্টে ছিলেন। আপনি জানেন না, রমেশ সিপ্পি চন্দ্রবদনীজিকে তাঁর ছবির নায়িকা করতে চেয়েছিলেন।

তারপর ?

বহিনজি করলে তো। উনি কি দুগগি-তিগগি না কি ?

ওয়াহ্ ! ওয়াহ্ !

চারণের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তোমাদের এই গাড়োয়ালে কি কি ফসল ফলাও তোমরা অমিতাভ ?

অনেকইরকম।

যেমন ?

যেমন মক্কী ? 'মক্কীকা রোটি আর শুর্ষকা শাগ'-এর কথা পাঞ্জাবি ধাবাওয়ালাদের দৌলতে ঢেরই শুনেছেন ! নিশ্চয়ই। সেই মক্কী। মানে মকাই।

তা শুনেছি।

মক্কী ছাড়া গেঁহু হয়। জও হয়।

জ টা কি জিনিস ?

একরকমের ধান। পুজোতে লাগে। চাল হয় দু-রকম। সাট্টি এবং ঝঙ্গোরা। কোদুকা হয়।

সেটা কি জিনিস ?

গেঁহুরই মতন। আটা হয় তা থেকে।

আর।

শর্ষে, পালং, মুলি, ঘেণ্ডা মুলি, খাম আলু।

আর ফলের মধ্যে ?

নারাঙ্গি, ছোট ছোট হয়, সান্তরা বড়। আর মাল্টাও হয় আরও বড়। তাছাড়া, যোশিমারী আলু হয়। নিম্বু হয় দুরকমের ছোট ও বড়। চাকোতরাও হয়।

চাকোতরাটা কি জিনিস ?

বাঙালিরা বলে বাতাবী নেবু।

হাসল চারণ, অমিতাভর মুখে শ্যামবাজারি "নেবু" শুনে।

তোমাদের এই পাহাড় জঙ্গলে নানারকম জানোয়ার, পাখি আছে, পড়েছি, জিম করবেট সাহেবের বইয়ে। তবু তুমি যদি নিজমুখে বল তো মিলিয়ে নিই।

নীচে হাতি আছে। দেখেছেন তো রাজাজি ন্যাশনাল পার্কে। অন্যান্য জায়গাতেও আছে। বড় বাঘ, চিতা, ভালু, বিরাট বিরাট হিমালয়ান ভালু, বুকে সাদা 'V' চিহ্ন থাকে তাদের। ভালু এমনিতে নিরামিশাষী কিন্তু হিমালয়ান ভালুকেরা আমিষও খায়। কাকার আছে। ঘুরাল। হনুমান। পাখির মধ্যে ঈগল, নানারকম। দাঁড়কাক কুচকুচে কালো। কবুতর, মুরগী, ময়ূর, চুকোর, খালিজ ফেজেন্টস, বুলবুলি আরও কত পাখি। অত কি আমি জানি !

বাঃ। তবু তো অনেকই জানো। আমাদের দেশে বহুত মানুষ আছেন, ভারী ভারী ডিগ্রিওয়ালা মানুষ, যাঁদের ডিগ্রি পাকানো থাকে আলমারির ড্রয়ারে, তাঁদের যদি জিজ্ঞাসা করো এটা কি গাছ ? তো ওঁরা বলবেন গাছ। এটা কি পাখি ? পাখি। এটা কি নদী ? নদী। এটা কি ফুল ? ফুল। এমনকি তুমি যদি তাঁর বউকে দেখিয়ে বল ইনি কে ? মানে, এঁর নাম কি ? উনি বলবেন, বউ।

অমিতাভ খিলখিল করে হেসে উঠল। ভারী মজা পেয়েছে ও চারণের কথা শুনে।

বলল, আপ বহুতই মনমৌজি আদমি হেঁ সাহাব। মনমৌজি কথাটার মানে অমিতাভ ঠিক জানে না। তবে তাতে চারণের প্রশস্তির রকম বোঝানোর সুবিধাতে কোনও হেরফের হল না।

অমিতাভ বলল, অব ম্যায় চলে সাহাব। ম্যায় হিঁয়া রহনেসে আপ খাত নেহি লিখ পায়েঙ্গে।

অমিতাভ সত্যিই চলে গেল।

পাটনকে চিঠিটি লিখতে বসলে এখন এত অল্প সময়ে শেষ করা যাবে না। কারণ, সে যে সব কথা বলে গেল সেই সব সম্বন্ধে চারণ সম্পূর্ণ একমত নয়।

একমত কেন হওয়া সম্ভব হল না পুরোপুরি ওর পক্ষে, তা বুঝিয়ে বলতে গেলে সময় এবং মনোযোগেরও দরকার। কিন্তু আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রবদনীর এসে পড়ার কথা। তা যদি আসে, তবে চিঠিটি মিছিমিছি আরম্ভ করে আধাখেঁচড়া করে রেখে দিতে হবে।

চিঠির ব্যাপারে চারণ চিরদিনই অত্যন্ত মনোযোগী। চিঠি যখন লেখে কারওকেই, তখন মনে করে যে, যাকে লিখছে তিনি বা সে যেন তার সামনেই বসে আছেন। তাঁর বা তার সেই মুহূর্তের বেশভূষা, মানসিকতা, সেই সময়ের আবহাওয়া, চিঠির প্রাপকের পরিবেশ, প্রতিবেশ সব কিছু সম্বন্ধেই একটা ধারণা অথবা উর্দুতে যাকে বলে 'আন্দাজ' তাই করে নিয়ে চিঠি লিখতে বসে। চিঠির প্রাপকের মুখে-চোখে চারণের চিঠির প্রতিটা লাইন কীরকম অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলে তাও যেন

চারণ কল্পনা করতে পারে। গান তো গায়কের একলার নয়! গান যতখানি গায়কের, ঠিক ততখানি শ্রোতারও। একটুও কম বা বেশি নয়। চিঠি যে লেখে, আর চিঠি যে পায়, তাদের বেলাও এই একই কথা প্রযোজ্য।

চারণের মনে পড়ে গেল পাটনের মা তুলির চিঠির কথা। তুলি বয়সে চারণের সমবয়সী অথবা ছোটও হতে পারে। হয়তো ছোটই ছিল। মেয়েদের বয়স তো জিগ্যেস করা যায় না। আগে অন্তত যেত না। যখন মেয়েরা যথেষ্ট মেয়েলি ছিল এবং সেই মেয়েলিপনাতে পুরুষেরা আকৃষ্ট হত এবং মেয়েরা তাদের মেয়েলিপনার কারণে নিজেরাও বিব্রত হত না। মেয়েরা মেয়েলি হবে অথবা পুরুষ পুরুষেরই মতন। তাই তো উচিত। তাই এতে দুপক্ষের কোনও পক্ষেরই বিব্রত হবার কি কারণ একালে কী সেকালে তা চারণ কোনওদিনও বুঝে উঠতে পারেনি। মেয়েদের মধ্যে পুরুষ পৌরুষ প্রত্যাশা করে না শুধু তাই নয়, পছন্দও করে না, যেমন মেয়েরা করে না পুরুষের মধ্যে মেয়েলিপনা। এই সত্য সম্বন্ধে চারণের কোনওই সন্দেহ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না।

ছোট্ট এবং সুন্দর চিঠি লিখত তুলি।

মেয়েরা সাধারণত চিঠি লেখার ব্যাপারে খুবই সাবধানী হয়। বিশেষ করে এদেশের মেয়েরা। 'শতং বদঃ না লিখঃ" এই লিখন তারা সর্বদাই মেনে চলে। পুরুষ মাত্রই, যদি সে ধূর্ত, ধাউড় বা ভণ্ড না হয়, স্বভাবতই অসাবধানী, অগোছালো তার অভিব্যক্তি এবং মনোভাবে। অবশ্য ব্যতিক্রমী পুরুষও থাকেন।

তুলির প্রথম চিঠিটির কথা মনে আছে চারণের। আতর-মাখানো ফিকে-হলুদ-রঙা সিল্ক-এর একটি স্কার্ফ-এর মধ্যে তুলির চিঠিগুলো জড়িয়ে রেখে দিয়েছে সে তার ড্রয়ারে। পাটনের অমানুষ বাবা, যিনি হয়তো কোনওদিনও তার মন বা শরীরকে কোনও আয়নার সামনেই দাঁড়িয়ে কখনওই দেখেননি, এই চিঠিগুলোর কথা জানলে চারণকে গুণ্ডা দিয়ে খুন করাতেও হয়তো বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না।

চারণের এই দোষ। উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীরই মতন ছড়িয়ে যাওয়া। যদি একে দোষ বলা যায়।

এই সব ভাবতে ভাবতে চান সেরে নিল চারণ।

চারণের ভাবনার জাল ছিঁড়ে দিয়ে অমিতাভ দৌড়ে এল চারতলাতে। বলল, চন্দ্রবদনীজি আ পঁউছি হ্যায়। উনকি হিঁয়াই লায়েগা স্যার কী আপ উতরকে আইয়েগা নীচে?

চারণ বলল, না না। আমিই যাচ্ছি।

বলেই, বারান্দাতে দাঁড়িয়ে নীচে তাকাল ঝুঁকে। কারওকেই দেখা গেল না। চারণ ভাবল, নিশ্চয়ই পোর্টিকোর নীচে আছে সে, অথবা বসার ঘরে বসেছে গিয়ে।

অমিতাভকে ব্যাগটা নামিয়ে নিয়ে যেতে বলবে কি বলবে না, বুঝতে পারল না। রাতটাও কি চন্দ্রবদনীদের বাড়িতেই কাটাতে হবে? না শুধু "Day spend" করারই নেমন্তন্ন? পাটনের চক্রান্তর চক্করের প্রকারটি যে ঠিক কী রকম তাতো চারণের জানা নেই।

নীচে নেমে, বসার ঘরে উঁকি মেরে দেখল চারণ যে, সেখানেও সে নেই। বাইরে বেরিয়ে পোর্টিকোর নীচে গিয়ে দেখল, নাঃ। সেখানেও নয়।

এদিকে ওদিকে চেয়ে অবশেষে দেখতে পেল যে, একটি তরুণ হর্স-চেস্টনাট গাছের নীচে চন্দ্রবদনী দাঁড়িয়ে বাগানের শোভা দেখছে। ডান পাশ থেকে তাকে দেখল চারণ। একটি ফলসা-রঙা তাঞ্চোই সিল্ক-এর শাড়ি। তার গাঢ় বেগুনি পাড়। সাদা-রঙা ব্লাউজ। তার গলাতে ফলসা-রঙা লেসের কুঁচির কাজ করা। মুক্তোর মালা গলাতে। মুক্তোর ছোট দুটি দুল, কানের সঙ্গে লেপটে আছে। বাঁ হাতটি খালি। ডান হাতে সাদা ব্যান্ডের সাদা ডায়ালের হাত ঘড়ি। সকালের রোদ এসে পড়েছে তার মুখে। চান করে এসেছে। চুলে তেল দিয়েছে। চামেলির গন্ধ বেরুচ্ছে। হয়তো চামেলির তেলই দিয়েছে। ঘন কালো ভিজে চুল এর মধ্যে তার সাদা সিঁথিটা, সে যে কতখানি ফর্সা তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। মুখে অন্য কোনও প্রসাধন নেই। সুস্নাত শরীর থেকে সুগন্ধ

উড়ছে। মেয়েরা শরীরের নানা অদৃশ্য স্থানে নানা সুগন্ধি মাখে। সে সবের কথা চারণের জানার কথা নয়। কিন্তু চন্দ্রবদনীর দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল যে, বাহ্যিক কোনও সুগন্ধির বা প্রসাধনের কোনও প্রয়োজন হয় না চন্দ্রবদনীর। তার শরীরই সুগন্ধি। মুখেও প্রখর ব্যক্তিত্ব আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোনও প্রসাধন নেই।

চন্দ্রবদনী হাত জোড় করে বলল, নমস্কার।

নমস্কার।

চারণ বলল।

কেমন লাগছে আমাদের রুদ্রপ্রয়াগ ?

এসে অবধি যে-টঙে চড়িয়েছিল পাটনচন্দ্র তা থেকে তো আর নামিইনি। জায়গাটির ভালত্ব বা মন্দত্ব সম্বন্ধে কিছু যে বলব, তার উপায় কি ? এমনকি করবেট সাহেব রুদ্রপ্রয়াগের কুখ্যাত মানুষখেকো চিতাটা কোথায় মেরেছিলেন সে জায়গাটা পর্যন্ত দেখা হল না।

দেখিয়ে দেব পরে। করবেট সাহেব আমার ঠাকুর্দাকে চিনতেন। আমাদের বাড়িতেও এসেছেন কয়েকবার। যদিও উনি বয়সে আমার ঠাকুরদার চেয়ে অনেকই বড় ছিলেন।

তাই ? তবে তো আপনাদের বাড়ি আমার কাছে এই কারণেই এক তীর্থ।

কেন ? আপনি ভক্তি করেন বুঝি ওঁকে খুব ?

করব না ! শিকারী বলেই নয়, মানুষ হিসেবে ভক্তি করি, দেশপ্রেমী হিসেবে ভক্তি করি, সাহিত্যিক হিসেবে ভক্তি করি।

সাহিত্যিক হিসেবে ?

নিশ্চয়ই। আপনি পড়েননি ওঁর লেখা ?

না তো।

ঈসস। এই জন্যেই বলে, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।

তারপর চারণ বলল, এখুনি কি যেতে হবে ?

যেমন আপনার খুশি।

স্যুটকেসটা কি নামিয়ে আনাবে ওপর থেকে ?

তা আনালেই ভাল। কারণ আমাদের বাড়িতে এমন কোনও পুরুষ নেই যাঁর জামাকাপড় আপনার গায়ে হতে পারে। আর যদি চেঞ্জ না করে চলে তবে...

রাতে কি আপনাদের ওখানেই থাকতে হবে ? না এখানে এসে শোব ?

সে কী ! পাটন বলেনি আপনাকে ?

কি ?

যে, আজ আপনি আমাদের বাড়িতেই থাকবেন। কাল ভোরে আমরা চলে যাব পউরিতে। পউরিতে আমাকে পৌঁছে দিয়ে আপনি ফিরে যাবেন দেবপ্রয়াগে।

তাই ?

তাই মানে ? আপনি জানতেন না ? নাকি অন্য কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল ?

না। তা নয়। মানে আমাকে কিছুই বলেনি তো পাটন।

বলেনি ? আশ্চর্য তো !

সে যাই হোক। ও যা ঠিক করেছে তাই হবে। প্রথমবারেই বুড়ি-ছোঁয়ার মতন বদ্রীনাথ কেদারনাথ দেখে ফেললে এ জীবনে আর এই গাড়োয়ালে আসাই হবে না। আমারও মন বলছিল যে, দেবপ্রয়াগেই ফিরে যাই।

চন্দ্রবদনী বলল, অবশ্য দেবপ্রয়াগে যেতে আপনাকে পউরি থেকে নেমে আসতে হবে আবার শ্রীনগরে।

তা তো হবেই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে চারণ বলল, একটা কথা ভাবছিলাম।

কি ?

আপনার মতো শিক্ষিতা, স্থানীয় নারীরও কি এসকর্ট এর দরকার ? এতটুকু পথ যেতে ?

সামান্য অপ্রতিভ হল চন্দ্রবদনী ।

একটু ভেবে বলল, আমার ? একদমই না ! বরং আপনাকেই আমি এসকর্ট করে নিয়ে যেতে পারি যেখানে যাবেন ।

তাই তো !

চারণ বলল, আমি তো তাই ভেবেছিলাম । আমি...

কিন্তু পাটন আশঙ্কা করছে আগামীকাল কোনও গোলমাল হতে পারে ।

চন্দ্রবদনী বলল ।

কোথায় ?

উত্তরাখণ্ড-এর সব জায়গাতেই ।

কেন ?

তা বলেনি । কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না যে, পাটনের সঙ্গে আমার ভাই চুকোর-এর অনেকদিনের বন্ধুত্ব । সেও থাকত স্টেটস-এ । ও এখানে ফিরে আসে উত্তরাখণ্ডে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করার স্বপ্ন নিয়ে । আমাদের পরিবারের অনেকেই হয় আর্মিতে নয় এয়ারফোর্সে । সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই । আমরা, বলতে পারেন, "ফৌজি" পরিবার । তাই কেতাবী পড়াশুনো তার ভাল লাগেনি । তাকেও, বোধহয় Family Bug-এ কামড়েছিল । সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে একদিন এখানে ফিরে এল । ফিরে আসার মাস ছয়েক পরে পাটনের সঙ্গে এই রুদ্রপ্রয়াগ বাজারেই তার দেখা, একেবারেই অকস্মাৎ । তারপর পুনর্মিলন । চুকোর এখন রুদ্রপ্রয়াগে নেই । কোথায় আছে, সে খবরও জানি না । তবে আছে এই আদিগন্ত পর্বতমালার কোথাও না কোথাও । কিন্তু চুকোর যেখানেই থাকুক তার সঙ্গে পাটনের একটা গোপন যোগসূত্র যে আছে তা বুঝতে পারি । তবে ওইটুকুই । বুঝতেই পারি । বুঝতে পারার চেয়ে বেশি কিছু জানতে পারি না ।

তারপর বলল, ইফ উ্য ফিল দ্যাট আই অ্যাম অ্যান আনওয়ান্টেড কোম্পানি তাহলে আমি একাই যাব ।

কী যে বলেন ! এ তো আমার সৌভাগ্য । আপনাকে দেবপ্রয়াগে দেখার পর থেকে...জানি না কী বলব । সামনা-সামনি আমি কথা গুছিয়ে বলতে পারি না । ভাল তো বলতে পারিই না । তাই কিছু না বলাই ভাল ।

তাহলে কী ভাবে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন ?

তাও জানি না । বোধহয় চিঠিতে একটু একটু পারি । তবে বলার মতন কথা না জমে উঠলে বা বলার মতন কেউ না থাকলে ।

চন্দ্রবদনী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ ।

তারপর বলল, চলুন । আমরা চলতে চলতে কথা বলি । অনেক উপরে উঠতে হবে কিন্তু । বেশ অনেকটা পথ । এতখানি উঁচুতে অন্যত্র উঠলে অনেকই পুণ্যার্জনও করতে পারতেন, কিন্তু এখানে পুণ্যর সম্ভাবনা কম । তবে এটুকু বলতে পারি যে, পাপও নেই ।

আমার স্যুটকেস কি হবে ?

আপনি এখুনি তো আর চেঞ্জ করছেন না । আমার সঙ্গে দুজনে এসেছে বাড়ি থেকে । তারা বাজার করছে এখন । বাজার করা সেরে তারা স্যুটকেস বয়ে নিয়ে যাবে । কাল সকাল সাতটাতে গাড়ি এসে আমাদের তুলে নেবে । আজই সন্ধের আগে এসে যাবে রুদ্রপ্রয়াগে । সে গাড়িতেই আমরা যাব কাল ।

কোথা থেকে আসবে গাড়ি ?

হৃষীকেশ থেকে । আপনারই তো ঠিক করা গাড়ি ।

চারণ একটু থতমত খেয়ে বলল, ও, হ্যাঁ, তাই তো । ভুলেই গেছিলাম ।

বলেই বুঝতে পারল, পাটন এখানেও এক তিড়ি মেরেছে। Pulled a fast one on him।

চন্দ্রবদনী বলল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি পড়েছেন কি ?

চারণ একটু অবাক হল। প্রথমত স্থানটি রুদ্রপ্রয়াগ। দ্বিতীয়ত প্রশ্নকর্ত্রী চন্দ্রবদনী। তৃতীয়ত এই গাড়োয়াল হিমালয়ে বসে একেবারে পদ্মা নদীতে নেমে যাওয়াটা, শারীরিকভাবে না হলেও, মানসিকভাবে একটু কঠিন বলে মনে হল।

মানিকবাবু তো মুক্তিকেই বাস্তবায়িত করেছেন হোসেন মিঞার মধ্যে। করেন নি কি ? হোসেন মিঞার মতো এমন একটি চরিত্র বিশ্বসাহিত্যেই দুর্লভ।

হুঁ। সুদূরের পিয়াসী।

চারণ বলল।

চন্দ্রবদনীর মুখ চোখ, ভোরের প্রথম সূর্যের আলো চন্দ্রবদনী গিরিশৃঙ্গর উপরে পড়লে যেমন তা ঝিকমিকিয়ে ওঠে, তেমনই যেন ঝিকমিকিয়ে উঠল। বলল, ঈসস। আপনি জর্জ দাদুর কথা মনে করিয়ে দিলেন।

কে জর্জ দাদু ?

জর্জ বিশ্বাস।

তাই ?

হ্যাঁ। আমি তখনও পাঠভবনেও ভর্তি হইনি। মা গেছিলেন পৌষ উৎসবে, শান্তিনিকেতনে। বাবারও তখন ছুটি ছিল। বাবাও গেছিলেন। জর্জ দাদু খালি গলাতে সকালবেলা গানটি গেয়েছিলেন মেলাতে।

"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসি।"

"সুদূর বিপুল সুদূর !" এই শব্দকটি যে আট বছরের একটি মেয়ের বুকে কী সুরই বাজিয়ে দিয়েছিল, তাকে কোন চিরযাত্রীর অদৃশ্য বেশে সাজিয়ে দিয়েছিল তা কী বলব। আমার মধ্যে ঐ তিনটি শব্দের অনুরণন আজও থামেনি। আর জর্জ দাদু কীভাবে যে গাইতেন। কীভাবে শব্দ কটি উচ্চারণ করেছিলেন তা ভাষাতে বোঝানো যায় না। "ওগো সুদূর বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও বাঁশরি—মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাশরি"।

চারণ চুপ করে ছিল।

চন্দ্রবদনী বলল, সেই ছেলেবেলা থেকে আমার মনে "সদূর বিপুল সুদূর"-এর একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল। বিশ্বাস করবেন না হয়তো বললে, আমি যাকে বিয়ে করেছিলাম ভালবেসে তিনি এয়ারফোর্সের ফাইটার পাইলট ছিলেন। ওঁর সঙ্গে যেদিন প্রথম আলাপ হয়েছিল আমার, আমি ওকে জিগ্যেস করেছিলাম যে আপনারা তো মুহূর্তর মধ্যে কত দূরে চলে যান, হাওয়ার বেগ, শব্দের বেগ এসব আপনাদের কাছে তুচ্ছ কিন্তু "সুদূর বিপুল সুদূরের" মানে আমাকে বোঝাতে পারেন ?

উত্তরে উনি কী বলেছিলেন ?

বলেছিলেন, মানে, উনি তো বাংলা বুঝতেন না। ইংরেজিতেই কথাবার্তা হচ্ছিল। তবুও উনি খুব উদ্দীপ্ত হয়ে বলেছিলেন Oh! Its great. The very idea is great. Yes! To go beyond and beyond and beyond is our job. We churn around the blue space. The eternal space or you may as well say, we are churned by eternal space. "ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি/মোর ডানা নেই, আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাশরি" ওটি ইংরেজিতে তর্জমা করে শোনাতেই তিনি সত্যিসত্যি একেবারে thrilled। বললেন, বাঁশরির মানে তো বুঝলাম, পাশরিটা কি ব্যাপার ?

চারণ বলল, আমিও কিন্তু জানি না।

চন্দ্রবদনী পথে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক হয়ে বলল, ঠাট্টা করছেন।

চারণ বলল, সত্যিই জানি না। গানটা কতবার শুনেছি অথচ এই পাশরি শব্দটির মানে জানার

ইচ্ছে হয়নি কখনও এমন করে। বাঁশরির সঙ্গে পাশরি মিলে গেছে, কানে মধুর ঠেকেছে, এই অবধি।

চন্দ্রবদনী বলল, পাশরি মানে, ভুলে যাওয়া। পাসরন থেকে পাসরি। সেখান থেকে বানান ভেদে বা আর্ষ-প্রয়োগে পাশরি।

বাঃ!

চারণ বলল, আপনি কত জানেন!

হাসাবেন না, প্লিজ। চড়াইতে ওঠার সময় হাসলে আমার পেটে ব্যথা হয়।

অবাক কাণ্ড।

চারণ বলল।

তারপর বলল, আসলে পদ্মনদীর মাঝির হোসেন মিঞার সাধনাইতো ছিল সেই অজানাকে জানার। যেখানে eternal surging water churns him, churns the space around him or to say it in the other way round, he churns the water and the space.

চারণ চুপ করে রইল। চন্দ্রবদনীর নাম তাকে মজিয়েছিল হৃষীকেশ-এ। তার গান মজিয়েছিল দেবপ্রয়াগে। আর তার ব্যক্তিত্ব, তার মেধার ঔজ্জ্বল্য মুগ্ধ করল রুদ্রপ্রয়াগে।

ও ভাবছিল, সত্যিই এই দেবভূমিতে এসে যেন দেবী দর্শনই হল।

চন্দ্রবদনী বলল, আপনি Kunt Humsun-এর "Growth of the Soil" উপন্যাসটি পড়েছেন?

হুঁ।

পদ্মানদীর মাঝির সঙ্গে কোথায় একটা মিল আছে না? হোসেন মিঞার চরিত্রের সঙ্গে...

এমন সময়ে বাজারের দিক থেকে, দুজন হাট্টা-কাট্টা গাড়োয়ালি, হোটেলের অমিতাভর মতন নয়, এসে, গাড়োয়ালিতে চন্দ্রবদনীর সঙ্গে কী সব কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলে হোটেলের দিকে চলে গেল। একজনের কাঁধে একটি বড় থলে।

চন্দ্রবদনী বলল, চলুন এবারে বড় রাস্তা ছেড়ে আমাদের পাথরে বাঁধানো পাকদণ্ডী ধরে উঠতে হবে। কষ্ট হবে যদিও আপনার। তবে—

তবে কি?

দুপাশের দৃশ্যে মন ভরে যাবে, চোখ প্রফুল্ল হবে।

বাঃ।

এবারে আমরা পিচ রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ঝুলন্ত-পুল পেরোব পায়ে হেঁটে। চলুন।

এই পথই গেছে বদ্রীনারায়ণ?

হ্যাঁ।

অলকানন্দা যে পথে এসেছে উপর থেকে সে দিকেই গেছে বদ্রীনাথের পথ। আর মন্দাকিনীর পাশ দিয়ে গেছে কেদারনাথের পথ। সামনেই কিছুটা গেলে দুই নদীর সঙ্গম। সেখানে এক বিরাট পাথর আছে। তার নাম নারদ শিলা। নারদ মুনি নাকি সেখানে বসে বীণা বাজাতেন।

আপনি এসব বিশ্বাস করেন?

চারণ বলল।

করতে ক্ষতি কি? যিশুখ্রিস্ট বেথেলহম-এর কোন খামারবাড়িতে জন্মেছিলেন, মহম্মদ হাতেমতাই-এর উপরে কি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, বকর-ঈদ-এর ইতিহাস কি? তা যদি বিশ্বাস করি, লেনিন বা স্টালিনের দাড়িতে কটি চুল ছিল তাও যদি শুনে রাখতে পারি, তাহলে হিন্দুদের দেবদেবী, পৌরাণিক কাহিনীই বা কেন অবিশ্বাস করতে যাব?

তারপরে চন্দ্রবদনী বলল, এবারে তো মোটে একটি রাতই থাকবেন এখানে। কাল ভোরেই তো চলে যাব আমরা। তাই এবারে হবে না। কিন্তু পরের বার এলে আপনাকে কোটিশ্বর শিবের গুহাতে নিয়ে যাব।

সেটা কোথায়? তাছাড়া আমি তো কোনও মন্দির টন্দিরের ভিতরে যাই না। কোনও দেব-দেবী

মানি না আমি। তবে ঈশ্বর নামক কোনও অদৃশ্য কিন্তু অনুভূত শক্তি যে আছে তা মানি। হয়তো আমি মূর্খ বলেই। অবশ্যই মানি।

গোয়াতে গিয়ে আপনি পর্তুগিজদের গির্জা দেখেননি? ইহুদিদের সিনাগগ? প্যারিসে গিয়ে নতরদাম গির্জা? লানডানের ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি? তাহলে হিন্দুদের মন্দির এবং দেবদেবীদের উপরেই আপনার এই বিশেষ বিদ্বেষের বা তাচ্ছিল্যের কারণ কি? আর বিদ্বেষ এবং তাচ্ছিল্যই যদি থাকবে তাহলে দেবপ্রয়াগেই বা এতদিন কি করছিলেন? হৃষীকেশে? আপনি একটি প্যারাডক্স।

হাসি-হাসি মুখে যদিও বলল চন্দ্রবদনী কথাগুলি, কিন্তু চারণ বুঝতে পারল যে কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ অবশ্যই জড়িত ছিল।

চারণ হেসে ব্যাপারটাকে লঘু করে বলল, বিদ্বেষ বলব না, বলা উচিত উদাসীনতা। এ বিষয়ে পরে কখনও বিশদ আলোচনা করা যাবে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা দিয়েই আপনাকে আমার বক্তব্য বোঝাতে পারব আশা করি। তবে এখন কোটিশ্বর শিব-এর মন্দিরের কথাই বলুন শুনি।

রুদ্রপ্রয়াগ শহর ছাড়িয়ে, যদি একে শহর আদৌ বলা চলে, চোপড়া বলে একটা জায়গার পথ ধরে মিনিট পনেরোও হাঁটিতে হবে না। তারপর অলকানন্দার পাড় ধরে অনেকখানি নীচে নামতে হবে নদীর দিকে।

তারপর?

কোনও জনমানব নেই। শুধুই জলের শব্দ। পাখির ডাক। জলের উপরে রোদ পড়ে ভিবজোর এর খেলা। সেখানেই সেই অনেক পুরনো শিবমন্দির। পাহাড়ের গায়ের গুহার মধ্যে অগণ্য শিবলিঙ্গ। কেউ তৈরি করেনি। মানে, কোনও মানুষে। প্রকৃতিই নিজে হাতে গড়েছেন। প্রত্যেকটি শিবলিঙ্গর রং আলাদা আলাদা। অলকানন্দার জল সমস্তক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করে ভিজিয়ে দিচ্ছে সেই শিবলিঙ্গগুলিকে। সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে চব্বিশঘণ্টা প্রদীপ জ্বলছে। সেই প্রদীপ শিখার আলোতেই দর্শন করতে হয়। রুদ্রপ্রয়াগের মানুষদের কাছে এই মন্দির অত্যন্তই পবিত্র। সবসময়েই খালি পায়েই ঢুকতে হয় সেখানে।

চারণ চুপ করে শুনল চন্দ্রবদনীর কথা।

কথা বলতে বলতে ওরা পাথরে-বাঁধানো আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে বেশ অনেকটা উপরে চলে এসেছে। পেছন ফিরে এবং বাঁদিকে চেয়ে দেখলে অলকানন্দার রূপ যেন ক্রমশই আরও খুলছে বলে মনে হয়। দূরত্ব সবসময়েই সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং হয়তো রহস্যময়তাও ধার দেয়, মানুষ এবং প্রকৃতিকেও।

ভাবছিল, চারণ।

চারণ বলল, রুদ্রপ্রয়াগবাসীরা কোটিশ্বরের গুহার অগণ্য শিবলিঙ্গদের পুজো করেন এমন ভক্তিভরে দেবতাজ্ঞানে, আর যে মানুষ-দেবতাটি রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতাবাঘটিকে মেরে, তাঁদের বাঁচিয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে, তাঁকে কি একেবারেই ভুলে গেছেন এখানের বাসিন্দারা? তখন তো অন্য কোনও দেবতাই বাঁচাতে পারেননি সেই বাঘের পেটে যাওয়া প্রায় দেড়শ জন হতভাগ্য মানুষকে।

আদৌ নয়।

চন্দ্রবদনী বলল।

তারপর বলল, রুদ্রপ্রয়াগের মানুষেরা অকৃতজ্ঞ নয়। সেই চিতাবাঘকে জিম করবেট সাহেব মেরেছিলেন "গুলাবরায় চট্টির" কাছেই, সেই বাঘেরই নখরাঘাতের চিহ্নবাহী "পণ্ডিত"-এর বাড়ির অদূরের একটি আমগাছে, রাতে বসে। সেদিন দুখের রাত পোহাল, নতুন দিন এল, স্বস্তির দিন, সুখের দিন। সে দিনটি ছিল দোসরা মে। ঊনিশশ ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দ। তারপরের বছর থেকে প্রতিবছরই দোসরা মে তারিখে মানুষখেকো যেখানে মারা পড়েছিল সেখানে এক মেলা বসে। তার নামই করবেট মেলা। সেই মেলাতে, রুদ্রপ্রয়াগের চিতাবাঘ-এর হাতে নিহত হওয়া প্রতিটি নারী ও পুরুষের উত্তরসূরীরা প্রতিবছর যোগ দিতে আসেন দূরদূরান্ত থেকে। তা তারা এখন যেখানেই

থাকুক না কেন ! পুরনো দিনের মানুষদের কাছে তো বটেই এবং তাঁদের মুখে গল্প-শোনা মাঝবয়সীদের কাছেও জিম করবেট সাহেবও তো এক দেবতাই। কুমায়ুঁ ও গাড়োয়াল কখনওই ভুলবে না তাঁকে।

চারণ বলল, বাঃ অনেক উঁচুতে উঠে এসেছি তো ! দাঁড়ান, দাঁড়ান ! একটু। পেছন ফিরে একটু দেখি ভাল করে।

দেখুন !

বলে, চন্দ্রবদনী মুখ না-ফিরিয়েই দাঁড়িয়ে রইল। গ্রীবা একটু ডানদিকে হেলানো। কয়েকটি অলক আলতো হাওয়ায় ওড়াউড়ি করছে। তার গায়ের গন্ধ, চুলের গন্ধ, চারধারের গাছ-গাছালির গন্ধ, ওক, হর্সচেস্টনাট, তোন, তাড় আরও কত নাম না জানা গাছের গন্ধর সঙ্গে কলুষহীন দেবভূমির এই একশভাগ পবিত্র পরিবেশের মধ্যে ফলসা-রঙা শাড়ি-পরা চন্দ্রবদনীর দিকে তাকিয়ে চারণের হঠাৎই তুলির কথা মনে হল। তুলি দাঁড়িয়ে আছে বাঘমুণ্ডার হাতিগির্জা পাহাড়ের পথের একটা সমকৌণিক বাঁকে। তার পরনেও ফলসা-রঙা শাড়ি ছিল।

তুলি বলেছিল, চ্যাটার্জি সাহেব, ওই যে দেখুন। ওই যে বড় বড় কালো পাথরগুলো দেখছেন, ওইখানেই হাতিরা সব প্রার্থনা করতে আসে। তাইতো এই পাহাড়ের নাম হাতিগির্জা।

মনকে রুদ্রপ্রয়াগে ফিরিয়ে এনে চারণ বলল, আপনি পেছনে চেয়ে দেখবেন না একবার ?

না।

কেন ?

আমি পেছনে তাকাই না কখনও। কী জীবনে, কী পথে !

কেন ? অমন ধনুকভাঙা পণ কেন ?

পেছনে তাকালেই মানুষ পেছিয়ে পড়ে। সে কী কী অর্জন করেছে বা হারিয়েছে সেই সব ভাবনাতে মেদুর হয়ে যায় তার স্মৃতি। সেই মুহূর্তে, সেই দিনে তার আর নতুন কিছু করা হয় না। সামনে এগোনো হয় না। তাই...

বাঃ। মান্য যুক্তি। অবশ্যই !

চারণ বলল।

ও দেখছিল, তুলির চেয়ে চন্দ্রবদনী অনেক লম্বা। শারীরিক উচ্চতাতে তো বটেই, হয়তো মানসিক উচ্চতাতেও। সে যে এই তুষারাবৃত হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গ চন্দ্রবদনী ! তার মতন হবার সাধ্য আছে আর কার ? সেই মুহূর্তে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে নীচের আশ্চর্য সুন্দর নীলচে-সবজে-সাদা অলকানন্দার জলরাশি আর তার বিচিত্র রঙা সব নুড়িময়, বালুময় চরের দিকে চেয়ে চারণের মন তুলির স্মৃতি এবং চন্দ্রবদনীর উপস্থিতিতে আপ্লুত হয়ে উঠল।

নারীরা পুরুষের জীবনের কত বড় শূন্যতা যে পূরণ করেন, তা যদি সব নারীই জানতেন ! চন্দ্রবদনীও কি জানে !

ভাবছিল, চারণ।

এখানে বসি ?

বলেই, একটি বড় সাদা পাথরের চাঁঙড় দেখাল চন্দ্রবদনীকে চারণ।

যেখানে আপনার খুশি। তবে এই পাথরটার উপরেই একটা মস্ত বড় বাঘ বসে থাকত জ্যোৎস্না রাতে, গরমের দিনে, আমি যখন ছোট ছিলাম। আমাদের শোওয়ার ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যেত। মা দেখাতেন, মনে আছে।

তারপর বলল, বসলেনই যখন, তখন আমিও আপনার পাশে বসি।

না, না। পাশে নয়, পাশে নয়।

চারণ বলে উঠল।

কেন ? পাশ কি কারওকে ইজারা দিয়ে রেখেছেন ?

না, তা নয়। পাশে থাকলে ভাল করে দেখা যায় না যে কারওকেই।

অদ্ভুত কথা। স্বামী-স্ত্রী, রাধা-কৃষ্ণ, চিরদিন তো পাশাপাশিই থেকেছেন।

তা থেকেছেন। পাশাপাশি থাকলে অন্যদের পক্ষে তাদের দেখতে সুবিধা অবশ্যই হয়, কিন্তু তাদের দুজনের একে অপরকে দেখতে সুবিধা হয় কি আদৌ ?

চন্দ্রবদনী হেসে ফেলল।

বলল, সত্যিই তো ! কথাটা তো কখনও ভেবে দেখিনি। আপনার দেখার চোখ খুব ভাল।

আমার চোখের দেখাও ভাল।

আপনি তো চুকোরের মতন বললেন।

চুকোর ?

হ্যাঁ। আমার ভাই।

কি বলে সে ?

সে বলে, দ্যাখ দিদি। আমাকে তুই হেলা করিস না। একদিন দেখতে পাবি এই চুকোর শর্মাই গাড়োয়ালের সর্বকালীন সেরা লেখক বলে সারা ভারতবর্ষে গণ্য হবে।

ও লেখে বুঝি ?

কী করে না ও। গদ্য লেখে। গান গায়। ছবি আঁকে। বাঁশি বাজায়। চুকোর আমাদের গ্রামেরই শুধু নয়, এই পুরো তল্লাটের সবচেয়ে এলিজিবল ব্যাচেলর।

তা, তার সঙ্গে দেখার চোখ আর চোখের দেখার কি সম্পর্ক ?

চারণ জিজ্ঞেস করল।

না, এ কথা বলার কারণ, চুকোরের হাতের লেখা অসম্ভব খারাপ। তা নিয়ে চিরদিনই সকলেরই কাছেই ও গালমন্দ খেয়ে এসেছে। অন্যদের কিছু বলতে পারে না। যা বলার তা ওর একমাত্র দিদিকেই বলে।

কি বলে ?

বলে, হাতের লেখা কার কেমন সেটা টোটালি ইরেলিভেন্ট দিদি। কার লেখার হাত কেমন সেটাই আসল কথা। কত মূর্খ আমি দেখেছি এযাবৎ যাদের হাতের লেখা মুক্তোর মতন। আরও কত মূর্খ দেখেছি, যাদের ব্যাকরণের জ্ঞানও অসীম। যাদের হাতের লেখা ভাল তারা ইচ্ছে করলেই ভাল পোস্টার বা সাইনবোর্ড লিখিয়ে হতে পারে। আর যাদের ব্যাকরণের জ্ঞান গভীর তারাও ইচ্ছে করলে শ্রীনগরের বা নিদেনপক্ষে যোশীমঠের স্কুলের ব্যাকরণের মাস্টারমশায় হতে পারে। তাদের সঙ্গে একজন লেখকের তফাৎ আছে। লেখক যে, যেমন আমি, সে চেষ্টা করলে তার হাতের লেখা ভালও করে ফেলতে পারে কিন্তু পোস্টার বা সাইন-বোর্ড লিখিয়ে বা বৈয়াকরণ কস্মিনকালেও ইচ্ছে করলেই লেখক হয়ে উঠতে পারে না। লেখক হতে হলে উপরওয়ালার আশীর্বাদ লাগে। কেউ কেউ লেখক হয়েই জন্মায় রে দিদি আমার মতন। চেষ্টা করে ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, রাজনৈতিক নেতা হওয়া যায়, কিন্তু চেষ্টা করে লেখক বা কবি কখনওই হওয়া যায় না।

ঠিকই তো বলেছে চুকোর।

চারণ বলল।

তারপরই বলল, চুকোর তো একরকমের পাখি, না ? চকোরের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে কি ?

চন্দ্রবদনী হেসে ফেলল বলল, আপনি দেখছি পাটনের চেয়েও ছেলেমানুষ। চকোর-চকোরী তো জলের পাখি। হাঁস, একরকমের। আর আপনার চুকোর একরকমের Patridge।

Patridge মানে ?

সমতলভূমির তিতিরও Patridge Family-রই। আমাদের চুকোর সমতলের কালি তিত্তির, রঙ্গিলা তিত্তিরেরই মতন। ওই প্রজাতিরই পাখি।

দেখতে কেমন ?

কী বলব ! ছাই-ছাই- গোলাপি-গোলাপি- খয়েরি-খয়েরি। লেজের শেষদিকটা চেস্টনাট রঙের। মাথার দুপাশে কালো দাগ আছে। দাগটা দুপাশেই ঘাড় অবধি নেমে গেছে। পেটের ও পিঠের

পাশও কালো কালো স্ট্রাইপ। মাথার দুপাশ ও ঘাড় বেয়ে যে কালো দাগ নেমেছে তা বুকের কাছে পৌঁছে জোড় লেগে যাওয়াতে ব্রেসলেট-এর মতন দেখায়।

বাঃ।

এই Patridge, হিমালয়ের এই সব অঞ্চলেই পাওয়া যায়। কুমায়ুনেও। এর নামের উচ্চারণ কিন্তু চুকোর নয়, চুকার। ইংরেজি নামও তাই। "Chukar"

ভাইয়ের নাম চুকার রাখলেন কে?

আমিই। বাবা ওর নাম রেখেছিলেন বদ্রীপ্রসাদ। মানে, বদ্রীনাথজির প্রসাদ আর কী। মা রেখেছিলেন আমার নাম, তাই ভাইয়ের নামের ব্যাপারটা বাবাকেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমিই স্কুল-লিভিং-সার্টিফিকেট পরীক্ষার আগে ওর নাম বদলে চুকার করে দিই। ওর ভীষণই আপত্তি ছিল বাবার দেওয়া নামে। বাবা জানতে পেরে রাগ করাতে, ও বলেছিল, বাবার নাম থোড়াই বদলেছি। বদলেছি তো নিজেরই নাম।

বাবা ওর কথা শুনে হেসে ফেলেছিলেন।

চুকার বলত, বদ্রীনাথজির ছায়াতেই তো থাকি আমরা। নামের মধ্যেও তাঁকে না জড়ালে কি চলে না!

তা এত নাম থাকতে চুকারই বা কেন? পাখির নামে নাম কেন?

চারণ বলল।

চন্দ্রবদনী হেসে বলল, কারণ একটা ছিল অবশ্য। ভাই যখন ছোট ছিল ও ডাকত ঠিক মদ্দা চুকার-এর মতন।

মানে?

অবাক হয়ে বলল চারণ।

মানে, চুকার যখন ডাকে, আপনাদের সমতলের তিতিরেরই মতন।

তিতিরের ডাক কেমন?

আমি শুনিনি কখনও।

আঃ আপনাদের নিয়ে পারা যায় না। কলকাতার ইট-কংক্রিটের কীট আপনারা। এইসব পাহাড়ের নীচে নামলেই বটেই, বিহারে, উত্তরপ্রদেশে মধ্যপ্রদেশে, তিতিরে তিতিরে ছয়লাপ। তিতির ডাকে চিঁহা চিঁহা চিঁহা চিঁহা চিঁহা চিঁহা করে। বাবা যখন দেরাদুনে পোস্টেড ছিলেন তখন আমাদের বাংলোর হাতার মধ্যেই যে কত তিতির ছিল কী বলব। সকাল সন্ধেতে তাদের ডাকে মাথা গরম হয়ে যেত। একসঙ্গে এবং খুব ঘনঘন সমান গতিতে অনেকবার ডাকে তিতিরেরই মতন চুকারও। মদ্দা চুকার তো ডাকে বার কুড়ি, একবার ডাকতে শুরু করলে, ভাইও ডাকত দিদি! দিদি! দিদি! দিদি! দিদি! অথবা, মা! মা! মা! মা! মা! মা!

চারণ হেসে ফেলে বলল, তাই?

হ্যাঁ। তাই চুকার।

চন্দ্রবদনী বলল।

তারপরেই উদাস হয়ে গিয়ে বলল, কী যে হবে ভাইটার আমার। ভীষণ জেদি, একরোখা অথচ ভাবালু, আদর্শপরায়ণ। ওর মতন ছেলের এই সময়ে, এই দেশে বেঁচে থাকাই মুশকিল।

চারণ বলল, ওর মতন অনেক ছেলেরই তো দরকার এই মুহূর্তে আমাদের দেশে।

চন্দ্রবদনী উদাস হয়ে গেল। তারপরে চুপ করে চেয়ে রইল নীচের অলকানন্দার দিকে।

ওর শাড়ি সরে গেছিল বুকের পাশ থেকে। চারণের অসভ্য চোখ দেখল, বেগুনি ব্লাউজে-ঢাকা বগলতলি ঘামে ভিজে গেছে। সেদিকে হঠাৎই চোখের ঝলক পড়তেই হঠাৎই এক তীব্র কামভাবে জর্জরিত হল চারণ। পরক্ষণেই লজ্জা পেল। পুরুষমাত্রই কি অসভ্য? নিজেই নিজেকে নিরুচ্চারে বকে দিল খুব করে। বলল, ও ও ও দুষ্টু ছেলে? একী অসভ্যতা! ভীষণ শাস্তি দেব। নিজেকে বকল, যেমন করে চারণের মা ওকে বকতেন। ভাবল, দুমাস সাধুসঙ্গে থেকে উন্নতির এই রকম!

এক সময় চন্দ্রবদনী বলল, চলুন এবারে ওঠা যাক।

চারণ বলল, চলুন।

বেশ অনেকটা উঠে এসেছে ওরা। এখন উপরে দেখা যাচ্ছে চন্দ্রবদনীদের গ্রাম, নানা গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে। রোদ-ঝলমল। সবে ধান উঠেছে, থাকে-থাকে Teracing-করা ক্ষেতে ক্ষেতে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে খড়ের গাদা। এই পাহাড়ি খড়ের গাদার রকম সমতলের গাদার মতন নয়। পাহাড়ি ছাগল ডাকছে এদিক-ওদিক থেকে। এখানের গরুর গলার ঘণ্টার আওয়াজ অন্যরকম। পাখ-পাখালিও সমতলের মতন নয়। কোথায় কোন অদৃশ্য জায়গাতে বসে কোনও রাখাল ছেলে ভেড়ার পালের ওপরে নজর রাখতে রাখতে বাঁশি বাজাচ্ছে গাড়োয়ালি গানের সুরে। ভারী ভাল লাগছে চারণের।

নীচ দিয়ে যে পথ চলে গেছে, একটি কেদারনাথের দিকে আর অন্যটি বদ্রীবিশালের দিকে, অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর ধারে ধারে, সেই সব পথ বেয়ে প্রতি বছর যে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী "জয় কেদার" "জয় বদ্রীবিশাল" ধ্বনি দিতে দিতে চলে যান তাঁরা জানেনও না যে, সেই সব পথের দুপাশেই পর্বতগাত্রের উপরে উপরে তাঁদের চোখের আড়ালে এরকম অনেকই গ্রাম আছে। জনপদ। এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে যাবার পায়ে-চলা পথ আছে পর্বতের মাথায় মাথায়, উপত্যকায়, মালভূমিতে, উতরাই ও চড়াইয়ে, অমিতাভর বর্ণনানুযায়ী, সরগুজা, মাক্কি, গেঁহু, জ, সাট্টি, ঝাঙ্গোরা, নারাঙ্গি, মালটা, চাকোতরা আর যোশিমারি আলুর ক্ষেত পেরিয়ে এবং সিলভার ওক, ধুপি, ওয়ালনাট, নানারকম পাইন, আরুপাটে ইত্যাদি আরও কত গাছগাছালির ছায়ায় ছায়ায়। এইসব গ্রামে গ্রামে সুগন্ধি বনপথে আর রোদ ও চাঁদের আশীর্বাদধন্য উঠোনে উঠোনে যুবক-যুবতী ভালবাসে একে অপরকে, বিয়ে করে, সংসার করে। তারপর একদিন তারাও বুড়ো হয়ে যায়। বহু-বর্ণ লেপের জামা আর পেতলের নথ আর দুল পরে জ্যাবজ্যাবে করে সিঁদুর মেখে বুড়ি পিঠ দিয়ে বসে নতুন-আসা নাতির জন্যে গাঢ় গোলাপি-রঙা উলের গাছি উঠোনে এলিয়ে সোয়েটার বোনে। আর বুড়ো দুহাতে তার হৃত-ক্ষমতার শেষ প্রতিভূ কালো থেলো-হুঁকোটি ধরে গুবুক-গাবুক শব্দ করে তার ক্ষেতের পাথরের দেওয়ালে রোদে পিঠ দিয়ে বসে তামাক খায়।

ভারী খুশি, ভারী আনন্দ এই আকাশে বাতাসে। এই সকালের রোদে। বড়ই ভাল লাগছে এখন চারণের। হয়তো চন্দ্রবদনীর সঙ্গও ভাললাগার একটা বড় কারণ। অনেক নীচ দিয়ে বয়ে-যাওয়া অলকানন্দা এবং মন্দাকিনীর উপরে রামধনু-তোলা চোখ-ধাঁধানো সূর্যালোকের দিকে তাকিয়ে ও ভাবছিল, ভাগ্যিস এসেছিল চন্দ্রবদনীর সঙ্গে। নইলে গাড়োয়ালের বুকের কোরকের মধ্যের এই, প্রাণের প্রাণ যে অজানাই থাকত!

এমন সময়ে পেছনে কাদের পায়ের শব্দ ও গলার স্বর শোনা গেল। পেছন ফিরে দেখল চারণ যে পাঁচ-ছজন নারী-পুরুষ উঠে আসছে উপরে, পাথরের পাকদণ্ডী বেয়ে রুদ্রপ্রয়াগ বাজার থেকে। তাদের মধ্যে চন্দ্রবদনীর সেই দুজন লোকও ছিল।

গাড়োয়ালিতে ওদের সঙ্গে কী সব সংক্ষিপ্ত দু-একটা কথা বলল চন্দ্রবদনী, কোমল আদেশের সুরে। তারা চারণদের ছাড়িয়ে টগবগিয়ে উপরে চলে গেল দেখতে-দেখতে।

চন্দ্রবদনী বলল, বসবেন না কি এখানে একটু। বসতে পারেন। আমার তাড়া নেই কোনও। আমার বড় পিসি এসেছেন চামৌলি থেকে। তিনিই আপনার জন্যে রান্না করছেন। ঠাকুমা নেই দাদু কিন্তু আছেন আমার। দাদুর বয়স তিরানব্বই। কিন্তু আপনার চেয়েও ফিট। গ্রাম থেকে বাজারে আসেন সপ্তাহে তিন-চারদিন। টানটান মেরুদণ্ড। ইংরেজ সাহেবদের মতন অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলেন। সপ্তাহে একবার শ্রীনগরেও যান বইয়ের দোকানে এবং লাইব্রেরিতে।

বলেন কি? নাঃ। দেখি, আপনাদের গ্রামে গিয়ে কেমন লাগে। পছন্দ হলে, বাকি জীবন ভাবছি এখানেই থেকে যাব।

তারপরই বলল, আপত্তি আছে?

আমি কে আপত্তি করার? জীবন আপনার, ইচ্ছে আপনার, সময় আপনার, মন যা চায় তাই

করবেন। তবে বড় শহুরেদের এই ভাবনাটাও একটা বিলাস। কল্পনার সাম্রাজ্যে তো কারও অধিকারই অন্য কেউ খর্ব করতে পারে না।

চারণ বলল। এখানে বসি ?

ওরা দুজনেই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। যতই রোদের তাপ বাড়ছে ততই আরাম লাগছে। পেছন থেকে ঘাড়ে রোদ এসে পড়াতে আরামে চোখ বুঁজে আসছে চারণের। প্রায় সন্ধে রাত থেকে সকাল অবধি ঘুমিয়েও যেন ঘুমের আশ মেটেনি। কোন মানুষের মধ্যে কত ঘুম যে জমে থাকে সে তা নিজেও জানে না। আর কষে দম-দেওয়া টেনশন-এর স্প্রিং কখন কোথায় যে একেবারে গা-এলিয়ে দিয়ে এলো-খোঁপার মতন unwinding process শুরু করবে তাও আগে থাকতে জানা পর্যন্ত যায় না। এই মনুষ্য-শরীর বড়ই দুর্জ্ঞেয়। কী নারীর শরীর, কী পুরুষের ! এ এক বিচিত্র ঘড়ি। কোনওটা ব্যাটারিতে চলে, কোনটা বা স্প্রিং-এর। কোনওটাতে ক্লকওয়াইজ দম দিতে হয়, কোনওটাতে অ্যান্টি-ক্লক-ওয়াইজ। অথচ আশ্চর্য ! ইংরেজি শব্দটাই হচ্ছে ক্লকওয়াইজ। যে ব্যাটারিতে চলে সেই ব্যাটারি যে কখন ক্ষয়ে আসে তাও ছাই বোঝা যায় না আগে থাকতে। রিমোট-কন্ট্রোলে কারও অদৃশ্য আঙুলের ছোঁয়াতে চলে শরীরী-ঘড়ি। অন্তত চারণের শরীরের ঘড়ি। কখন যে সে আপন খেয়ালে ফাস্ট হয়ে যায় আর আপন খেয়ালেই স্লো, তা আগে থাকতে বোঝা পর্যন্ত যায় না। কে জানে।

চন্দ্রবদনীর শরীরের ঘড়ি কেমন চলে ! কিসে চলে ?

ভাবছিল চারণ।

নিজের মনকে তাও বোঝে কিন্তু শরীরকে যে বোঝেনি কোনওদিনই। সে যে বড়ই আনপ্রেডিকটেবল। অবুঝ তার চাওয়া, অসহায় তো বটেই।

আশ্চর্য ! এখানে বসে বসেই চন্দ্রবদনীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওর তুলির কথা মনে হল। আর মনে হল, নিজের প্রথম যৌবনে লেখা দুছত্র কবিতার কথাও।

"বার বার চেয়োনাকো কারও পানে।
প্রতিটি চাহনি জেনো
অজানিতে আসক্তি আনে।"

চন্দ্রবদনীর প্রতি আসক্তি অবশ্য জন্মে গেছিল প্রথমবার হৃষীকেশ-এ ওর নাম উচ্চারিত হতেই। কিন্তু হিন্দুদের এই দেবভূমির পবিত্র গিরিশৃঙ্গর নামে যার নাম, তার দিকে চেয়েও চারণের মনে এমন কামভাব জাগছে কেন ? চারণের শিক্ষা, রুচি, সাফল্য, মান, যশ সবই কি ভেক ? মিথ্যা ? তার শরীরের উপরেই যদি তার নিজের দখল নাও থাকে, মনের উপরে তো থাকবে দখল অন্তত। নইলে, কিসের শিক্ষার গুমোর ওর ?

ভারী লজ্জা হল চারণের। ঘৃণাও হল খুব নিজের উপরে। তার সঙ্গে জানোয়ারের তফাৎ কোথায় ? পুং-লিঙ্গর সব প্রাণীই কি একইরকম মানসিকতার ? তার শরীরী ক্ষুধায় ? মানুষও কি ব্যতিক্রম নয় ?

নিজেকে যে জানার অনেকেই বাকি সে কথাই আবার নতুন করে মনে হল।

তুলির ব্যাপারে ওর ভূমিকাটা passive ছিল। Active এবং Aggressive ভূমিকা ছিল তুলিরই। ইংরেজিতে যাকে বলে "অ্যাকুইসেন্স", চারণ তাই দিয়েছিল। মৌন-সম্মতি। কিন্তু চন্দ্রবদনী তার শরীর এবং মন দুইয়েরই উপরে এমন মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে এইটুকু সময়ের মধ্যেই যে, তার এই উদাসী হওয়ার উচ্চাশায় এই উদাসী হাওয়ার পথে বেরিয়ে এতদূরে আসা এবং সাধুসঙ্গে এতগুলো দিন কাটানো বৃথাই হল মনে হচ্ছে। ইংরেজিতে যাকে বলে Back to square one, ওর অবস্থা একেবারেই সেরকম।

নিজের উপরে এক গভীর অনুকম্পা জন্মাল চারণের। ছিঃ। ছিঃ। বলল, নিজেকে।

কতক্ষণ সময় যে এই আত্মবিশ্লেষণে কেটে গেল, কে জানে। ততক্ষণ চন্দ্রবদনী যে কি ভাবছিল তাই বা কে জানে। মাঝে মাঝে সেও পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল চারণের দিকে। চোরা-চাউনি নয়।

চন্দ্রবদনীর স্বভাব-চরিত্রের অন্দরবাহিরে চৌর্যবৃত্তির বা বক্রতার আভাস পর্যন্ত নেই কোনও। এমন পর্বতশিখরের মতন ঋজু স্বভাবের নারী চারণ আগে দেখেনি।

একসময়ে স্বগতোক্তিরই মতন চন্দ্রবদনী বলল, আমাদের বাড়িতে গিয়ে আপনি ধন্দে পড়বেন কিন্তু। ধন্দই বলব শব্দটিকে। আগেই বলে রাখা ভাল।

কেন ? কিসের ধন্দ ?

মা তো নেই আমার। মা থাকলে আপনার কোনও অসুবিধেই হত না। মা তো শুধুমাত্র বাঙালিই ছিলেন না ! আমার মায়ের মতন Effiminate Feminine আমি আর দেখিনি। শিক্ষিতা বাঙালিনীর আদর্শ প্রতিমূর্তি ছিলেন। শিক্ষায়, রুচিতে, সংস্কৃতিতে, আচারে ব্যবহারে, চলায়-বলায়। আমি ছিটেফোঁটাও গুণ পাইনি আমার মায়ের। রূপও পাইনি। মা ছিলেন ব্রাহ্ম। বাবা হিন্দু। ঠার্কুদা বৌদ্ধ। আবার এমনি বৌদ্ধ নন। তিব্বতী বৌদ্ধ।

তারপর বলল, আমার মায়ের মতো অ্যাডভেঞ্চারাস বাঙালি মহিলাও আমি কমই দেখেছি। মানে, ভালবাসার ব্যাপারে। নইলে শান্তিনিকেতনে মানুষ হয়ে এমন এক পরিবারে, এই উত্তুঙ্গ গিরিশিখরে জীবন কাটাতে একটুও দ্বিধা কি করতেন না ?

আপনার মা যে অমন সাহস করেছিলেন তার পেছনে আপনার বাবার ভূমিকাও নিশ্চয়ই অনেকখানি ছিল। যেমন-তেমন পুরুষের জন্যে কোনও নারীই অমন ঝুঁকি নিতে পারতেন না।

চারণ বলল।

তারপর বলল, বৌদ্ধদের মধ্যে হীনযান, মহাযান এইসব বিভাগের কথাই জানতাম। তিব্বতী বৌদ্ধরা কি অন্য কোনওরকম ?

হাসল, চন্দ্রবদনী।

বলল, তা নয়। সে সব তো আছেই, থাকেই। তিব্বতের দালাই লামাকে যাঁরা মানেন, তাঁরাই তিব্বতী বৌদ্ধ। তাঁদের সঙ্গে জাপানের বৌদ্ধ ও ভারতের সমতলের বা দার্জিলিং বা সিকিম বা ভুটানের বৌদ্ধদের সঙ্গে কিছু তফাৎ আছে।

তারপরে বলল, আপনি Zen ধর্মের নাম শুনেছেন ?

অবশ্যই।

তিব্বতী বৌদ্ধদের সঙ্গে Zen-এর কিছু কিছু মিল আছে। আপনার যদি ইন্টারেস্ট থাকে, তাহলে ঠাকুর্দা আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন। উনি তিব্বতে ছিলেন বছর পাঁচেক, চাইনিজ অ্যাগ্রেশানের আগে পর্যন্ত। দারুণ ইন্টারেস্টিং মানুষ।

কী করে বোঝাবেন ওসব আমাকে ? মানে, কোন ভাষায় ?

বাঃরে ! আপনাকে বললাম না যে, ঠাকুর্দা ইংরেজদের মতন অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলেন। জিম করবেট সাহেবের বন্ধু ছিলেন। সারা পৃথিবীতেই যে কত তাঁর বন্ধু ছিলেন। আমরা রুদ্রপ্রয়াগে থাকি বলে আমাদের হেয় করবেন না মশাই। গেঁয়োও ভাববেন না যেন।

ছিঃ ! আমি কি ইডিয়ট ?

চারণ বলল।

তারপর চন্দ্রবদনীকে বলল, দেখুন ! আপনাকে দেখেই আপনার পরিবার সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করা যায়। আমি বুদ্ধু তো নই ! বৌদ্ধ না হতে পারি !

ঠাকুর্দার কাছে শুনেছি, তিব্বতী বৌদ্ধদের মধ্যেও নানারকম মত-পার্থক্য আছে, মানে বিভিন্ন Relegious schools, যেমন সব ধর্মের মধ্যেই থাকে।

যেমন ?

যেমন, লঙ্গচেম্পা, নাগার্জুনা, শান্তিদেভা, অতীশ...

অতীশ ? মানে অতীশ দীপঙ্করের মতাবলম্বী ?

ঠিক তাই। আরও আছে, সং খাপা। আপনার ইন্টারেস্ট থাকলে ঠার্কুদা সব বুঝিয়ে দেবেন।

আপনার মা কি গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন ?

চারণ জিজ্ঞেস করল।

ব্রাহ্মধর্মও তো একটি আলাদা ধর্ম। তবে সবচেয়ে খোলামেলা, উদার, Minimum Rituals-এর ধর্ম। হিন্দুধর্মের মতন এতরকম Rituals সম্ভবত আর কোনও ধর্মেই নেই। তাছাড়া, আপনার তো "গোঁড়া" শব্দটার মানে জানার কথা। গোঁড়ামি, কোনও ধর্মেরই মান বাড়ায় না। গোঁড়ামির বীজ সুপ্ত থাকে অশিক্ষারই মধ্যে, কূপমণ্ডুকতার মধ্যে। হিন্দুদের মধ্যেও তো গোঁড়া হিন্দু আজকাল নেইই বলতে গেলে।

তারপর বলল, একটা সময় পর্যন্ত বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা বড়মানুষ ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই তো হয় ব্রাহ্ম নয় ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন।

তাই?

যেমন, রামমোহন রায়, ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা; চিত্তরঞ্জন দাস, সুকুমার রায়, ড. বিধান রায়, আরও কত নাম বলব।

তা ঠিক। তবে ব্রাহ্মদের মধ্যে মেয়েদের তুলনায় ইদানীংকালের ছেলেরা বোধহয় একটু নিষ্প্রভ। তাই না? অধিকাংশ মেয়েরাই তো বিয়ে করে দেখি অন্য ধর্মাবলম্বী ছেলেদের।

আজকাল ধর্ম মানেই বা কজন? নিজস্বার্থ ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম কি আর আদৌ আছে?

তা যা বলেছেন।

তারপর বলল,

হিন্দুধর্মের মতন এমন ভেদবোধ অন্য কোনও ধর্মেই নেই। বিরাদরী ব্যাপারটাই নেই হিন্দুধর্মে। যেমন আছে ইসলাম-এ।

তা আছে। তবে ওই বিরাদরী, ইসলাম-এর Virtue যেমন, তেমন আবার Vice-ও। আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে, ইরানের খোমেইনি বা দিল্লির শাহী ইমামের ভাবভঙ্গি দেখে।

চন্দ্রবদনী বলল।

চারণ বলল, আস্তে বলুন। এই জন্যেই হয়তো আপনাকে কোতল করার ফতোয়া জারি হতে পারে। কূপমণ্ডুকতার একটা সীমা সব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই থাকা দরকার বলে মনে হয় আমার।

ঠিকই তাই। হিন্দুধর্ম একটি Confused Mass-এর সংজ্ঞা যেন। ইসলাম-এর বিরাদরীর Antithesis! সাধারণে এবং অল্পশিক্ষিতরা এই Rituals-এর গোলোকধাঁধার মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে মরে। বৈতরণী পেরুনো আর হয় না। পরস্পরবিরোধী মত ও পথে হেঁটে মরে। হিন্দুধর্মকে আজকাল আর কোনও "Binding Force"-এর মধ্যেই গণ্য করা যায় না। কিন্তু হিন্দুধর্মের এই সব জাফরি ভেঙেই তো ব্রাহ্মধর্মের জন্ম।

চন্দ্রবদনী বলল, হিন্দুধর্মের মধ্যে জাতপাতটা খারাপ। খুবই খারাপ। কিন্তু এই ধর্মাবলম্বীরা অন্য সব ধর্ম সম্বন্ধে যতখানি ঔদার্য পোষণ করে ততখানি অন্য কম ধর্মাবলম্বীই করেন।

চারণ বলল, হিন্দুদের ব্রাহ্মরা কি একটু ছোট চোখে দেখেন না?

কেউ কেউ হয়তো দেখেন। তাঁরা সৎ ব্রাহ্ম নন। উদারও নন। আবার যে সব হিন্দু ব্রাহ্মদের ছোট চোখে দেখেন তাঁরাও সৎ হিন্দু নন। কোনও ধর্মই তো কোনও গন্তব্য নয়। সব ধর্মই এক একটি Means মাত্র।

ঠিকই বলেছেন।

চারণ বলল।

তারপর বলল, তাঁর জামাই নগেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি কিছুদিন আগে পড়েছিলাম 'দেশ' পত্রিকাতে। রবীন্দ্রনাথ, হিন্দুধর্ম আর ব্রাহ্মধর্মের সম্পর্কে কয়েকটি খুব দামি কথা বলেছিলেন সেই চিঠিতে। ঠিকঠাক মনে নেই কিন্তু যতদূর মনে আছে, তা সম্ভবত এইরকম।

কি বলেছিলেন?

চন্দ্রবদনী আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, রবীন্দ্রনাথ কি বলেছিলেন যে "আমরা হিন্দু"?

ঠিক তা বলেননি। তবে অনেকটা তাই। শুনুন আগে।

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

বলুন।

বলেছিলেন, "আমরা হিন্দু। আমাদের কোনও প্রাচীন ইতিহাসের বন্ধন নেই কোন প্রাচীন সমাজের ভিত্তি নেই আমরা হঠাৎ মুহূর্তকালের বুদ্ধুদের মত স্ফীত হয়ে উঠেছি এমন অদ্ভুত দীনতা আমরা প্রচার করতে পারব না। হিন্দুসমাজ যে মৃত পদার্থ নয় তার মধ্যে নবভাবস্রোত শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে পারে, ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্বই তার প্রমাণ। হিন্দু সমাজ যদি মৃত হত তবে ব্রাহ্ম সমাজকে সে প্রসব করতেই পারত না। সেই কথা মনে রেখে ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দু সমাজের নবতর পরিণতি বলে আমরা যেন গৌরব করতে পারি। আমরা হিন্দুসমাজের জীবন থেকেই উদ্ভূত এবং এই পিতৃঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।"

আর ?

চন্দ্রবদনী বলল।

আরও অনেক কথা লিখেছিলেন। পড়ে, খুব ভাল লেগেছিল।

তারপর মুগ্ধস্বরে বলল, জানেন, রবীন্দ্রনাথ পড়লেই বুঝি, তাঁর চিঠিপত্র, শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালা, তাঁর গান শুনলে যে, মানুষ হিসেবে তাঁর তুলনাতে আমরা কত ছোট। কত সামান্য আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি-শুদ্ধি।

তা ঠিক।

কী ভাল রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারেন আপনি! সত্যি! আমার গলাতে যদি বিধাতা একটুও সুর দিতেন।

চন্দ্রবদনী বলল, "একলা গায়কের নহে তো গান।" সকলে গাইলে শুনবে কে? আজকাল যেমন হয়েছে! ক্যাসেটের বিজ্ঞাপন দেখলে তো মনে হয় দেশের যত কাক চিল ব্যাঙ ইঁদুর সকলেই গায়ক হয়ে গেছে। ভাল শ্রোতার ভূমিকা গায়কের ভূমিকার চেয়ে একটুও খাটো নয়। ছিল না কোনওদিনই।

তারপর বলল, আমার তো মনে হয় "রাবীন্দ্রিক"ও একটি ধর্মই। আমার মাও একথা বলতেন। তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মরই মতন ব্রাহ্মধর্মর মধ্যেও "রবীন্দ্রিক" একটি আলাদা বিভাগ। School.

ঠিকই হয়তো বলতেন আপনার মা।

হঠাৎই চন্দ্রবদনী উঠে পড়ে বলল, চলুন, এবারে আমরা উঠি। নইলে, পিসি আবার চিন্তা করবেন। আপনার জন্য ব্রেকফাস্টও করতে চেয়েছিলেন। আমিই নিবৃত্ত করে এসেছি। সেই ক্ষোভটা দুপুর আর রাতের খাওয়াতে পুষিয়ে নেবেন।

তারপর বলল, যারা ভাল খেতে না-পারে, তারা আমার চামৌলির পিসির দুচোখের বিষ। আমার স্বামী এই কারণেই পিসির খুবই প্রিয় ছিল। ওর আকস্মিক মৃত্যুটা আমার যত না বেজেছে আমার ঠাকুর্দা, বাবা ও পিসিকে বেজেছে তার চেয়েও বেশি। মা তো চলে গিয়ে বেঁচেই গেছেন।

আর চুকারের ?

চুকারের কোনও ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখর বোধই নেই। অনেক বছরই হল ও সে সব বিসর্জন দিয়েছে। ও-ও শ্যামানন্দজিরই মতন এক সন্ত। হয়তো রবীন্দ্রনাথেরও মতন। যাঁরা প্রকৃত বড় মাপের মানুষ হন তাঁদের কোনও ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ থাকে না। সুখকে তো বটেই সব দুঃখকেও তাঁরা আত্মস্থ করে নেন। তাঁরা তাঁদের পরিবারের কেউ নন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারওকেই তাঁদের প্রয়োজন হয় না। যে-ব্রততে জীবনযাপন করতে এসেছেন তাঁরা, সেই ব্রততেই জীবন নিবেদিত করেন। আমার ছোট ভাই হলে, কি হয়, চুকারও সেই জাতের মানুষ। ওর প্রকৃতি, Material-ই আলাদা। আমাকে দেখে চুকারের সম্বন্ধে কোনও ধারণাই আপনি করতে পারবেন না। আমি অতি সাধারণ আর ও অসাধারণ।

চলুন, ওকে দেখলে, ওর সঙ্গে আলাপ হলেই বুঝবেন। পাটনের সঙ্গে ওর খুবই বন্ধুত্ব। পাটনও কিন্তু অসাধারণ ছেলে। ওই বয়সী খুব কম ছেলের মধ্যেই অমন গভীরতা দেখেছি।

গভীরতা তো আর বয়স নির্ভর নয়। অনেকে, আমারই মতন, বুড়ো হলেও অগভীরই থাকে।

আবার যখন শাক্যসিংহ সংসার ছেড়েছিলেন তখন তাঁর বয়স কত ছিল ? স্বামী বিবেকানন্দ কতদিন বেঁচেছিলেন ?

তা ঠিক।

চন্দ্রবদনী বলল।

তারপর বলল, তা যেমন ঠিক, বিনয় যেমন গুণ বলে মান্য, অতিবিনয় কিন্তু আদৌ গুণ নয়, দোষ। অতি-বিনয়ী মানুষদের মধ্যে অধিকাংশই কিন্তু দুর্বিনীত !

তাই ? আপনার ধারণা ?

হেসে বলল, চারণ।

হ্যাঁ। আপনি কিন্তু অতি-বিনয়ী।

চন্দ্রবদনী বলল।

আরও অনেকখানি উঠে এসেছে ওরা। এইখানের পরিবেশ যেন দুই নদীর প্রয়াগের থেকেও নির্মল। সম্পূর্ণ কলুষহীন। এইখানে কোনওদিনও, আশা করা যায়, পেট্রল বা ডিজেল-এর পোড়া-গন্ধ ওড়ানো কোনও যানবাহন আসবে না। একেকবারের নিশ্বাসে যেন নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হচ্ছে চারণের ভিতরে !

চন্দ্রবদনীদের বাড়ি পৌঁছে সকলের সঙ্গে আলাপিত হয়ে নানারকম গল্পটল্প করে খাওয়া-দাওয়া করতে করতে দুটো বেজে গেল। অভিনব পরিবেশ এবং নিবিড় আন্তরিকতাতে মুগ্ধ হল চারণ।

বিয়ে ও করেনি। কোনওদিনও করবে কিনা তাও ঠিক নেই কিন্তু মনে মনে বলল, কোনও পুরুষের শ্বশুরবাড়ি যদি কখনওই হয়, তবে যেন এমনটিই হয়। নারীরা হয়তো জানেনও না যে, তাঁদেরই মতন প্রত্যেক পুরুষেরই মনে তাঁদের শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে একধরনের প্রত্যাশা ও কল্পনা থাকেই। সেই প্রত্যাশা পূরিত না হলে নারীদেরই মতন আশাভঙ্গতাজনিত গভীর এক কষ্টবোধ প্রত্যেক পুরুষকেও পীড়িত করেই।

কী আদর ! কী আদর ! চন্দ্রবদনীর ঠাকুর্দার 'তো কোনও তুলনাই নেই। মুখে সবসময়েই এক ফালি স্মিত হাসি হলুদ ফানুসেরই মতন ঝুলে আছে। কথা বলার সময়ে সেই ঈদের-চাঁদ হাসি হঠাৎই কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে যায়। আর কী গভীর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান মানুষটির ! জ্ঞান যেখানে গভীর সেখানেই সাধারণত তাকে বদ্ধ বলে মনে হয়। মনেই হয়। আসলে সেই বদ্ধতার গভীরতা চারণের মতন সাধারণ মানুষদের অনুমেয়ই নয়। অগভীর মানুষেরাই পুঁটিমাছের মতন অল্প জলে ফরফর করে। তেমন মানুষদেরই শহুরে চারণ বেশি কাছ থেকে দেখেছে। কেশর সিং সাহেবের মতন প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানী অথচ সংসারী মানুষ বেশি তো দেখেনি। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে জ্ঞানের এবং স্থৈর্যের যেন এক বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয় চারণের। "ওঁ মণিপদ্মে হুঁম" এই মুখ্য ধ্বনিই বৌদ্ধ-তীর্থর চারপাশে অনুরণন তোলে। "বোধি" বা জ্ঞান লাভ করার পরই শাক্যসিংহ "বুদ্ধ" হয়েছিলেন তাই বোধহয় তাঁর অনুরাগীদের হাঁটা চলা কথা বলা সবকিছুর মধ্যেই এক বিশেষ ধরনের স্থৈর্য ও আড়ম্বরহীনতা লক্ষিত হয়।

চন্দ্রবদনীর দাদু পৃথিবীর সমস্ত সময়টুকুই যেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লামাদের লাল বা হলুদ জোব্বার পকেটে তিনি বন্দি করে রেখেছেন। কোনও কিছুতেই বিন্দুমাত্র তাড়া নেই। না, জন্মানোতে, না বড় হয়ে ওঠাতে, না মৃত্যুতে। রোগ, জরা এবং মৃত্যুকে জয় করার সাধনাই যে রাজপুত্র শাক্যসিংহের সাধনা ছিল !

চন্দ্রবদনীর চামৌলির বড় পিসিমারও তুলনা নেই। "বড়ি বুয়া" এই নামেই ডাকছিল তাঁকে চন্দ্রবদনী। সর্বজনীন মাতৃমূর্তি যেন ! সদাহাস্যময়ী অথচ লাস্যহীনা। তাঁকে প্রথম দর্শনেই দেখে চারণের দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া একখানি আগমনী গানের বাণী মনে পড়ে গেছিল

"শারদ সপ্তমী উষা গগনেতে প্রকাশিল।
দশদিক আলো করে আমার দশভুজা মা আসিল।...
পুলকে ভরিল হিয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া

চল সখী উলু দিয়া বরণ করো
মা আসিল।"

মানুষীর মধ্যে যদি জগন্ময়ী মূর্তি কেউ দেখতে চান তবে এই রুদ্রপ্রয়াগ বাজারের অনেক উপরের এই গ্রামে এসে চন্দ্রবদনীর "বড়ী বুয়াকে"ই দেখে আসতে হবে।

চন্দ্রবদনী বলল, বড়ি বুয়ার রান্নার উৎকর্ষ অথবা পদ দেখে কিন্তু একবারও ভাববেন না যে, আমরা রোজই এইরকমই খাই। আমরা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একেবারেই মাড়োয়ারি-গুজরাটিদেরই মতন সিম্পল। আমার মা এই ব্যাপারটাকে খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন। সে কোটিপতিই হন আর দীনদরিদ্র, মাড়োয়ারি-গুজরাটি এবং দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যেও কিন্তু বাঙালিদের মতন অমন খাওয়ার "পাটি" নেই। রান্না করতে আর খেতেই যদি দিনের আট ঘণ্টা চলে যায় তাহলে অন্য কাজ করা যাবে কখন ? শুধু খাওয়ার জন্যেই তো এখানে আসা নয় মানুষ জন্ম নিয়ে !

আমার ঠার্কুদা তো বটেই, বাবাও Plain living and high thinking-এ বিশ্বাসী। ভবিষ্যতেও যদি আবার কখনও যদি আমাদের এখানে আসেন তখন কিন্তু এইরকম মহাসমাদর প্রত্যাশা করবেন না।

চন্দ্রবদনী বলল।

বড়ি বুয়া বললেন, হ্যাঁ। হ্যাঁ। পরে এলে, বাড়ির ছেলের মতনই থাকবে, খাবে। রাজাবাহাদুর তো চলেই গেছে। চুকার তো থেকেও নেই। এ বাড়িতে ছেলে কোথায় ? তুমি এলে বাড়ির ছেলে হয়েই থাকবে। তাছাড়া, যদি ভালমন্দ দশপদ খেতে ইচ্ছেই হয় তবে চামৌলিতে চলে এসো। আমার বড় ছেলে খড়গ ঠিক তার বাবার মতনই হয়েছে।

"বাপ কী বেটা সিপাহীকি ঘোড়া
কুছ নেহিতো থোড়া থোড়া।"

চারণ হাসল। বড়ি বুয়ার কথা শুনে। তারপর বলল কিন্তু চামৌলি যেতে হয় কোথা দিয়ে ? মানে, কী করে ?

ওমা। তাও জানো না ? এখান থেকে তো কাছেই।

তাই ?

হ্যাঁ।

চন্দ্রবদনী বলল।

কাছে মানে ? কতদূর এখান থেকে ?

এখান থেকে চামৌলি যতদূর, চামৌলি থেকে রুদ্রপ্রয়াগও ততই দূর।

চন্দ্রবদনী হেসে বলল।

হাসল, চারণও।

এই বাক্যটিই দেবপ্রয়াগে শুনেছিল, মনে পড়ল। কে বলেছিল ? চন্দ্রবদনীই কি ? নাকি সাধু সন্তদের মধ্যেই কেউ, তা অবশ্য মনে পড়ল না।

'বড়ি বুয়া' বললেন, রুদ্রপ্রয়াগে নেমে গিয়ে অলকানন্দার ব্রিজ পেরিয়ে বাঁয়ে যে পথ চলে গেছে সে পথে গিয়ে, ডান দিকে ঘুরে গেলে 'মোহনখাই' বলে একটি জায়গা পড়বে। তারপর চোপ্তা, চামৌলি। আমাদের ওখানে কিন্তু পথ এখনও কাঁচাই আছে। পিচ পড়েছে সবে তাতে। তাই সেই জায়গায় প্রকৃতিও কীরকম তার একটা আন্দাজ নিশ্চয়ই করতে পারো, মানে যে-পথ এখনও পাকাই হয়নি সেই পথপাশের গ্রামের।

—নিশ্চয়ই ! পারি বইকী ! কল্পনা করতেও ভাল লাগে যে, পৃথিবীতে এখনও এমন কিছু কিছু জায়গা রয়ে গেছে যেখানে বিজলীর আলো নেই, বাস বা ট্রাকের কান-ফাটানো এয়ার-হর্ন নেই, কেবল-টিভির ডিশ-অ্যান্টেনা নেই, ভোগ্যপণ্যর লাগাতার এবং লজ্জাকরভাবে নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন নেই।

চারণ বলল।

খেতে-করতে সূর্য ঢলে পড়ল পশ্চিমে। খাওয়া তো নয়, "ফাঁসির খাওয়া"। আসলে, ঢলেনি ততটা, পাহাড়টা এতটাই উঁচু যে, বেলাবেলিই আড়ালে পড়ে গেল সে। তার প্রাত্যহিক অধঃপতনটা শেষ অবধি কেউ ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে দেখুক তা বোধহয় এখানের সূর্যের ইচ্ছে নয়।

বড় বড় হাই উঠছিল চারণের। আলো কমতেই শীতও বাড়ল। সবসময়ই কনকনে উত্তুরে হাওয়া বইছে একটা।

চন্দ্রবদনী বলল, একটু শুয়ে নেবেন নাকি আপনি ? আপনার অভ্যেস তো নেই।

কিসের ?

এতখানি চড়াই ওঠবার কষ্ট করার।

চারণ বলল, এমন সাধ্বী-সঙ্গর অভ্যেসও নেই, এমন আদর যত্নরও। শুধু কষ্টটার কথা ধরলেই বা চলবে কেন ? তা করলে তো অন্যায় করা হবে।

তারপরই বলল, চুকার কোথায় ? তার সঙ্গেই তো আলাপ হল না।

কোথায় তা আমিও জানি না। আপনাকে যখন আনতে যাবার জন্যে নামলাম নীচে, ঠাকুর্দার কাছে শুনলাম যে, সে নাকি শেষ রাতে বেরিয়ে গেছে।

তাই ?

অবাক হয়ে বলল, চারণ।

তারপরই বলল, তাহলে কি পাটনের সঙ্গেই গেল ? সেও তো একখানি চিঠি লিখে রেখে ভোররাতেই চলে গেছে। সে অবশ্য গন্তব্যর আভাস দিয়ে গেছে। তবে সত্যি বলেছে কি না তা বলতে পারি না।

একসঙ্গে বেরোলেই যে একই গন্তব্যে যাবে তার কি মানে আছে ? কতজনেই তো একসঙ্গে প্রতিমুহূর্তেই বেরোয় পথে। তাই বলে, কোন পথ যে কাকে কোথায় নিয়ে যায়, তা কি আগে থাকতে জানা যায় ? পথিকও জানে না অনেক সময়। পথ তো জানেই না।

বাঃ।

বলল, চারণ।

আপনি ভারী সুন্দর কথা বলেন।

আপনিও।

তাই ?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার মক্কেলরা ছাড়া আর কেউই বলেনি এ কথা।

পাটনের মা তুলিদিও নয় ?

তুলিকে আপনি চিনতেন ?

চমকে উঠে বলল, চারণ।

এক দুর্জ্ঞেয় হাসি হেসে চন্দ্রবদনী বলল, This world is really small.

তারপরে বলল, তুলিদির কাছে আপনার কথা এতই শুনতাম একসময়ে যে, তুলিদিকে খুব ঈর্ষা হত। ওর বাবা-মা সত্যিই আক্ষরিকভাবে তুলিদিকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছিলেন। তুলিদির রূপ-গুণের কোনও তুলনা ছিল না। একটাই দোষ ছিল। সাহস বড় কম ছিল। পরকীয়াতে যতটুকু সাহস লাগে তার চেয়ে অনেক বেশি সাহস লাগে সমাজ সংসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে। বড় বেশি মেনে নেওয়ার প্রবণতা ছিল ওর মধ্যে।

তারপর বলল, সত্যি ! পাটনকে দেখে এবং জেনে, পাটনের বাবা সম্বন্ধে কোনও ধারণাই করা যায় না। আমি তো তাঁকে দেখেছি দিনের পর দিন।

অধিকাংশ অশিক্ষিত বড়লোকেরা ওইরকমই হয়। সব দেশেই।

বড়লোক হওয়ার পর অধিকাংশ মানুষই আর মনুষ্যপদবাচ্য থাকে না। এ কথা অশিক্ষিত বড়লোকদের মতন শিক্ষিত বড়লোকদের বেলাতেও প্রযোজ্য।

সারা জীবন টাকাওয়ালা মানুষদের নিয়েই তো কাটালাম ! টাকা হজম করা, পাথর হজম করার চেয়েও কঠিন। টাকাই মানুষকে হজম করে ফেলে মানুষের অজানিতে।

সত্যিই তুলিদির কথা মনে হলে বড় কষ্ট হয়।

চন্দ্রবদনী চারণের দুচোখে দুচোখ রেখে বলল, যদি বা একটু সুখের মুখ দেখেছিল বেচারি, সেই সুখেও তো বেশিদিন সুখি হওয়া হল না তার। সাত-তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল।

কোন সুখ ?

চন্দ্রবদনী অনেকক্ষণ চারণের চোখে চেয়ে কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

তারপরে বলল, আপনি জানেন না ?

চারণও একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি আমার নিজের সুখের কথাটুকুই শুধু জানি। অপরের সুখের কথা তো অপরেরই জানার কথা। মানে, সে সুখের গভীরতার কথা। কারও পক্ষেই কি অন্যের সুখের কথা জানা সম্ভব ? যদি কেউ কাউকে সত্যিই সুখী করে থাকে, তার পক্ষেও জানা সম্ভব নয়।

তারপরই কথা ঘুরিয়ে চারণ চন্দ্রবদনীকে বলল, আপনি বহুদিন কাছ থেকে দেখেছেন বললেন পাটনের বাবাকে, সেটা কীরকম ?

বাঃ রে। আমি পাঁচ মাস ছিলাম যে তুলিদিদের বাড়িতে একসময়ে।

সে কি ? কোন সুবাদে ?

বিস্মিত এবং একটু ভীতও হয়ে জিজ্ঞেস করল চারণ।

চন্দ্রবদনী বলল, সুবাদ সুবোধ্যও হতে পারে অথবা দুর্বোধ্য। অত জেনে কী করবেন ?

চিন্তাতে ফেললেন দেখছি আপনি আমাকে।

সে কথা শুনে খুব জোরে হেসে উঠল চন্দ্রবদনী।

বলল, চিন্তা করা ভাল। তবে দুশ্চিন্তা করবেন না।

তীর্থ করতে এসেছিলাম আর এ কোন জটিল অঙ্কর মধ্যে এনে ফেলল আমাকে পাটনচন্দ্র ?

স্বগতোক্তির মতন বলল চারণ।

তীর্থ করতে আপনি মোটেই আসেননি।

তো ? কী করতে এসেছিলাম ?

নিজেকে খুঁজতে এসেছিলেন। আয়নার সামনে দাঁড়াতে এসেছিলেন।

তারপরই বলল, আশ্চর্য ! আয়নার দোকানিরাও কখনও কখনও অন্য দোকানের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেন হয়তো। দেখতে হয়ই। যে পরিবেশে মানুষ থাকে, সেই পরিবেশ যতই, ভাল বা মন্দ হোক না কেন, তা তাকে আবিল করে দেয়ই। অনুষঙ্গ থেকে নিজেকে আলাদা করে দেখার আর কোনও উপায়ই থাকে না বোধহয়। তাই না ? নইলে মি. চারণ চ্যাটার্জি এই দাড়িতে-ছারপোকা, কম্বলে-ছারপোকা, দুর্গন্ধি, উপোসী, অপার্থিব জগতের জীব, ছায়ামূর্তির মতন সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে আসবেন কেন ?

তারপর বলল, জানেন, আপনার কথা আমি আগেই জেনেছিলাম, মানে, এই অঞ্চলে যে আপনি এসেছেন। আপনার আসা তো আসা নয়। সে যে আবির্ভাব।

কী করে ?

পাটনের কাছ থেকেই। কিন্তু যেদিন দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার পারে, গুরুজির গুহাতে আপনাকে দেখলাম, জোড়াসনে বসলেন আপনি এসে, পাটনের সঙ্গে, ছেঁড়া কম্বলের উপরে, তখন তুলিদিদের বাড়িতে দেখা আপনার, সাদা-রঙা লেফ্টহ্যান্ড-ড্রাইভ ওপেল ক্যাপিটান গাড়ি থেকে থ্রি-পিস স্যুট পরে-নামা সেই চেহারাটার কথা মনে পড়ে গেল। এখন তো Opel Astra গাড়ি নিয়েই কত মানুষ হই-হই তুলেছে। Opel Kapitan তো Astra-র চেয়ে অন্তত দ্বিগুণ বড় গাড়ি ছিল, তাই না ? আর তখন দেশে তো হত না, ইমপোর্ট করতে হত।

হ্যাঁ।

লজ্জিত হয়ে বলল, চারণ।

তারপরই বলল তাতে কি ? কোনও শিক্ষিত মানুষেরই কাছে গাড়ি-বাড়ি টাকা-পয়সা কি গর্বের জিনিস ?

না তা নয়। তবে আপনার পরিবেশ প্রতিবেশের মানুষকে যে অমন পরিবেশে দেখব তা ভাবতেও পারিনি।

চন্দ্রবদনী বলল।

তাহলে বলতে হয়, আপনি আমার গাড়ি, আমার শোফার, আমার থ্রি-পিস-স্যুটকেই দেখেছিলেন, আমাকে দেখেননি। মানে, আমার আসল আমিকে।

কার আসল আমিকেই বা কে দেখতে পায় অত সহজে ? আসল আমিকে অত সহজে দেখতে পাওয়া গেলে কি সক্রেটিস অমন করে বলতে পারতেন যে "Catch Me, Me, Me, the real me" ! তাছাড়া, তুলিদি যে আমাকে সবই বলেছিল, মানে আপনার সঙ্গে তার সম্পর্কের রকম, গভীরতার কথা।

তুলি আপনাকে সব বলেছিল ? মানে ? কী সব ?

সব, সব। সেই কটকের প্রথম রাতের কথা থেকে শুরু করে সবই বলেছিল। আসলে, বড় একলা ছিল তো বেচারি। মনে এমন কিছু কথা সব মানুষেরই থাকে, কারওকে না বলতে পারলে সদ্য মা-হওয়া নারীর স্তনভারের মতনই তার মন ভারী হয়ে ওঠে। সে ভার লাঘব না করতে পারলে অস্বস্তির আর শেষ থাকে না।

আপনি সেই ভারের কথা জানলেন কি করে ? আপনি তো মা হননি কখনও।

চন্দ্রবদনী হেসে বলল, মেয়েরা মা না হলেও মায়ের জাত বলেই মায়েদের অনেক কথা এমনিতেই জানে। সে প্রসঙ্গ থাক।

চারণ বলল, ঘুমুবার আর দরকার নেই। ঘুম কেটে গেছে। শীতের দিনে, অবেলায় না ঘুমনোই ভাল। গতকাল পাটনের পাল্লায় পড়ে স্কচ-হুইস্কি খেয়ে তারপর হেভি লাঞ্চ করে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়াতে দিনটাই নষ্ট হয়ে গেল। তাছাড়া, কাল মনও অভিঘাতে ভারাক্রান্ত ছিল।

কিসের অভিঘাত ?

সে কথা এখন থাক। আজকের দিন ও রাতটা আমি নষ্ট করতে চাই না।

দিন ও রাত তো নষ্ট হবেই। সব দিন সব রাত নষ্ট হবারই জন্যে। মানে, ফুরিয়ে যাবারই জন্যে। দিন ও রাতের গায়ে লেবেল মারার ক্ষমতাটুকুই শুধু আছে আমাদের হাতে। আসলে, মানুষের এইখানেই মস্ত হার। তাই না ? আপনি কি বলেন ? চাঁদে পা দিল মানুষ। কৃত্রিম উপগ্রহ ছেড়ে দিল আকাশে, পুকুরে, চারা-পোনা ছাড়ার মতন আকাশময়, কিন্তু সময়কেই ধরে রাখতে পারল না। এঁটে উঠতে পারল না তার সঙ্গে। তার গায়ে আঙুলই ছোঁয়াতে পারল না। সময়ের চেয়ে বেশি Perishable আর কোনও জিনিসই নেই বোধহয়।

সময়কে কি কোনও জিনিসের পর্যায়ে আদৌ ফেলা যায় ?

মানে, কংক্রিট নয়, অ্যাবস্ট্র্যাক্ট জিনিস ? জিনিস বলব না, বলব কনসেপ্ট।

ঠিকই।

বলল, চারণ।

তারপর বলল, প্রসঙ্গটা ওঠালেন আপনিই তাই বলি যে, আমি এখানে তীর্থ করতে আদৌ আসিনি। তেমন তীর্থ করতে এলে, খেতে খেতে, বমি করতে করতে, দেব-দেবতাদের নাম করে হুংকার দিতে দিতে যতদিন এসেছি এই অঞ্চলে তার এক-বিশাংশ সময়েরও কম সময়ে, কলকাতায় ফিরে যেতে পারতাম। গিয়ে, "জোয়ালেও" জুতে যেতে পারতাম। কিন্তু মনের অশান্তি, ছটফটানি, কাটেনি এখনও। 'তীর্থ'র ধারণাটা আমার কাছে একেবারেই অন্যরকম। তা সকলের পক্ষে বোঝাও হয়তো সম্ভব নয়।

বলুনই না একটু চেষ্টা করে দেখি, বুঝতে পারি কি না।

জানি না, পারবেন কি না ! তবে আপনার মা সম্বন্ধে পার্টনের কাছে ও আপনার কাছে যতটুকু জেনেছি, তাতে মনে হয়, তিনি হয়তো বুঝলেও বুঝতেন।

তারপর বলল চারণ, তীর্থ সম্বন্ধে এই ধারণাটিও আমার নিজস্ব ধারণা নয়। এও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই ধার করা।

বলুনই না শুনি।

তীর্থ তো অন্তরেরই ব্যাপার। তীর্থ পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে গেলেই হয় না, যদি না "অন্তর তীর্থে" যাওয়া যায়।

বাঃ !

বলল, চন্দ্রবদনী।

"প্রতিদিনই এসো, অন্তরে এসো। সেখানে সব কোলাহল বারণ হোক। কোনওরকম আঘাতই না যেন পৌঁছয় আমার অন্তরের গভীরে, কোনও মলিনতা যেন না স্পর্শ করে। সেখানে ক্রোধকে পালন কোরোও না, ক্ষোভকে প্রশ্রয় দিও না, বাসনাগুলিকে হাওয়া দিয়ে সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে রেখো না কেন না সেখানেই তোমার তীর্থ, তোমার দেব-মন্দির।"

বাবাঃ আপনি এতও জানেন।

ঠাট্টা করছেন ?

চারণ বলল।

না, ঠাট্টা করছি না। সিরিয়াসলিই বলছি। কিন্তু যা বললেন এই যদি আপনার বিশ্বাস হয়, তবে একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না, এত নৈতিকতা, শুদ্ধতা সত্ত্বেও তুলিদির সঙ্গে "অ্যাফেয়ারটা" করলেন কি করে ? "বাসনাগুলিকে হাওয়া দিয়ে যদি না জ্বালানোতেই" বিশ্বাস করেন আপনি ?

চারণ হেসে ফেলল। হেসে ফেলেই মনে হল, যখন ওর শঙ্কা পাওয়ার কথা তখন হাসল কী করে।

চন্দ্রবদনী লক্ষ করল যে, সেই হাসির মধ্যে শিশুর হাসির অপাপবিদ্ধতা আছে। লক্ষ করে আশ্চর্য হল।

চারণ বলল, আপনাকে এর চেয়ে একটু বেশি বুদ্ধিমতী বলে মনে করেছিলাম আমি।

মানে ?

এ তো রবীন্দ্রনাথেরই কথা। আমি তো নিজে রবীন্দ্রনাথ নই। আমি যে অতি সাধারণ একজন রক্তমাংসের মানুষ। যে-ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষাতে নব্বুই পার্সেন্ট নম্বর পাওয়ার সাধনা করেছিল, ফল বেরুলে দেখা গেল যে, সে হয়তো টায়-টায় নম্বর পেয়ে কোনওরকমে পাস করে গেছে। কিন্তু তা বলে তার সাধনা তো মিথ্যে নয়। সাধনার পবিত্রতা এবং মান্যতা তো সিদ্ধিনির্ভর নয়। তবে তো সব সাধনাতেই এমনকি শব-সাধনাতেও ব্যবসাদারীর সঙ্গে কোনওই তফাৎ থাকত না। শুধুমাত্র লেন-দেন এরই ব্যাপার হত এইসব অন্তর্গত দেওয়া-নেওয়া। প্রত্যেকেরই সামনে তাই কোনও মহৎ আদর্শ রাখাটা খুবই জরুরি। কোনও আদর্শে আস্থা রাখাটাই একটা মস্ত সাধনা। অন্ধকার রাতে ঝড়ের মধ্যে "হাল" এর উপরে হাত রেখে নৌকো বাওয়াটাই "দাঁড়ের" উপরে হাত রেখে বাওয়ার চেয়ে অনেকই বেশি জরুরি। হালে হাত থাকলেই যে সব মাঝিই দরিয়া পেরোতে পারতই, পারবেই, তার যদি কোনও স্থিরতা থাকত তবে তো সাধনা কথাটাই মিথ্যে হয়ে যেত। তাই নয় কি ? শুধুমাত্র এই তীর্থর কথাই আমি জানি। উত্তুঙ্গ গিরি-শিখরে উঠে সুন্দর কালো পাথরের মন্দিরগাত্রে সাদা চকখড়ি দিয়ে যেসব তীর্থযাত্রী লিখে রাখেন, "আমি এসেছিলাম", "শ্রীরামপুরের কালু রায়" বা "চন্দননগরের ভুলু দাস" অথবা কামিনী, যোগেন অথবা হৃদয়ে তীর বেঁধা ছবি ইত্যাদি, তাঁদের তীর্থযাত্রার রকম আর আমার তীর্থযাত্রার রকম তো এক নয় ! "পুষ্পবনে পুষ্প নাহি, পুষ্প আছে অন্তরের" মতন আমিও বিশ্বাস করি, শারীরিকভাবে কোনও ক্ষেত্রতে পৌঁছলেই শুধু সেই কারণেই কোনও মানুষ-মানুষীরই "তীর্থ" করা হয় না। যদি না, অন্তরকেই তীর্থ করে তোলা যায়।

ঠিক। অবশ্যই ঠিক। চন্দ্রবদনী বলল।

তারপর হেসে বলল, আবারও বলছি আপনাকে যে, খুবই ভাল কথা বলেন আপনি।

আগেই তো বলেছি, আমার জীবিকার্জন তো মুখ দিয়েই করতে হয়। তা বলে, আমি মানুষটা মুখ-সর্বস্ব, এ কথা ভুলেও ভাববেন না।

সেটা না বললেও চলত।

তারপরই বলল, এখনও যতটুকু বেলা আছে চলুন আপনাকে আমাদের গ্রামটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি।

কোনও ফাঁকা জায়গাতে চলুন। ঘিঞ্জি জায়গাতে নয়।

চারণ বলল।

নিজের মনটাকে ফাঁকা করে তুলুন তাহলেই আর ফাঁকা জায়গার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না।

বাবাঃ! আপনি দেখি সন্ন্যাসী ভীমগিরি মহারাজের মতন কথা বলছেন।

সন্ন্যাসী নাই বা হলাম বিবাগী হতে ক্ষতি কি?

এখন রাত কত তা কে জানে!

রাত নামার আগে আগে ওরা দুজনে পুরো গ্রামে একটা টহল দিয়ে এসে, জামাকাপড় বদলে, বসবার ঘরে বসে গল্প করছিল এখন। ঘরের দুকোণে কাঠ-কয়লার কাঙরি রাখা ছিল, ফায়ার-প্লেস-এর বিকল্পে। যেমন কাশ্মীরের ঘরে ঘরে থাকে। "ফারহান" পরে গড়গড়ার লম্বা নল হাতে তুলে সুগন্ধি তামাক খায় কাশ্মীরীরা গুড়ুক-গুড়ুক শব্দ করে। গাড়োয়ালি, কুমায়নি, হিমাচল প্রদেশের মানুষেরাও খায়। তেমনই যেন বন্দোবস্ত, রুদ্রপ্রয়াগে চন্দ্রবদনীদের বাড়িতেও। শুধু গড়গড়ার বদলে পাইপ।

চন্দ্রবদনী বিকেলে ফিরে এসে চান করেছিল গরম জলে। এখন একটা কাঁঠালি-চাঁপারঙা সিল্কের শাড়ি পরেছে, গায়ে হালকা হলুদ ফুলহাতা কার্ডিগান, শাড়ির নীচে হালকা-হলুদ সিল্কের সায়ার আভাস দেখা যাচ্ছে রুপোর পায়েজোরের উপরে। পায়েও হালকা হলুদ রঙা মোজা। পুরু কার্পেটের উপরে পা দুটি মেলে রেখেছে। উজ্জ্বল বিজলী আলোর নীচে বসে ভারী উষ্ণ লাগছে চারণের। সেই উষ্ণতা কতখানি "কাঙরীর" আর কতখানি বিজলী-আলোর এবং আরও কতখানি চন্দ্রবদনীর সান্নিধ্য-জনিত তা চারণ বুঝতে পারছে না।

চন্দ্রবদনীর ঠাকুর্দার কাছে "ধম্মপদ"-এর কথা শুনছিল। বৌদ্ধধর্মের "ধম্মপদ"-এর কথা শুনছে শিশুকাল থেকেই কিন্তু কী তার শিক্ষা, তা কখনওই জানবার সুযোগ হয়নি।

কেশর শিং শর্মা সাহেব পাইপ খান। বহু পুরনো হয়ে যাওয়া ইংলিশ ব্রায়ার পাইপ। কে জানে? হয়তো "ডানহিল"ই হবে। সবসময়ই তাঁর হাতে থাকে। মনে হয়, যেন পাইপই তাঁর Staple Food।

কি টোব্যাকো খান?

চারণ শুধিয়েছিল।

কী আর খাব? প্রিন্স হেনরি। যা পাওয়া যায় দিল্লি বা দেরাদুনে। তার সঙ্গে কখনও সখনও হল্যান্ড-এর "Amphora" পেলে মিশিয়ে নিই Aroma-র জন্যে। 'Amphora' কলকাতা-বম্বে-দিল্লি সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। হয়তো চোরা-চালানিরাই নিয়ে আসে।

তা না হলে আর আসে কি করে!

সকলের চোখের সামনেই বিক্রি হয়, পুলিশ-কনস্টেবল যেমন সকলের চোখের সামনেই ট্রাকওয়ালাদের কাছ থেকে ঘুষ নেয়। এসব অন্যায় আর অন্যায় বলে মানে না কেউই।

চারণ হেসে বলল, অন্যায় যে করে বা যারা করে আর সেই অন্যায়কে আমরা যারা মেনে নেই, তারাও কি সমান অপরাধী নই ?

তা ঠিক। তবে ন্যায়-অন্যায় ব্যাপারটা, বিশেষ করে পোস্ট-ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়াতে একটি রিলেটিভ টার্ম। আমাদের অনেক ধ্যান-ধারণার খোলনলচে পালটে ফেলার সময় হয়েছে যাতে স্বদেশী যুগের মতন অন্যায়কে অন্যায় বলে আমরা চিহ্নিত করতে পারি এবং চিহ্নিত করে তাকে বর্জনও করতে পারি। সব গ্রহণ-বর্জনের পেছনেই এক বিশেষ মানসিকতা থাকে। পরিবর্তন আসা দরকার সেই মানসিকতাতেই।

তারপরেই বললেন, এ প্রসঙ্গ থাক। বুড়ো হলে, মানুষ বেশি কথা বলে। তোমরাই বরং বল, আমি শুনি। তবে আমার টোব্যাকোর স্টক, চুকার কিংবা চুকারের বাবা একবার মাস দু-তিনেকের মতন এনে দেয় আমাকে।

চন্দ্রবদনীর দাদুর চেহারার মধ্যে ভারী একটা প্রশান্তি আছে। তার কাছে গেলেই নিজের মনও যেন শান্ত হয়ে যায়। মাথাতে একটা সন্ন্যাসীদের তন গেরুয়া-রঙা গরম টুপি। অথচ পরেন প্যান্ট-কোট।

কেশর সিং সাহেবের পাইপের ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ শুনে মনে হল চারণের যে, পাইপটার stem-এ মনে হয় থুথু জমেছে। পরিষ্কার করা দরকার।

ভাবল, চারণ।

চুপ করে গেলেন যে বড়! কী ভাবছেন ?

তারপর বলল, বড়ি বুয়ার হাতে-বানানো দারচিনি-তেজপাতা-লবঙ্গ দেওয়া আর এক কাপ চা খাবেন না কি ?

চারণ বলল, না, না। আর নয়। ভাল জিনিস কম বলেই ভাল।

হালকা কচি-কলাপাতা-রঙা উলের লাছি নিয়ে সোয়েটার বুনতে-বসা চমৌলির বড়ি বুয়ার দিকে ও ফিরে বলল, দারুণ খেলাম বুয়া, চা'টা।

বড়ি বুয়া ওকে বললেন, একদফা মেরী নজদিক আওতো বেটা।

কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে, চারণ উঠে ওঁর কাছে গেল।

উনি বললেন, আররে বেটা, জারা উলটো হো যাও।

চারণ উলটো হয়ে, মানে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াতে বড়ি বুয়া চারণের কাঁধের মাপ নিলেন উলের গাছি-সমেত কাঁটা দিয়ে।

চন্দ্রবদনী মুখ টিপে হাসল। চারণকে বলল, বাঃ বাঃ আপনাকে বড়ি বুয়ার এতই ভাল লেগে গেছে যে আপনার জন্যে সোয়েটারই বুনতে বসে গেলেন। রংটা অবশ্য আপনাকে মানাবে খুব।

বড়ি বুয়া কপট রাগ করে বললেন, দশ পাতা ইংরেজি পড়াটাই একমাত্র শিক্ষা নয় বেটি। প্রতিবছরই কোনও-না-কোনও প্রিয়জনের জন্যে একাধিক সোয়েটার-বোনা ভালবেসে, তাদের ভালবেসে রেঁধে খাওয়ানো, তাদের জন্যে পাঁপড়-আচার বানানো এই সবই হচ্ছে মেয়েদের ভালবাসার প্রকাশ।

চন্দ্রবদনী বলল, তোমরা সময় কী করে নষ্ট করতে হয় তাই শিখেছিলে বড়ি বুয়া। তুমি দিল্লির কনট-সার্কাসে চল না একবার আমার সঙ্গে। কি পালিকা বাজারে। কত রকমের কত রং-এর যে, মেশিনে-তৈরি রেডিমেড সোয়েটার পাবে সেখানে যে, একেবারে ভালবাসার "পিং-হুলার"এ হয়ে যাবে।

বড়ি বুয়া হেসে ফেললেন চন্দ্রবদনীর কথা শুনে।

চারণ বলল, 'পিং-হুলারে'টা আবার কী জিনিস ?

হাসছিল চন্দ্রবদনীও। চন্দ্রবদনীর ঠাকুর্দাও যোগ দিলেন হাসিতে।

স্বগতোক্তি করলেন, নাতনির রসিকতা দ্যাখো!

হাসছিল, চন্দ্রবদনীও।

কারওকে হাসতে দেখে এত সুখি এর আগে আর হয়নি চারণ। ওর মনে হল চন্দ্রবদনীর এই একটি দিনের সান্নিধ্যতেই সাধু হওয়ার মতন কাবু হয়ে পড়েছে। প্রথম ধাক্কা খেয়েছিল চন্দ্রবদনী নামটিতেই। তারপর তার সঙ্গে দেবপ্রয়াগে দেখা হবার পর, তার গান শোনার পর এবং গত দু-আড়াই মাসের এক সম্পূর্ণ অন্য জীবনযাপনের পর চন্দ্রবদনীদের বাড়িতে বসে তার ঠাকুর্দা এবং চামৌলির বড় পিসিমার সঙ্গে গল্প-মস্করা করা এক পরমাসুন্দরী আধুনিকা অথচ সম্পূর্ণ ভারতীয় নারীকে খুবই কাছ থেকে দেখে অজগরের চাউনিতে আটকে-পড়া হরিণশিশুরই মতন অবস্থা হয়েছে যেন দুঁদে ব্যারিস্টার চারণ চ্যাটার্জির।

চারণের মনে পড়ে গেল যে, ওর মা বলতেন, "কার মরণ যে কোথায় লিখে রেখেছেন ঈশ্বর তা শুধুমাত্র তিনিই জানেন।" বাক্যটির যথার্থ তাৎপর্য এতদিন পরে হৃদয়ঙ্গম করল যেন চারণ। তার মৃত্যু যে, এই দেবভূমির রুদ্রপ্রয়াগের উপরের এই সুউচ্চ পর্বতের উপরের একটি বাড়ির এই উষ্ণ পরিমণ্ডলেই, unseen question-এর উত্তরেরই মতন, সেই সত্য, অদৃশ্য, ঈশ্বর-নামক element যে স্থির করে রেখেছিলেন, তাকি সে আজ সকালেও জানত! এত কিছু কি ঘটে যেতে পারে অল্প কঘণ্টার মধ্যে? একি সম্ভব? চারণ চ্যাটার্জি অন্য পক্ষের মতামতের জন্যে বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করেই কী দারুণ দুঃসাহসে জীবনের এমন পরম এক জরুরি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল? কি করে? সওয়াল না জিজ্ঞেস করেই জবাব দিয়ে দিল কোন অন্ধ মূর্খতাতে?

চারণের একটা উর্দু শায়ের মনে পড়ে গেল,

"ম্যায় দিল দে দিয়া হ্যায় উনকি,
দেখে উ্য ক্যা করেঙ্গে,
রাখতি হ্যায় দিলকে দিলমে,
ইয়া কি জুদা করেঙ্গে?"

ভাবছিল, জীবনের এতখানি উষর বন্ধুর পথ পেরিয়ে এসে সেকি মরুদ্যানের সামনে দাঁড়াল? প্রেমেই পড়ল কি? কোন সকালের পাখি যে কার জন্যে কী গান মুখ করে নিয়ে আসবে, তা আগের শেষ রাতেও বা কে বলতে পারে!

চারণ আবারও বলল 'পিং-হুলারে'টা কী? বলবেন না?

চন্দ্রবদনী হাসতে হাসতেই বলল, পিংহুলারে একটি গুরুমুখী শব্দ। মানে, ধরুন, কী বলব, জলসা বা ভ্যারাইটি-শো।

তাই?

বলে, চারণও যোগ দিল হাসিতে।

চন্দ্রবদনী তারপর বড়ি বুয়াকে হাসতে হাসতেই বলল, আর শুধুই সোয়েটার? ইন্ডানা কোম্পানির নানান আচার, পাচরঙ্গের আচার, তারই বা স্বাদ খারাপ কি? দিল্লির মেয়েরা প্রেগন্যান্ট হলেই আচারের বিক্রির ধুম পড়ে যায়। এখন নিজের হাতে সোয়েটার পাপড় আচার বানাবে, তার সময় কার আছে? তুমি একবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগেই পড়ে রইলে বড়ি বুয়া।

বড়ি বুয়া বললেন, সময় সকলেরই আছে। নিজের প্রিয়জনের জন্যে নিজে হাতে সোয়েটার বোনাতে যদি সময় নষ্ট হয়, তবে সেই সময় নিয়ে তোরা, কি করলি, না করলি তাতে কিই বা এসে যায়। আমার অন্তত যায় আসে না। সকলের সময়ই দামি। কে কার সময় কী ভাবে খরচ করবে সেটা তার সম্পূর্ণই নিজস্ব ব্যাপার। আমার দামি সময় আমি এইভাবেই 'নষ্ট' করেছি আজীবন এবং ভবিষ্যতেও করব। পনেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, পঁয়তাল্লিশ বছর বড় সুখি, দাম্পত্যজীবন কাটিয়েছি। পাঁচবছর হল একলা হয়ে গেছি। কিন্তু জীবনের একমুহূর্তও 'নষ্ট' হয়েছে বলে মনে হয়নি।

তা হয়তো হবে। কিন্তু বড়ি বুয়া, আমাদের পৃথিবীটা যে তোমার দেওদার-ওক-পাইন—হর্স চেস্টনাট, তোন, তাড় গাছেদের গায়ের খুশবু আর "চুকার" এবং "খালিজ ফেজান্টস"-এর ডাকে

জেগে-ওঠা লক্ষ হীরের দ্যুতিতে ঝলমল করে-ওঠা শিশির-ভেজা চামৌলির সকাল বা বড় বিষণ্ণ 'ভগুয়া' লাল এর আকাশ-ঘেরা সন্ধের মতন সুন্দর নয়। আজকের আমাদের পৃথিবী যে বড়ই দোড়াদৌড়ির, মারামারির, প্রতিযোগিতার। বড়ি বুয়া এ কথা তোমরা না বুঝলে চলবে কী করে। চন্দ্রবদনী বলল।

এ জীবনে যা বুঝেছি, যা জেনেছি, যা শান্তি পেয়েছি তাই নিয়েই যেন বাকি কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারি। তোদের বুদ্ধি তোদের যুক্তি তোদেরই থাক। স্বামী বাইরের কাজ সামলাবে, রোজগার করবে, আর স্ত্রী নিজের বাড়িকে ছবির মতন সুন্দর করে রাখবে। নিজের ছেলেমেয়েকে মনের মতন করে মানুষ করবে, স্বামী ও স্ত্রী দুজনে দুজনকে খুব ভালবাসবে, এর চেয়ে ভাল গার্হস্থ্য আর কী হতে যে পারে, তা আমি তো জানি না।

চন্দ্রবদনী বলল, আজকাল যে একজনের আয়ে কারওই সংসার চলে না বড়ি বুয়া।

এই 'চলা' বলতে কে কি বোঝে তার উপরেই সব নির্ভর করে। এই চলার তো শেষ নেই। উপরে তাকাবার শেষ নেই। সুখ কাকে বলে, সে কথা তোদের মতন মেমসাহেবরা যে কখনই জানবি না। সুখ আর আরাম যে কোনওদিনও এক কথা ছিল না রে বেটি।

"সুখ" একটা মানসিক অবস্থা। সুখের সঙ্গে কোনওরকম Material Gains-এর কোনওদিনই কোনও সাযুজ্য ছিল না।

নিজের সহোদরার স্বপক্ষে বললেন, মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে কেশর সিং সাহাব।

তারপরই বললেন, চারণকে, তুমি কি ইংরেজ দার্শনিক Bertand Russell-এর Conquest of Happiness বইটা পড়েছে ?

না তো!

বলেই বলল, আপনার তো অনেক পড়াশোনা।

উনি হেসে বললেন, আমাদের প্রজন্মের মানুষেরা বেশি পড়িনি বেটা। কিন্তু যতটুকু পড়েছি তা থেকে শেখার বা জানার মতন অনেক কিছুই পেয়েছি। গানের বেলাও তাই। আজকের মতন ব্যাঙ, ঝিঁঝিপোকা, গিরগিটি, তক্ষক, দাঁড়কাক, ষাঁড় সকলেই তখন ক্যাসেট করত না ? যে যাই করত, তার পেছনে দীর্ঘদিনের সাধনা থাকত। শর্ট-কার্টও বা ফাঁকিতে জগৎ মাৎ করার প্রবৃত্তি ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, আত্মসম্মান আর লজ্জাবোধ তখনও ছিল মানুষের। জানি না কেন, হয়তো বুড়ো হয়েছি বলেই এখন মনে হয়, তরুণতর প্রজন্মের এমন অনেক গুণই আছে যা আমাদের ছিল না। আবার একথাও মনে হয় যে, তাঁদের এমন অনেক দোষও আছে, যা আমাদের ছিল না।

Russell কি বলেছিলেন তাই বলুন, মানে ওই বইয়ে ?

চারণ বলল।

Russell বলেছিলেন, সুখি হওয়ার কথা। সুখি হতে পারা তো আর সহজ কাজ নয়। এভারেস্ট জয়ের মতনই কঠিন কাজ। তাই নাম দিয়েছিলেন বইয়ের "The Conquest of Happiness"। সুখ-অসুখ-এর একটি উদাহরণও দিয়েছিলেন তাতে।

কি উদাহরণ ?

লানডান-এর এক টিউব স্টেশনে একটি সুন্দরী মেয়ে নেমে এসে প্লাটফর্ম-এ দাঁড়াল ট্রেইন-এর অপেক্ষায়। অপরূপ সুন্দরী সে। প্লাটফর্ম-এর সব মানুষ তার দিকে চেয়ে রইল। সে, সেই মুহূর্তে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুখি মহিলা হয়ে গেল। সুখের দেমাকে সে ঝলমল করে উঠল।

তারপর ?

তার সামান্য পরে আর একটি মেয়ে এসে নামল সেই প্লাটফর্ম-ই। তার ফিগার আরও ভাল, সে আরও অনেক বেশি সুন্দরী। এবং সে আসা মাত্র সবাই প্রথম জনের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দ্বিতীয় জনকে দেখতে লাগল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম মেয়েটি পৃথিবীর দুখিতম মহিলা হয়ে গেল।

তারপর উনি একটু চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সুখ তো থাকে যার যার বুকেরই মধ্যে। অথচ সেই খবরটাই না জেনে, আমরা সুখের খোঁজে কোথায় না কোথায় দৌড়ে বেড়াই।

তারপর আবারও একটু থেমে বললেন, চন্দ্রবদনীর স্বামী বাজবাহাদুর এই কথাটা বুঝত।

পাঞ্জাবিরা সাধারণত বহির্মুখী হয়, যদিও দারুণ দিলদার, মন-মৌজী হয় সকলেই। কিন্তু বাজবাহাদুর ছিল আমার বৌমার মতন, মানে চন্দুর মায়ের মতন। মানসিকভাবে যেন বাঙালিই ছিল সে। তাই তো চন্দু এবং তার মায়ের অত পছন্দ ছিল তাকে।

বলেই বললেন, দেখ তার ফোটো।

চারণ বসার ঘরের দেওয়ালে চেয়ে দেখল, এয়ার-ফোর্সের উনিফর্ম পরা নয়, ক্যাজুয়াল পোশাকে এক অতি বুদ্ধিমান, উজ্জ্বল-চোখের পুরুষ।

তার তুলনাতে নিজেকে ছুঁচো বলে মনে হল চারণের।

চন্দ্রবদনীর মুখে কোনও ভাবান্তর লক্ষ করল না চারণ।

তাছাড়া সুখ ব্যাপারটা সবসময়ই রিলেটিভ ব্যাপার। যে কথা Russell অতদিন আগে বলে গেলেন। সেই কথা আজও আমরা, মানে সারা পৃথিবীর মানুষই বুঝতে পারলাম না। উনি বলেছিলেন, ''We do not struggle for existence, we struggle to outshine our neighbours.''

আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী কেউই যেন আমার চেয়ে ভাল না থাকে, কারও বাড়ি, গাড়ি, আসবাব, আজকাল তো আরও কত কী হয়েছে, মাইক্রোআভেন, ভিডিওক্যামেরা সে সব যেন আদৌ না হয় তাদের। আমার চেয়ে ভাল বা উঁচুদরের, কারওই যেন না হয়। এই একমাত্র প্রার্থনা হলেই মুশকিল। দুঃখে মরে যায় মানুষে। কী দুঃখ! কী দুঃখ!

বড়ি বুয়া বললেন, এই মিথ্যার মরীচিকার পেছনে দৌড়বার কি শেষ আছে কোনও? কোনও ধর্মই মানুষকে লোভী হতে শেখায় না। বস্তুবাদী হতে শেখায় না। পরকে হিংসা করতে তো বটেই, দ্বেষ করতে বা ঈর্ষা করতেও শেখায় ন। তা সে ধর্ম হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, ক্রিশ্চিয়ানিজম, শিখ বা যাই হোক না কেন।

শেখর সিং সাহেব বললেন, আসলে মানুষ হিসেবে আমরা অনেকই নিকৃষ্ট হয়ে গেছি। ভোগ্যপণ্যর যোগান যত বেড়েছে, শরীরে এবং মনের শ্রমহ্রাসের নানা যন্ত্র যতই আবিষ্কৃত হয়েছে, মানুষ ততই নিকৃষ্ট হয়েছে চরিত্রে। তারা মনুষ্যত্ব থেকে তীব্রবেগে দূরে সরে যাচ্ছে।

চারণ চুপ করে ভাবছিল।

চন্দ্রবদনী বলল, দাদু আর একটা কথা বললেন না আপনি Russell-এর ওই বইয়ের।

কি কথা?

সেই যে উনি বলেছিলেন, ইংল্যান্ডের Industrial Revolution ঘটে যাওয়ার পরে মানুষেরই উদ্ভাবিত সব যন্ত্রপাতি যত সাধারণ, একঘেয়ে, mundane, কাজ, তার ভার নিয়ে নেবে আর মানুষে তখন অনেক বেশি সময়ে পাবে মানবিক কাজ করার জন্যে। ''To do the humane things.''

শেখর সিং সাহেব বললেন, আর আজ কি ঘটল বল? এত যুগ পরে মানুষ তার কায়িকশ্রম তো সব বিসর্জন দিলই এমনকি মস্তিষ্কও ইজারা দিল Computer নামক যন্ত্রকে। সারা বিশ্বে এখন Computer-এর জয়জয়কার।

বড়ি-বুয়া বললেন, একদিন মানুষ বুঝতে পারবে যে, সে আসলে গুহামানবের সভ্যতাতেই নিজ পায়ে হেঁটে যে ফিরে গেছে। বেশিদিন দেরি নেই আর। যা কিছু গড়ে তুলেছিল মানুষের মতন মানুষেরা সারা পৃথিবীতে, মানবিক, মন-নির্ভর, মস্তিষ্ক-নির্ভর সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত ইত্যাদি ইত্যাদি তার সবকিছুকেই সে সঁপে দিয়েছে Computer-এর হাতে।

এই ক্রিয়াকাণ্ডর মাধ্যমে সে নিজের সবরকম নিজস্বতাকেই বিসর্জন দিতে যে বসেছে এই কথা বোঝার মতন মানুষ এখন আর বেশি নেই। বিজ্ঞানের, বিজ্ঞাপনের জয়ধ্বনির মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্বের মৃত্যুযন্ত্রণার কাতর রব কারও কানে পৌঁছচ্ছে না। সকলেই ভাবছে, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল! কিন্তু অদূর ভবিষ্যতও যে কি বয়ে আনবে তাদের জন্যে সে সম্বন্ধে কারওই কোনও ধারণাই নেই। ওই কম্প্যুটারের বোতামেই মানুষের মরণ-ভোমরা লুকিয়ে আছে। "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু"-এর

চেয়ে বড় সত্য আর নেই। এটা ভাবলেও এই পাহাড়চুড়োর গ্রামে বসে আতঙ্কিত বোধ করি আমি। জানি না মানুষের এই বিজ্ঞান-মনস্কতা, ঈশ্বর-অবিশ্বাস এবং যন্ত্রনির্ভরতা মানুষকে কোথায় কোন সুগভীর কন্টকাকীর্ণ গিরিখাদের দিকে তাড়িত করছে। কোন রাহু ভর করেছে এই ঈশ্বরবোধ-রহিত ভোগবাদী দু-পেয়েদের।

চারণের মনে হল যে, এসব কথা কখনও যে তার মনেও আসেনি এমন নয়। স্বভাবতই ও শিশুকাল থেকেই বিজ্ঞানবিরোধী, যন্ত্রবিরোধী। এই বিজ্ঞানের যুগেও। বিজ্ঞানের এই রগরগে অগ্রগতি মানুষের ভোগবিলাস আর অর্থের যোগান অবশ্যই বাড়াবে, আরও আয়েসী করবে তাদের, কিন্তু সুখি কি করবে আদৌ ? এইসব প্রশ্নে জর্জরিত হয়েছিল বলেই সে কলকাতা ছেড়ে এমন উদ্দেশ্যহীনভাবে হলেও এই সাধুসন্তদের মধ্যে এসে সেইসব প্রশ্নর উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছে। সন্তদের এই অনাড়ম্বর কষ্টের জীবনের মধ্যে তাঁদের সুখটা যে কোথায় লুকিয়ে আছে সেটাই খুঁজতে এসেছে। তাই স্বাভাবিক কারণে চন্দ্রবদনীর দাদু আর চন্দ্রবদনীকেও ভাল করে জেনে ভারী ভাল লাগছে ওর। পাটনের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করছে। অতি গভীর কৃতজ্ঞতা।

এখন কোথাওই আর কোনও শব্দ নেই। সব দরজা-জানালাও তো বন্ধই। তবে রাত গভীর হওয়াতে অনেক নীচ দিয়ে বয়ে-যাওয়া অলকানন্দার মৃদু শব্দ উঠে আসছে, একটানা, মর্মরধ্বনির মতন। নদীর বুকের উপরে উপরে কোনও রাত-চরা পাখি ডাকছে উড়তে উড়তে। তার ক্ষীণ কিন্তু সি-শার্প-এ উচ্চারিত তীক্ষ্ণ ডাক, নদীর শব্দের সঙ্গে বন্ধ দরজা-জানালাতে এসে মৃদু করাঘাত করছে।

চারণের পাশের ঘরই চন্দ্রবদনীর। মধ্যের দরজাতে খিল-তোলা। ওদিকেও খিল আছে। চন্দ্রবদনী খিল তুলতে বলেনি। তবু চারণ খিল তুলে দিয়েছে। দরজার ওদিকেও খিল তোলা কি না, জানে না চারণ।

ভাবছিল ও, ইট-কাঠ-কংক্রিকেটর দরজাতে কত সহজে খিল তুলে দেওয়া যায়। এদিক-ওদিক-সবদিকের দরজাতেই। কিন্তু একজন মানুষের মনে যে অগণ্য অদৃশ্য দরজা-জানালা থাকে— লোভের, আশার, আকাঙ্ক্ষার, বাসনার, কামনার সেই সব তাতেও খিল তুলে, এক ঘর থেকে অন্য ঘরকে নিশ্ছিদ্র আড়াল তুলে দুর্ভেদ্য করা যদি যেত, তবে কী ভালই না হত।

এই ঘরটাই চুকারের। ঘরের বইপত্র, বাথরুমের দরজার পিঠে লাগানো হ্যাঙ্গার থেকে ঝুলিয়ে-রাখা, শেষ রাতে ছেড়ে যাওয়া, একটি ফেডেড জিনস এবং দেওয়ালে চে-গুয়েভারা আর হো-চি-মিন-এর ছবি দেখে এই ঘরের মালিকের বয়স এবং মানসিকতা সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করে নেওয়া যায়।

পাটন, চারণকে যে সব কথা বলেছিল, বিদ্রোহের কথা, উত্তরাখণ্ডর স্বীকৃতির কথা সে সব শুনে চারণ কিছুই বলেনি। বলেনি, কারণ চারণ মনে মনে অত্যন্তই প্রগতিবাদী। ছাত্ররা এবং যুবারা যদি সবসময়ে সজীব না থাকে তাদের ন্যায্য দাবি (যে দাবিকে, তারা অন্তত নিজেদের বিবেকমান্যতাতে ন্যায্য বলে মনে করে) নিয়ে সোচ্চার না হয়, তবে তো তাদের শিক্ষাই বৃথা।

ওর মনে পড়ে গেল ড. সর্ভপল্লী রাধাকৃষ্ণান লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "If we are to preserve ourselves; we must use the lighted torch, the cleansing fire, the spirit that rebels...we hear on all sides about the revolt of youth. I am afraid I have a good deal of sympathy with this attitude of revolt, and my complaint is, that it is not sufficiently widespread,"

যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েরই কর্তব্য নির্দেশ উনি বলেছিলেন :

"Any university that produced graduate who played for safety and cared for comfort had failed in its eventual task. Timidity and conservation were the greatest dangers to the society."

তবে যা নিয়ে বিপ্লব, যা নিয়ে বিদ্রোহ, তা সত্য ও ন্যায্য কারণের জন্যে হতে হবে।

কিন্তু এও ঠিক যে, এই আন্দোলন ও বিপ্লবের অন্য একটি পিঠও আছে। ভাঙা একবার আরম্ভ হলে, টুকরো হওয়া আরম্ভ হলে, কত টুকরো যে হবে তা কেউই বলতে পারে না। "বিপ্লব" বা "আন্দোলন" করার মতন অবস্থার মধ্যে যাতে দেশের কোনও রাজ্যের অধিবাসীদেরই পড়তে না হয়, অসন্তোষ যাতে ধিকিধিকি আগুন হয়ে না জ্বলে কোনও রাজ্যবাসীরই মনে, তা কেন্দ্রর কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার দায়িত্বে যাঁরা থাকেন বা ছিলেন, তাঁরা যদি প্রথম দিন থেকে মনে রাখতেন তবে আজ সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তেই এমন এমন আগ্নেয়গিরিসুলভ অবস্থার উদ্ভব হত না। হওয়া আদৌ উচিতও ছিল না। উরুগুয়ের টুপামারো বা ফিলিপিনস-এর হুকস্‌রা যা বলেন এবং পাটনও গতকাল যা বলছিল : "If the country does not belong to everyone it will belong to no one." তাতে পূর্ণ সমর্থন আছে চারণের। চারণ Rigis Debray-র সেই বিখ্যাত উক্তিতেও বিশ্বাস করে "For a revolutionary, failure is a springboard. As a source of theory it is richer than Victory as it accumulates experience and knowledge."

কিন্তু একই সঙ্গে চারণের T.S. Ellot-এর বিখ্যাত পংক্তিগুলির কথাও মনে হয় :

"Time present and time past.
Are both perhaps present in time future,
And time future is contained in time past."

সারা দিনের নানা সুখকর ঘটনার পরে শুয়ে শুয়ে কত কথাই যে মনে হচ্ছে চারণের। শরীরের বিশ্রাম হয় কিন্তু মননশীল মানুষের মন কি কখনওই বিশ্রাম পায় ?

একটা সুগন্ধি লেপ বের করে দিয়েছেন বড়ি বুয়া চারণের জন্যে। অতিথিদের জন্যে সম্ভবত আলাদা করে রাখা থাকে। পরিষ্কার ওয়াড় পরানো। সম্ভবত আতরও লাগানো।

চারণ ভাবছিল, সচ্ছলতার নিজস্ব কোনও বিশেষ গুণ না থাকলেও তা এক এমন পরিবেশের সৃষ্টি করে যে, তার ভাগীদার হতে পেরে ভালই লাগে। তবে সেই সচ্ছলতা অবশ্যই সৎপথে অর্জিত হওয়া উচিত।

'বড়ি বুয়ার' কচি-কলাপাতা-রঙা উল দিয়ে তার জন্যে সোয়েটার বোনা দেখে চারণের মনের মধ্যেও নানা-রঙা উলের লাছির ভিড় জমতে শুরু করে ছিল। সে মুহূর্ত থেকেই ওর মন এক সুখানুভূতিতে ছেয়ে গেছে। চন্দ্রবদনীর চোখেও কি সেই সময়ে কিছু ও দেখেছিল ? কে জানে। সেই মুহূর্তে নিজেকে যেন সদ্য-যুবক বলে মনে হচ্ছিল, অনভিজ্ঞ, এমন কি সন্দেহহীনভাবে অজ্ঞ বলেও, যে নির্মল অজ্ঞতা, মানুষকে স্বর্গদ্বারে নিয়ে যায় (যে Ignorance is Bliss!)।

বিছানাতে এপাশ ওপাশ করছিল চারণ। ঘুম আসছিল না। অথচ অতখানি পাহাড় চড়েছে, আসা উচিত ছিল। এমন হয় কখনও কখনও। ঔচিত্য, অনৌচিত্যতে পর্যবসিত হয়।

পাশের ঘরে চন্দ্রবদনীও উসখুস করছে মনে হল। তার চুরির রিনঠিন, পায়জোরের অস্পষ্ট ঝুনুঝুনু। কি পরে শুয়েছে চন্দ্রবদনী, কে জানে। তারও কি ঘুম আসছে না ? তারপরই ও ভাবল, চন্দ্রবদনীর মতন রূপসী এবং সর্বগুণসম্পন্না এক নারীর মনে চারণ সম্বন্ধে কী করে এমন বৈকল্য জন্মাল ? সত্যিই কি জন্মাল ? এও কি সম্ভব ? এত তাড়াতাড়ি কি ভুলে যেতে পারল এই বিধবা তার স্বামী রাজবাহাদুরকে ?

তারপরেই মনে পড়ল, কটক শহরের বাখরাবাদে এক রাতে এক সধবা নারীর মনে এবং শরীরেও অমনই বৈকল্য ঘটেছিল।

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম দেবা না জানন্তি,
কুতো মনুষ্যাঃ।"

তার নিজের শরীর মনের কথাও তার নিজের তো অজানাই, হয়তো দেবতাদেরও অজানা। শুধু নারীদের দোষ দিয়ে কি লাভ ? কখন যে কি ঘটে, আগে থাকতে কে বলতে পারে !

ওর মনে পড়ে গেল বাখরাবাদের সেই রাতের কথা। তুলিও এমনই পাশের ঘরেই শুয়েছিল। মাঝরাতে যখন চারণ তার ঘরের দরজাতে মৃদু করাঘাত শুনল, তখন ভেবেছিল, চোর এল কি ?

নতুন জায়গাতে, নতুন বিছানাতে, প্রথম রাতে খুবই দেরি করে ঘুম আসে কিন্তু ঘুম আসার পর হঠাৎ কোনও কারণে ঘুম ভেঙে গেলে ওর মনে হয় নিজের বাড়ির শোওয়ার ঘরেই বুঝি শুয়ে আছে। এমন বোধহয় সকলেরই মনে হয়। তা যে নয়, তা বুঝতে সময় লাগে একটু।

পরমুহূর্তেই ভেবেছিল, চোর আর কবে কার ঘরে মৃদু করাঘাত করে ঢুকেছে? কি করবে, তা ভেবে না পেয়ে চারণ উঠে বসেছিল খাটে। তারপর উঠে গিয়ে দরজা খুলেছিল যথাসম্ভব কম শব্দ করে। ওর মনে করাঘাতের শব্দতেই একটি সন্দেহ জেগেছিল। খুলেই, আতঙ্কিত হয়েছিল মাঝরাতে তুলিকে দরজাতে দেখে। কি করবে তা বুঝে উঠতে পারার আগেই তুলি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে এসেছিল। পরণে ফিকে গোলাপি নাইটির উপরে গাঢ় গোলাপি হাউসকোট।

কি করছেন? কি করছেন?

ফিসফিস করে বলেছিল চারণ। উদ্বিগ্ন, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে।

তখনও তুলিকে ও আপনি করেই সম্বোধন করত। তার কিছুদিন পরে তুলিরই আবদারে "তুমি" বলত। তুলি বলত, যার "বড় আদর" খাই, সে আপনি বললে লজ্জা করে।

ঘরে ঢুকে, তুলি নিজেই ছিটকিনি তুলে দিয়ে হাঁটু গেড়ে চারণের পায়ের কাছে বসে হাঁটুর একটু উপরে, দুউরুর মধ্যে তার মুখটি রেখেছিল। থরথর করে কাঁপছিল উত্তেজনাতে, ভয়ে এবং হয়তো পাপবোধেও চারণের শরীর। তারপরেই চারণ লক্ষ করেছিল যে, তুলির চোখের জলে তার পায়জামার দুহাঁটুর উপরের অংশটুকু ভিজে আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বড় করুণা হয়েছিল তুলির ওপরে, কষ্ট হয়েছিল ওর জন্যে, মায়া হয়েছিল, দয়া এবং আরও কী কী যে হয়েছিল তা ও জানে না। সব অন্যায়বোধ, পাপবোধ, ভয়, উত্তেজনা, আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে নিচু হয়ে দুহাতে তুলিকে কোলে তুলে নিয়ে তার বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়েছিল। আজকে মনে পড়ছে সেই বিছানাতেও আতরের গন্ধ ছিল, অম্বর আতরের। আর আজ বুড়ি-বুয়ার দেওয়া রজাইতে আছে রুহ খসস-এর গন্ধ।

তারপরে অনভিজ্ঞ চারণকে কিছুই করতে হয়নি আর। তৃষিতা, বেচারি কিন্তু অভিজ্ঞা তুলিই করল যা কিছু করার একে একে।

চারণ শুধু ভয় পেয়ে অস্ফুটে একবার বলেছিল, যদি...অ্যাকসিডেন্ট?

তুলি প্রায়ান্ধকার ঘরে তার উষ্ণ কোমল পুষ্ট ঠোঁটে চারণের আধোখোলা ঠোঁটদুটি চেপে বন্ধ করে দিয়ে বলল, লাইগেশান করা আছে।......দশ বছর। কথা বলবেন না এখন।

বর্ষার বাগান থেকে রজনীগন্ধা আর বেলফুলের গন্ধ উড়ছিল। একটা মস্ত কনকচাঁপা গাছ ছিল তুলিদের বাড়ির বাগানের গেটের পাশে। কনকচাঁপার তীব্র গন্ধ ভাসছিল বৃষ্টি শেষের হাওয়াতে। পরিবেশে। সেই রাতটি ছিল শুক্লপক্ষের। সপ্তমী কী অষ্টমী হবে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আধখানা চাঁদের আলো জানালার কাছের কাঁঠালগাছেদের ভিজে পাতাতে পড়ে পিছলে আসছিল খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে। স্নিগ্ধ দুধলি আলোর আভাসে আভাসিত করেছিল তুলির পেঁজা-তুলোর মতন স্নিগ্ধ, সুগন্ধি নগ্নতাকে। দূরে বহমানা মহানদীর জলের গন্ধ আসছিল জোলো হাওয়াতে।

সেই বহুদূরে ফেলে-আসা রাতটাকে এখনও কোনও স্বপ্ন অথবা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হয় চারণের। কেওড়াতলার ইলেকট্রিক চুল্লিতে ছাই হয়ে-যাওয়া উনচল্লিশ বছরের তুলির অস্তিত্বটাও এক স্বপ্ন বলে মনে হয়।

পাটনের সঙ্গে এখানে দেখা না হলে সেই সব কথা, মনে হয়তো আসতও না। সেই রাতেই বুঝেছিল চারণ যে, নারীরা পুরুষদের থেকে অনেক, অনেকই বেশি সাহসী। জীবনের সব ব্যাপারেই। কী রণে, কী রমণে।

রুদ্রপ্রয়াগে চন্দ্রবদনীদের বাড়ির উঠোনের সামনেই যে মস্ত সিলভার-ওক গাছটি আছে, তার মগডাল থেকে কোনও বড় রাতচরা শিকারি ঈগল হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠল।

চমকে উঠেছিল চারণ।

নিজেকে বকল চারণ। ও নিজেও কি রাতের শিকারি পাখিরই মতন?

ছিঃ ! ছিঃ !

নাঃ। চারণ বলল নিজেকে, কী করতে এই দেবভূমিতে এসেছিলে, কী খুঁজতে এসেছিলে পাতক ? আর মনের মধ্যে কি পরম স্বার্থপরায়ণ ও সাধারণ সব Mundane স্থূল ভাবনা উঁকি-ঝুঁকি মারছে অনেকক্ষণ থেকে ! ছিঃ। শরীরের মতন Mundane ব্যাপার মনসর্বস্ব শিক্ষিত মানুষের কাছে আর কি আছে ? ও তো নিজেকে মনসর্বস্ব জেনে চিরদিনই শ্লাঘাবোধ করে এসেছে। আত্মার শুদ্ধি সম্পূর্ণ করতে এসে কি শরীরসর্বস্ব করে তুলল নিজেকে ?

মনে মনে অন্য প্রসঙ্গে ফিরল ও।

চন্দ্রবদনীর দাদু কেশর সিং সাহেব বলেছিলেন ধম্মপদের উপদেশের কথা। ভারী ভাল লাগছিল শুনতে। যদিও কয়েকটির কথাই মাত্র বলেছিলেন উনি চারণকে। তাও ক্রমানুসারে নয়। যেমন যেমন মনে এসেছিল তাঁর তেমন তেমনই বলেছিলেন।

(১) বলেছিলেন, ঘৃণাকে কখনও ঘৃণা দিয়ে জয় করা যায় না। প্রেমই একমাত্র বোধ যা দিয়ে ঘৃণাকে জয় করা যায়।

(২) একজন মূর্খ, যে নিজেই জানে যে সে মূর্খ, শুধু সেই কারণেই সে একজন জ্ঞানী মানুষ। যে মূর্খ নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবে সে অবশ্যই মূর্খ।

(৩) যদি কেউ হাজার মানুষকে কোনও যুদ্ধে পরাস্ত করে থাকেন তিনি তো মহাবীর। কিন্তু তাঁর চেয়েও বড় বীর তিনি, যিনি নিজেকে জয় করতে পেরেছেন।

(৪) যদি কেউ একশ বছর বেঁচেও পরম সত্য যা তাকে না জেনে থাকেন তবে যিনি সেই সত্যকে জেনে গেলেন তাঁর মাত্র একদিনের জীবনও অনেক মূল্যবান প্রথমজনের জীবনের চেয়ে।

একটু থেমে থেমে, চন্দ্রবদনীর ঠাকুর্দা ধম্মপদের এই নিদানগুলি যখন বলছিলেন তাঁর রোদ-পোড়া হলদেটে-তামাটে মুখে ফানুসের মতন একটি হাসি ঝুলেছিল।

শেষে উনি শেষ উপদেশটা বলেছিলেন :

মৃত্যুর হাত থেকে কারওকেই কারও ছেলে বা কারও বাবা বাঁচাতে পারেন না। মৃত্যু যখন দরজাতে কড়া নাড়ে তখন তার হাত থেকে বাঁচাতে পারেন না জ্ঞাতিগুষ্টি, প্রজা বা শাস্ত্রীরাও, কেউই পারে না। মৃত্যু অমোঘ, অবিসংবাদী।

হৃষীকেশ থেকে যে অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা এসেছিল, সেটাকে সম্ভবত হোটেলের অমিতাভই হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে মানা করেছিল। চন্দ্রবদনীদের বাড়িতে যেতে হলে যেখানে বড় রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চড়াইয়ে উঠতে হয়, সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল গাড়িটাকে সে।

চন্দ্রবদনীর সঙ্গে তার ঠাকুর্দা কেশর সিং সাহেব এবং চামৌলির "বড়ি বুয়ার" আশীর্বাদ নিয়ে নেমে এসে গাড়িতে যখন উঠল চারণ, তখন আলো ফুটে গেছে, তবে রোদ আসেনি। পাহাড়তলিতে তো বটেই, অলকানন্দাতেও।

নদীরও রূপ, সমুদ্রেরই মতন, দিনে রাতের প্রহরে প্রহরে যে কত বিভিন্ন হয়, তা এই সব অঞ্চলে এসে লক্ষ করে ও অবাক হয়েছে।

নদী তো এর আগেও কতই দেখেছে ! কিন্তু যেখানেই গেছে এর আগে বেড়াতে, সেখানেই হয়তো ওর কলকাতার মনটা আর চোখদুটিকে কলকাতার অনুষঙ্গের সঙ্গে সাথী করে বয়ে নিয়ে গেছে। এই বোধহয় প্রথমবার নিজের উপরে নিজে তিতিবিরক্ত হয়ে, নিজের জীর্ণ, মলিন, অভ্যেসে-অভ্যেসে পরাভূত "আমিটা"র ভিতর থেকে ওর "অন্য" আমিকে নিয়ে এই দেবভূমিতে

এসেছে। অন্যত্র যখন গেছে এর আগে চোখ দিয়ে দেখেছে অনেক কিছুই। কিন্তু আবার দেখেওনি। মানে, চোখ দিয়ে দেখেছে, মন দিয়ে দেখেনি। তাই এবারের চারণের জন্যে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন চমক উপস্থিত হচ্ছে। চারণের জীবন সাম্প্রতিক অতীত থেকেই কোনও এক আশ্চর্য যাদুকরের যাদুদণ্ডের পরশে সত্যিই নতুন হয়ে উঠেছে। নিজেই চমৎকৃত হয়ে যাচ্ছে ও। প্রতিমুহূর্তে।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। অলকানন্দার উপরের ছোট ব্রিজ পেরিয়ে এখন চলেছে অলকানন্দাকে ডানপাশে রেখে শ্রীনগরের দিকে। দেখতে দেখতে জিম করবেট-এর রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতা শিকারের জায়গাটাও পেরিয়ে এল ওরা। পাটনের বর্ণনা-দেওয়া সেই বোর্ডটিও দেখল। এক ঝলক মাত্র, চলন্ত গাড়ি থেকে।

চন্দ্রবদনী বলল, দিনের এই সময়টুকুকে ভারী ভাল লাগে আমার।

তাই ?

হুঁ।

পউরিতে যাওয়ার কি অন্য কোনও পথ নেই ?

এখান থেকে ? না, এখান থেকে একটিই পথ।

শ্রীনগর হয়ে ?

হ্যাঁ।

শ্রীনগরের উচ্চতা কত ?

শ্রীনগর উপত্যকায়। সমতলও। তবে সমুদ্রতল থেকে দুহাজার ফিট মতন হবে। কেন ? দেবপ্রয়াগ থেকে আসবার সময়েতো শ্রীনগর হয়েই এসেছিলেন ! লক্ষ করেননি বুঝি।

ফিট কেন ? মিটার নয় কেন ?

বলেই বলল। আমরা অবশ্য "সতেরোশ ষাট গজে মাইল" এই হিসেবই জেনে এসেছি। আমি গোঁড়া মানুষ। ক্যালকুলেটরও ব্যবহার করতে পারি। পারি না, না। অথবা করি না।

বাঃ।

বাঃ কেন ?

আমিও পারি না।

চন্দ্রবদনী বলল, লজ্জিত না হয়েই। কম্প্যুটারের যুগে যে-মানুষ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারে না তার অবশ্যই লজ্জা হওয়া উচিত। তবু হয় না দেখেই লজ্জিত হয়।

চারণ শুধোল, এই জায়গাটির কি নাম ?

চান্টিখাল।

তারপরই বলল, আশ্চর্য ! দেখতে দেখতে আমরা দশ মাইল চলে এলাম।

অর্থাৎ ষোলো কিমি মতন ?

হবে।

রুদ্রপ্রয়াগের উচ্চতা কত ?

দুহাজার ফিট মতো।

এই চান্টিখাল থেকে শ্রীনগর কতদূর পড়বে ?

বারো-তেরো মাইল হবে।

শ্রীনগর থেকে কোনদিকে যাব আমরা ?

আপনি পাটনের সঙ্গে যে পথ দিয়ে এসেছেন, দেবপ্রয়াগ হয়ে, অলকানন্দার বাঁপাশ থেকে ডানপাশে নতুন সেতু পেরিয়ে, সেই পথে না গিয়ে আমরা চলে যাব শ্রীকোট হয়ে পউরি। চীর, পাইন, দেওদার-এর সুগন্ধি বনের মধ্যে দিয়ে প্রায় খাড়া চড়াইয়ে। পউরির উচ্চতা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট মতন।

আপনার পউরিতে কি কাজ ?

কাজ তো তেমন কিছু নেই ! আমার শ্বাশুড়ি ওখানে এসে রয়েছেন ট্যুরিস্ট লজ-এ। চেঞ্জের জন্যে। প্রতি বছরই এখানে এই সময়ে এসে থাকেন দিন পনেরো।

ও।

চারণের মনে নানারকম ভাবনা এল। চন্দ্রবদনী, তার বাড়ি, তার ঠাকুর্দা, তার বড়ি-বুয়া পর্যন্ত ঠিকঠাকই ছিল। যদিও চুকারের সঙ্গে দেখা হল না। কিন্তু চন্দ্রবদনীর চলে যাওয়া স্বামীর মায়ের কাছে, কাছে মানে, তার শ্বাশুড়ির কাছে তাকে হাজির করানোর পেছনে কি অভিপ্রায় থাকতে পারে, তা ভেবে পেল না চারণ। চন্দ্রবদনী স্থানীয় মেয়ে এবং অত্যন্ত সপ্রতিভ, শিক্ষিত মেয়ে। তার পক্ষে রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে পউরি একা একা যাওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয়। অথচ পাটন কেন যে চারণের জিম্মায় দিল তাকে, তা কে জানে ! এর পেছনেও কি কোনও চক্রান্ত আছে ? He can very well small a rat। সে কি জ্যোতি বসু হয়ে যাবে ? চতুর্দিকেই, তাঁর নিজ মতে, গভীর চক্রান্ত-বেষ্টিত ?

মুখে সে প্রসঙ্গে কিছু না বলে, চারণ বলল, পউরি জায়গাটাতে কী আছে ? দেখার মতন কিছু আছে ?

দেখার মতন কিছু আছে কি নেই সে কথা তো যে দেখে তার চোখ, আর যাকে বা যা দেখে, তার গুণপনার উপরেই নির্ভর করে। তৃতীয় জনের কি কোনও এক্তিয়ার আছে সে বিষয়ে মন্তব্য করবার ? তবে ?

পউরি, জওহরলাল নেহরুর অত্যন্ত প্রিয় জায়গা ছিল। বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা হিসেবে। এখান থেকে যে কতগুলি বরফাবৃত চুড়ো পরিষ্কার দেখা যায়, তা বলার নয় ! ট্যুরিস্ট লজ-এর বাগানে রোদের মধ্যে চেয়ার পেতে বসে থাকলেই দিন কেটে যায়। সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে মার্চ পর্যন্ত তো এই দৃশ্যের কোনও তুলনাই নেই।

কোন কোন পিক দেখা যায় ?

কত নাম বলব ? যেমন, স্বর্গারোহিনী, চৌখাম্বা, হাতিপর্বত, ত্রিশূল, নীলকণ্ঠ, কামলিং...

বা বাঃ। আপনিও ভূগোলের দিদিমণি হয়ে গেলেন দেখছি।

আরও আছে।

যেমন, সুমেরু পর্বত, খর্চাকুণ্ড। কেদারনাথ তো আছেই ! এ ছাড়াও আছে বান্দরপুঞ্ছ, ভৃগুপন্থ, জৌনলি, গঙ্গোত্রী গ্রুপ ইত্যাদি।

এ সবই শৃঙ্গ ?

হ্যাঁ।

এত শৃঙ্গর মধ্যে বাস করে কেউ ? শৃঙ্গবিদ্ধ হয় না ?

চন্দ্রবদনী হেসে বলল, যাদের মধ্যে বিদ্ধ হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তারা হয়তো হয়।

চারণ হেসে বলল, বাবাঃ এক নাগাড়ে ট্যুরিস্ট গাইডেরাও এত নাম আউড়াতে পারবে না।

হাসল, চন্দ্রবদনী।

রোদে এখন চারপাশ ঝলমল করছে। রোদ এসে পড়েছে চন্দ্রবদনীর কোলে।

হালকা ছাই-রঙা একটি শান্তিপুরী শাড়ি পরেছে ও। সাদা ব্লাউজ। শাড়ির পাড় গাঢ় খয়েরি। চুলে একটি সাদা চন্দ্রমল্লিকা গুঁজেছে। বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলের মতন কার্তিকের প্রথম চন্দ্রমল্লিকা। আ লিটল আর্লি ফর দ্যা সিজন, দো। গায়ে একটি ছাইরঙা পশমিনা শাল। তার শরীর থেকে ফিরদৌস আতরের হালকা খুশবু উড়ছে। কেন জানে না, ভারী ভাল লাগছে চারণের। এত ভাল বহুদিন, বহু বছর লাগেনি। তুলির কাছাকাছি যখন থাকত, তখন ছাড়া। তাও শেষের দিকে তুলির সঙ্গও তেমন ভাল লাগত না।

এই মুহূর্তে, এক গভীর কারণহীন প্রশান্তি তার মনকে কানায় কানায় পূর্ণ করে তুলেছে। কেন জানে না, বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও নারীর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে শরীর পৌনঃপুনিক ভাবে এসে গেলেই সম্পর্কর জেল্লাটা সম্ভবত চটে যায়। শারীরিক ব্যাপার মাত্রই বোধহয় স্থূল। কিংবা কে

জানে! চারণের মানসিকতাটাই বোধহয় অস্বাভাবিক সূক্ষ্ম। সবরকম স্থূলতার সঙ্গেই তার জন্মবিরোধ। আর সে জন্যেই তো এত এবং এতরকম কষ্ট ওর! জয়িতার মানসিক সঙ্গয় ও খুবই আনন্দ পেত, কিন্তু যে মুহূর্তে চারণ বুঝে গেছিল যে, জয়িতা তাকে ভালবাসে না, ভালবাসা ভালবাসা খেলা করে মাত্র, ধড়িবাজ বেড়াল যেমন ইঁদুরের সঙ্গে খেলে, সেই মুহূর্তেই জয়িতার প্রতি সব দুর্বলতাই আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছিল। তবু, জয়িতার মধ্যেও ভাললাগার মতন অনেক কিছুই ছিল। প্রতিরাতেই জয়িতাকে ফোন করত একবার করে পুরনো অভ্যেসের বশে। কোনও কোনও উইক-এন্ডে বা রবিবার তাজ-বেঙ্গলে কী ওবেরয় গ্রান্ডে কী অ্যাম্বারের দোতলাতে বা বেঙ্গল-ক্লাব বা স্যুইমিং ক্লাবে খেতে যেত ওকে নিয়ে। একদিন "পিয়ারলেস ইন"-এর আহেলীতে গিয়ে বাঙালি খানাও খেয়েছিল। কিন্তু সেই সব ক্ষিদেহীন খাওয়া, প্রেমহীন কাম এরই মতন মনকে আলোড়িত করত না আদৌ। সেই সব outing-ও অভ্যেসেই পর্যবসিত হয়ে গেছিল। চারণের মতনই হয়তো অনেক আধুনিক, শিক্ষিত, কৃতী মানুষই বোঝেন যে, জীবনে অন্য অনেক বিপদের হাত থেকেই বাঁচা যায়, বাঁচা যায় না একঘেয়েমি, অভ্যেসের দাগা আর জরার হাত থেকে। অমন জীবন, মৃত্যুর চেয়েও অনেকই বেশি অনাকাঙ্ক্ষিত।

চন্দ্রবদনীর মধ্যে শতকরা কুড়ি ভাগ তুলির, তুলির শর্তহীন সমর্পণ-তন্ময়তা, কুড়িভাগ জয়িতার চাকচিক্য, সমাজে প্রেজেন্টেবিলিটি এবং ষাট ভাগ চন্দ্রবদনী আছে। ওরিজিনাল। তার কোনওই প্রোটোটাইপ বা বিকল্প নেই। চন্দ্রবদনীর মতন মেয়ে হয়তো ভারতবর্ষে একটিই! গাড়োয়াল হিমালয়ের বরফাবৃত একমাত্র শৃঙ্গ, কুঞ্জাপুরী থেকে দেখা চন্দ্রবদনীরই মতন।

লোকজন গাড়িঘোড়া দেখছি আজ শ্রীনগরে এখনও খুবই কম। ভালই হল। আমরা ফাঁকায় ফাঁকায় পউরির রাস্তাতে উঠে যেতে পারব।

চন্দ্রবদনী বলল।

প্রায় আটটা তো বাজে। শহর যেন সত্যিই আজ একটু বেশি ঘুমঘোরে আছে বলে মনে হচ্ছে। আসবার সময়ে এগারোটা নাগাদ এসে পৌঁছেছিলাম। তখন প্রায় কলকাতা শহর বলেই মনে হয়েছিল।

চারণ বলল।

চন্দ্রবদনী বলল, এই শ্রীনগরই তো ছিল আগে গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী। শ্রীনগর চিরদিন শহরই ছিল! গোর্খাদের আক্রমণে সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রিটিশের সাহায্য নেওয়ার সময়ে গাড়োয়ালের আধখানি ভেট দেন গাড়োয়াল রাজ। গাড়োয়াল যে দুভাগ হয় শুধু তাইই নয়, দুটি আলাদা নামও হয়, গাড়োয়ালের। "তেহরি" গাড়োয়াল আর "পউরি" গাড়োয়াল। গাড়োয়াল-রাজ-এর রাজধানী শ্রীনগর থেকে "তেহরিতে" স্থানান্তরিত হয়ে যায়। আর পউরি গাড়োয়ালের পুরোটাই চলে যায় ব্রিটিশের তাঁবে।

চারণ বলল, সেই জন্যই জিম করবেট-এর লেখাতে পড়েছি পউরির ডিভিশানাল কমিশনার, করবেট-এর বন্ধু ইব্বটসন সাহেব থাকতেন পউরিতে। জানতাম না যে পউরি, পউরি-গাড়োয়ালের হেড-কোয়ার্টার্সও ছিল পউরিতে। উঁচু জায়গা। সুন্দর নিসর্গ। সাহেবদের বেশ "হোম হোম" লাগত বোধ হয়, তাই ডিভিশানাল কমিশনার সেখানেই থাকতেন।

হয়তো তাই।

চন্দ্রবদনী বলল। অবশ্যই ওটি ছাড়াও আরও নানা কারণ ছিল।

তারপরই বলল, আজ কী বার? রবিবার কি?

না তো!

একটু পরেই জেগে উঠবে শহর রই-রই করে। শহর জেগে ওঠার আগেই আমরা পেরিয়ে যাব শ্রীনগর। ও, জানি না পাটন আপনাকে বলেছে কি না, এই শ্রীনগরেই কিন্তু গাড়োয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ও। উত্তরাখণ্ড নিয়ে যে আন্দোলন তার Epicentre হচ্ছে শ্রীনগরের বিশ্ববিদ্যালয়।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আর বিখ্যাত কমলেশ্বর মন্দিরও এখানেই। মানুষে বলেন, এই

মন্দিরেই নাকি রামচন্দ্র হাজার পদ্মফুল নৈবেদ্য দিয়েছিলেন মহাদেবকে। "কমল"-এর অর্ঘ্য দান করেছিলেন বলেই এই শিবের নাম কমলেশ্বর শিব। কমলেশ্বর মন্দির ছাড়াও অনেক মঠ-মন্দিরও আছে কাছাকাছি।

শ্রীনগর থেকে রুদ্রপ্রয়াগ কত কিমি ?

চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে।

এবারে গাড়িটা বাঁদিকে মোড় নিল।

আমরা এবারে দেবপ্রয়াগের পথ ছেড়ে দিলাম। দুকিমি এসেছি শ্রীনগর থেকে এবারে ক্রমশই চড়াইয়ে উঠবে গাড়ি। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট উঠবে তো। মাত্র তিরিশ কিমি পথ বেয়ে এতখানি উঁচুতে উঠতে হলে চড়াই ভাল খাড়া হবেই।

চন্দ্রবদনী বলল।

তা ঠিক।

দেখতে দেখতে আবহাওয়াও বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দুপাশের গাছগাছালির প্রকৃতি বদলে যেতে লাগল। ডানদিকে খাদ আর বাঁদিকে ঘন বনে ঢাকা প্রায় খাড়া পর্বত। চীর, পাইন, দেবদারু, হর্স-চেস্টনাট, ওক।

মিনিট পনেরো পর যখন কিছুটা উঠেছে উপরে, চারণ ড্রাইভারকে বলল, গাড়ি রোকোতো জারা।

গাড়ি দাঁড় করালে, গাড়ি থেকে নেমে জোরে শ্বাস নিল। বাঁদিকের খাড়া পাহাড়ের উপরে গ্রাম আছে। গরু চরাচ্ছে কোনও রাখাল ছেলে। গরুর গলার ঘণ্টা বাজছে। দুটি ছেলে কাছে দূরে কথা বলছে। ভারী শান্তি এখানে। নির্মল পরিবেশে, নীলাকাশে, দূষণমুক্ত এইরকম কলুষহীন ভূখণ্ড যে আজও আছে এই পৃথিবীর বুকে, তা জেনেই আনন্দ হচ্ছে চারণের।

হাওয়া নেই কিন্তু এক আশ্চর্য পবিত্র সুগন্ধ চারদিকে, গাছ-গাছালির, ঘাস-পাতার। গন্ধটা পুজোর ঘরের গন্ধের মতন। কে জানে! এই জন্যেই হয়তো এসব দেবভূমি।

গাড়ির ভিতরেই বসে চন্দ্রবদনী চারণের পাগলামি দেখে হাসছিল।

চারণ ঘাড় উঁচু করে উপরে চেয়ে দেখছিল।

চন্দ্রবদনী বলল, সব পর্বতকেই মনে হয় অগম্য না হলেও দুর্গম। উত্তুঙ্গ। কিন্তু সেটা আপাত দৃষ্টিতে। এই খাড়া পর্বত-এর উপরে উঠতে পারলে দেখবেন সেখানে সবই আছে। মানুষের পা পড়েনি এমন জায়গা ত্রিলোকেই খুব বেশি নেই। এটা মন্দ যেমন, আবার ভালও। মালভূমি আছে, গোচারণ-ভূমি, গ্রাম, ছোট ছোট জনপদ দু-পাঁচ ঘরের। উপরে উঠলে দেখা যাবে আমাদের গ্রামেরই মতো সেখানেও রোদে লেপ শুকোতে দেওয়া হয়েছে, গরু-ছাগল চরছে, শিশুর চিৎকার, নারীর হাসি, বৃদ্ধর কাশি। এইসব নিয়েই হয়তো প্রকৃতি সম্পূর্ণ হয়। মানুষ বা বিধাতার নিজের হাতে গড়া কোনও কিছু দ্বারা প্রাণিত না হলে প্রকৃতি যেন অসম্পূর্ণ থাকে।

চারণ মুখে কিছু বলল না। কিন্তু মনে মনে বলল, তা কেন! গাছ-গাছালির, পাখ-পাখালির, পোকা-প্রজাপতি, ঝিঁঝিঁপোকা-নীলমাছির কি প্রাণ নেই। প্রাণ তো সর্বত্রই। প্রকৃতি সবসময়েই অন্য কারো চেষ্টা ব্যতিরেকেই প্রাণিত।

ও ভাবছিল, আশ্চর্য! খাড়াই চড়ছে, উঠেও এসেছে প্রায় পাঁচ কিমি মতো অথচ উলটোদিক থেকে একটিও গাড়িকে নামতে দেখল না। এখন পর্যন্ত। উলটোদিক থেকে আসা কোনও ট্র্যাফিক নেই বলেই ড্রাইভার একটু অমনোযোগী হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। অদৃশ্য বাঁকে হর্ন দিচ্ছে না। এমন পাহাড়ি পথেও যতখানি উচিত ততখানি পথের বাঁদিক ঘেঁষে গাড়ি চালাচ্ছে না। যে কোনও মুহূর্তেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অভ্যেস বসে চারণ প্রতি বাঁকের আগে থাকতেই তাকে বলে চলেছে হর্ন বাজানা। হর্ন বাজানা!

এই ড্রাইভারটি আড়িয়া পাঞ্জাবি। সম্ভবত দিল্লি বা হরিয়ানাতে বাড়ি। কথায় কথায় 'হান্‌জি, হান্‌জি' করে বটে কিন্তু বিনয়ী আদৌ নয়। বেশ দুর্বিনীত। অথবা কানে কম শোনে। কানে কী

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

একটা ওষুধও লাগাচ্ছিল রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বেরোবার আগে। ডান কানের ফুটোতে ওষুধটা বিল্ট-ইন ড্রপারে করে ঢেলে, ডান কানের পাতা ধরে এমন টানাটানি করছে তখন থেকে একটু সুযোগ পেলেই যে, চারণের মনে হচ্ছিল কানের পাতাটি বোধহয় স্থানচ্যুতই হবে। মানুষটার নাক চিবুক কাটাকাটা হলে কী হয়, বুদ্ধিটা সম্ভবত ভোঁতা। কথা বললে, বুঝতে সময় নেয় এবং শুধু সময়ই নেয় না, কথা ঠিকমতো বোঝেও না। আর যখন বোঝেও, তখনও তা শোনে না। অবাধ্য এবং গোঁয়ার। একটি বিস্কিট-রঙা ফুলহাতা সোয়েটার পরে, ডানদিকে বেঁকে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে, মুখে এমনই এক ভাব ফুটিয়ে বসে রয়েছে, যেন চারণদের বৈতরণীই পার করাচ্ছে সে।

নাম ক্যা হ্যায় তুমহারা ?

জী ?

তুমহারা নাম ক্যা ?

রওনাক সিং।

বাঁতে তো শুনা করো।

আপ বহুতই জাদা বাঁতে করতেঁ হ্যায়। বেকারকি। বাঁতে শুননা, না গাড়ি চালানা ?

চারণ, চন্দ্রবদনীর সামনে অপ্রতিভ হল।

ভাবল, ঠিক আছে। মওকা আসুক। তোমাকে কি করে কড়কাতে হয় তখন দেখাব।

মুখে বলল, হর্ন বরাবর হর-টার্নিহিমে বাজাতে চলনা।

রওনাক সিং উত্তর দিল না কোনও। বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে ডান কানটা নিয়ে আবার টানাটানি করতে লাগল।

এবারে অনেকখানি উঠে এসেছে ওরা। সত্যিই আশ্চর্যের কথা। এতখানি পথ এল অথচ একটিও প্রাইভেট গাড়ি, বাস, জিপ বা ট্রাক উঠতে কী নামতে দেখল না এই পথ বেয়ে। পউরি শহরটা কি এমনই নির্জন, নিরুপদ্রব ? এখনও ? তাহলে প্রতি বছর ছুটিতে এখানে এসেই থাকবে এবার থেকে। জওহরলাল নেহরু হয়তো এই কারণেই আসতেন এখানে ঘন ঘন।

রাস্তাটা বাঁয়ে একটা মোড় নিতেই চারণ স্বতঃস্ফূর্ত, উচ্ছ্বসিত স্বগতোক্তি করে উঠল। বাঃ। অপূর্ব।

চন্দ্রবদনী স্মিতহাসি হাসছিল, মুখে কথা না বলে।

ডানদিকে পর্বতশ্রেণীর অতগুলি চুড়ো সকালের রোদে একেবারে ঝকমক করে উঠল। আর চুড়ো বলতে সাধারণত মানুষে যা বোঝে তেমন চুড়োও নয়। সবকটি চুড়োই বরফাবৃত তো বটেই পর্বতের শরীর থেকে এবং হাঁটু পর্যন্ত সবটাই বরফে মোড়া। পুরো পর্বতমালাই বরফাবৃত। কোন চুড়ো ফেলে কোন চুড়োকে দেখবে ?

চারণ বলল, কী যেন সব নাম বলেছিলেন আপনি ? আর একবার বলুন না ? মিলিয়ে নিই। এক এক করে।

চন্দ্রবদনী হেসে বলল, সত্যি সত্যিই আবার বলতে হবে ?

সত্যি সত্যিই ?

তবে বলছি আবার মিলিয়ে নিন।

বলতে যাওয়ার আগেই পথটা বাঁদিকে আর একটা বাঁক নিতেই সবগুলো ঝকঝকে শৃঙ্গ একইসঙ্গে মিলিয়ে গেল।

চারণ বলল, একী লুকোচুরি !

চন্দ্রবদনী হাসছিল। বলল, সমস্ত প্রার্থিত জিনিসই যদি অত সহজে পাওয়া যেত তাহলে তার দাম থাকত না কানাকড়িও। তাছাড়া যা প্রার্থনার, তা পাওয়া হয়ে গেলেও পাওয়ার ঘরে বেশিদিন কখনওই লাগাতার তাকে রাখতে নেই।

তাই ?

বলেই, চারণ অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরেই আবার পথটা একটা বাঁক নিতেই সবকটি শৃঙ্গ একই সঙ্গে আবারও ঝকঝক করে উঠল।

পাহাড়ে, আদেখলা বাঙালি চারণ, গাড়োয়াল-কন্যা চন্দ্রবদনীকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, ওই যে সবকটা দেখা যাচ্ছে আবার।

চন্দ্রবদনী হেসে বলল, সব নয়। আধেক ধরা পড়েছে আপনার চোখে, আধেক এখনও বাকি আছে। এখান থেকে প্যানোরোমিক ভিউ তো পাওয়া যাচ্ছে না।

তবু, নামগুলো আরেকবার বলুনই না। আপত্তি আছে ?

চারণ স্কুলের ছাত্রর মতন ছটফট করতে করতে বলল।

চন্দ্রবদনী হাসতে হাসতে বলল, নাম বলছি। কিন্তু কোনটা কি তা পউরিতে পৌঁছে ট্যুরিস্ট লজ-এর বাগানে বসে চিনিয়ে দেব আপনাকে। নামগুলো এখন উলটোপালটা হয়ে যাবে, মানে যেমন দেখতে পাচ্ছেন চোখে তেমন ক্রমানুসারে হবে না।

নাই বা হল। বলুন!

স্বর্গারোহিনী, চৌখাম্বা, হাতিপর্বত, ত্রিশূল, নীলকণ্ঠ, কামলিং...

তারপর ?

সুমেরু পর্বত, খর্চাকুণ্ড, কেদারনাথ, বান্দরপুঞ্ছ, ভৃগুপন্থ, জৌনলি, গঙ্গোত্রী গ্রুপ এইসব।

আচ্ছা, সত্যিই কি মানে, মহাপ্রস্থানে-আসা পাণ্ডব লক্ষ্মণ হনুমানজির লেজে পথ আটকে থাকাতে, যেতে বাধা পেয়েছিলেন ?

চন্দ্রবদনী হাসল।

বলল, আপনাকে কে বলল ?

বলেছিলেন, হৃষীকেশের কাছে কুঞ্জাপুরীর মন্দিরের পুরোহিত কুঁয়ারসিংজী।

তাই ?

তারপর বলল, দেখুন, আমি যেমন আমার দাদুর গৌতম বুদ্ধকেও চোখে দেখিনি তেমন হনুমানজিকেও চোখে দেখিনি। কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ এই যে মহাবীর, মহম্মদ, যিশুখ্রিস্ট, শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব ইত্যাদি ইত্যাদি ধর্মগুরুকে মেনে নিয়ে, তাঁদের অনুশাসন মেনে নিয়ে, তাদের নিজের নিজের জীবনে শুদ্ধতা, ন্যায়, নীতি আনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, বর্তমান সময়ের সর্বজ্ঞ এই বিষম ভুঁইফোড় অবিশ্বাসীদের মধ্যে বাস করেও, সেটাই বা কম কি ? পৃথিবীর কোনও ধর্মই, কোনও ধর্মগুরুই তো কোনও মানুষকে খারাপ কিছু করতে বলেননি এ পর্যন্ত। যা-কিছুই মানুষকে ন্যায় বা শুভবোধের প্রতি মনোযোগী করে তোলে, সে সবকে খারাপ আখ্যা দেওয়ার কি দরকার ? লক্ষ্মণ যদি হনুমানজির লেজ এ পথ আটকেই গিয়ে থাকেন এবং হনুমানজি যদি পরে দয়াপরবশ হয়ে নিজেই তাঁর লেজকে সরিয়ে লক্ষ্মণের চলার পথ সুগম করে দিয়ে থাকেন, অন্তত তেমন করেছিলেন বলে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, তাতে আমার আপনার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটছে কি ? কোনও ধর্মে আর এইরকম কাহিনী নেই ?

চারণ চুপ করে গেল। বুঝল যে, তার প্রশ্নটিই বোকার মতন হয়েছিল।

বেশ অনেক উপরে উঠে Snow-line-এর অনেক নীচে, পাদদেশে, বাড়ি ঘর দেখা যাচ্ছে। পউরিতে কি পৌঁছে গেল ওরা ?

ভাবছিল চারণ। একটু পরই প্রায় খাড়া পথটি একটি সমকৌণিক বাঁক নিয়েছে বাঁয়ে। গাড়িটিও বাঁক নিতেই ওরা চমকে উঠে দেখল প্রায় শ দুই ছেলে, তাদের মধ্যে দু-তিনজন মেয়েও ছিল, একটা সমতল জায়গাতে, পথ অবরোধ করে জমায়েত হয়েছে। জায়গাটি পাহাড়ি শহরের "ম্যাল"-এর মতন। বাজার, বাসস্ট্যান্ড সবই সম্ভবত এখানে। কিন্তু সব কিছুই বন্ধ রয়েছে। থমথমে ভাব একটা। আজ শ্রীনগরের সকাল থেকেই চারণের কেমন অস্বস্তি লাগছিল। তারপরে যান-বিরল এতখানি পথ এসে এই অবরোধ! কী ব্যাপার, কে জানে!

ওদের গাড়ি দেখেই ছেলেরা তিনদিক দিয়ে তেড়ে এল ভীষণ রাগের সঙ্গে চিৎকার করতে

করতে। বলতে লাগল, রোকো! গাড়ি রোকো!

বুদ্ধিহীন, গোঁয়ার রওনাক সিং গাড়ি জোরে চালিয়ে আরও উপরের ট্যুরিস্ট লজ-এর দিকে যেতে চেষ্টা করছিল মূর্খের মতন ওই উত্তেজিত জনতাকে অগ্রাহ্য করে, প্রায় তাদের চাপা দিয়েই।

চারণ, আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করল।

ছেলেরা, গাড়ির বনেটে, দরজায়, ছাদে জোরে জোরে থাপ্পড় এবং লাথি মারছিল। ব্যাপারটা কি? তা ভাল করে বোঝবার আগেই ইডিয়ট মাথা-মোটা রওনাক সিং গাড়িটা চড়িয়ে দিল জনতার উপরে। যদিও তখন গাড়ি প্রায় গতিরহিত হয়ে গেছিল। বুদ্ধিভ্রংশ হয়েই করল, না ভয়ে, বোঝা গেল না। চড়িয়েই, স্বগতোক্তি করল কী যেন বিড়বিড় করে। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে।

পাছে, জনতা চন্দ্রবদনীর কোনও ক্ষতি করে সেই চিন্তাতে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নীচে নামতে গেল চারণ। বিপদের সময় যা ঘটে, বিপদের উপর বিপদ, দরজা হঠাৎ খুলতেই, পাশে দাঁড়ানো ছেলেদের কারও কারও গায়ে দরজাটা গিয়ে ধাক্কা দিল। আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই চার-পাঁচজন ছেলে উড়ে এসে পড়ল চারণের উপরে। কিল-চড়-ঘুষি বৃষ্টির মতন পড়তে লাগল।

চন্দ্রবদনীকে দেখে গাড়োয়ালি বলে আদৌ মনে হয়নি। তার গড়ন তার মায়ের মতন। তাই বাঙালি বলেই মনে হয়। কিন্তু সে যখন বাঁদিকের দরজা খুলে নেমে গলা তুলে সেই জনতাকে ভর্ৎসনা করল গাড়োয়ালিতে তখন জনতার মধ্যে অধিকাংশ যুবকই শান্ত হল কিন্তু যারা মাটিতে ফেলে চারণকে মারছিল তারা মেরেই চলল। উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত জনতার ন্যায়-অন্যায় বোধ, বিবেক বা কাণ্ডজ্ঞান বলে থাকে না কখনওই কিছুমাত্র। প্রত্যেক জনতারই কাণ্ডজ্ঞানহীনতা এবং ক্ষিপ্ততা দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়ে, নিয়ন্ত্রণবিহীন হয়ে।

তখন জনতার মধ্যে যে দু-তিনটি মেয়ে ছিল তারা এসে চন্দ্রবদনীর কাছে দাঁড়াল। গাড়োয়ালি এবং ইংরেজিতেও কথা বলল তারা চন্দ্রবদনীর সঙ্গে। এবং মেয়েদের মধ্যে একজন গিয়ে উন্মত্ত ছেলেগুলিকে থামাল। চারণের গায়ের উপর সালোয়ার-কামিজ পরা সেই মেয়েটি শুয়ে পড়ল। চারণকে বাঁচাবার জন্যে। তা করতে গিয়ে সেই মেয়েটিও উন্মত্ত ছেলেগুলির হাতে মার খেল। মেয়েটি একটা সালোয়ার কামিজের ওপর Shocking Pink রঙা ফুলহাতা সোয়েটার পরেছিল। তার খোঁপাটি থাপ্পড়ের চোটে খুলে গেল। চুল ছড়িয়ে গেল পিঠময়।

শকিং-পিঙ্ক রংটি চারণের চিরদিনের অপছন্দ। কিন্তু সেই মুহূর্তে রংটিকে বড় সুন্দর বলে মনে হল ওর। মনে হল, তা ওর জীয়নকাঠির রং।

উত্তেজনা প্রশমিত হলে জানা গেল যে, সমস্ত পাহাড় ও উপত্যকাতে আজ ভোর থেকে "বন্ধ" ডাকা হয়েছে। চারণেরা কেন সেই বন্ধ অমান্য করে নীচ থেকে এত দূরে এসেছে? এটা কি স্বেচ্ছাকৃতভাবে "বন্ধ"-কে অমান্য করা নয়?

কেন "বন্ধ" ডাকা হয়েছে তা চন্দ্রবদনী জিগ্যেস করাতে জনতা বলল, যে পুলিশ কাল রাতের কোনও সময়ে উত্তরাখণ্ড আন্দোলনের দুজন নেতৃস্থানীয় ছাত্রকে গুলি করে মেরে দিয়েছে। আজ ভোরে তাদের লাশ নাকি ভাসতে দেখা গেছে অলকানন্দার হিমশীতল খরস্রোতা জলে এবং সেই লাশ ছাত্ররা উদ্ধারও করেছে।

চারণ ভাল করে লক্ষ করে দেখল যে, ছেলেগুলি সকলেই ছাত্র এবং শিক্ষিত। মুহূর্তের মধ্যে চারণের মনে পড়ে গেল গত পরশু পাটনের-করা ভবিষ্যদ্বাণী।

শাস্তি অবশ্য চারণের যথেষ্টই হয়েছে। একটা ভুরু কেটে চোখ ফুলে যাওয়াতে চোখে কিছু দেখতেই পাচ্ছে না। নীচের ঠোঁটটিও কেটে গেছে প্রায় দুফাঁক হয়ে। নাক মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে, জামা-কাপড় ভেসে যাচ্ছে। জনতার রোষ তখনও পুরো প্রশমিত হয়নি। চন্দ্রবদনী যদি গাড়োয়ালিতে কথা না বলত সময়মতন, তবে কী যে হত তা বলা যায় না। হয়তো সে মারাই যেত!

জনতা তখনও গাড়ির সামনেটাতে অবরোধ করে দাঁড়িয়েই ছিল। ইডিয়ট রওনাক সিং দু-চারটে

লাথি-কিল-চড় হজম করে নিয়েছে। ভরপেট খাওয়ার পর মানুষে যেমন হজমিগুলি খায়, তেমনই মানসিকতাতে। জাঠেরা ওইরকমই হয়, তাই ভাল সৈন্যও হয় তারা। একটি ছেলে রওনাক সিং-এর ফুল-হাতা সোয়েটার ধরে জোরে টানাতে, মেশিনে-বোনা সোয়েটারটার সেলাই কিছুটা ছিঁড়ে গেছে কাঁধের কাছে। ব্যসস। ক্ষতি বলতে ওর ওইটুকুই! অথচ গাড়িটা যদি সে ক্ষিপ্ত জনতার উপরে অমন বে-আক্কেলের মতন চড়িয়ে না দিত তবে হয়তো শিক্ষিত ছাত্রেরা অতখানি ক্ষিপ্ত হত না। দরজা খুলে চারণ চন্দ্রবদনীর বিপদের কথা ভেবেই নামতে গেছিল। তার যে অমন প্রতিক্রিয়া ঘটাব তা তো জানেনি আগে।

চন্দ্রবদনী যখন মেয়েদের বুঝিয়ে বলল যে, ওরা কিছুই জানত না এসব, তবে সারা পথে এবং শ্রীনগরেও সুনসান ভাব দেখে সন্দেহ অবশ্যই হয়েছিল যে কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু সেটা যে কী...

আশ্চর্য! শ্রীনগরে রওনাক সিং একটি পেট্রল পাম্প থেকে পেট্রলও নিয়েছিল। সেখানেও কেউই কিছু বলল না, সাবধান করল না। সত্যিই কোনও দোষ ছিল না ওদের।

চন্দ্রবদনীর অনুরোধে জনতা পথ ছাড়ল উপরের ট্যুরিস্ট লজে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু শাসিয়ে দিল যে, নীচে নামা চলবে না কোনওমতেই। আজ এবং কালকেও "বন্‌ধ" উঠবে সে কথাও বলা যাচ্ছে না। লাগাতার বনধ চলতে পারে অনির্দিষ্টকাল, কর্তৃপক্ষ উত্তর প্রদেশের পুলিশের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা না নিলে!

চন্দ্রবদনী চারণের জন্যে ডাক্তারখানা বা হাসপাতালের কথা বলতে গেলে, জানা গেল, সব বন্ধ। তখন চন্দ্রবদনী গাড়িতে উঠে বলল, ট্যুরিস্ট লজে চলুন। সেখানে আমার শাশুড়ি আছেন। তিনি খুব ভাল পারেন এসব। ট্যুরিস্ট লজে ডেটল, ব্যান্ডেজ ইত্যাদিও থাকার কথা।

গাড়িটা ওই ম্যাল মতন জায়গাটা পেরিয়ে কিছুটা গিয়েই আবারও চড়াই চড়তে লাগল। মনে হল, ট্যুরিস্ট লজটা শহরের সবচেয়ে না হলেও, বেশ উঁচু জায়গাতে হবে নিশ্চয়। যাতে তুষারাবৃত পর্বতমালা সবচেয়ে ভাল দেখা যায়।

গাড়িটা যখন উঠছে তখন দেখল একদল ছেলে উপর থেকে নেমে আসছে। ওরা যখন কাছাকাছি এসেছে গাড়ির, চন্দ্রবদনী গাড়ির কাচ নামাল ওর দিকের। ভিড়ের মধ্যে একটি ছেলে হঠাৎ বাংলাতে বলল, আপনারা বাঙালি?

চন্দ্রবদনী বলল, হ্যাঁ।

কী করে হল এমন?

প্রশ্ন করেই উত্তরটাও বুঝতে পারল। তারপর স্বগতোক্তি করল, টেনশান অ্যান্ড একসাইটমেন্ট ইজ রানিং ভেরি হাই। আই ডোন্ট ব্লেম দেম। উত্তেজিত হবার কারণ তো ঘটেছেই।

রক্তাক্ত চারণ ওর দিকের কাচ নামাল। কিন্তু কথা ও বলতে পারল না।

ছেলেটি বলল, আমি এখানের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে কাজ করি। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

ট্যুরিস্ট লজে।

সেখানের গেটে তো তালা বন্ধ। আমি তো সেখান থেকেই আসছি। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর হতে পারে, আগুনও লাগতে পারে, তাই।

সে কী! একজনের সঙ্গে তো দেখা করতেই এলাম আমি রুদ্রপ্রয়াগ থেকে। ওঁর তো ওখানেই থাকবার কথা!

ম্যানেজার নেই, স্টাফ নেই, শুধু চৌকিদার আছে। তাকে জিগ্যেস করবেন, সে বলতে পারবে। লজ-এ তো কোনও ট্যুরিস্ট নেই, কেউই নেই। আমি যতদূর জানি। থাকবে কি করে? কোনও স্টাফই যদি না থাকে?

তারপর ছেলেটি বললেন, আপনাদের কিন্তু এখুনি চলে যাওয়া উচিত। এই বনধ কতদিন চলবে কে জানে! সিচুয়েশান কোনদিকে টার্ন নেবে, কে বলতে পারে!

তারপর অন্যদের সঙ্গে সামান্য পরামর্শ করে বললেন, শ্রীনগরের দিকে যাবেন না। সেখানেই

তো আসল গণ্ডগোল। তাছাড়া ম্যালই পেরোতে পারবেন না। গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলে কি ভাল হবে ?

চন্দ্রবদনী বলল, তবে যাব কোনদিক দিয়ে ?

ওই ছেলেটি এবং আরও দুজনে বললেন, বাবুখাল, পিপলিপানি, ঘুমখাল হয়ে কোটদ্বারে পৌঁছে চলে যান। কোটদ্বারে কোনও গোলমাল নেই। কোটদ্বার তো সমতলে। গণ্ডগোল যত সব তো পাহাড়েই। বনধও থাকবে না সেখানে। আর যদি সেরকম অবস্থা বুঝে পথেই কোথাও থেকে যেতে চান, তাহলে ল্যান্সডাউনেও থাকতে পারেন। পথ ছেড়ে কিছুটা ভেতরে যেতে হবে অবশ্য।

তারপর ছেলেটি শুধোল, আপনারা যাবেন কোথায় ? দিল্লি ?

হ্যাঁ। আমি দিল্লি যাব, উনি যাবেন...

বলেই, চন্দ্রবদনী চুপ করে গেল।

চারণ কোথায় যাবে, তা চন্দ্রবদনী কী করে জানবে ?

চারণ ভাবছিল যে, ও নিজেই কি জানে ! সে ত গন্তব্যহীন। তৈলাক্ত বাঁশে চড়তে গিয়ে কোটদ্বার থেকে কি আবারও পরিক্রমা শুরু করবে নতুন করে ?

এঁর একটু চিকিৎসা-শুশ্রূষা কি কোথাও হতে পরে ?

ছেলেরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

তারপর সেই বাঙালি ছেলেটি বলল, আজ যে সবই বন্‌ধ।

একশিশি ডেটল, একটু তুলো, কোনও পেইনকিলার ট্যাবলেট কিছুই কি পাওয়া যাবে না ?

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি স্থানীয় ছেলে ইংরেজিতে বলল, আপনারা ট্যুরিস্ট লজ-এর দিকেই যান, সেখানে যাঁর খোঁজ করছেন তাঁর খোঁজ করুনই না হয় একবার গিয়ে। করে, যখন নেমে পিপলিপানির পথের দিকে যাবেন, আমি মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব তুলো আর ডেটল নিয়ে। আমার মায়ের কাছে একস্ট্রা-স্টক রাখা থাকে।

চন্দ্রবদনী তাকে গাড়োয়ালিতে ধন্যবাদ দিল। ছেলেটি অবাক হয়ে বলল, আপনি তো চমৎকার গাড়োয়ালি বলেন।

চন্দ্রবদনী ওই বিপদগ্রস্ত অবস্থাতেও হাসল। কী করে হাসল, ওই জানে ! ভারী সুন্দর আশ্বাস ও স্বস্তিবাহী সেই হাসি। বলল, আমি গাড়োয়ালিই। আমার বাড়ি রুদ্রপ্রয়াগে।

তাই ?

অবাক গাড়োয়ালি ছেলেটি। বাঙালি ছেলেটিও কম অবাক হল না।

তারপরে বলল, আপনারা এগোন। ওই ছেলেটিও বলল, আমি এগিয়ে যাই। মা যদি বাড়ি থেকে কোথাও গিয়ে থাকেন তাহলেই মুশকিল হবে। কোথায় যে ওসব রাখেন, তাও জানি না আমি।

ট্যুরিস্ট লজ-এর সামনেটায় ষাট ডিগ্রি কোণে গেট-এর কাছে গাড়িটিকে যখন দাঁড় করাল রওনাক সিং তখন বাঁদিকে তাকিয়ে তার সব শারীরিক কষ্ট ও মানসিক উত্তেজনা ভুলে গেল চারণ। ঝকঝক করছে রোদে সারি বাঁধা শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ। জওহরলাল নেহরু কেন বারবার এখানেই ছুটি কাটাতে যে আসতেন তা বুঝতে পারল ও।

রওনাক সিং হর্ন বাজাল। চন্দ্রবদনী নামল। তারপর হেঁটে, তালা বন্ধ গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চারণও নেমে ওই তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে রইল।

হর্ন-এর শব্দ শুনে চৌকিদার হেলতে-দুলতে এল। মুখে বিরক্তি নিয়ে। দূর থেকেই বলল, হাত নেড়ে, খোলা যাবে না।

চন্দ্রবদনী, সে গেট-এর কাছে এলে, গাড়োয়ালিতে তার সঙ্গে কী সব বলল। চৌকিদার মাথা নাড়ল। নেতিবাচক। তারপর হাত দিয়ে একটা ভঙ্গি করে কী যেন বলল। কিছু একটা দিলও চন্দ্রবদনীর হাতে। আরও কী সব বলল, গাড়োয়ালিতে। বুঝল না চারণ।

চন্দ্রবদনী, চিঠির মতো কোনও কিছু পড়ল গেট-এর সামনে দাঁড়িয়ে। চৌকিদার তাহলে একটা

চিঠিই দিয়েছিল ওকে।

চন্দ্রবদনী ফিরে এসে গাড়িতে উঠল। চারণও এসে বসল। বলল, ইচ্ছে করছে না এই স্বর্গ ছেড়ে চলে যেতে।

কোনও স্বর্গেই তো চিরদিন থাকা যায় না! চন্দ্রবদনী যেন একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলল।

যায় না?

কথা বলতে ভীষণই কষ্ট হচ্ছে চারণের। রক্তে মুখের ভিতরটা ভরে গেছে। থকথকে হয়ে গেছে মেটের মতন। বমি পাচ্ছে ওর। মাথাতে, বুকে পেটেও অসহ্য লেগেছে। আগে ব্যথাটা বোঝেনি। এখন আস্তে আস্তে ব্যথাটা সর্বাঙ্গে ছেয়ে যাচ্ছে।

চন্দ্রবদনী বলল, আপনাকে একটি এ টি এস দেওয়ানো দরকার ছিল। ডাক্তারখানা কি আর খোলানো যেত না! কিন্তু যেখানেই যেতে চাই, ছেলেরা সেখানে জমায়েত হয়ে আছে, তাদের পেরিয়েই যেতে হবে। পউরি শহরে ঢোকার প্রবেশদ্বার বলতে যা বোঝায়, ওই জায়গাটি তাই।

তারপরই স্বগতোক্তি করল, যাকগে। ডেটল আর তুলো পেলে উন্ডসগুলো ড্রেস তো করে দিতে পারতাম!

আপনার শাশুড়ি-মায়ের কী হল? এখানে আসেননি? চৌকিদার কী বলল?

এসেছিলেন। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কেউ গতকাল ভোরেই নাকি শ্রীনগর থেকে ফোন করে ওঁকে ব্রেকফাস্টের পরে পরেই বেরিয়ে পড়ে কোটদ্বার হয়ে দিল্লী পৌঁছতে বলেছিলেন।

তারপর বলল, সেই অ্যাডভান্স ওয়ার্নিং পেয়ে নিশ্চয়ই প্রাইভেট ট্যাক্সিতে বা বাসে করে ফিরে গেছেন। ওঁর তো এখান থেকে নামবার কথা ছিল আগামী পরশু। ভারী আশ্চর্য তো! স্বজনেরা আমার চলে-যাওয়া এবং স্বল্পকালীন স্বামীর মায়ের প্রতি যতখানি মনোযোগী আমার প্রতি ততখানি নয়। আমাকেই জানাল না কেউ কিছু। অথচ সকলেই ভাল করেই জানত যে আমি আপনার সঙ্গে আজ ভোরে পউরির দিকে বেরোব।

কে খবর দিলেন?

জানি না। তাই তো ভাবছি।

আমার একমাত্র ননদিনীটির উপরে চুকারের চোখ আছে। ওরা একই সঙ্গে পড়ত দিল্লীর জে এন উ্যতে যদিও আলাদা বিষয়ে। মেয়েটি ভাল। তা ভাল হোক গে। তার ভাবী শাশুড়ির জন্যে চুকার ভেবে মরে গেল আর দিদির কথা একবারও ভাবল না! এই তো দুনিয়া!

আপনি এত সব খবর জানলেন কি করে?

হাতের মধ্যে মুঠো করে রাখা একটি খাম দেখাল চন্দ্রবদনী। বলল, আমার থটফুল, হাইলি কনসিডারেট শাশুড়ি এই চিঠিটি আমার জন্যে রেখে গেছিলেন। চৌকিদারকে মোটা বকশিশও করে গেছিলেন যাতে আমার হাতে ওই চিঠিটি সে দেয়। সে তখন বাংলোতে না থাকলে তার বৌ যেন দেয়, সে কথাও বলে গেছিলেন। চিঠিময় অ্যাপলজি। লিখেছেন, কোটদ্বারে গিয়ে ডিসাইড করবেন সোজা দিল্লি যাবেন না হরিদ্বারে কাটিয়ে যাবেন দু-তিনটি দিন। যদি হরিদ্বারে যান তবে সেখানের হোটেলের নাম-ঠিকানাও দিয়ে গেছেন। ভদ্রমহিলার মতন ওয়েল-অর্গানাইজড দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ খুব কমই হয়।

চারণের মন বলল যে, চন্দ্রবদনী ওঁর সঙ্গে আলাপ করাবার জন্যেই যেন সঙ্গে করে এনেছিল চারণকে।

মন বলল। যা বলল, তা ভুলও হতে পারে। মন যাই বলে তাই তো আর ঠিক হয় না সবসময়।

ট্যুরিস্ট বাংলোর গেট-এর সামনের চত্বরে দাঁড়িয়ে যে, আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য দেখল চারণ, তা দেখে যে "আঃ" উচ্চারণ করবে তেমন অবস্থাও ছিল না। "উ"কারান্ত ছাড়া অন্য কোনও শব্দই ঠোঁটের বীভৎস অবস্থার কারণে ওর পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। নিজের জন্যে বড়ই কষ্ট হচ্ছিল।

একটা ব্যাপার লক্ষ করে খুবই অবাক হচ্ছিল চারণ। ছেলেগুলো যে ওকে অমন বিনা দোষে

মারল, তাতে তাদের কারও ওপরেই ওর আদৌ কোনওরকম ব্যক্তিগত আক্রোশ জন্মায়নি। বরং প্রতিদিন তারই মতন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শয়ে শয়ে যে সমস্ত মানুষ বিনা দোষে মার খায় ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত জনতার হাতে, তাদের প্রতি তার নিজের অসহায়তার মধ্যে এক গভীর সমব্যথা ও সমবেদনা বোধ করল ও। উত্তেজিত জনতার মধ্যে প্রত্যেক মানুষই একই সঙ্গে একইরকম অবুঝ, যুক্তিহীন এবং অনেকই সময়ে অন্যায় আচরণও করেন পৃথিবীর সর্বত্রই। সেই সব মুহূর্তে, মনে হয়, জনতার মধ্যের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মানসিকতা একীভূত হয়ে যায়। তাঁদের নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব কোনও দানবের হাতে চলে যায় নিজেদের অজান্তে। যুক্তিহীন, বিচারহীন, বিবেকহীন যার সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড। কিন্তু আসলে বোধহয় তা হয় না। ভাগ্যিস হয় না। জনতার মধ্যে থেকেও, ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত, অন্ধ মানসিক অবস্থাতে সামিল হয়েও বিভিন্ন মানুষের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন হয়। প্রহার করলেও সেই প্রহারের তীব্রতার রকমও অবশ্যই বিভিন্নরকম হয়। জনতারই কেউ কেউ জনতাকে প্রতিরোধ করার, বোঝানোর চেষ্টা করেন।

নিজের অত্যন্ত ক্লিষ্ট শারীরিক অবস্থাতেও ও ওর কষ্টকে যে এমন নৈর্ব্যক্তিক ভাবে নিতে পেরেছে তা জেনে একরকমের ভাললাগাতেও সিক্ত হল ও। মানুষ হিসেবে ও যে আর দশজনের মতন সাধারণ নয়, তা জেনে ন্যায্য কারণে শ্লাঘাও বোধ করল একটু।

রওনাক সিং গাড়িটা ঘুরিয়ে এবারে উতরাইয়ে নামতে লাগল। চারণের ভয় করছিল যে নীচের ম্যালে জমায়েত হওয়া ছেলেরা গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ না শুনে ফেলে। তারা তো আদেশ করেছিল ওদের ট্যুরিস্ট লজেই থাকতে। সেখান থেকে না নামতে। তবে, যে পথ দিয়ে ওদের যেতে বলল একটু আগেই ছাত্রদের অন্য একটি দল, বাঙালি ছেলেটিও, সেই পথটি গেছে ম্যাল-এর উলটোদিক দিয়ে। শহরের বাইরে দিয়ে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলে ওদের রোষে পড়তে হবে না হয়তো। দেরি করলে, কী হবে তা বলা যায় না।

সেই ছেলেটি কিন্তু ঠিকই দাঁড়িয়েছিল ট্যুরিস্ট লজের সামনে থেকে পথটি যেখানে নেমে প্রধান পথের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে। গাড়ি সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই সে তাড়াতাড়ি তুলোর একটি প্যাকেট আর ছোট্ট এক শিশি ডেটল হাত বাড়িয়ে দিল, চন্দ্রবদনী কাঁচটা নামাতেই। বেশ ঠাণ্ডা ছিল। নভেম্বর মাস, তায় এত উঁচু জায়গা।

চারণ, পকেটে হাত দিল টাকা বের করার জন্যে। তার আগেই চন্দ্রবদনী একটি একশ টাকার নোট বের করে হাত বাড়িয়ে ছেলেটিকে দিতে গেল। সে প্রথমে বিরক্ত হল। তারপর হাসল। বলল, এসব তো বাড়িতেই ছিল। দাম দিতে হবে না, মাকে আমি কিনে দেব আবার। তাছাড়া, চারণের দিকে তাকিয়ে বলল, এখানে আমাদের মধ্যেই কেউ কেউ আপনাকে অন্যায় রাগে মেরেছে। আমি না হয় তাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তই করলাম একটু।

তারপরই বলল, আপনারা আর দেরি করবেন না। পথে আবার কোথায় কি হয় ? বেরিয়ে যান তাড়াতাড়ি। চড়াই পড়বে এরপরেই কিছুটা। বাবুখাল ছ-হাজার ফিট মতন উঁচু।

চন্দ্রবদনী কাঁচ তুলতে তুলতে সামান্য উদ্বিগ্ন গলাতে বলল, কোটদ্বার কখন পৌঁছব ?

তা তিন-চারটে হবে। গুড লাক।

চারণ ভাবছিল, চন্দ্রবদনীর মতন কোনও বিধুমুখী সঙ্গে থাকলে শ্মশানকেও স্বর্গোদ্যান বলে মনে হয়, পৃথিবীর সব মানুষই বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

এতকিছু যে ঘটে গেল, রওনাক সিং-এর কিন্তু কোনওই বিকার নেই। নিজের দোষেই যে সে চারণকে মার খাওয়াল এবং নিজেও কিঞ্চিৎ মার খেল, তার সোয়েটারের সেলাই চড়চড় শব্দ করে ছিঁড়ে গেল, তাতে তার কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে হল না। ভাবখানা It's all in the game! মাঝে মাঝেই ডান হাত দিয়ে তার লম্বকর্ণর মতন ডানকানটিকে টানাটানি করা ছাড়া তার মধ্যে এইসব দুর্ঘটনা ও বাধা সম্বন্ধে অন্য কোনওরকম ক্রিয়া-বিক্রিয়া আদৌ না দেখতে পেয়ে অবাক হল চন্দ্রবদনী এবং চারণও। ভাবখানা যেন এই জাঠ তনয়কে স্বয়ং শ্রীশ্রী গীতাই প্রসব করেছেন। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন"-র এমন জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত এর আগে দেখেনি। রওনাক

সিং-এর কাছে বহু সাধু-সন্ন্যাসীরাও তুচ্ছ।

গাড়িতে দুবোতল মিনারাল ওয়াটার ছিল বিসলেরির। এখন শহুরে এবং ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রাও আমেরিকানদের মতনই শরীর-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। এবং আমেরিকান এবং অন্য বিদেশীরাও যেহেতু কেদার-বদ্রী এবং অন্যান্য জায়গাতে আসেন, এই সব পথের পান-সিগারেটের দোকানেই মিনারাল-ওয়াটার পাওয়া যায় আজকাল।

'বড়ি বুয়াই' সব বন্দোবস্ত করে বেতের একটা চারকোণা বাস্কেটে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। সঙ্গে ফেস-টাওয়েল, ন্যাপকিন সব দিয়েছিলেন পরিপাটি করে। সঙ্গে খাবারও নিশ্চয়ই কিছু আছে। পুরনো দিনের মানুষেরা ওরকমই ছিলেন। যাত্রামাত্রই যে অগ্যস্তযাত্রা এমন মনে করাই তাঁদের অভ্যেস ছিল। পথে কোথায় কোন বিপদ ঘটে, খাওয়ার পাওয়া যায় কী না যায়, এই ভেবে সবসময়েই বারণ না শুনে কিছু-না কিছু সঙ্গে তাঁরা দিয়ে দিতেনই।

গাড়িটা, পউরির এলাকা ছাড়িয়ে এল মিনিট দশেকের মধ্যে। এরকম পাহাড়ি পথে যতখানি জোরে চালানো সম্ভব গাড়িকে, তাই চালাচ্ছিল রওনাক সিং। অথচ এদিকে আগে সে এসেছে বলে মনে হল না। সম্ভবত সে সমতলে দিল্লি-হৃষিকেশই করে থাকে। হয়তো কেদারবদ্রীর পথেও এসেছে দু-একবার কিন্তু এদিকে যে সে আসেনি কখনও তা প্রতি মোড়ে পৌঁছেই বোঝা যাচ্ছিল। না-আসাতে, তার কোনওই ভয় বা বৈকল্য নেই। স্টিয়ারিং-এ দুটি হাত রেখে, বেঁকে বসে, সে মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। মুখে একটিও কথা নেই। তার প্যাসেঞ্জারেরা তার সম্পূর্ণই অযোগ্য তাই সম্ভবত কথা বলার কোনও তাগিদই সে অনুভব করছিল না।

অর্জুনের মতন গাড়ি চালাচ্ছে এখন রওনাক সিং।

গাড়িটা একবার দাঁড় করাতে বলল, রওনাক সিংকে, চন্দ্রবদনী।

গতি কমিয়ে এনে বাঁদিকে দাঁড় করাল গাড়িটা সে, একটা মস্ত বড় প্রাচীন ওক গাছের কাছে। বাঁদিকে গভীর উপত্যকা। গহন জঙ্গল সেখানে। হাওয়া নেই, কিন্তু এই রোদ-ঝলমল সকালে, তুঁতে-নীল আকাশ আর এই কলুষহীন ক্লোরোফিল উজ্জ্বল ঝকঝকে গাছ-গাছালি ঘাস-পাতা থেকে আশ্চর্য সুন্দর এক মিশ্র গন্ধ উঠছে।

চন্দ্রবদনী বলল, চারণকে, আপনি নেমে, ঐ কালভার্টটার উপরে বসুন।

"উ"কারান্ত একটি শব্দ করল চারণ, তারপর বাধ্য ছেলের মতন বসল নেমে গিয়ে, পাথরের কালভার্ট-এর উপরে।

জলের বোতল বের করে, ডেটলের শিশি খুলে, একটি ফেস-টাওয়াল বের করে নিজের কাঁধ ও বুকে অ্যাপ্রনের মতন ছড়িয়ে নিয়ে অন্যটা চারণের বুকে জড়িয়ে দিল, পাছে জল না পড়ে তার বুকে। তারপর আস্তে আস্তে ওর ক্ষতস্থানগুলি ধুয়ে, ডেটল-মাখানো তুলো জলে সামান্য ভিজিয়ে নিয়ে, বুলিয়ে দিতে লাগল। জ্বালাতে মুখ বিকৃত করে ফেলল চারণ।

তারপর বলল, মুখটা কুলকুচি করে নিন।

কুলকুচি করবে কি! মুখের মধ্যে রক্ত জমে তো মেটের মতো থকথকে হয়ে গেছে। নিজেরই বমি-বমি পাচ্ছিল। না জানি ওর ঐ চেহারা দেখে চন্দ্রবদনীর কি মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই গা গোলাচ্ছে।

ভাবছিল ও।

তবে, দু-তিনবার কুলকুচি করাতে মুখের ভেতরের আড়ষ্টতা যেন কমল একটু। তবে সব ক্ষতস্থানেই ডেটল পড়াতে জ্বালাও করছিল প্রচণ্ড।

জল খাবেন?

চন্দ্রবদনী শুধোল।

মাথা নাড়ল চারণ। নিজের কেটে-যাওয়া ঠোঁটটাকে সেলাই করে, বন্ধ করে দেওয়া এখুনি দরকার। সেখানে থেকে, পরিচর্যা করার পরে আবারও একটু একটু রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

জল খেয়ে মিনারাল ওয়াটারের বোতলটা ফেরৎ দিল চন্দ্রবদনীকে। চন্দ্রবদনী নিজের হাত ব্যাগ

থেকে একটি ডিসিপিরিন ট্যাবলেট বের করে বলল, এটা খেয়ে নিন তো। ব্যথার হয়তো সামান্য উপশম হবে।

ভাবল, ও। কোটদ্বার কি সমতলে ? ভাবলই। কিন্তু জিগ্যেস করতে পারল না। কবে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারবে, কে জানে।

গাড়ি চলতে লাগল, ঘুরে ঘুরে, যেন উড়ে উড়ে, স্বর্গলোকের দিকে। এখানেও কোনও যানবাহন নেই, "আপ" অথবা "ডাউন" এও। যাকে বলে "সর্বাত্মক, স্বতঃস্ফূর্ত 'বন্‌ধ'," তাই হয়েছে। মনে হচ্ছে, এরা পাহাড়ে ওঠার সব মুখগুলিতেই পাহারা রেখেছে তাই কোনও গাড়ি উঠে আসতে পারছে না।

নামছে তো নাই। তাহলে কোটদ্বার এও কি বন্ধ থাকবে ?

কথা যা বলার তা চন্দ্রবদনীই বলছিল। চারণ শুনছিল আর ভাবছিল।

চন্দ্রবদনী বলছিল, অনুতাপের গলাতে, আমার ছোট ভাই তার বন্ধুবান্ধব সমবয়সীরা যে আন্দোলনে নেমেছে তার ফল কি হবে জানি না। তবে দুটি ছেলে মারা গেছে কাল পুলিশের গুলিতে। ভবিষ্যতে হয়তো আরও মারা যাবে। যারা মারা গেল, তারা কারা, কে জানে! কোন মায়ের কোল শূন্য হয়ে গেল তা কালকের আগে জানা যাবে না। তারপর হয়তো পুলিশও মরবে। তারও পর হয়তো নাগাল্যান্ড, মণিপুর, গোর্খাল্যান্ড, কাশ্মীর, ঝাড়খণ্ড-এর মতন চিরস্থায়ী গণ্ডগোলের জায়গা হয়ে যাবে যুগযুগান্ত ধরে শান্তির নীড় হয়ে থাকা এই সমস্ত অঞ্চল। দেবভূমি। দেবতাদের সঙ্গে অসুরেরা কোনওদিনও সহাবস্থান করতে পারেনি। আর এখন মানুষমাত্রই অসুরই হয়ে উঠেছে।

চারণ তো চুপ করেই ছিল কিন্তু তার মস্তিষ্ক তো চুপ করে ছিল না। নানা ভাবনা ভাবছিল তা।

উত্তরাখণ্ডকে আলাদা রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া কখনই উচিত নয়। ভাবছিল চারণ। দিলে, মণিপুর, গারো হিলস, খাসী হিলস, গোর্খাল্যান্ড, এবং অনেক রাজ্যের অনেক অংশ নিয়ে পুরো ঝাড়খণ্ড এলাকাকে স্বীকৃতি না দিলে চলবে না। কোনও স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দল ও নেতা হয়তো উত্তরাখণ্ডকে স্বীকৃতি দিয়েই দেবেন তাঁর নিজের দল ও তাঁর গদি সুরক্ষিত করার জন্যে। এখন স্বার্থই তো বুদ্ধির সমতুল। নিজ-স্বার্থহীন বুদ্ধিকে আর বুদ্ধি বলে কোথাওই মান্য করা হচ্ছে না। বুদ্ধিরও তো কতইরকম থাকে। এখন বুদ্ধি মানেই দুর্বুদ্ধি, তা জনস্বার্থ, দেশের স্বার্থ, সবকিছুরই বিরোধী হলেও কোনও ক্ষতি নেই। নেতার স্বার্থ এবং পার্টির স্বার্থ নিশ্চিত হলেই, সেই স্বার্থে মগ্ন হলেই নেতাদের চলে। Immediate Gainটাই সব।

চন্দ্রবদনী বলল, আপনাকে একটু চা খাওয়াতে পারলে হয়তো আপনার ভাল লাগত। ব্যথা কি বেড়েছে ?

চারণ পেটে আর বুকে হাত দিয়ে দেখাল, তার ব্যথার স্থান। মানে, ব্যথা যেখানে বেশি। চোখের উপরেও অনেকখানি কেটে গেছে।

চারণ ভাবছিল, যেসব ব্যথা বাইরে থেকে দেখা যায় না, যে আঘাতে বাহ্যিক ক্ষতর সৃষ্টি হয় না, বাইরে থেকে অন্যের চোখে যা বীভৎস বলে মনে হয় না, সেই ব্যথা যে কারও আদৌ আছে বা থাকতে পারে, এই সত্যই বুঝতে পারে না অন্যে। একের পেটের খিদে, পিঠের আঘাত, অতি সহজেই বোঝা যায় কিন্তু হৃদয়ের খিদে, হৃদয়ের আঘাত হয়তো সেজন্যেই অন্যের পক্ষে বোঝা এত কঠিন। যা কিছুই এই সংসারে বাহ্য, তাই সহজে গ্রাহ্য। অব্যক্ত, অন্তর্লীন কথা কেউই বোঝে না। অন্তর্মুখী মানুষ-মানুষীর তাই বোধহয় এত দুঃখ এই পৃথিবীতে।

গাড়িটা চলেছে তো চলেছেই! তবে পথের দুপাশের দৃশ্যে চারণ এরকম শারীরিক অবস্থাতেও মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। পথ কেবলই পাহাড় চড়ছে, পাহাড় নামছে। কার্তিকের গায়ের গন্ধ-মাখা নিবিড় অরণ্যের মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে যে সব খরস্রোতা নদী, গভীর জঙ্গলাকীর্ণ, গাঢ় সবুজ-রঙা গিরিখাত দিয়ে বইছে সব। নদীকেই সম্ভবত এই অঞ্চলে 'খাল' বলে।

মনে হল চারণের।

অমনই একটি খাল পেরুনোর পরেই দেখা গেল পথের উপরে আড়াআড়ি করে গোছা গোছা তার ফেলা আছে পথপাশের জয়েন্ট পোস্ট থেকে। গাড়িকে যেতে হলে, সেই তারের জটলার উপর দিয়েই যেতে হবে এবং তা গেলেই গাড়ি এবং আরোহীরাও তড়িদাহত হবে। সেই উদ্দেশ্যেই বোধহয় ফেলে রাখা হয়েছে তারগুলি।

গাড়িটাকে সে জায়গা থেকে কিছুটা দূরে দাঁড় করিয়ে দিল রওনাক সিং। দিয়েই বলল, ম্যায় যা কর, উঠাকে ফেকতা হুঁ।

চন্দ্রবদনী হায়! হায়! করে উঠল।

চারণও চঞ্চল হয়ে উঠল মুখে কিছু বলতে না পেরে। 'সর্বনাশ হবে' এই শব্দদুটি উচ্চারণ করতে গিয়ে শুধু দুটি 'চ'কারান্ত অস্ফুট শব্দ বেরোল তার মুখের রক্তাক্ত অভ্যন্তর থেকে।

এমন সময়ে দেখা ও শোনা গেল তিন-চারটি যুবক বড় বড় পা ফেলে উতরাই-এর পথ বেয়ে পেছন দিক থেকে নেমে আসছে। পাহাড়ি মানুষেরা যেমন নাচতে নাচতে উতরাই নামে তেমনি করে তো বটেই, আরও জোরে ওরা নেমে আসছে।

ওরা জোরে জোরে কথা বলতে বলতে আসছিল। রাস্তা, পায়ে হেঁটে পেরোতে হলেও ঐ ভূপতিত তারমণ্ডল সম্বন্ধে ওদেরও একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কারণ, তারগুলি যে বা যারাই বিচ্ছিন্ন করে রাস্তা জুড়ে ফেলে রেখে থাকুক, তারা এমন করেই ফেলে-ছড়িয়েছে, যে তা পেরিয়ে কোনও ইঁদুরের পক্ষেও যাওয়া সম্ভব নয়, মানুষ তো দূরস্থান।

এ ছেলেরা কারা?

আবারও মারবে না তো চারণকে?

ভাবল, ক্লিষ্ট-স্নায়ু চারণ।

চারণকে গাড়িতেই বসে থাকতে বলে, চন্দ্রবদনী নেমে ওদের সঙ্গে গাড়োয়ালিতে কথাবার্তা বলতে লাগল, ওরা কাছে এলে।

ছেলেদের মধ্যে একজন বলল, এগুলি বিজলীর তার নয় বোধহয়। নিশ্চয়ই টেলিফোন বা টেলিগ্রাফের তার?

রওনাক সিং, যে, সকাল থেকে কিল-চড় ছাড়া আর কিছুই খায়নি, সে কিন্তু কেবলি তড়পে তড়পে এগিয়ে যাচ্ছিল তারগুলি তুলে ধরে পথপাশে ছুঁড়ে ফেলবে বলে। চন্দ্রবদনী আর চারণই তাকে এতক্ষণ আটকে রেখেছিল। এখন আটকাল ছেলেগুলিও। অথচ রওনাক সিং-এর ঝুঁকি নেবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। সে ভাড়ার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছে হৃষীকেশ থেকে। গাড়ি না চললেও তার মালিক ভাড়া পাবে দিন হিসেবেই। সেও দানাপানির টাকা পাবে। মাইনে তো পাবেই। যারা উত্তরাখণ্ড-এর জন্য আন্দোলন করছেন সেই ছেলেরা এবং উত্তরাখণ্ড যার পিতৃভূমি, সেই চন্দ্রবদনীও এমন পথে-ফেলে-রাখা তার ছুঁয়ে Noticed by a few and utterly unpublicised মৃত্যুবরণ করতে আদৌ রাজি নয় বলেই মনে হল। সাংবাদিকদের ক্যামেরা, দূরদর্শনের ক্যামেরা সামনে থাকলে, অনেক জন্মভীতুও সাহসী হয়ে উঠে অনেক কিছু করে ফেলতে পারে। প্রচারের মহিমা আর তার লোভ বড় লোভ, যদিও বড় নীচ ও ইতর লোভ। অনেক তাবড় তাবড় মানুষও এই রোগে যে পুরোপুরিই আক্রান্ত তা তো সকাল সন্ধে কলকাতাতে চারণ দেখেই!

প্রচারের কোনও লোভ চারণের ছিল না কখনওই। তাছাড়া ওই পুঞ্জীভূত তার সরানোর কোনও দায়ও ছিল না তার। মনে মনে বেশ বিরক্ত ছিল সে। ভাবল, যা করবার তা চন্দ্রবদনীই করুক। তার ভায়েদেরই তো আন্দোলন!

তারপরই এ কথা মনে হয়ে নিজেই কষ্ট পেল যে মানুষ হিসেবে সে সম্ভবত খুব উচ্চস্তরের নয়। চন্দ্রবদনী তো তাকে বাঁচাতে গিয়ে মারও খেয়েছিল পউরিতে।

তারের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে প্রায় কুড়ি মিনিট। আলোচনা, পরামর্শ চলছেই। মাঝে মাঝে একমাত্র রওনাক সিংই সেদিকে এগিয়ে যেতে চাইছে আর চন্দ্রবদনী চেঁচিয়ে বলছে নেহি, নেহি, মত যানা। প্রায় "মত যা, মত যা, মত যা যোগীরই" মতন শোনাচ্ছে সেই "মত যানা"। আর ছেলেরা

রওনাক সিং-এর বিস্কিট-কালার ফুলহাতা সোয়েটারটা ধরে টেনে তাকে বার বার আটকাচ্ছে। পউরিতে সোয়েটার ধরে টানাটানি করেছিল এদেরই দোস্ত-বিরাদরেরা রওনাককে প্রাণে মারবার জন্যে, আর এরা টানাটানি করছে তাঁকে প্রাণে বাঁচাবার জন্যে।

"কেয়া চক্কর"।

ভাবল, চারণ।

এই "কেয়া চক্কর" শব্দটা পাটন মাঝে মাঝেই হৃষীকেশ ও দেবপ্রয়াগে ব্যবহার করত। আর নিচু গলাতে হেসে বলত, এই চক্কর থেকেই 'যাবতীয় চক্রান্তর পায়দা হয়েছে। বুঝলে গো চারণদা।"

হঠাৎই পাটনের কথা মনে পড়ে গিয়ে, মনটা খারাপ হয়ে গেল চারণের। খুবই মিস করছে ওকে। পাটনের কাছে চারণের কৃতজ্ঞতার কোনও শেষ নেই। অনেকই কারণে। দারুণ একটা ছেলে বটে। ওরিজিনাল। ওই ওর তুলনা।

ইতিমধ্যে হঠাৎই গাড়ির সামনে একটা ধ্বস্তাধস্তির আওয়াজ শোনা গেল এবং রওনাক সিং হা হা করে হাসতে হাসতে দৌড়ে গেল রাস্তা জুড়ে পড়ে থাকা তারগুলোর দিকে। তারপর প্রায় সেগুলির উপরেই দাঁড়িয়ে পড়েই নিচু হল। আরও নিচু, আরও, এবার দুহাত দিয়ে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরবে ও তারগুলোকে। ছেলেরা হৈ হৈ করে উঠল। চন্দ্রবদনী শঙ্কিত, ভয়ার্ত একটি শব্দ নিক্ষেপ করল। বি শার্প-এ। এবং পরক্ষণেই দুহাতে, তার বুকের কাছে তারের কুণ্ডলী পাকিয়ে নিয়ে পথের স্তূপীকৃত তারেরই উপরে পড়ে গেল সে।

চারণের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপরই পাশের নদী আর সামনে-পেছনের পাহাড় রওনাক সিং-এর হা-হা হাসির প্রতিধ্বনি তুলল। হাসির হররা ফুটে উঠল, ছুটে গেল পাহাড়ে, জঙ্গলে এবং নদীতে।

না। মরে নি রওনাক। যদি মরতও ও তবুও যারা সেই মৃত্যুর সাক্ষী তাদের কাছে অমর হয়েই রইত।

তারগুলি বিজলির তার নয়।

ঐ ছেলেগুলি ওদের গাড়িতে লিফ্‌ট চাইল, সামনের জনপদ অবধি। সামনেই বসল তারা তিনজনে চাপাচাপি করে, রওনাক-এর সঙ্গে। রহস্যভেদ হওয়াতে, অপেক্ষা শেষ হওয়াতে এবং পথের কাঁটা অপসারিত হওয়াতে সকলেরই মেজাজ বহুত খুশ ছিল। মূল সমস্যা, আন্দোলনের কারণ, এসব কিছুরই চেয়ে পথের উপরে ফেলে রাখা স্তূপীকৃত তারই বড় সমস্যা হয়ে উঠেছিল এতক্ষণ। এমনই হয়তো হয় সংসারে। কাছের তুচ্ছ জিনিস দূরের জিনিসকে আড়ালে ফেলে দেয়, তা সেই দূরের জিনিস যত বড়ই হোক না কেন।

চন্দ্রবদনীর প্রশ্নের উত্তরে ছেলেরা বলল, সামনেই ঘুমখাল পাবেন। সেখানেই আমরা নেমে যাব। সেখানেও যদি 'বন্‌ধ' না থাকে তবে ডাক্তারখানা, হোটেল সব পাবেন।

কিন্তু সব জায়গাতেই 'বন্‌ধ' আর ঘুমখাল কি খোলা থাকবে?

চন্দ্রবদনী জিগ্যেস করল ওদের।

থাকতে পারে। কারণ, দুপাশের মুখই তো বন্ধ। পাহাড়ে কোনও গাড়ি উঠতেও পারছে না, পারছে না নামতেও। মধ্যবর্তী এলাকা নিয়ে তো আন্দোলনকারীদের মাথাব্যথা নেই। তাদের 'বন্‌ধ' তো সফল হয়েছেই। দেখাই যাক। একটু পরেই তো পৌঁছে যাব।

একটি ছেলে রওনাক সিংকে বলল, আররে! আপ তো অজীব আদমী হেঁ ভাই। উও খতরনাক তারোঁকি উপ্পর কুদকে চড় গ্যায়ে!

হিন্দি ছবির আর যাই কুপ্রভাব পড়ুক না কেন সমাজের উপরে, ভারতের একীকরণের কাজে এই মাধ্যমটি একটি বড় কাজ করেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সকলেই এখন হিন্দি ছবির ডায়ালগ বলার মতন করে ডায়ালগ বলে। এটা সার্বিক ভাল অবশ্যই নয়। তবে আংশিক ভাল তো বটেই।

অনেকক্ষণ পরে রওনাক সিং তার ডান-কানের কল্যাণে, আবারও লেগে পড়ে, দার্শনিকের মতন

হেসে বলল, আররে সাহাব, সবহি খাতরেকে পর ওইসেহি কুদকেই চড়না পড়তা হ্যায়। আইস্তা আইস্তা চলনেসে খতরা জবরদস্ত বন যাতা হ্যায়। কোঈভি খাতরে জবরদস্ত বননেকি পাহিলেহি উসকি বুতানা চাহিয়ে।

চারণ ভাবছিল, এই জন্যেই হয়তো জাঠ-এরা এত ভাল সৈন্য হয়। সেনাবাহিনীর "জাঠ রেজিমেন্ট" একটি "প্রাইজ" রেজিমেন্ট। ক্লাবে প্রায়ই বলেন মেজর জেনারেল ঝান্টুমারি।

ঘুমখালে এসেই জানা গেল যে, পউরির ছেলেরা যা বলছিল তা ঠিক নয়। কোটদ্বার-এও বনধ আছে। ভোরের প্রথম প্রহরে যে কয়েকটি প্রাইভেট গাড়ি ও বাস উঠে আসতে পেরেছিল কোটদ্বার থেকে ঘুমখাল অবধি তাদের মুখেই শুনেছে স্থানীয় দোকানিরা।

দুপুরের বাজার এখানে চকমক করছে। সব দোকানই খোলা। মোড়ে পৌঁছে দেখে বাঁয়ে একটি পথ চলে গেছে। সরু। নিশ্চয়ই অভ্যন্তরের কোনও অনামি জায়গাতে পৌঁছেছে গিয়ে সেই পথ। চারণের ভারী ইচ্ছে করে এইরকম কোনও জায়গাতে, কোনও নাম-না-জানা গ্রামে গিয়ে স্থানীয় মানুষদের বাড়িতে থাকতে। তবেই না তাদের জানা যায়, তাদের বোঝা যায়। এমন মনোভাব সমতলের সব মানুষেরই যদি থাকত, তবে হয়তো আজ উত্তরাখণ্ড নিয়ে আন্দোলন করে ছাত্রদের বুকের রক্ত ঝরাতে হত না।

এই আমাদের দোষ। ভাবছিল চারণ। যতটুকু, যে সময়ে করলে হয় তা, কখনওই করি না আমরা। তার ফলে যে সমস্যাটা Molehill ছিল তাই একদিন সত্যিই Mountain হয়ে ওঠে। প্রথম থেকে কুমায়ুঁ ও গাড়োয়ালের মানুষদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে দরদের সঙ্গে অবহিত যদি হত দিল্লি, তবে এই আন্দোলনের মিটিমিটি আগুন আজ এমন হাওয়া পেয়ে দাবানলের মতন পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে যেত না।

এসব ভেবে চারণের মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ছেলেগুলির নির্দেশে ওষুধের একটি বড় দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল রওনাক সিং।

বেশ ছেলেগুলি। একজন শ্রীনগরে পড়ে, একজন পউরিতে, আরেকজন ডালহাউসিতে। তারা সক্রিয় রাজনীতি করে বলে মনে হল না কিন্তু তাদের এই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে, কথাবার্তাতে মনে হল। এতবছর স্থানীয় মানুষদের উন্নতিকল্পে উত্তরপ্রদেশ সরকার না কি কিছুমাত্রই করেননি, এমনই ওদের মত।

চারণ ভাবছিল যে, এরা হয়তো জানে না তথাকথিত "উন্নতি"-র সঙ্গে সঙ্গে সার্বিক অবনতির বীজও রোপিত হয়ে যায়ই। চৌপাই পুরনো হলেই যেমন তাতে ছারপোকা হয়ই, প্রশাসন পুরনো হলেই, তাতে দুর্নীতি এবং আরও নানা অবক্ষয় বাসা বাঁধে। দিল্লী যেমন "উন্নতি" করেছে তেমন উন্নতি নিশ্চয়ই এদেরও কাম্য নয়। আর্থিক সচ্ছলতা অনেকই ক্লেদ ও গ্লানি inject করে দেয় মানুষের ও সমাজের মধ্যে। তখন রোদে পিঠ দিয়ে পা-ছড়িয়ে বসে ভাবতে হয়, গরীব থাকাই ভাল ছিল। না, এমন মূল্য দিয়ে "বড়লোক" হওয়া।

শেষপর্যন্ত ওরা কোটদ্বোয়ার না যাওয়াই মনস্থ করল, ঘুমখালে দোকানদার এবং বাস-ট্রাক-ড্রাইভারদের কাছে নানারকম পরস্পরবিরোধী কথা শুনে।

কেউ কেউ বলল, কোটদ্বোয়ার-এ বন্‌ধ থাকার কথা নয়। কেউ কেউ বলল, অবশ্যই আছে। একজন বলল, আমি সকাল আটটাতে যখন কোটদ্বোয়ার ছেড়ে বেরিয়ে আসছি তখনই বহুতই মুশকিলের সঙ্গে এসেছি। প্রায় আটকেই পড়েছিলাম। কোটদ্বোয়ার তো পাহাড়ি এলাকারই দ্বোয়ার। সেখানে গাড়ি না আটকালে কোথায় আটকাবে?

হয়তো 'বন্‌ধ' নেই সেখানে অথবা হয়তো বন্‌ধ সকালে ছিল। এখন উঠে গেছে কিন্তু শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিতে অবসন্ন অবস্থাতে ওইরকম ঝুঁকি নেওয়ার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নিল চন্দ্রবদনী। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কতটাই বা এসেছে। অতি সামান্যই পথ।

পরিকল্পনা মাফিক সবকিছু না চললেই চারণ একেবারে ল্যাজেগোবরে হয়ে যায়। পঞ্চাশ মাইল

পথকে পাঁচশ মাইল বলে মনে হয়। তাছাড়া, আহত সে, রীতিমতো অসুস্থই। আঘাতটা কী রকম তা তো শরীরের নানা জায়গার এক্সরে না করলে বোঝা যাবে না। আঘাতের যেটুকু চিহ্ন বাইরে দৃশ্যমান সেটুকুর যন্ত্রণাও আদৌ কম নয়। রাতে যে অবশ্যই বাড়বে আরও, সে বিষয়েও কোনওই সন্দেহ নেই।

ঘুমখাল-এর তিনমাইল পরেই একটি মোড়। সেই মোড়ে পৌঁছে ডানদিকে ঘুরতে বলল চন্দ্রবদনী রওনাক সিংকে। সেই সুন্দর চীর, দেওদার, পাইন, ওক, বার্চ-এর ছায়ায় ছায়ায় চলে-যাওয়া সুগন্ধি পথ বেয়ে এগারো-বারো কিমি এসে ল্যান্সডাউনে পৌঁছনো গেল।

ল্যান্সডাউনে যখন পৌঁছল রওনাক সিং-এর গাড়ি তখন বেলা তিনটে বাজে। শীতের দিন। সূর্য তখনই কমজোর। মরা-মরা। তার তেজ কমে এসেছে। ঘণ্টাখানেক পরেই ঠাণ্ডাটা পাখা-ঝাপটে পড়বে ল্যান্সডাউনে, যেমন ফলভরা লিচুগাছের উপরে বাদুড়েরা সন্ধে নামলেই পড়ে।

ভাবল, চারণ।

এই শহর, মনে হল, চন্দ্রবদনীর চেনা শহর। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়োয়াল রেজিমেন্টের হেড কোয়ার্টার্স এই ল্যান্সডাউনেই। যেখানেই সেনাবাহিনী, সেখানেই নিয়মানুবর্তিতা। সবকিছুই ঝকঝক তকতক করছে। চমৎকার রাস্তা ঘাট। সৈন্যদের পোশাকে, বাড়িতে, ফলকে এবং কামানের গায়ে অফিসারস মেস বা রেজিমেন্টাল হেড কোয়ার্টার্স, যেখানেই যা কিছু তামা বা পেতল আছে, রোদ পড়ে তাই চকচক করছে। তাদের জেল্লা রোদে বিকীরিত হচ্ছে। ইস্ত্রি-করা পোশাক পরে, নিখুঁত ভাবে দাড়ি কামিয়ে, চকচকে করে পালিশ-করা বুট পরে জওয়ান, ল্যান্স-নায়েক, নায়েক, জমাদার, সুবেদাররা সবাই সপ্রতিভতার সংজ্ঞার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে। পার্কিং-লট-এ এমনভাবে ট্রাকগুলো বা জিপগুলো দাঁড় করানো আছে যে, তা দেখেও ভাল লাগে। মনে হচ্ছে, ট্রাক বা জিপ বা অফিসারদের গাড়ি, তারাও যেন ড্রিল-এ সামিল হয়ে 'অ্যাটেনশন'-এ দাঁড়িয়েছে সার সার।

সিভিলিয়ানদের অনেক কিছুই শেখার আছে সেনাবাহিনীর কাছে। একটু কষ্ট করে এই নিয়মানুবর্তিতা শিখে নিতে পারলে প্রত্যেক মানুষের তো বটেই, পুরো সমাজের ও জাতিরই অনেকই উন্নতি হত। বিশেষ করে আমাদের দেশের।

এই ল্যান্সডাউন, চেনা শহর, চন্দ্রবদনীর।

অস্ফুট, স্বগতোক্তি করল চন্দ্রবদনী, কতদিন পরে এলাম! বাবা, যখন এখানে প্রথমে পোস্টেড হন তখন আমি পাঁচ বছরের এবং চুকার এক বছরের ছিল। এখানের আর্মি স্কুলে পড়তাম আমি। চুকার একদিন হারিয়ে গেছিল এখানে, যখন ওর বয়স তিন। সে অনেক লম্বা গল্প।

চারণের, কথা বলতে গেলেই কষ্ট হচ্ছে এখনও। তাই কথোপকথন আজ হচ্ছে না। চন্দ্রবদনী একাই বলছে যা বলার।

চন্দ্রবদনীই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। প্রধান সড়কের উপরে তো নয় ল্যান্সডাউন। তার উপর ফৌজি এলাকা। তাই নিয়মকানুন অত সহজে শ্লথ হবার নয়। সেনাবাহিনী যেখানে থাকে, সেখানের জীবনযাত্রার উপরে তাদের শুভপ্রভাব পড়ে অজানিতেই। অনবধানে সেখানের মানুষ অনেক নিয়মনিষ্ঠ হয়ে ওঠে সম্ভবত।

হর্ন দিতেই গেট খুলল চৌকিদার দৌড়ে এসে। চন্দ্রবদনী নেমে রিসেপশানে গিয়ে কথাবার্তা বলল গাড়োয়ালিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুজন বেয়ারা এসে ওদের মালপত্র নামিয়ে নিল। এতক্ষণ একইভাবে বসে থাকাতে চারণ অনুমানও করতে পারেনি আদৌ যে, তার শরীরে এত ব্যথাবেদনা।

পেছনের সিটের দরজা খুলে একজন বেয়ারা দাঁড়িয়ে ছিল তার নামার অপেক্ষাতে কিন্তু চারণ নিজ চেষ্টাতে নামতে পারল না। পা অসাড়। সারা শরীরে বিষের মতন ব্যথা।

চন্দ্রবদনী ওদিক থেকে তাড়াতাড়ি এসে চারণের হাত ধরল। অন্য হাত ধরল একজন বেয়ারা।

চারণের মনে হল, যেন অন্য কারো পায়ে ভর করে ও হেঁটে চলেছে। পা দুটো যেন কোমরের নীচ থেকে উধাও হয়ে গেছে। নাকের কাছে এখন আর ডেটল অথবা রক্তের গন্ধ নেই। চন্দ্রবদনীর শরীরের খুব কাছে থাকাতে, সকালে-লাগানো পারফ্যুম-এর গন্ধ পেল। যদিও গন্ধ

অনেকই হালকা হয়ে গেছে দিনশেষে। তবু নাক ভরে গেল ভাললাগাতে। গন্ধটি কি শুধু চন্দ্রবদনীর পারফ্যুমেরই ? না তার শরীরেরও ? প্রত্যেক নারীর গায়েই তার এক নিজস্ব গন্ধ থাকে। হয়তো পুরুষের শরীরেও থাকে। নারীরাই জানবেন। সব নাকও সব গন্ধের জন্যে নয়। সব গন্ধ সব নাকে পৌঁছয়ও না। চারণের নাকে কিন্তু পৌঁছয়, বহু দূর থেকেই, নদীর গন্ধ, নারীর গন্ধ, ফুলের গন্ধ, পথের গন্ধ। এই সবই যোজনগন্ধা, চারণের কাছে।

নিজের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে একবার বাথরুমে গেল। চন্দ্রবদনী বসে রইল চেয়ারে। তারপর বেয়ারাকে বলল, আরও দুটি বালিশ নিয়ে আসতে, যাতে ও আরাম করে শুতে পারে। নিজে হাতে, চারণের ওভারনাইটার খুলে পায়জামা পাঞ্জাবি আর বাড়িতে পরার চটি বের করে দিল। তারপরে বেয়ারাকে বলল, বাথরুমের গিজারটা 'অন' করে দিতে।

চমকে উঠল চারণ। গিজার! কতদিন হয়ে গেছে। শব্দটা যেন অচেনা। মানুষ সত্যিই অভ্যেসের দাস। কলকাতাতে মনে হত, শীতের দিনে যেখানে গিজার নেই সেখানে থাকা অসম্ভব। অথচ দেবপ্রয়াগে থাকার সময়ে বুঝেছিল যে কোনও কিছু না হলেই দিব্যি চলে যায়, যদি মন সজীব থাকে। রুদ্রপ্রয়াগের হোটেলেও অবশ্য গিজার ছিল।

ঘর ছেড়ে যাবার আগে চারণকে বলল চন্দ্রবদনী, গরম জলে চান করে নিলে ফ্রেশ লাগবে। ম্যানেজার সাহেবকে বলে আমি হসপিটালের একজন ডাক্তার অথবা কম্পাউন্ডারকে আনার বন্দোবস্ত করছি। প্রয়োজনে বাবার পরিচয় দেব। তাঁরা এসে, আপনাকে ফ্রেশ করে দেবে। যদি আসা না সম্ভব হয় তবে আপনাকেই নিয়ে যাব। গাড়ি তো আছেই। গাড়িতে নিয়ে এলে হয়তো ওদের আসতে অসুবিধা হবে না।

তাছাড়া, ওষুধপত্র যা খাবার, ইনক্লুডিং পেইনকিলার, তারও বন্দোবস্ত করছি। ততক্ষণে চা খান। একপট চা পাঠিয়ে দিচ্ছি বিস্কিটের সঙ্গে।

একটু থেমে বলল, রাতে কি খাবেন ?

চারণের মুখ যেন কেউ অ্যারালডাইট দিয়ে সেঁটে দিয়েছে।

সে বলল, মানে বলতে গেল যে, কিছুই খাবে না কিন্তু তার মুখ দিয়ে শকুন-বাচ্চার চাপা-কান্নার মতন একটা সংক্ষিপ্ত আওয়াজ বেরোল শুধু।

কিন্তু তাতেই চন্দ্রবদনী বুঝল, যা বোঝার।

যে বুঝতে চায়, সে মুখ দেখেই বোঝে। কথা না বললেও চলে।

ভাবছিল, চারণ।

চন্দ্রবদনী বলল, কিছুই না খেয়ে থাকলে হবে না। "রাতের উপোসে হাতি মরে"। আমার মা বলতেন। এখন চা-টা খান, তারপর আমি পাতলা করে মসুর ডালের খিচুড়ি করতে বলছি। তার আগে এক পেগ ব্রান্ডি খান গরম জল দিয়ে। আমার সঙ্গে আছে। বাবার ট্রেনিং। শিশুকাল থেকে দেখেছি, বাবা যেখানেই আমাদের নিয়ে যেতেন, সঙ্গে এক বোতল "ডকটরস ব্রান্ডি" থাকতই। সর্বরোগহারী। আমার বুকে কফ বসল তো চামচে করে খাইয়ে দিলেন, মায়ের গোড়ালি মচকে গেল তো একটু মালিশ করে দিলেন, চুকারের আঙুল কেটে গেল তো সেখানে একটু লাগিয়ে দিলেন।

তারপরই বলল, দেখেছেন! আমার সঙ্গেই ছিল কিন্তু একবারও মনে পড়েনি। এসব দেবভূমিতে কেউ ওসব খায়টায় না। পছন্দও করে না। গরম জলের সঙ্গে দিলে এতক্ষণে চাঙ্গা হয়ে যেতেন। ক্ষতস্থানে লাগিয়েও দেওয়া যেত অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে।

ঘর ছেড়ে চলে যেতে যেতে, যেন চারণের অনুচ্চারিত প্রশ্ন বুঝে নিয়েই, হেসে বলল, না। আমার বাবা কিন্তু টীটোটালোর। অ্যালকোহল তো খানই না, কোনওরকম নেশাই নেই।

চন্দ্রবদনী আবারও এগিয়ে এবার চৌকাঠ পেরিয়ে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল।

চারণের আরেকটা অনুচ্চারিত অনুরোধ বুঝে নিয়ে বলল, রওনাক সিং-এর থাকার এবং খাওয়া-দাওয়ার সব বন্দোবস্ত হচ্ছে। চিন্তা করবেন না কোনও।

ও ফাইন্যালি ঘর ছেড়ে চলে গেলে বালিশে মাথা নামিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে চারণের মনে হল

কালকে ভোর থেকে আজকের এই প্রাক-সন্ধ্যা পর্যন্ত চন্দ্রবদনী যেন তার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে উঠেছে। প্লান্ট লাইফে যাকে "সিমবায়োসিস" বলে। যেন, কতদিনের চেনা। যেন, সে কত আপনজন। সে ঘর থেকে চলে যাবার পরই যেন এই বোধটা অত্যন্ত স্পষ্ট হল। অথচ চন্দ্রবদনী তার কেউই নয়। কেউই নয়। কেউ হবেও না।

বাইরে তক্ষক ডাকছিল টাকটু-উ-টাকটু-উ করে। অন্ধকার হয়ে আসছিল। দিনশেষের নানা আওয়াজ কানে আসছিল। ভোরের উপত্যকা থেকে উঠে-আসা কুয়াশারই মতন যেন ভেসে আসছিল চারদিক থেকে সেই সব স্পষ্ট ও অস্পষ্ট আওয়াজ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষের নাড়ি বাঁধা সূর্যের সঙ্গে। তাই আজ সভ্যতার এত হাজার বছর পরেও, বিজলী আলো আবিষ্কারের এতবছর পরেও, জলে, স্থলে, অরণ্যে পর্বতে সূর্য যখনই ডোবে তখনই এমন জানান দিয়ে ডোবে। পাখি দ্রুত উড়ে ফেরে নীড়ে, মা ডাকে ছেলেকে, কাঠ চেলা-করা শেষ করে গৃহস্থ তাড়াতাড়ি, উঠোনে আগুন করবে বলে বা ফায়ার-প্লেসে দেবে বলে, একটু উষ্ণতার জন্যে। সূর্যর সঙ্গে উষ্ণতা এবং সূর্যর অভাবে উষ্ণতার অভাব বড় গভীরভাবে অনুভূত হয় বিজ্ঞানের এত অগ্রগতির পরেও। শরীর এবং মনেরও উষ্ণতা! কী আশ্চর্য!

বাইরে বেলা মরে আসছে। ঘরের আলো এখনও জ্বালাতে হয়নি। কিন্তু হবে একটু পরই। সূর্য তো অবশ্যই প্রাণবাহী। হেমন্ত আসা মানেই প্রাণের প্রাচুর্যের হ্রাস। তাই সবদেশের মানুষই কি ছায়ারা দীর্ঘ হলে অথবা শীতাভাসে, ব্যস্ত হয়ে পড়ে সব কাজ সেরে ফেলতে? বাইরে থেকে আসা নানা শব্দমঞ্জরীর মধ্যে বসে চারণের মনে হচ্ছিল একেই কি পশ্চিমের দেশগুলিতে "Autumn Solistice" বলে? রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের মাধ্যমে যে কথাকটি আশ্চর্য সুন্দর করে বলেছিলেন। সেই গানও তো Autumn Solistice-এরই গান।

"করো ত্বরা, করো ত্বরা
কাজ আছে মাঠ ভরা
দেখিতে দেখিতে দিন আঁধার করে
...এল যে শীতের বেলা বরষ পরে।"

চারণ সবিস্ময়ে এবং হয়তো সভয়েও লক্ষ করছিল যে, তার মধ্যে, তার সেই পরম-প্রিয় এবং একই সঙ্গে পরম-ঘৃণ্য পরনির্ভরতাটা ফিরে আসছে। ফিরে আসছে, দ্রুতপক্ষ পরিযায়ী পাখির মতন। তার হৃদয়ের পথ নির্ভুলে চিনে।

তার আপন জগতের মানুষেরা, অবশ্যই সে বেশ বড়, এমনকি পূর্ণ-যুবক হয়ে ওঠার পরও তার মায়ের উপর পরম-নির্ভরতা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে এসেছেন চিরদিনই। তার বাবাও ঠাট্টা করতেন। বলতেন তুই একটা মেয়েলি পুরুষ। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা ব্রজেন জ্যাঠা বলতেন, "তুই একখান মাইগ্গা।" তাদের বাড়ির চল্লিশ বছরের পুরোনো কাজের লোক, ওড়িশাবাসী রতিকান্তদা বলত, "তুম্ব গুট্রে মাইচা হ্যালা।" মেয়েলি, মাইগ্গা আর মাইচার নামাবলিতে সে মোড়া ছিল।

চারণ জানত যে, নিজের মায়ের তো অবশ্যই, শিশুকাল থেকেই নারীদের প্রভাব তার জীবনে অসীম। সববয়সী নারীদেরই। তাদের উপরে সে চিরদিনই নির্ভর করে এসেছে জীবনের সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে তো বটেই কোনও কোনও নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপারেও। বহির্জগতের অনেক ব্যাপারেও। এবং তাঁদের উপর নির্ভর করে সে যতখানি নিন্দামন্দজনিত কষ্ট পেয়েছে তার চেয়ে অনেকই বেশি পেয়েছে আনন্দ। যার বা যাদের উপরে শতকরা একশভাগ নির্ভর করা যায় এমন মানুষের সংখ্যা তো সংসারে কোনওদিনও বেশি ছিল না। সংসারে বেশি না থাকলেও চারণের জীবনে, মানে জীবনের বিভিন্ন বয়সে তেমন নারীর সংখ্যা নেহাৎ কমও ছিল না। নিজের সব ভার অন্যের উপরে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে চাপিয়ে দিয়ে সে খুবই হালকা বোধ করেছে চিরদিনই। নিজের মা, মামাতো দিদি, কাজরী, তার চেয়ে মাত্র দুবছরের বড় ছিল সে, যার সঙ্গে কৈশোরের দিন থেকে এবং কাজরী দিদির বিয়ে না-হওয়া পর্যন্ত এক মিষ্টি রোম্যান্টিক সম্পর্কও ছিল। সে, তুলি এবং আরও কয়েকজন তার জীবনকে কখনও পুরোপুরি আবার কখনও আংশিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। নিয়ন্ত্রিত

হতে, জীবনের কোনও কোনও ক্ষেত্রে, কোনও পর্যায়েই সে কখনওই আপত্তি তো করেইনি বরং আহ্লাদিতই হয়েছে। জীবনে অনেক হারের মধ্যে যে জয়ের অনেক আনন্দর চেয়েও গভীরতর আনন্দ আছে, এই সত্যটা ও খুব কম বয়সেই হৃদয়ঙ্গম করেছিল।

গতকাল সকাল থেকেই সে লক্ষ করছে যে চন্দ্রবদনী ধীরে ধীরে তার উপরে এক আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করেছে। সেটা সে অবধানে করছে কি অনবধানে, তা ঠিক জানে না চারণ। কিন্তু সন্দেহ নেই, যে করছে। এবং চারণ খুশি হয়েই তার রাশ চন্দ্রবদনীর হাতে তুলে দিচ্ছে। ও তো নিয়ন্ত্রিত হতেই চায়। এই পরম পরাভবের সুখের খোঁজ কজন রাখেন ?

ও জানে না কেন, হৃষীকেশে চন্দ্রবদনী নামটি ওর কানে আসা মাত্রই নামটি এমন এক অনুরণন তুলেছিল ওর মধ্যে যে, তা বলার নয়। জয়িতার সান্নিধ্য, তা যত তীব্রভাবেই চারণ কামনা করে থাকুক না কেন, কখনও এমন সার্বিক প্রার্থনা জাগায়নি প্রার্থিতাকে পাওয়ার জন্যে। জয়িতাকে পাওয়ার জন্যে, হয়তো শুধু শারীরিকভাবে পাওয়ার জন্যেই ওর যে আর্তি, তার সঙ্গে সস্তা আতরের তীব্র ও কটু গন্ধের তুলনা যদি করা চলে, তবে চন্দ্রবদনীর জন্যে প্রার্থনার সঙ্গে তুলনা করতে হয় এই দেবভূমির উপত্যকায় এবং গিরিখাদের গভীর জঙ্গলে ফুটে থাকা শ্বেতা ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা ফুলের গন্ধের সঙ্গে। সেই সুগন্ধ, কোনও সুরঋদ্ধ গায়কের গলার গানের সুরের আরোহণ অবরোহণের মতনই চারণকে আচ্ছন্ন করে তোলে।

আর কী আশ্চর্য! চন্দ্রাবদনীকে যেমন কল্পনা করে ছিল বাস্তবে তা পুরোপুরি মিলে গেছে। মিলেও গেছে। মনের মধ্যে এক শর্তহীন জলধারা যেমন ঢাল পেলেই স্বতঃসিদ্ধ নিয়মে গড়িয়ে যায় এবং গড়িয়ে গিয়ে অন্য জলধারার সঙ্গে মেশে, চারণও অনবধানে তেমনই গড়িয়ে যেতে শুরু করেছিল মনে মনে, চন্দ্রবদনীর দিকে কুঞ্জাপুরীর সেই মন্দিরের সুন্দর, নিষ্কলুষ, পরিবেশে সামনের কালো পাথরের চাতালে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে সেই সকালে দূরের নগাধিরানি চন্দ্রবদনীর দিকে চাইবার পরমুহূর্ত থেকেই। এতসব কথা ভাবতে ভাবতে বালিশের উপরে মাথা রেখে চারণের চোখ বুঁজে আসছিল। কিন্তু মনের মধ্যে এক আশ্চর্য আনন্দময় শান্তির বাতাবরণ অনুভব করছে সে কাল সকাল থেকেই। সেই বাতাবরণ তার শারীরিক সব কষ্ট ও অস্বস্তিকে যেন ভুলিয়ে দিয়েছিল। ও যেন একটা 'ঘোর', একটা spell-এর মধ্যে আছে। মনে মনে প্রার্থনা করছে তার ঈশ্বরের কাছে, তিনি যেন তার এই ঘোর না কাটিয়ে দেন। এই ঘোর যেন চিরদিনই থাকেই।

চিরদিন ?

হ্যাঁ। চিরদিন! চিরদিন!

যদি চিরদিন বলে আদৌ কিছু থেকে থাকে। দিন তো একদিন ফুরোয়ই সকলেরই।

স্কাইলাইটের মধ্যে দিয়ে পূবের আকাশের সাদাটে ভাব দেখা যাচ্ছিল। দূরে কোথাও জওয়ানেরা ফিজিক্যাল ট্রেনিং শুরু করেছে। একটু আগেই বিউগেল-এর আওয়াজ শোনা গেছিল একবার। তারপর অফিসারের মুখনিঃসৃত সপ্রতিভ সংক্ষিপ্ত শব্দ, মুচমুচে অর্ডার। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে জওয়ানদের দৌড়নোর এবং নানা ব্যায়ামের শব্দ।

চারণ ভাবল। উঠে, একবার বাইরে যায়। সৈন্যদের ব্যায়াম করা দেখে নিজেই একটু 'ফিট' হয়ে আসে।

ভাবলই। কিন্তু উঠতে গিয়েই দেখল সর্বাঙ্গেই ব্যথা বেড়েছে অনেক। কালকে শুধু ক্ষতস্থানগুলিতেই ব্যথা ছিল! আজ সর্বাঙ্গ যেন বিষ-বেদনাতে টনটন করছে। বিছানা থেকে নিজ

চেষ্টাতে ওঠা আদৌ সম্ভব নয়। তবে কি সে এই অতি স্বল্পপরিচিত যুবতী বিধবার গলগ্রহ হয়েই থাকবে। ভারী লজ্জা হল চারণের নিজের জন্যে। নিজের কারণে। কষ্টকে ছাপিয়ে সেই অপারকতার লজ্জাটা তাকে বড়ই হীনমন্য করে তুলল। একটু পরেই বেয়ারা বেড-টি নিয়ে এল। তখন অগত্যা উঠতেই হল। উপায় থাকলে অনেক কিছুই করা দুঃসাধ্য বলে মনে হয় কিন্তু নিরুপায় হলে সব মানুষই অসাধ্যসাধন করতে পারে।

ঘরের দরজা খুলে বারান্দাতে এসে বসল ও। খুবই ঠাণ্ডা। কিন্তু রোদও এসে পড়েছে বারান্দাতে, চীর-পাইনের হিজিবিজি ফিনফিনে আঙুলের বারণ না শুনে। উপত্যকা থেকে নানা পাখি ডাকছে। কী পাখি? চুকার কি? মুদারাতে ডেকে চলেছে বারবার। অনেকবার একইসঙ্গে।

বাইরেই রাখতে বলল চায়ের ট্রে। অনেক কষ্টে ঘরে ফিরে গিয়ে মোজা আর শালটা নিয়ে এল।

ততক্ষণে পাশের ঘর থেকে চন্দ্রবদনীও উঠেছে। হালকা সবুজ রঙের ফ্লানেলের ড্রেসিং-গাউন পরে বেরিয়ে এল সে। রাতে শোবার সময়ে খোঁপা ভেঙে এক বিনুনী করেছে। বিনুনীটা সামনে এনে দুই বুকের মধ্যে দিয়ে নামিয়ে দিয়েছে তার নাভি অবধি। ড্রেসিং গাউনের বুকের ভাঁজের মধ্যে দিয়ে গাঢ় সবুজ রঙা নাইটির নীচে খালিজ-ফেজেন্ট-এর মতন একজোড়া বুকের আভাস দেখা যাচ্ছে। সেখানে চোখ পড়তেই শীত যেন কমে গেল চারণের, সঙ্গে সঙ্গেই। মনে পড়ে গেল সেই বিখ্যাত শায়েরী

"নীগা যায়ে কাঁহা সীনেসে উঠকর?
হুঁয়া তো হুসনকি দৌলত গড়ী হ্যায়।"

অর্থাৎ, নারীর বুক ছেড়ে চোখ আর কোথায় যাবে? খোদা তো সুন্দরীর সব সৌন্দর্য ওখানেই গড়ে রেখেছেন।

ভাবল, এই শায়েরী মনে পড়তেই বুঝল যে, তাহলে তেমন অসুস্থ হয়নি ও।

কেমন আছেন?

চন্দ্রবদনী জিগ্যেস করল।

ভাল।

মিথ্যে করে ভাল বললেও যেন ভালত্বর দিকে কিছুটা এগুনো যায়।

বলেই ভাবল, ও।

এই শিক্ষাটা পশ্চিমীদের কাছ থেকে আমাদের হয়তো নেওয়ার ছিল। চারণ ভাবল। কোনও পশ্চিমীকে কেমন আছেন? জিগ্যেস করলে তাঁরা কেউই তাঁর শরীর-বৈকল্যর দীর্ঘ বর্ণনা অথবা তার মেজশালীর ছোটছেলের নাক দিয়ে ক্রমান্বয়ে সিকনি পড়া বা সেজ জ্যাঠার সেরিব্র্যাল অ্যাটাক ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে আপনাকে বিব্রত করার কথা ভাবতেই পারেন না। হয়তো নিজেরাও বিব্রত হন না। কেমন আছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ওঁদের শরীর মনে যত বৈকল্যই থাক না কেন, ওঁরা পুলকভরা গলায় বলেন "ফাইন"।

চারণ "ফাইন" অবধি যেতে পারল না। মিথ্যাচার করে "ফাইন" বললে তাঁর বিবেক "ফাইন" করে দিত তাকে।

ভাল হয়ে যাবেন আস্তে আস্তে। নিচুস্বরে বলল চন্দ্রবদনী। শরীর সুস্থ হয়ে যাবেই কিন্তু মনের উপরে ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। এসব ঘটনাতে সবচেয়ে বেশি যা আহত হয় তা শরীর নয়, আমাদের সুপ্ত অহং। ইগো। কোনও মেয়ে ধর্ষিত হলে তার শরীরের কষ্টটা তার মানসিক কষ্টের তুলনাতে অতি সামান্যই হয়। আসলে, এইরকম সব ঘটনা আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে যায় যে, আমরা সকলেই আসলে মন-সর্বস্ব জীব। শরীরটা মুখ্য নয়, গৌণ। অথচ শরীর নিয়েই আমাদের যত আদিখ্যেতা।

চন্দ্রবদনীর এই আলোচনাতে চারণ ভাল করে যোগ দিতে পারল না কারণ তার তখনও ভাল করে কথা বলার মতন অবস্থা হয়নি। মনো-সীলেবল ও হুঁ-হ্যা করে কাজ চালাবার মতো কথা বলতে পারছে বটে তবে স্বাভাবিক হতে এখনও আরও কদিন লাগবে।

গতরাতে গরম জলে ব্রান্ডি, পেইনকিলার এবং মুসুর ডালের খিচুড়ি খুব কাজ দিয়েছে। আর্মি হাসপাতাল থেকে একজন কম্পাউন্ডার এসে টেডভ্যাক ইনজেকশান দিয়ে গেছিলেন রাতেই। আজ সাড়ে আটটার সময়ে ও হাসপাতালে গেলে এক্সরে করবেন ওঁরা। যদিও দরকার ছিল না। এসব চন্দ্রবদনীর বাড়াবাড়ি। আসলে ওর কিছুই হয়নি।

চন্দ্রবদনী ঘরে যেতে গেল চারণের আধ ভর্তি চায়ের কাপটি তুলে নিয়ে। যাবার আগে বলল, বড় চুমুকে শেষ করে দিন।

গরম আছে ?

অস্ফুটে বলল চারণ।

টেপিড ! বলে, অন্য একটি কাপ, ওর জন্যে দেওয়া খালি-কাপটি ট্রে থেকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

তারপর ফিরে এসে বলল, গরম চায়ের লিকারের সঙ্গে এই ব্র্যান্ডিটুকু খেয়ে নিন। আরও চাঙ্গা বোধ করবেন।

চারণ বলল, বাঃ বাঃ—এ যে পাঁড় মাতালের খোয়ারি ভাঙা !

চন্দ্রবদনী যেন চারণের চলে-যাওয়া মা ! ভাবছিল, চারণ।

চা খাওয়া হলে, চারণ বলল, হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে, তারপর ?

তারপর কি ?

তারপর কোন পথে যাওয়া হবে ?

বলে, হাসল চন্দ্রবদনী।

তারপর বলল, এমন তো নয় যে, "আমরা দুজনে চলতি হাওয়ার পন্থী, পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি" ! আমাদের পথ তো আলাদা আলাদাই। এখান থেকেই জুদা হয়ে যেতে হবে। আপনার খুবই কষ্ট হল। তবে আমার কিছু লাভ হল। কিছু নয়, খুবই।

কি লাভ ? কেন ?

সে নাই বা জানলেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে গেট-এর পাশের মস্ত প্রাচীন ওক গাছটার দিকে চেয়ে বলল, যখন শরৎকালে হরশৃঙ্গার ফোটে তখন সে না-ফুটে পারে না বলেই ফোটে। কিন্তু তার গন্ধ যখন সন্ধ্যের শরত-শিশিরের গন্ধের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে পরিবেশে ভাসতে থাকে তখন হরশৃঙ্গার গাছ কি জানে কত কী বয়ে আনে সেই সুগন্ধ তার পাশ দিয়ে পথ-চলা মানুষের মনে ? সেই মানুষের মনে কত কী সূক্ষ্মবোধের জন্ম দেয় ?

সূক্ষ্মবোধের জন্ম, বাইরের কোনও কিছুই দিতে পারে না, আপনার মতো সূক্ষ্ম যার মন, তার মনে তো বটেই। তাই সেই মনের তানপুরার তারে কাঁচপোকা উড়ে এসে বসলেও অনুরণন ওঠে, ওঠে চৈত্রমাসের অবুঝ হাওয়া দাপাদাপি করলেও।

বাঃ।

কি বাঃ।

সুন্দর কথা বলেন আপনি।

তাই ?

তারপর বলল, এই সুন্দর কথা বলা মানুষেরাই দেশটাকে ডোবাল। শুধু কথা আর কথা। বেশি কথা মানেই মিথ্যে কথা।

হবে হয়তো।

হঠাৎ-ভাবনাতে বুঁদ হয়ে গিয়ে বলল চন্দ্রবদনী।

তারপর হেসে বলল, গানটা কার বলুন তো ? মনে পড়ছে না। কার লেখা ? কার সুর ? কার গাওয়া ? শান্তিনিকেতনে রাজেশ বলে বন্ধু ছিল আমার, সংগীতভবনের। সে আমার সঙ্গে কোথাও সাইকেলে করে গেলেই এ গানটা গাইত। সে বর্ষারদিনে কোপাই-এর দিকেই যাই আর পৌষোৎসবের সময়ে মেলা প্রাঙ্গণেই ঘুরে বেড়াই।

কি গান ?

"এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হত, বল তো ?"

হেসে ফেলল চারণ। হেসে ফেলেই, ঠোঁটের যন্ত্রণাতে কষ্ট পেল।

বলল, হাসাবেন না, হাসাবেন না। প্লিজ !

"হুঁ" শুনে হেসে উঠল চন্দ্রবদনী !

কিছুক্ষণ পরে নিজের চায়ের কাপটা ট্রেতে নামিয়ে রেখে বলল, গাড়ি এসেছিল আপনারই জন্যে। আপনি রওনাক সিংকে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে কোটদ্বোয়ার, নাজিমাবাদ হয়ে চলে যান হরিদ্বার। সেখানেও থাকতে পারেন। নইলে যেখান থেকে রুদ্রপ্রয়াগে এসেছিলেন সেই আপনার দেবপ্রয়াগেই ফিরে যেতে পারেন। বিকেলের মধ্যেই কমফর্টেবলি পৌঁছে যাবেন। অথবা ভীমগিরি মহারাজদের হৃষীকেশেও যেতে পারেন। যেমন আপনার খুশি।

তাই ?

কিন্তু।

কিন্তু কি ?

আপনি কি সত্যিই চান যে আমি হরিদ্বার বা হৃষীকেশ বা দেবপ্রয়াগে চলে যাই ? আমি কোথায় যে যাব তা ঠিক করিনি। হরিদ্বারেই যদি যাই তবে সেখান থেকে তো, কলকাতাতেও ফিরে যেতে পারি।

কলকাতাতে ?

অবাক হয়ে বলল, চন্দ্রবদনী।

হ্যাঁ। আমার বন্দরে। মাঝে কিছুদিনের জন্যে নোঙর তুলে নিয়ে এদিকে ওদিকে ভেসেই বেড়ালাম শুধু।

যেতে চেয়েছিলেন আসলে কোথায় ? কোনও সুন্দর বহুবর্ণ প্রবাল নির্জন দ্বীপে কি ? যেখানে জলদস্যুদের গুপ্তধন পোঁতা আছে এবং আছে প্রবাল দ্বীপের রাজকুমারী ?

ঠিক তা নয়। মানে, তেমন জায়গাতে নয়।

তাহলে ঠিক কি জন্যে আপনি কলকাতা ছেড়ে হাউই-এর মতন উড়ে এসেছিলেন এই দেবভূমিতে ? এখানেই চিরদিনের মতন থিতু হবেন বলে কি ?

না। তাও নয়।

তবে ?

খুঁজতে এসেছিলাম।

কি ? পরশ পাথর ?

হয়তো তাই ?

পেলেন ?

পাইনি। হয়তো পাওয়ার কাছাকাছি এসেছি।

তাহলে ? এখান থেকে কলকাতাতেই ফিরবেন ?

ঠিক করিনি এখনও। পুরো ব্যাপারটাই ফ্লুইড আছে।

আচ্ছা পাগল মানুষ যা হোক আপনি !

হয়তো।

তাহলে আপাতত আমার সঙ্গেই চলুন !

কোথায় যাবেন আপনি ?

অমি রুদ্রপ্রয়াগেই ফিরে যাব। উত্তরাখণ্ড-এর জন্যে এই আন্দোলন কতদিন চলবে, কী রূপ নেবে তা তো জানি না। তাছাড়া যতদিন না নতুন চাকরি পাচ্ছি ততদিন যাওয়ার মতন কোনও জায়গাও তো নেই আমার। হয় বাবার কাছে গিয়ে থাকা, নয় ঠাকুর্দার কাছে। বাবার এখন ফরোয়ার্ড-এরিয়াতে পোস্টিং। ফ্যামিলি নিয়ে যাওয়া মানা। তাছাড়া, ওই সব জায়গাতে ইয়াং

আর্মি-অফিসারেরা মেয়ে দেখলে জুরাসিক পার্ক-এর প্রাণী হয়ে যায়। সে প্রাণীদের থেকে প্রাণ বাঁচানোই মুশকিল।

হাসল, চারণ।

আপনার চাপরাসি হয়ে বেরিয়েছিলাম রুদ্রপ্রয়াগ থেকে! এখন এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে আপনাকে একা ছেড়ে দিই কি করে! আপনার ঠাকুর্দা বা বড়ি-বুয়াই বা কি বলবেন আমাকে!

আপনার মতলব তো ভাল বুঝছি না। আপনি কি ঠিক করেছেন বড়ি-বুয়ার সোয়েটারটি গায়ে চড়াবার পরই রুদ্রপ্রয়াগ ছাড়বেন?

হেসে ফেলল চারণ।

হেসেই, কেঁদে ফেলল। ঠোঁটে যা ব্যথা!

আপনার গিজারটা কিন্তু 'অন' করাই আছে।

সময়মতন চানটা সেরে নেবেন। কড়া ইস্ত্রি করা মাড় দেওয়া জামা কাপড় পরার দরকার নেই। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে জওহর কোট শাল জড়িয়ে নেবেন উপরে।

মাড় দেওয়া ইস্ত্রি করা কামড় জামা সঙ্গে থাকলে তো! তারাও মালিকেরই মতন সব ন্যাতন্যাতে হয়ে গেছে।

ব্রেকফাস্ট কি খাবেন? সব কিছু খাওয়ার মতন অবস্থা তো এখনও হয়নি। আপনার জন্যে পরিজ, গরম দুধ আর মিষ্টি কমলালেবু দিতে বলছি। টক থাকলে তো আবার ঠোঁট জ্বলবে। চান করেই ব্রেকফাস্ট করবেন তো?

না। আমি ব্রেকফাস্ট করার পরই চান করি।

ভাল। তবে আটটাতে ব্রেকফাস্ট দিতে বলি? আমিও তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

না, না আপনি আবার কেন? ভীষণ অস্বস্তি লাগে আমার। আমি তো শিশু নই! একাই যেতে পারব বেশ।

তবে, নন কি? শিশু?

আপনিও এইরকম অভিযোগ করছেন?

করছি। তবে সব ব্যাপারে নয়। কোনও কোনও ব্যাপারে অবশ্যই। তুলিদি আপনাকে যেমন করে বুঝেছিল, তেমন করে খুব বেশি মেয়ে বুঝতে পারবে না বোধ হয়।

তুলি কি আপনার কাছে আমার গল্প খুবই করত?

খুব। ওর জগতই ছিল শুধু আপনাকে নিয়ে। "চারণময়" জগত। তা নাহলে আপনাকে কাছ থেকে না জেনেও আপনাকে এমন করে আমি জানতাম কী করে! যতই গল্প শুনতাম আপনার ততই ভাবতাম কী এমন আছে বা থাকতে পারে একজন পুরুষের মধ্যে যা এমন করে তুলিদির মতন একজন পরমা সুন্দরী এবং কোটিপতির স্ত্রীকে আকর্ষণ করতে পারে।

তাই?

চারণ বলল, লজ্জিত হয়ে।

আপনার কথা শুনতে শুনতে মনের মধ্যে আমার ভাবী স্বামী সম্বন্ধে এমনই এক ধারণা গড়ে উঠেছিল যে ভীষণই ভয় হত, সেই ধারণার সঙ্গে বোধহয় কারওকেই আর মেলাতেই পারব না। ফলে আমার হয়তো বিয়ে করাই হয়ে উঠবে না। তাই তো সাত তাড়াতাড়ি...

আমার মতন স্বামী কি আদর্শ স্বামী হত? যে স্বামী পরস্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া করে...

পরকীয়ার মধ্যে বঞ্চনা থাকলে তা অবশ্যই দূষণীয়। যে পরকীয়া একজন দুঃখী পুরুষ বা দুঃখী নারীকে বাঁচার অনুপ্রেরণা দেয়, তার জীবনকে পূর্ণ করে তোলে, যার দমবন্ধ দাম্পত্যর ঘরে রোদে-চাঁদে ভরা একফালি বারান্দা হয়ে আসে, তা মোটেই দূষণীয় নয়।

তাছাড়া তুলিদির সঙ্গে আপনার সম্পর্কটিতে পাটনের অন্ধ, সম্পদমত্ত, অশিক্ষিত বাবাকে, শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটাও ছিল। যিনি নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করে এসেছেন চিরটাকাল, তাঁর শক্তি যে শূন্যময়তারই দ্যোতক, সে কথা, এই ফাঁকির কথা, তিনি জানতে পেলে অবশ্যই বুঝতে

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

পারতেন। তার পরে হাহাকারে ভরে যেতেন। আচ্ছা! তিনি কি ঘুণাক্ষরেও জানতেন না এই বঞ্চনার কথা ?

জানি না। জানতেও পারেন। আমার দ্বারা তাঁর ব্যবসার উপকার হত বলেই, জানলেও হয়তো তাঁর কোনও উৎসাহ ছিল না। টাকা ছাড়া, মানুষটা আর কিছুকেই ভালবাসেননি পৃথিবীতে।

চন্দ্রবদনী বলল, তাছাড়া ভাল-মন্দ এই দুই শব্দই আপেক্ষিক। তুলিদির সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্ক করে আপনি তুলিদিকে যেমন জীবন দিয়েছিলেন তেমন তাঁকে বাঁচিয়ে ছিলেন। লিটারালি। নাক দিয়ে প্রশ্বাস নিলে আর নিঃশ্বাস ফেললেই, ভোগ-বিলাসের সমস্ত উপকরণের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকলেই কি আর কোনও মানুষ বেঁচে থাকনে ? বাঁচা যে কাকে বলে, এই কথাটাই তো অধিকাংশ নারী-পুরুষ বোঝেন না।

একটু চুপ করে থেকে বলল, যাই হোক। ও সব কথা থাক। আপনাকে খুব কাছ থেকে জানলাম দু'টি দিন। এই আমার মস্ত পাওয়া। কিন্তু বললেন না তো, কি খুঁজতে এসেছিলেন এই দেবভূমিতে ?

অনেকক্ষণ কথা বলল না চারণ। আরেক কাপ চা ঢেলে নিল। চন্দ্রবদনীকেও জিগ্যেস করল। কিন্তু ও নিল না।

চারণ একটু চুপ করে থেকে, বাহিরের প্রাচীন ওক গাছটার দিকে চেয়ে অস্ফুটে, যেন স্বগতোক্তিরই মতন বলল, হয়তো বাইরের কিছু নয়। হয়তো নিজেকেই খুঁজতে এসেছিলাম। নিজের বহিরঙ্গ আমিটা অন্তরঙ্গ আমিটাকে যে কবে অমন সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলে হজম করে ফেলেছে সে কথা যে মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলাম, সেই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। To Correct my bearings.

পেলেন খুঁজে ? কারেক্ট করলেন কি নিজের বেয়ারিংস ? কম্পাস নিয়ে এসেছিলেন কি সঙ্গে ? স্টপওয়াচ ? গায়রোমিটার ?

হাসল, চারণ।

বলল, না। পাইনি খুঁজে। তবে প্রার্থিত বস্তুর কাছাকাছি পৌঁছেছি বলে মনে হয়েছে একাধিকবার, কিন্তু পরক্ষণেই তা হারিয়ে গেছে আবারও।

তারপরই বলল, আপনি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের "দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী" বইটি পড়েছেন কি ? যে-বইয়ের জন্যে উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ?

না। নোবেল প্রাইজ তো প্রতিবছরই কেউ না কেউ পাচ্ছেন। পশ্চিমে সোরগোল হলেই যে সে বই ভাল হবে তার কোনওই মানে নেই। মিলন কুন্দেরা! মিলন কুন্দেরা! করে গগননিনাদী রব উঠল। ওমাঃ। পড়ে দেখলাম, শোভা দে-র শ্বেতাঙ্গ সংস্করণ। আমিও চেষ্টা করলে ওঁর চেয়ে ভাল পর্নোগ্রাফি লিখতে পারি। সাহিত্য আর পর্নোগ্রাফির মধ্যে তফাৎ আছে। সাহিত্য কাকে বলে এই সরল প্রশ্নটিই করে দেখবেন অনেক বড় বড় আঁতেলদের। মনে হয়, আমার তো মনে হয়, যিনি যত বড় আঁতেল, তিনি ঠিক ততখানি কনফিউজড।

তারপরই বলল, হঠাৎ হেমিংওয়ের কথা কেন ?

আমি খুব ভক্ত হেমিংওয়ের। ওয়াল্ট হুইটম্যান এবং রবার্ট ফ্রস্ট এরও ভক্ত।

"You expected to be sad in the fall.
Part of you died each year when the leaves fall
From the trees and their branches were bare.
Against the wind and the cold, wintry light.
But you knew there would always be the spring.
As you knew the river would flow again
After it was frozen. When the cold rains
Kept on and killed the spring, it was as though.

A young person had died for no reason.''

এটি কোন বইয়ে আছে হেমিংওয়ের ?

The Moveable Feast. তবে The Old Man and the Seaই আমার খুব প্রিয় বই। এই সব লাইন মনের মধ্যে কেমন এক বিষণ্ণতা আনে। এই সব লেখা, যে অন্য অনেক লেখার চেয়ে আলাদা, তা বোঝা যায়। লেখা, যদি পড়ার মতন না হয় তবে তা পড়া এক শাস্তি বিশেষ। গদ্যই হোক আর কবিতাই হোক।

তা ঠিক।

চারণ বলল।

হাসপাতাল-টাসপাতাল চারণের একেবারেই পছন্দ নয়। নানারকম তীব্র, ঝাঁঝাল ওষুধের গন্ধ। যন্ত্রণাকাতর রোগী ও রোগিণীর ক্লিষ্ট মুখ, কারও কারও গোঙানি, মন খারাপ করে দেয়। রোগ শোক তো আছেই! সে সবকে ভুলেই থাকতে চায় চারণ। তবু যেতে হয়, হাসপাতালে, নার্সিংহোমে কখনও সখনও।

যখন ওর শরীরের নানা জায়গার এক্স-রে করা হচ্ছে দুই রেডিওলজিস্ট-এর সংলাপ কানে এল ওর।

সিনিয়র যিনি, তাঁকে ক্যাপ্টেন সিং বলে ডাকছিলেন অন্য জনে। আর অন্যজনের নাম ক্যাপ্টেন বাগারিয়া। ক্যাপ্টেন বাগারিয়া বললেন, কর্নেল শর্মা কি জানেন ?

জানেন বইকি!

কী করে আপনি জানলেন ?

তা বলতে পারব না। এখানের সবাই জানেন যখন, তখন কর্নেল শর্মা তো নিশ্চয়ই জানেন।

ভেরি স্যাড। স্ত্রী গেছেন সেই কবে। তারপর সেদিনই গেল জামাই। তারপর ছেলে। ভেরি স্যাড ইনডিড।

ক্যাপ্টেন সিং বললেন, ছেলের যাওয়া নিয়ে আমার কোনও দুঃখ নেই। সে তো শহীদ হয়ে গেছে। জানি না, কোনওদিন আমাদের উত্তরাখণ্ড-এর স্বপ্ন সফল হবে কি না। কিন্তু তা হোক আর না হোক চুকার শর্মা যে এক বিশেষ বিশ্বাসে ভর করে প্রাণ দিয়েছিল একথা গাড়োয়াল হিমালয়ের সব মানুষ মনে করে রাখবে।

চারণের বুকের ওপর এক্সরে মেশিনের চাঁইটা ছিল। কাঠের টেবলের উপর চিৎ হয়ে হাসপাতালের দেওয়া জামা পরেই শুয়েছিল। শীতও লাগছিল খুবই। কিন্তু ওই কথোপকথন শুনে শীত যেন অনেকই বেড়ে গেল।

সে তুতলে বলল, ফাটা ঠোঁট নিয়ে, কোন চুকার শর্মা ?

কর্নেল শর্মার ছেলে। এখানে উনি পোস্টেড ছিলেন অনেকদিন আগে। আমরা দেখিনি। তবে এখানকার অনেকেই চেনে তাঁকে। চুকারও নাকি ছিল এখানে শিশুকালে।

চারণ বলল, যিনি গতরাতে এই হাসপাতাল থেকে কম্পাউন্ডারকে সঙ্গে নিয়ে ট্যুরিস্ট লজে এসেছিলেন, তিনি তো চুকারের দিদি। কর্নেল শর্মার মেয়ে।

তাই ?

ওঁরা দুজনেই বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বললেন।

চারণ বলল, একটাই অনুরোধ আপনাদের। আমার কিছু হয়নি। আমাকে ছেড়ে দিন। আর খবরটা এখন ওঁকে জানাবেন না। আমিই ওঁকে সঙ্গে করে রুদ্রপ্রয়াগে নিয়ে যাচ্ছি।

আপনার পরিচয়টাতো জানলাম না।

ক্যাপ্টেন সিং বললেন।

আমি কলকাতায় থাকি। আ ফ্রেন্ড অফ দ্যা ফ্যামিলি। রুদ্রপ্রয়াগেও ছিলাম। সেখান থেকে পউরি যাব বলে বেরিয়েছিলাম দুজনে একসঙ্গে। কিন্তু "বনধ" এর জন্যে প্রাণ বাঁচিয়ে কোনওক্রমে

এখানে এসে উঠেছিলাম।

চারণ বলল।

আই সী!

ক্যাপ্টেন বাগারিয়া বললেন।

কোটদ্বোয়ারেও কি "বনধ" ছিল গতকাল?

ছিল! সন্ধের পরই বনধ উঠেছে।

ওঃ! আমাকে প্লিজ একটু তুলে দিন। আমি যাব।

সার্টেনলি। আপনি যান।

আপনার রিপোর্টে যদি খারাপ কিছু থাকে তো আমি মেসেঞ্জার দিয়ে মোটর-সাইকেলে করে পাঠিয়ে দেব রিপোর্ট। না থাকলে, পাঠাব না। আই উইশ বোথ অফ ট্যু আ সেফ জার্নি টু রুদ্রপ্রয়াগ।

থ্যাঙ্ক ট্যু।

চারণ বলল।

তারপর আস্তে আস্তে দীর্ঘ বারান্দাটা পেরিয়ে এসে রওনাক সিং-এর পার্ক-করে রাখা গাড়িতে উঠল।

চারণ ভাবছিল। তার উদ্বাস্তু ব্রজেন জেঠু, তার বাবার অতি প্রিয় সজ্জন, বলতেন মাঝে মাঝেই, "বোঝলানা বাবা। এভরিথিং ইজ প্রিকন্ডিশন্ড। যা কিসুই জীবনে ঘটে, তা ঘটিতব্য ছিল বইল্যাই ঘটে।"

কে জানে! চারণের জীবনে কী কী ঘটার ছিল?

রওনাক সিং তার ডান কানটা আবারও সবেগে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করতে করতে জিগ্যেস করল, সব ঠিক-ঠাক হ্যায় না সাহাব?

হ্যাঁ। দর্দ হ্যায়। বাসস।

দর্দ তো রহেগাই। দিলকা চোট মিলনেসে ঔর জাদা দিন রহতাথা। ইয়ে তো স্রিফ বদনকাই। দিলত ঠিক্কেই হ্যায় না?

চারণ একটু থমকে গেল রওনাক-এর কথা শুনে।

ওর মনে হল যে, রওনাক-এর ডান কানটা তো একবার দেখিয়ে নেওয়া হল না হাসপাতালে! অথচ কাল রাতেও কম্পাউন্ডার এসেছিলেন ওদের ওখানে এবং আজ ও নিজেও হাসপাতালে এল!

গাড়িটা হাসপাতালের কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে বাইরের পথে পড়ল।

চারণ ভাবছিল, আসলে, ওরই মতন যারা ভাগ্যবান, যারা মালিক, যারা ওয়েল-অফফ তাদের অধিকাংশই বোধহয় তাদের খিদমদ্‌গারদের, চাকর, বেয়ারা, ড্রাইভার এদের কারওকেই সমান চোখে দেখে না। পোষা কুকুর, বেড়াল সম্বন্ধেও তাদের যতখানি দরদ বা চিন্তা সেটুকুও সম্ভবত চারণদের কাছে এবং চারণদের জন্যে জানকবুল-করা এইসব মানুষদের সম্বন্ধে নেই। এটা লজ্জার, ভারী লজ্জার।

কান কৈসী হ্যায়? রওনাক?

কিসকা কান সাহাব?

আরে! তুমহারা কান। ঔর কিসকা কান?

ঠিক্কেই হ্যায়। ঈয়ে দো কান নেহি ভি রহতা তো সাহাব, ম্যায় বহুতই মজামে দিন গুজারনে শকতাথা। ঈয়ে দো কানসে হর ইনসান কি কাফি দুখ পঁহুছতা হ্যায়। হর আদমীকি বদনমেহি ইয়ে দো কানই সবসে জাদা দর্দ প্যায়দা করতা হ্যায়। কভভি মেরি দিল চাহতা কি শালে কানকো দোকান পাক্কাড়কে ঠিকসে শিখলাউঁ। মগর আপনা কানকো শিখানা ইতমিনান নেহি না হ্যায়!

কিঁউ?

দুসিরেকো বোলি শুননা পড়তা হ্যায় না! দিল-দুখানা-ওয়ালি সারি বাঁতে। যো বহেড়া হ্যায় উ

বহুতই মজেমে দিন গুজারতা।

চারণ, রওনাকের উদ্ভট কথা শুনে তাজ্জব বনে গেল। বলল, তুম ক্যা সাচমুচ বহেড়া বননে কি ফিক্করমে হ্যায়। দোনো কান লেকর তুম যেইসি হরকৎ করতে রহতা হ্যায় পাঁচ মিনিট বাদহি বাদ যো হামারা লাগতা হ্যায় কি, তুম সাচমুচ বহেড়াই বন যাওগে।

ঠোঁটের কোণে মিচকি হাসি হেসে বলল রওনাক সিং, বদ্রীবিলাজিকি দোয়ামে ম্যায় বহেড়া বন যাতাথা তো বহুতই মজা আ যাতাথা সাহাব। সাচমুচ।

চারণ লক্ষ করেছে যে রওনাক এই 'সাচমুচ' শব্দটি ঘন ঘন ব্যবহার করে এবং তা খুবই মুচমুচে হয়ে বেরোয় তার মুখ থেকে। প্রতিবারই।

পাগলের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ভাবল চারণ। চুপ করে থাকাই ভাল। কে জানে। এই সারথি তাদের, হয়তো পাগল নয়, হয়তো অর্জুনেরই মতন জ্ঞানী-গুণী কেউ ?

কিন্তু ও বিষয়ে মন দেবার মতন মানসিক অবস্থা তার তখন ছিল না! চুকার-এর খবরটা নিয়ে এমন কি করবে সে, তা নিয়েই ভেবে অস্থির হল। খবরটাকে কি লুকোনো যাবে ? তা কি পারা যাবে আদৌ! দশমাসের পোয়াতি তার পেটও লুকাতে পারে, ইচ্ছে করলে। কিন্তু এই খবর...

বলল, শোনো ভাই রওনাক। চন্দ্রবদনীজিকি ছোটা ভাইকো পুলিশ জানসে মার দিয়া। যে দুটি যুবকের লাশ অলকানন্দার জলে কাল সকালে ভাসতে দেখা গেছে তার মধ্যে একটা ওরই ছোট ভাই-এর। চুকার শর্মা তাঁর নাম।

রওনাক যেহেতু তখনও পুরোপুরি কালা হয়ে যায়নি, চারণ এ কথা বলে ভেবেছিল, অবশ্যই রওনাক উঃ আঃ করবে সেই দুঃসংবাদ শুনে। কিন্তু রওনাক সিং ডান হাত দিয়ে তার ডান কান নাড়াচাড়া করতে করতে, বাঁহাতে গাড়ি স্টিয়ার করতে করতেই বলল, পরিসানি হুয়া হোগা বিচারিকা।

কিসকো ?

অবাক হয়ে শুধোল চারণ।

দিদিকি ছোটা ভাইকো।

কোন চিজকি পরিসানি ?

ওয়াহ। অলকানন্দাজিকি পানি কিতনি ঠাণ্ডা থী পঁরশু রাতমে। রাতভর বহলতা হুয়ে নদ্দীমে ওতনি সর্দিমে বহতই তকলিফ হুয়া হোগা বিচারিকি।

চারণ নির্বাক হয়ে গেল রওনাক-এর বাক্য শুনে।

ও ভাবছিল, এই পৃথিবীতে এই সংসারে, একই বস্তুকে, একই ঘটনা বা দুর্ঘটনাকে কত বিচিত্র চোখেই না দেখে একেকজন মানুষ।

অলকানন্দার ঠাণ্ডা জলজনিত কারণে মৃত চুকারের কষ্টের প্রসঙ্গে না গিয়ে, চারণ বলল, ইয়ে সব বাঁতে উনকি নেহি বাঁতানা রওনাক। বিচারী রো পড়েঙ্গি শুননেসে।

বেফিক্কর রহিয়ে সাহাব। ম্যায় কভভি না বাতাউঙ্গা। মগর, উনোনে রো কাহে পড়েঙ্গি ? ফৌজি আদমীয়াঁ কি ঘর কি ছাপ্পরমে মওৎ হরওয়াক্ত রহতি হ্যায়। রহতি হ্যায়, কবুতর যেইসি। মওত তো আনাহি শকতা। আতাহি হ্যায়। দুখ, মওতমে নেহি হ্যায় সাহাব, দুখ দুশমনকি মওত নেহি লা পায়া, সিরফ উস লিয়ে। ফৌজি আদমীকি পরিবারোঁমে মওতই হ্যায় জিন্দেগী। মওত, হুঁয়া আঁসু নেহি না বহলতা হ্যায়!

অবাক হয়ে রওনাক-এর দিকে চেয়ে রইল কলকাতার বঙ্গনন্দন চারণ। ছেলেবেলা থেকে অনেকই কিছু জেনেছে, শিখেছে কিন্তু এমন কথা জম্মে শোনেনি। কখনও মনেও আসেনি।

গাড়িটা যখন বাংলোর গেট-এ ঢুকল তখন চারণ দেখল, চন্দ্রবদনী অফিস ঘর থেকে বেরোচ্ছে।

কেন ? অফিস ঘর থেকে কেন ?

টেলিফোন এসেছিল কি ? কে জানে।

গাড়িটাকে সিঁড়ির সামনে দাঁড় করাতেই চন্দ্রবদনী বলল, আমি গাড়িটাকে নিয়ে একটু

বাস-স্টপেজে যাব কিংবা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ? পনেরো মিনিটেই ফিরে আসব।

কেন ? কী করতে ?

কেন আবার ? আমাকে ফিরে যেতে হবে না রুদ্রপ্রয়াগে ? আমি তো আমার শাশুড়ি মায়ের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম পউরিতে। দেখা যখন হল না, তখন ফিরেই যাই রুদ্রপ্রয়াগে। চাকরি-বাকরির জন্যে যে সব অ্যাপ্লিকেশন করেছি তার উত্তর বা ইন্টারভিউ লেটার এলে, তা আসবে রুদ্রপ্রয়াগেরই ঠিকানাতে।

একটু পরে চারণ বলল, আমি তাহলে তৈরি হয়ে নিচ্ছি। আপনিও তো দেখছি তৈরি হয়েই নিয়েছেন। মালপত্র বারান্দাতে বের করে আমি বিলও পেমেন্ট করে দিচ্ছি। আপনি এলেই আমরা রুদ্রপ্রয়াগের দিকে বেরিয়ে পড়ব।

আপনি কেন বিল দেবেন ? আমার জন্যেই তো আপনার পউরিতে আসা ! এত দুর্ভোগ।

আমিই না হয় দিলাম।

দুর্ভোগের সঙ্গে সুভোগও ছিল।

উত্তর না দিয়ে চন্দ্রবদনী বলল, তবে যাই।

চারণ দুচোখ দিয়ে রওনাক সিং-এর চোখে চাবুক মেরে না-বলে বলল, খবর্দার ! যদি বলেছ কিছু তুমি চন্দ্রবদনীকে।

রওনাক চোখ থেকে চোখ সরিয়ে আবার ডান কানের সাধনাতে লাগল। চারণের মনে হল, টিকটিকির লেজ-এর মতন ডান কানটাই না একসময়ে খসে যায় রওনাক-এর।

গাড়ি চলে গেলে ও অফিসে গিয়ে বিল চাইল। সত্যিই পেমেন্ট করে দিয়েছে চন্দ্রবদনী আগেই। লজ্জিত হল জেনে খুবই। রুম-বেয়ারাকে ডেকে মালপত্র যা ছিল অতি সামান্যই, তা বারান্দাতে বের করিয়ে এনে রোদে পিঠ দিয়ে বসল চন্দ্রবদনীর ফিরে আসার অপেক্ষাতে।

ভাবছিল, খবরটা, কখন, কী করে দেবে চন্দ্রবদনীকে। নাকি রুদ্রপ্রয়াগে গিয়েই ওর আত্মীয়দের মুখ থেকেই শুনবে ও খবরটা ? চুকার শর্মার ঠিকানা তো রুদ্রপ্রয়াগই। সেখানেই তো গেছে খবরটা সবচেয়ে আগে। ওদের হদিস কেউ জানে না বলেই ওরা আগে খবরটা পায়নি। যে-ছেলেদের হাতে ও পউরিতে প্রহৃত হল ওরা। তারা যদি জানত চন্দ্রবদনী কে ? তাহলে তো ওরা পাইলটিং করে নিয়ে যেত তাদের গাড়িকে।

এখন আবার পউরির পথে চলেছে রওনাক সিং-এর গাড়ি। গাড়ির বাইরেও কোনও উত্তেজনা নেই, ভিতরেও নেই, শুধুমাত্র রওনাক-এর কান টানাটানি ছাড়া।

চারণ ভাবছিল, কান ব্যাপারটা সত্যিই বড় অভিশাপের। কান না থাকলে নব্যকালের কত রবীন্দ্রসংগীত গায়ক-গায়িকাদের গান শোনার অত্যাচার থেকেই পার পেতে পারত। সেই সব দোর্দণ্ডপ্রতাপদের নাম না হয় নাই করল।

চন্দ্রবদনী খুব ভাল মেজাজেই আছে।

একটু আগেই ও বলেছে চারণকে, ঈশ্বরের অশেষ দয়া যে, যা ঘটেছিল তার চেয়ে সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটেনি। অথচ ঘটতে পারত। In one piece আপনাকে নিয়ে যে আবার রুদ্রপ্রয়াগের দিকে চলেছি এ কথা ভেবেই আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। রক্ত-টক্ত আমি দেখতে পারি না। দাদুর এক বন্ধু কাব্রাল সাহেব আমাদের গ্রামের উপরে যে মালভূমি আছে সেখানে একটি বড় শম্বর মেরেছিল। তখন আমি আর চুকার দুজনেই ছোট। কী একটা ছুটিতে আমরা ল্যান্সডাউন থেকে রুদ্রপ্রয়াগে এসেছিলাম।

ইসস কী রক্ত ! কী রক্ত ! আমার মনে হয় সে রক্ত দেখার কয়েক বছর পরই দাদু তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু চুকারটা ছিল অন্যরকম। রক্ত দেখে ওর উল্লাস হয়েছিল। তখনই জানতাম ওর মধ্যে একজন খুনে আছে। নিষ্ঠুরতা সুপ্ত আছে, ছাই-চাপা আগুনের মতন। হাওয়া পেলেই দপদপিয়ে উঠবে। যারা রক্ত ভালবাসে, তাদের অনেক সময় নিজের বুকের রক্ত দিয়ে সেই ভালবাসা পূরণ করতে হয়।

চারণ বলল, হঠাৎ এই কথা ? তারপর বলল, রক্তের মূল্যে ছাড়া কিছু কি কেনা যায় আদৌ ? স্থায়ী কিছু ?

তা বটে।

গাড়িটা সম্ভবত পউরির কাছাকাছি এসে পড়েছে। চড়া চড়াই উঠছে। গোঁ গোঁ করছে ফার্স্ট গিয়ারে ফেলা এঞ্জিন। এরপর উতরাই নেমে পউরিতে পৌঁছবে। নানা কথার মাঝে মাঝেই চারণের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠছে। তাও তো চুকার শর্মাকে সে চোখেও দেখেনি। তার ছেড়ে-যাওয়া জিনিস, ঘর, তার বইপত্র, ঘর ভর্তি তার অদৃশ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ-কল্পনা এক রাত তার ঘরে শুয়ে অনুভব করেছে অবশ্যই। সব অনুভবের কথা অন্যকে বলা যায় না।

চন্দ্রবদনী মুখ ফিরিয়ে বসে জানালা দিয়ে চেয়েছিল। গম্ভীর মুখে। কী যেন ভাবছিল। ও কী ভাবছে কে জানে !

চারণ বলল, মন খারাপ লাগছে ?

কী করে বুঝলেন ?

চোখ দেখে। কিন্তু কেন মন খারাপ লাগছে ?

এমনিই।

এমনিই আবার কারও মন খারাপ হয় না কি ?

এমনি মানে, ভাবছিলাম কতগুলো বছর কেটে গেল জীবনের। উত্তরের হাওয়াতে এক এক করে জীবনের পাতাগুলি ঝরে যাচ্ছে। এই ল্যান্সডাউনেই মা ছিলেন। আজ মা নেই। আমার বিয়ের পরে আমরা এখানে এক রাত থেকে গেছিলাম, আমার নববিবাহিত স্বামীকে আমার আর চুকারের শৈশবের দিনগুলোর কথা জানাতে। আজ ও-ও নেই। একদিন হয়তো চুকারও থাকবে না। বাবাও।

তারপরেই বলল, আসলে, কী ভাবছিলাম জানেন ?

কি ?

মানুষেরা গাছেদের কাছে হেরে যায়, হেরে যাবে চিরদিন।

মানে ?

মানে, মানুষও পর্ণমোচী, অনেক গাছেরাও পর্ণমোচী। অথচ গাছেদের ডালে ডালে পরের বসন্তে আবারও কিশলয় আসে। কিন্তু পর্ণমোচী মানুষের জীবনে পাতা ঝরে গেলে তা ঝরেই যায়। আর কোনওদিনও নবকিশলয়ে সে ভরে ওঠে না। তাই না ?

চারণ একটু চুপ করে থেকে বলল, তাইই।

তারপর বলল, আপনার ভারী সুন্দর একটি মন আছে। মনের চোখ দুটি আপনার ভারী সুন্দর। ওরিজিনাল।

মনের চোখ ? না, চোখের মন ?

ওই হল। অত জানি না আমি।

চারণ প্রসঙ্গ বদলে বলল, চন্দ্রবদনীর চুড়ো দেখিনি তবে কুঞ্জাপুরীর মন্দিরের কুঁবারসিংজী আমাকে অন্য দুটি শৃঙ্গার মধ্যেখানের আড়াল-পড়া একটি জায়গার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন ঐ খানে চন্দ্রবদনী। সত্যি কথা বলতে কি, নাম শুনেই প্রেমে পড়ে গেছিলাম।

চন্দ্রবদনী হেসে উঠল জোরে।

রওনাক সিং চমকে উঠে বলল, গাড়ি রোকেগা ক্যা ?

হাসতে হাসতেই চন্দ্রবদনী বলল, নেহি, নেহি। পিছিয়ে, আগে বাড়িয়ে। চারণের মনে পড়ল যে, ন-মাসীমা বলতেন ওরা বেশি হাসাহাসি করলেই, "যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শন্না"। বেশি হাসলেই উনি ওদের ঐ প্রবচনটি বলে ভয় দেখাতেন।

এই গাড়োয়াল হিমালয়ের অথবা কুমায়ুঁ হিমালয়েও এক বিশেষ উচ্চতাতে উঠে এলে পরপর পাহাড়ের গায়ের বনে বোধহয় তেমন বৈচিত্র্য আর থাকে না। ওক, মেপল, চেস্টনাট, পাইন, ফার এই সব গাছের বনে এক ধরনের একঘেয়েমি আছে। তবে বৈচিত্র্য আছে গিরিখাদের হরজাই জঙ্গলে। খুব ভাললাগে উঁচুতেও, যখন অর্কিড ফোটে। নানারঙা। বসন্তে। প্রজাপতি ওড়ে। ইউ এস এ, কানাডা বা ইউরোপেও হেমন্তে যখন নানাগাছের পাতাতে নানারঙের ছোঁয়া লাগে হলুদ, বাদামি, খয়েরি, পাটকিলে, কালো, ম্যাজেন্টা, পারপল্ তখন যে কী অপূর্ব শোভা হয়! সেই শোভার সঙ্গে চারণের নিজের দেশ-এর মার্চ-এপ্রিলের পর্ণমোচী বনেরই শুধু তুলনা চলে। যখন তার স্বদেশের বসন্তবনের কুসুম গাছে নতুন পাতা আসে, তখন যে না চেনে কুসুম গাছ, তার মনে হতেই পারে যে, ফুলেই সেজেছে যেন সে গাছ।

মনটা বড়ই বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে চারণের। চুকারের মৃত্যু সংবাদটা ও না পারছে গিলতে না ফেলতে। অথচ খবরটা চন্দ্রবদনীকে ওর দেওয়াটা অবশ্যই উচিত।

হঠাৎ চন্দ্রবদনী বলল, আপনি কখনও চন্দ্রবদনীতে গেছেন?

চমকে উঠল চারণ। তার ভাবনার জাল ছিঁড়ে গেল। চন্দ্রবদনীর প্রশ্নটা দ্ব্যর্থক মনে করে নিজেই হঠাৎ পুলকিত হল। মনে মনে বলল, যেতে হয়তো চাই, ভীষণই চাই, কতখানি চাই তা এই মুহূর্তের এই প্রশ্নর সম্মুখীন হবার আগে হয়তো বুঝতেও পারেনি। কিন্তু মুখে কিছুই বলল না।

চুপ করে আছেন যে?

চন্দ্রবদনী বলল।

ইচ্ছে করে না? যেতে?

জানি না।

বলল, চারণ।

কোন চন্দ্রবদনীতে যাবার প্রতি তার অনীহা, সেকথা নিজে না বুঝেই।

এমন সময়ে ট্রাফিক পুলিশের প্রসারিত হাতের সামনে দাঁড়াল রওনাক সিং-এর গাড়ি ঠিক যে জায়গাটিতে ছেলেরা তাদের গতকাল সকালে পথে আটকেছিল, সেই ম্যাল-এই।

পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে রয়েছে পুরো পউরি।

কাঁহা যানা?

পুলিশ শুধোল।

রওনাক বলল, জাহান্নাম।

মজাক কর রহ্যা হ্যায় ক্যা?

কিস লিয়ে? তুম মেরি শ্বশুরালকি আদমী থোড়ি হ্যায়।

বকোয়াস মত করো। যানা কঁহা?

ই পাহাড়ি রাস্তে কাঁহাপর উতরে হ্যায়?

শ্রীনগরমে।

তো হুঁয়াই যানা।

উসকি বাদ?

শোচা নেই। রাতমে কেয়া খানা হ্যায় উ আভভি আভভি শোচ লিয়া ক্যা তুমনে? পুলিশজি?

পুলিশকে তাজ্জব বানিয়ে উলটো প্রশ্ন করল রওনাক।

পুলিশ, অজীব রওনাক সিংকে কজ্জা করতে না পেরে বলল, আ রহা কাঁহাসে?

ডান কানটা ডান হাতে দুবার নেড়ে রওনাক সিং বলল, বেহেস্ত সে। কিঁউ? আপকি কোঈ তকলিফ হ্যায় ক্যা? যানা হ্যায় উঁহা?

চলো, তুমকো বন্ধ করে গা থানেমে।

পুলিশ বলল, রেগে গিয়ে।

এই শিবঠাকুরের আপন দেশে রামগড়ুরের সরকারি ছানাদের পক্ষে কোনও অপকর্মই করা অসম্ভব নয় বলেই চারণ তাড়াতাড়ি বলল, আমরা আসছি ল্যান্সডাউন থেকে, যাব শ্রীনগর হয়ে রুদ্রপ্রয়াগ। শ্রীনগরে কি এখনও খুব টেনশান আছে?

টিশান? টিশান তো নেহি হ্যায় কোঈ শ্রীনগরমে। রেলস্টেশন তো আপকি মিলোগি নিজামাবাদ নেহি ত হারদ্বোয়ার যা কর! শ্রীনগর সে বাঁয়া ঘুম কর, হৃষীকেশ পৌঁছনেকো বাদ দেরাদুন ভি চল দেনে শকতা হ্যায়। হুঁয়াভি টিশান হ্যায়।

টেনশনকে যে টিশান বলে জানে তার সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে চারণ ডানহাতটি তুলে বলল, সুক্রিয়া।

উত্তরপ্রদেশের সমতলবাসী গুঁফো পুলিশ বলল উষ্মার সঙ্গে, আপকি ড্রাইভার সাহাবকি জারা শুধারিয়ে, নেহি তো...

রওনাক তার কানসর্বস্ব সুন্দর মুখটি জানালার মধ্যে দিয়ে গলিয়ে দিয়ে বলল, আররে পুলিশ কি বাচ্চে, তু খুদকো শুধার। ভারী আয়া মাস্টার মেরা! হাঃ!

চারণ রওনাককে ভর্ৎসনা করে বলল, ক্যা হো রহা হ্যায় রওনাক? বাঁতে মত বনাকে, আভি উতরো ধীরে ধীরে পাহাড়কে নীচে। ইয়ে ক্যা মজাককি ওয়াক্ত হ্যায়?

বাঁদিকে বরফ ঢাকা শৃঙ্গগুলো সকালের রোদ পড়ে ঝলমল করছিল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই রওনাক সিং-এর গাড়ি সেই স্বর্গ থেকে ঝুপ করে নীচে নেমে ডানে একটা বাঁক নেওয়া মাত্রই সেই "ইলাস্বর্গ" মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। চারণ ভাবছিল এ জীবনে স্বর্গমাত্রই বোধহয় এমনই মিলোয়।

চন্দ্রবদনী হেসে বলল, 'টিশান' আর 'টেনশন'-এ গোল বাঁধিয়ে ট্রাফিক পুলিশটি খুব একটা ভুল করেনি, কারণ প্রতিটি স্টেশনেরই মতো প্রতিটি টেনশানও তো মানুষকে বহুদিকে চারিয়েই দেয়। প্রতিটি টেনশানই এক একটি স্টেশন বইকী!

তা ঠিক! চারণ বলল।

উত্তরটা কিন্তু দিলেন না আপনি আমার কথার।

কোন কথার?

চন্দ্রবদনীতে গেছেন কি না?

না। যাইনি।

বলল, চারণ।

তারপর নিরুচ্চারে বলল, তাছাড়া, চন্দ্রবদনীতে যাওয়া কি সোজা কথা? কী করে যেতে হয় তাও ত জানি না ছাই। যাওয়া কি আদৌ যাবে? যে-কোনও তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গকে দূর থেকে দেখেই তার মনে হয় একেকটি মৌন তাপস-তাপসীই যেন তাঁরা। কত হাজার হাজার বছর ধরে কত কথা, কত জ্ঞান, কত স্মৃতি বুকে করে নিথর নির্বাক হয়ে রয়েছেন তাঁরা একেকজন। তাঁদের মাথায় চড়তে চাওয়াটা শুধু আস্পর্ধার ব্যাপারই না, কুরুচিকরও হয়তো বা। তবে তীর্থযাত্রীরা তো কোনও শৃঙ্গেরই মাথায় চড়তে যান না। তাঁরা শৃঙ্গের পাদদেশের কোনও না কোনও মন্দিরেই যান। তাঁরা যখন মন্দিরের মধ্যের অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে প্রদীপ-জ্বলা ফুল-গন্ধী, ধূপ-গন্ধী ঘরে তাঁদের আরাধ্য দেবতাকে খোঁজেন তখন আসল দেবতা গিরিশৃঙ্গর উপর থেকে অথবা নীলাকাশের নীলিমাতে লীন হয়ে থেকে পুণ্যার্থীদের দিকে তাকিয়ে নীরবে হাসেন। আশীর্বাদও হয়তো করেন।

যদি যেতে চান তো পথ বলে দিতে পারি। চন্দ্রবদনী বলল।

কীভাবে যেতে হয়?

দেবপ্রয়াগে তো আপনি ছিলেনই। সেখান থেকেই যেতে হয়।

তাই? আশ্চর্য! পাটন তো একবারও বলল না কিছু। দেবদেবীতে কোনও ভক্তিশ্রদ্ধাই নেই

ওর। শুধু রক্তমাংসর চন্দ্রবদনীর কথাই সে জানিয়েছিল আমাকে।

পাটন তো পুণ্য বা ভক্তি অর্জন করতে দেবপ্রয়াগে ছিল না।

তো কি করতে ?

তা ওই জানে। অদ্ভুত এক ছেলে সে। নইলে চুকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় !

বলুন না কী করে যেতে হয় ?

দেবপ্রয়াগ থেকেই চন্দ্রবদনীর বাস ছাড়ে।

তাই ?

হ্যাঁ।

বাসে যেতে হয় কুড়ি কিমি মতো। তারপর আরও সাত-আট কিমি যেতে হয় হেঁটে। অথবা জিপেও। সিজন এর সময়ে জিপ পাওয়া যায় বাসস্ট্যান্ডে।

শেষ দেড় কিমি পথ যেতে হয় পায়ে হেঁটেই। তবে বাস তো নিয়মিত বা সময়মতন যায়, এমন নয়। দেবপ্রয়াগ থেকেই জিপ ভাড়া করে যাওয়াটাই ভাল।

কোন দিকে যেতে হয় ?

ভাগীরথীর উপরে যে ব্রিজ আছে দেবপ্রয়াগে, তা পেরিয়ে কিছুটা শ্রীনগরের দিকে গিয়ে বাঁদিকে পথ উঠে গেছে খাড়া পাহাড়ে। মহড় নামের একটা ছোট গ্রাম ও হিন্দোলখাল নামের একটি বড় গ্রাম পেরিয়ে গিয়ে যে গ্রামে পৌঁছতে হয় সেই গ্রামটির নামও চন্দ্রবদনী।

বলেন কি ? চন্দ্রবদনী নামের গ্রামও আছে ? বাঃ। মনটা ভাল হয়ে গেল।

কেন ? মন ভাল হল কেন ?

আপনাকে তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গর সঙ্গে এতদিন একাত্ম করে রেখেছিলাম। ওইসব গিরিশৃঙ্গে আমার মতন পঙ্গুর তো কোনওদিনও ওঠা হত না। এখন গ্রামও আছে ওই নামে শুনে, চেষ্টা করতে হবে আপনার কাছে পৌঁছনোর। পৌঁছলেও হয়তো পৌঁছনো যেতে পারে।

ওই গ্রাম থেকেই উপরে হেঁটে উঠতে হয়। মানে, মন্দিরে।

কোন দেবীর মূর্তি আছে চন্দ্রবদনীর মন্দিরে ?

কেন ? দুর্গার। চন্দ্রবদনী আর দুর্গা তো একই।

তাই বলুন। এতদিনে আপনার মাহাত্ম্যটা বোঝা গেল।

দেবদেবীকে মানুন আর নাই মানুন, ঠাট্টা করতে নেই কখনও।

তাই ?

হ্যাঁ। তবে সিংহবাহিনী দুর্গা ছাড়াও আরও দেব-দেবীর মূর্তি আছে মন্দিরের গায়ের নানা অলিন্দে।

কার কার ?

গণেশ, হনুমান, হরপার্বতী এবং কালীর মূর্তি আছে। আসল আরাধ্য স্থানে কোনও মূর্তি নেই। সেখানে পৌঁছতে হয় একটি অপরিসর দরজা দিয়ে গিয়ে। সেখানেই মায়ের শিলাপিঠ আছে। অনেকে বলেন, চন্দ্রবদনী বাহান্ন পীঠের এক পীঠ। সতীর শরীরের গোপনাঙ্গর অংশ নাকি পড়েছিল এখানে, কামাখ্যারই মতন।

তাই ?

কুঞ্জাপুরী কুঁয়ারসিংহী বলছিলেন যে স্তন পড়েছিল।

হতেও পারে।

শুনেছি। আমার মায়ের খুব প্রিয় জায়গা ছিল এই চন্দ্রবদনী। প্রতি বছরেই আসতেন একাধিকবার বিয়ের পর থেকেই। এই নামটিও মায়ের খুব পছন্দ ছিল। তাই কনসিভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক করেন যে, মেয়ে হলে তার নাম রাখবেন চন্দ্রবদনী।

নামটা আমারও খুব পছন্দ।

চারণ বলল।

আর নামের মালিককে ?

সেটা এখন নাই বা বললাম।

চন্দ্রবদনী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কে ?

শুনেছি, কুঞ্জাপুরীর মন্দিরেরই মতন তেহ্‌রির রাজারাই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করছিলেন। আগে এখানে নরবলিও হত নাকি। তবে এ বছরও গিয়ে দেখেছি, কুঞ্জাপুরীরই মতন সংস্কারের নামে মোজাক মার্বেল লাগিয়ে শ্রীবিঘ্নিত করার ষড়যন্ত্র করেছেন পুরোহিতেরা।

এই আমাদের এক দোষ। কী বনবাংলো, কী মন্দির, প্রকৃতির মধ্যে যা কিছুই ছিল না বা করা হয়েছিল অনেকদিন আগে, তার সংস্কারের নামে এমন কুরুচিকর সব সংযোজন হয় যা প্রকৃতির সঙ্গে এবং মূল স্থাপত্যর সঙ্গে একেবারেই বেমানান। প্রাচীনত্ব আর আভিজাত্য যে সমার্থক সে কথা বুঝতে বুঝতেই আমাদের জীবন শেষ হয়ে যায়।

ঠিক তাই।

বলল চন্দ্রবদনী।

পাহাড় থেকে নামার সময়ে পায়ে হেঁটে নামলে কষ্ট হয় হয়তো ওঠার চেয়েও বেশি। কিন্তু গাড়িতে নামলে তরতর করে নামা যায়। কষ্ট তো হয়ই না। সময়ও কম লাগে।

রওনাক সিং-এর পক্ষিরাজ শ্রীনগরের উপত্যকার দিকে গড়িয়ে চলল প্রতি বাঁকেই হর্ন দিতে দিতে। গড়িয়ে চলল মানে, গিয়ার নিউট্রাল করে নয়, গাড়ি গিয়ারে দিয়েই। নামার সময়ে যে সব নভিস পেট্রল বাঁচাবার জন্য গাড়ি নিউট্রালে ফেলে নামেন তাঁদের পেট্রল হয়তো বাঁচে কিন্তু প্রাণ সম্ভবত বাঁচে না।

দেখতে দেখতে অনেকই নীচে নেমে এল ওরা। তারপর চীর আর পাইনের গন্ধমাখা আলোছায়ার সুগন্ধি পথ পেছনে ফেলে রেখে এসে পড়ল শ্রীনগরের উপত্যকাতে। এখানে অলকানন্দার দৃশ্যের কোনও তুলনা নেই। গেরুয়া, পাটকিলে, কমলা এবং সাদা-রঙা বালি, নানা প্যাস্টেল শেডস এর নুড়ি, আর নীল সবুজ এবং সাদা জল। নদীর উপরে পর্বতরাজির গায়ে সবুজ ফ্রেমে বাঁধানো ঘন নীল আকাশ।

হঠাৎই নদীর দিকে তাকিয়েই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল চন্দ্রবদনী। এক মুহূর্তের জন্য। তারপরই সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে গাড়ির ভিতরে করল। গাড়িটা শ্রীনগরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাতে ঢুকতেই চন্দ্রবদনী রওনাককে বলল, গাড়ি জারা রুকিয়ে তো!

গাড়ি দাঁড়ালে, অলম্ব পথের বাঁদিকে একটি প্রাচীন গাছের নীচের সামোসা-জিলিপির দোকানের সামনের বেঞ্চে বসে-থাকা এক যুবককে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকল।

যুবক সম্ভবত দোকানের মালিক।

গরম হবে কি ?

স্বগতোক্তি করল, চারণ।

কী ?

চন্দ্রবদনী জিজ্ঞেস করল।

ওই সামোসা আর জিলিবি ?

ইতিমধ্যে হাতছানি দিয়ে ডাকা সেই গাড়োয়ালি ছেলেটি এসে গাড়ির জানলাতে দাঁড়াল।

চন্দ্রবদনী যুবককে কিছু বলল, গাড়োয়ালিতে।

চন্দ্রবদনী ইশারাতে তাকে গাড়ির সামনের সিটে উঠে বসতে বলল। সপ্রতিভ যুবকটি গাড়ির সামনের দরজা খুলে উঠে বসল সঙ্গে সঙ্গে। তার মাথায় গাড়োয়ালি টুপি। মুখে বুদ্ধির প্রসাধন। পরনে, ফেডেড জিনস।

রওনাক, গাড়ি স্টার্ট করে একটু এগোতেই যুবক বাঁ হাত জানালা দিয়ে বের করে রওনাককে লক্ষ করে বলল, বাঁয়া! বাঁয়া! লেফট।

রওনাক গাড়ির স্টিয়ারিং বাঁয়ে ঘোরাল। ছেলেটাকে গাড়োয়ালিতে যা বলল চন্দ্রবদনী তার মধ্যে

চুকার শব্দটি ছিল। সেই নামটি কানে যাওয়া মাত্রই চারণের মনে এক ভয়মিশ্রিতকৌতূহল জাগল।

ছেলেটির নির্দেশে রওনাক, গাড়িটি অলকানন্দার ধারের একটি জায়গাতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল। তারপর ছেলেটিরই নির্দেশে এঞ্জিন বন্ধ করল। গাড়ি থামলে, ছেলেটি দরজা খুলে নামল। বাঁদিকে বসেছিল চন্দ্রবদনী। বাঁদিকের দরজা খুলে চন্দ্রবদনীকে নামতে সাহায্য করল সেই যুবক। ভারী ভদ্র ও শিক্ষিত ছেলে। তার মুখশ্রী এবং ব্যবহারই বলে দেয়।

চারণ, তার কি করা উচিত তা বুঝতে না পেরে ডানদিকের দরজা খুলে গাড়ি থেকে নামল। নদীর জলের পাশে কতগুলো ল্যানটানা ঝোপ। তার পাশে একসার ঘন সবুজ পাতায়-মোড়া গাছ। দার্জিলিং-হিমালয়ে যে গাছকে বলে ধুপী। এই অঞ্চলে এদের কি নাম কে জানে। তাছাড়া, সে গাছ কি এই অল্প উচ্চতাতে হয়? ভাবছিল চারণ।

চন্দ্রবদনী সেই ছেলেটার সঙ্গে নীচে নেমে জলের দিকে এগিয়ে চলল বাধো-বাধো পায়ে।

রওনাক সিং গাড়িতে বসেই কান টানাটানি করছিল। স্টিয়ারিং ছাড়লেই ওর হোল-টাইম অকুপেশান হয় কান। স্টিয়ারিং বাঁহাতে ধরেও অনেক সময় ডানহাতে টানাটানি করে। চারণের কান দেখেই মনে হচ্ছে এটা ওর কোনও অসুখ নয়। হয় মুদ্রাদোষ, নয় অবসেশান। ওই এক নিরন্তর খেলায় পেয়েছে যেন তাকে। কোনও মধ্যান্তর পর্যন্ত নেই। কিন্তু চন্দ্রবদনীর হাবভাব দেখে সেই কানধারীও দরজা খুলে নেমে পড়ে চারণের পাশে পাশে চলতে লাগল।

ছেলেটা চন্দ্রবদনীকে একেবারে জলের পাশে নিয়ে গেল। গিয়ে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ওই যে! ওইখানে!

নদী সেখানে একটি বাঁক নেবার আগে থমকে গিয়ে একটি উপলবিছানো ব্যাকওয়াটারের সৃষ্টি করেছে। বড় বড় প্রস্তরখণ্ডে জায়গাটা আকীর্ণ। সেই পাথরের উপরে কোথাও কোথাও রক্তের দাগ লেগে আছে। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। আঙুল দিয়ে দেখাল ছেলেটি। আর তা দেখামাত্রই চন্দ্রবদনী একটি পাথরের উপরে বসে পড়ে মুখ নিচু করে দুহাতে মুখ ঢাকল। ঢেকেই, হঠাৎই অসংযতভাবে ডুকরে কেঁদে উঠল। কিন্তু চাপা কান্না। এবং ক্ষণিকের জন্য। তার বুক যে ভেঙে যাচ্ছিল তা ওরা তিনজনেই বুঝতে পারছিল। কিন্তু অনাত্মীয় যুবতীর গায়ে হাত দিয়ে, তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, কোলে বসিয়ে সান্ত্বনা দেবার যে কোনওই উপায় নেই অনাত্মীয় পুরুষের। অথচ চারণের খুবই ইচ্ছে করছিল যে, চন্দ্রবদনীকে বুকের মধ্যে নিয়ে তার সব শোককে মুছে দেয়, শুষে নেয়।

ভালবাসার জনের দুঃখে, যে, ভালবাসে, তার বুক তো ভেঙে যায়ই! ভালবাসার জনকে কাঁদতে দেখে কত মানুষে যে অন্যকে খুন করে, দুর্বল একা হাতে সবলের সঙ্গে লড়তে গিয়ে প্রাণ হারায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই ক্ষণিক দৃশ্য যে কত মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষরা যুদ্ধের কারণ হয়েছে তা কজনে জানে?

কিন্তু চন্দ্রবদনী?...ও কি জানত?...

রওনাক সিংও অবাক হয়ে চারণের দিকে চাইল। চারণও অবাক হয়ে তাকাতে লাগল একবার রওনাক-এর মুখের দিকে আর একবার চন্দ্রবদনীর মুখের দিকে।

একটা মাছরাঙা নীল-হলুদ পাখি অনেক দূরের ওপার থেকে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে উড়ে এল ওদের দিকে। তার ডানা দুটো এতই জোরে সে নাড়ছিল, মনে হচ্ছিল যে, কোনও একটি গোলাকার রঙিন উড়ন্ত জিনিস ধেয়ে আসছে ওদের দিকে। পাখিটা চন্দ্রবদনীর থেকে হাত পাঁচেক দূরে থাকতে থাকতেই হঠাৎই দিক পরিবর্তন করে রুদ্রপ্রয়াগের দিকে মুখ ঘুরোল।

রওনাক সেই গাড়োয়ালি ছেলেটিকে অনেকটা দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে, তাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার?

চারণও পায়ে পায়ে এগিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছল।

ছেলেটা হিন্দিতে বলল, এইখানেই চুকার শর্মা আর সতীশ সিং-এর ডেডবডি ভেসে এসে আটকেছিল। ছেলেরা যখন বডি তোলে তখন তাদের শরীরের বিভিন্ন ক্ষতস্থানে রক্তস্রোত আর

ছিল না বটে, ধুয়ে গিয়েছিল সারা রাত হিম-নদীতে পড়ে থেকে। কিন্তু মুখ দিয়ে ঝলক ঝলক রক্ত বেরিয়েছিল। বডি নাড়াচাড়া হতেই।

ডেডবডি এখন কোথায় ?

পোস্ট-মর্টেম হওয়ার জন্য লাশকাটা ঘরে গেছিল।

মারা তো গেছে পরশুদিন।

রওনাক বলল।

তাতে কি ? অজীব দেশে অজীব নিয়ম। এই দেশের নাম ভারত। এই দেশ আমাদের গর্ব যেমন, তেমন লজ্জাও।

তারপর বলল, ছেলেরা মৃতদেহ শোভাযাত্রা করে শহর প্রদক্ষিণ করিয়ে নিয়ে এসে নদীপারে দাহ করতে চেয়েছিল কিন্তু পুলিশ অনুমতি দেয়নি। পুলিশ বলেছিল, আত্মীয়রা এলে, বডি আইডেনটিফাই করলে, তারপরই পুলিশের হেপাজতে নদীপারে দাহ হবে।

তারপর ?

আত্মীয়রাও থাকেন একজনের রুদ্রপ্রয়াগে আর অন্য জনের চামৌলিতে। তাঁরা নাকি পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছেন যে ওই বীভৎস ফোলা-গলা মৃতদেহ তাঁরা দেখতে চান না। তাছাড়া, ওরা দুজন ওদের পরিবারের বা আত্মীয়দের যতখানি তার চেয়ে অনেকই বেশি ওই ছেলেদের, যারা উত্তরাখণ্ড-এর জন্য আন্দোলন করছে। যাদের কারণে, যাদের দাবিতে ভর করে ওরা প্রাণ দিয়েছে। ওরাই ওদের আসল আত্মীয়। রক্তের আত্মীয়তার দাবি ওরা তুলে নিয়েছেন।

আপনাকে এসব কে বলল ?

চন্দ্রবদনী জিজ্ঞেস করল।

ওই চায়ের দোকানটিতে ছেলে-ছোকরাদের আড্ডা। ওইখানেই বিপ্লবের বীজ বোনা হয়, ওইখান থেকেই ফসল তোলা হয়। আমি দোকানে বসে বসেই সব শুনেছি।

আপনি কি দোকানের মালিক ?

না আমি আমার মালিক।

ডেডবডি তাহলে এখন কোথায় ?

কাল রাতে দাহ হয়েছে অলকানন্দার পারে।

কী লোক! কী লোক! সারা শহর ভেঙে পড়েছিল। এমনিতে তো "বনধ" ছিলই। শোভাযাত্রা করতে দেয়নি বটে পুলিশ কিন্তু শোভাযাত্রার বাবা হয়েছিল ওই অন্ত্যেষ্টি।

আত্মীয়দের আইডেন্টিফিকেশন ছাড়া অন্ত্যেষ্টি হল কি করে ?

তাদের কাছ থেকে পুলিশ চিঠি নিয়ে এসেছিল। দুজনের আত্মীয়দেরই কাছ থেকে। রুদ্রপ্রয়াগ এবং চামৌলি থেকে।

সিচুয়েশন খুব টেন্স হয়ে গেছিল ?

হয়নি ? পুলিশ চৌকি তো জ্বালিয়েই দিয়েছিল ছেলেরা।

তারপর ?

তারপর মিলিটারি এসেছিল উপর থেকে নেমে। তবে ততক্ষণে ছেলেদের রাগ গাড়োয়ালের প্রশাসনের মাথা এবং স্থানীয় এম এল এ-দের মধ্যস্থতাতে অনেকখানি প্রশমিত হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল যে, এই ত্যাগ বৃথা হবে না। তেমন বড় কিছু পেতে হলে তার দামও বেশি পড়েই। কেন্দ্রীয় সরকার নাকি কথা দিয়েছেন ছাত্র নেতাদের সঙ্গে দেখাও করবেন। এবং আলাদা রাজ্যের দাবি মেনে নেবেন।

ওরা সকলে গিয়ে গাড়িতে বসলে, চন্দ্রবদনী তখন রওনাককে বলল, গাড়ি ঘুমাকে ইনকো পহিলো উতারনা।

যুবকটি গাড়িতে উঠে বসে বলল, আপকি কোই রিস্তা হ্যায় ক্যা ? উনদোনোসে ?

রিস্তাতো হর ইনসানকি সাথ হর ইনসানকি হোতাই হ্যায়। ইনসানিয়াত কি রিস্তা।

বলেই, চুপ করে গেল চন্দ্রবদনী।

চুকারকে তো চোখে দেখেনি চারণ কিন্তু তার দিদিকে দেখেছে। বয়সে তরুণী হলেও এক আশ্চর্য সুন্দরী এবং সম্ভ্রান্ত মহিলা, সম্ভ্রান্ততার সংজ্ঞাই যেন!

চুকারদেরই মতন আদর্শবাদী, সৎ, সাহসী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী অনন্য যুবকের প্রয়োজন আজকে আমাদের এই হতভাগী রাজনীতিক নামক একদল ঘৃণ্য দুপেয়ে জানোয়ারদের দ্বারা ধর্ষিত এই সুন্দর দেশে। চুকারদের মতো অনেক তরুণদের দেখেই সম্ভবত আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে একজন সৎ এবং নিজস্বার্থহীন ভারতপ্রেমী জিম করবেট MAN EATING LEOPARD OF RUDRAPRAYAG বইটির শেষ প্যারাগ্রাফে লিখেছিলেন :

"A typical son of Garhwal of that simple and hardy hill-folk; and of that greater India, whose sons only those few who live among them are privileged to know. It is these big-hearted sons of the soil, no matter what their caste or creed, who will one day weld the contending factors into a composite whole, and make India a great nation."

চারণের দুচোখ জ্বালা করে উঠল। সে নিরুচ্চারে বলল, কবে ? কবে সত্যি হবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করবেট সাহেব ? কবে ?

চারণ স্তম্ভিত ছিল। তাই নতুন করে স্তম্ভিত হবার কিছু ছিল না। বুঝল যে, চন্দ্রবদনী চুকারের মৃত্যুর খবর সম্ভবত কাল রাতে বা আজ সকালেই পেয়েছিল। যখন ওকে টুরিস্ট লজ-এর অফিস ঘরের থেকে বেরোতে দেখেছিল সম্ভবত তখনই কেউ ফোনে তাকে খবরটা দিয়েছিল। তার বাবা বা তার দাদু অথবা চুকারদেরই কেউ। পাটনও হতে পারে। আশ্চর্য! এইরকম মানসিকতার কোনও মানুষ বা মানুষীর সংস্পর্শে এর আগে আর কখনওই আসেনি চারণ। ওর মনে পড়ে গেল, কোথায় যেন পড়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ নাকি জোড়াসাঁকোয় এক সাহিত্যসংক্রান্ত ছোট সভা ডেকেছিলেন। কয়েকজন মিলে সেই সভার কাজ করতেন। তাঁর এক কন্যা অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। সেই সভাচলাকালীন একদিন সভার কাজ কিছুদুর এগোনোর পরে সভাস্থ একজন প্রশ্ন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, "আপনার কন্যা আজ কেমন আছে ?"

রবীন্দ্রনাথ নাকি, সভার কাজে নিমগ্ন নিরুত্তাপ গলাতে চোখ না তুলেই বলেছিলেন যে, "সে আজ সকালেই চলে গেল।"

এই ঘটনার কথা পড়ে চারণ স্তম্ভিত হয়েছিল। শোকের কদর্য বিস্তৃত বহিঃপ্রকাশ ও যেমন দেখেছে নগরে-গ্রামে অনেকই মৃত্যুতে তেমনই অনেক ব্রাহ্ম এবং ক্রিশ্চান বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে দেখেছে আশ্চর্য এক সমাহিত ভাব। কিন্তু এও ঠিক যে, প্রক্ষোভের এমন সুন্দর প্রক্ষেপন নিজের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কমই দেখেছে।

চন্দ্রবদনী আজ সাদা সালোয়ার কামিজ পরেছে। গরম সার্জ-এর। সকালে ল্যান্সডাউন থেকে বেরোবার আগে তেমন করে লক্ষ করেনি চারণ তার পোশাক। গলায় মালা পরেনি আজ, হাতে চুড়িও পরেনি। দুল পরেনি কানে। লিপস্টিকও মাখেনি। কাল মেখেছিল, হালকা। নাও মাখতে পারে। লক্ষ করেনি তেমন করে চারণ। মেয়েদের ঠোঁটের দিকে বেশি মনোযোগের সঙ্গে তাকালে চুমু খেতে ইচ্ছে যায় ঠোঁটে। তাই, তাকায় না। এখন বুঝতে পারছে যে, সকাল থেকেই চন্দ্রবদনী চুকারের জন্যে শোক পালন করছে। সে যাই হোক, চন্দ্রবদনীর পাশে, গাড়ির পেছনের সিট-এ বসে চারণের ভয় ভয় করতে লাগল। চন্দ্রবদনী কি মানবী নয় ? সে কি সত্যিই দেবী টেবী ? নিজের উপরে এরকম সংযমের কোনও উদাহরণ আর তো আগে দেখেনি কখনওই।

মৃত্যুর বিষয়ে, শোকের বিষয়ে কত বড় বড় মানুষের কত কথাই তো পড়েছে চারণ এ পর্যন্ত কিন্তু সেই সব পড়াশোনা কি জীবনে কাজে লাগাতে পেরেছে ?

ইতালিয়ান মনীষী স্পিনোজার লেখাতে পড়েছিল চারণ "The more things the mind knows, the better it understands its own powers and the order of nature. The better it

understands its own powers, so much the more easily can it direct itself and propose rules to itself. The better, also, it understands the order of nature, The more easily can it restrain itself from what is useless."

চন্দ্রবদনী হয়তো দার্শনিক স্পিনোজার এই লেখা না পড়েই এক স্থিতিতে এসে পৌঁছেছে সেখানে অনেক সাধু-সন্তও অনেক দিন তপস্যা করে এসে পৌঁছতে পারবেন না।

চন্দ্রবদনী স্বগতোক্তি করল, এসে গেলাম।

উঁ ?

অন্য জগতে চলে-যাওয়া চারণ বলল, সে জগত থেকে রুদ্রপ্রয়াগের পথে ফিরে এসে।

আর মিনিট পনেরো।

ওঃ।

তারপর বলল, আমাকে তাহলে এখান থেকে ফিরে যেতেই বলছেন ?

মাথা নাড়ল চন্দ্রবদনী। ইতিবাচক। যেন অনিচ্ছাতে। তারপরই মুখ ঘুরিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল চারণের দুচোখে। চোখ রাখল টায়ে টায়ে। যেন, একটু চাউনিও উপছে না পড়ে যায় বাইরে।

কোথায় যাবেন ? এখান থেকে ? দেবপ্রয়াগে ? না হৃষীকেশে ?

চন্দ্রবদনী বলল।

ঠিক করিনি।

হরিদ্বারেও যেতে পারেন। দেখেননি তো তেমন করে।

না। থাকিনি একদিনও। দেরাদুন থেকে তো সোজাই এসেছিলাম হৃষীকেশে।

তবে, তাই যান।

বললাম যে, ঠিক করিনি। কলকাতাতেও ফিরে যেতে পারি।

তাই ?

বিষণ্ণ গলাতে বলল, চন্দ্রবদনী।

তারপর বলল, আর আসবেন না এদিকে ?

চন্দ্রবদনীর চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে চারণ বলল, আসব। আপনি যদি আসতে বলেন।

আমি কে ? এখানে ডাকার মতন এত সব বড় বড় অপ্রতিরোধ্য শক্তি আছেন। তাঁরা থাকতে আমি আপনাকে ডাকি এমন সাধ্য কি ?

তবু, ডেকেই দেখবেন।

ডাকলে, শুনতে পাবেন ? নিরুচ্চারের ডাক ?

দেখতে দেখতে গাড়িটা জিম করবেট সাহেবের মানুষখেকো চিতা মারার জায়গাটি ছাড়িয়ে গেল। এবার নীচে নামবে অলকানন্দার উপরের ব্রিজ পেরুবে বলে। একটু পরই পৌঁছে যাবে গাড়ি। বড় রাস্তা থেকে, চন্দ্রবদনীর গ্রামের সরু পাকদণ্ডীর পথ যেখানে উঠে গেছে, সেই পথের মোড়ে নেমে চলে যাবে চন্দ্রবদনী।

কে জানে! এই যাওয়া কেমন হবে। যাওয়ার কতই না রকম হয়!

অবশেষে রওনাক সিং-এর গাড়িটা এসে অকুস্থলে দাঁড়াল। যা ঘটিতব্য তা ঘটেই। যতই "উইশফুল থিংকিং" করা হোক না কেন!

চন্দ্রবদনী নেমে রওনাকের হাতে একটা কিছু দিল। হাত উপুড় করে দিল, যাতে অন্যে দেখতে না পায়। সব দানই গোপনেই করা উচিত যে, তা চন্দ্রবদনী জানে। জেনে, ভাল লাগল চারণের।

রওনাককে তো দিল গোপনেই, যা দেবার। এখন চারণকে কি দেয়, তা কে বলতে পারে।

চারণও নেমে দাঁড়িয়েছিল। রওনাক সিংও গাড়িটা বাঁদিকে চেপে পার্ক করিয়ে নেমে দাঁড়াল। চন্দ্রবদনী তার ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল হাতের পাতা চিৎ করে। চারণ, পাপড়িমেলা চন্দ্রবদনীর নরম পদ্মফুলের মতন সুগন্ধি হাতে হাত রাখল। অন্য কেউই জানল না, কে দিল, আর কে নিল ? এবং তা কি ?

আপনার ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখবেন কিন্তু। লিখবেন তো ?

পেছন ফেরার আগে বলল, চন্দ্রবদনী।

ততক্ষণে দু-একজন মানুষ চন্দ্রবদনীর ফিরে আসা লক্ষ করে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সে এখন আর শুধুমাত্র চন্দ্রবদনীই তো নয় ! সে যে শহিদ চুকার শর্মার দিদি। নায়িকা।

চলি !

বলেই, চন্দ্রবদনী জনতার সমবেদনার মতন অস্বস্তিকর অনুভূতির হাত এড়াতে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল। তার মালপত্র সব পড়ে রইল। কেউ না কেউ তুলে বয়ে নিয়ে যে যাবেই সে কথা ও জানে।

চিঠি দেবেন কিন্তু ? কালই দেবেন। বুঝলেন।

আদেশের সুরে বলল ও, কিছুটা উঠে, ঘুরে দাঁড়িয়ে।

চন্দ্রবদনীর মুখ দেখে মনে হল চুকারের চলে-যাওয়ার শোকের উপরে চারণের চলে-যাওয়ার দুঃখেরও একটি পরত লেগেছে তার মুখে। পাছে, সেই দুঃখ প্রকাশ পায়, তাই সে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েই উঠতে লাগল চড়াই। শ্লথ পায়ে।

চারদিকের পাহাড়ে ঘনসবুজ গাছপালাতে প্রস্তরপুঞ্জর নীচে নীচে বসে থাকা ঘন নীল রক-পিজিয়নের পিঠে, অলকানন্দার আশ্চর্য সুন্দর রঙিন জল এবং তার বুকের নুড়িময় তীরভূমিতে সকালের উষ্ণ, উজ্জ্বল রোদ ঝিকমিক করছে। সেই পূর্ণ সকালে একরাশ আলোর মধ্যে দাঁড়িয়েও, হঠাৎই চারণের ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। আক্ষরিকার্থে নয়। এক অন্য ধরনের উষ্ণতার অভাব। প্রত্যেক মানুষ-মানুষীই হয়তো বাঁচে একটু উষ্ণতারই প্রত্যাশায়। "একটু উষ্ণতার জন্যে"র প্রার্থনায়। কোনও মানুষই পর্বত নয়, সমুদ্র নয়, আকাশের মতন বিরাট বিশাল নয়। মানুষ মাত্রই পাখিরই মতন। ছোট্ট পাখি। খুবই সামান্য তার অবয়ব, সামন্যতর তার জীবনের আয়োজন। হয়তো প্রয়োজনও। চারণের মতন প্রত্যেক সাধারণ মানুষেরই প্রার্থনা শুধুমাত্র একটি নীড়েরই। কবোষ্ণ, ছোট্ট, প্রিয়ার প্রিয় শরীরের সুগন্ধে আমোদিত একটি ছোট্ট নীড়ের।

রওনাক হঠাৎ চারণের ভাবনার জাল ছিঁড়ে দিয়ে বলল, চলে অব ? ক্যা সাহাব ?

জি হাঁ। চলো।

বলল, চারণ।

তারপর গাড়ির সামনের দরজা খুলে রওনাক এর পাশে বসল ও। সব মানুষ-মানুষীই অন্য মানুষের শরীরের, হৃদয়ের উত্তাপের কাঙাল। তাই পেছনের সিটের অতখানি জায়গাতে একা বসতে ইচ্ছে করল না।

যানা কাঁহা ?

রওনাক শুধোল।

উত্তারকে তো চলো রওনাক। কাঁহা যানা, উ বাদমে শোচে গা।

গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল রওনাক।

জানলা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখল চারণ। চন্দ্রবদনী সেই বড় চ্যাটালো কালো পাথরটার উপরে, যার উপরে সে শিশুকালে এক পূর্ণিমার রাতে বাঘ দেখেছিল, তার সাদা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে চারণকে। একটি সাদা ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরার ফুলের মতন দেখাচ্ছে চন্দ্রবদনীকে।

চারণও হাত নাড়ল।

রওনাক গাড়িতে গিয়ার দিয়ে ক্লাচ টিপে অপেক্ষা করছিল।

শুধোল, অব চলা যায় ?

হাঁ। হাঁ। জী হাঁ।

বলল, চারণ। সম্ভবত একটু বিরক্তিরই সঙ্গে।

রওনাক বুঝী মানুষ। তাকাল একবার চারণের মুখে। কিছু বলল না।

গাড়িটা এবারে উঠতে লাগল। কিছুটা উঠে কিছুটা সমান্তরালে গিয়ে আবার নামা শুরু করবে। তারপর অলকানন্দার ব্রিজ পেরিয়ে গাড়িটা আবারও উঠবে। কিছুটা ওঠা, কিছুটা সমান্তরাল পথে যাওয়া তারপরে কিছুটা নামা, আবারও ওঠা। এই পথ, হয়তো যে কোনও পথেরই সঙ্গে, মানুষের জীবনেরও বড়ই মিল। তাই কি শব্দদুটো জমাট বেঁধেছে ?

"জীবন-পথিক" ?

এখন বলার কথা আর কিছুই রইল না। এখন সময়, শুধু ভাববারই। ভাবতে ভাবতে যাবে চারণ।

ভাবতে, ভাবতে, ভাবতে...

ফাঁকা রাস্তায় পড়ার একটু পরেই রওনাক বলল, হামারা আজ হৃষীকেশ লওটানাহি পড়েগা। দুসরা প্যাসেঞ্জারকো লেকর কাল সুবেব সুবেব তেহ্‌রি যানা হ্যায়। উনলোগ কোম্পানিকো অ্যাডভান্স কর চুকা। ঔর গাড়ি নেহি হ্যায়। তিনঠো গাড়ি ইধার-উধার সওয়ারী লেকর পহিলেই চলা গিয়া।

আচ্ছা ?

চারণ বলল।

গত চব্বিশ ঘণ্টাতে রওনাক সিং যেন ওদের দুজনের পরিবারভুক্তই হয়ে গেল। ওকে ছেড়ে দিতে বিচ্ছেদ-ব্যথা বোধ করবে চারণ। তারপরই ভাবল, ছেড়ে দিতে তো একদিন সকলকেই হয়। অথচ ট্রেনের এক কামরার যাত্রী, প্লেনের পাশের সিটের যাত্রীও একধরনের আত্মীয়ই হয়ে ওঠেন স্বল্পকালের মধ্যেই।

রওনাককে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেই যদি একধরনের কষ্ট বোধ করে চারণ তাহলে চুকারকে চিরদিনের জন্যে ছেড়ে দিতে কত কষ্টই না হচ্ছে এখন দিদি চন্দ্রবদনীর।

আও বেটা আও।

প্রথমে একটু ইতস্তত করছিল চারণ।

তারপর গুহার দিকে এগিয়েই গেল পায়ে পায়ে। একটি পুরনো ছিন্ন বাঘের চামড়ার ওপরে যোগাসনে বসে ছিলেন এক সাধু। সাধুর চোখের দৃষ্টি অসাধারণ তীক্ষ্ণ। শাঁখামুটি সাপের দৃষ্টির মতন। তবে, তা দেখে ভয় লাগে না, সম্মোহিত হতে হয়।

দেবী চন্দ্রবদনীর মন্দিরের সিঁড়ির কাছ অবধি গিয়ে নেমে আসছিল চারণ। কোনও মন্দিরের ভিতরেই তো সে কখনওই প্রবেশ করেনি আজ অবধি। কিন্তু কে জানে কেন, চন্দ্রবদনীর মন্দিরের মধ্যে ঢুকতে খুব ইচ্ছা করছিল ওর। ওর মনে, মানুষী চন্দ্রবদনীর শরীরের মন্দিরে প্রবেশ করার যে এক গোপন ইচ্ছা অনবধানে জেগে ছিল তা যেন হঠাৎই প্রথম বৃষ্টি পাওয়া শুকনো, মরা ডালে ডালে কিশলয়ের নবাঙ্কুরের মতন উদ্ভাসিত হল। লজ্জা পেল চারণ।

ও যখন মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, মন্দিরের দিকে পেছন ফিরে ভাবছিল মন্দিরে ঢোকার মতন প্রাকৃত ও পৌত্তলিক ও হবে কি হবে না, ঠিক সেই সময়েই দূর থেকে সেই সাধু তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। তার পর মুহূর্তেই সে পায়ে পায়ে যেন কোনও অমোঘ সম্মোহনে সম্মোহিত হয়ে সেদিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

তখন ভর দুপুর। মাথার উপরে ঝুঁকে-পড়া নগাধিরাজ নীচের ছায়া নিয়ে দাবা খেলছেন। কিন্তু সাধুর প্রস্তরাশ্রয়ে শুধুই ছায়া, শীত, প্রায়ান্ধকার। কাছে আসার পরেই বুঝেছিল সে, সেটা গুহা ঠিক নয়, ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভীমবৈঠকার মতন রক-শেলটার। তবে বেশ গভীর।

কাছে পৌঁছলে, সাধু তাকে বসতে বললেন।

খিদে পেয়েছিল বেশ চারণের। রওনাক-এরও নিশ্চয়ই পেয়েছিল। কিন্তু রওনাক তো নীচেই আছে। উপর অবধি চারণের সঙ্গে উঠে আসেনি। দেব-দেবী দর্শনের পুণ্য সম্ভবত রওনাকের রাখার জায়গা নেই। গাড়ির পেছনের সিটে বসে সামনের সিট-এর পিঠ রাখার জায়গাতে পা দুটি তুলে দিয়ে সে আবারও তার কানের পরিচর্যাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রওনাক-এর মতন এমন উদ্ভট অথচ লাভেবল, ইন্টারেস্টিং মানুষ খুব বেশি দেখেনি এযাবৎ।

সাধু বললেন, ম্যায়নে বোলায়া ঔর তুরন্ত আ পড়া। মগর দেবীজীনে বোলায়াত গ্যায়া কাহে নেহি?

শোচতা থা।

তুমহারা পরিসানি ক্যা হ্যায় বেটা? তুমহারা দিল কিস লিয়ে দুখী হ্যায়?

চারণ মনে মনে বলল, ভেবেছ আমাকে মুরগী বানাবে? আমি অত বোকা নই। গত দুমাসে কত সাধুসন্ন্যাসী পার হয়ে এলাম। অত সোজা নাকি?

সাধু যেন তার মনের কথা বুঝে গিয়ে বললেন, কাম আহসানহি হ্যায়।

কওনসি কাম?

নিজেই নিজের হিন্দি উচ্চারণে তাজ্জব বনে গেল চারণ। গত দুমাসে তার নানাবিধ উন্নতির মধ্যে উত্তর ভারতের হিন্দির (দূরদর্শনের আজগুবি হিন্দি নয়!) উচ্চারণের উন্নতিও একটি।

চারণ আবারও বলল, কওনসি কাম?

তুমকো মোরগা বানানা। মগর ম্যায়…

মাফ কর দিজিয়ে সাধুজি। মুঝে মাফ কর দিজিয়ে।

জবানসে কহ্ রহা হ্যায় 'সাধুজি' ঔর দিলমে শোচ রহা হ্যায় ম্যায় তুমকো ধোকা দেগা। তুমলোগ ভারী ভারী শহরকে পঁড়ে লিখে আদমীওঁনে অ্যায়সাহি হোতা হ্যায়। আপনা দোনো হাত পহিলে সাফতো করো তবহি না ইনসাফ মাঙ্গোগে বেটা? ক্যা হামসে, ঔর ক্যা ভগয়ানসে।

চারণ, লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল।

সাধু বললে, আজ তুম চলে যাও। তুমহারা লিয়ে কোঈ ইন্তেজার করতা হোগা নিচুমে। দিল কিয়া, তো কাল ফিন আয়া করো। মগর ইসটাইমমে নেহি। ইসবখত বড়ি ভিড়ভাড় রহত্যা হ্যায়। তুম সামকি পহিলে আ যাও বেটা। রাত হিঁয়াই বিতানা। তুমহারা দিলমে যো আঁধি চল রহি হ্যায়…

না, না, আন্ধি-টান্ধি কিছু নয়।

চারণ প্রতিবাদ করে বলল।

উঠবে। আন্ধি উঠবেই। এখন শুধু মেঘ করছে। সবে। ঝড় উঠবে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, মারা গেছে যে, সে তোমার কে? আর মেয়েটিই বা কে?

কোন মেয়েটি?

যার কথা ভাবতে ভাবতে তুমি উপরে উঠে এলে। তুমি তো চন্দ্রবদনীজির কথা ভাবতে ভাবতে আসোনি। এসেছিলে কি?

চারণ, বলবে না ঠিক করেও বলে ফেলল, যার কথা ভাবছিলাম তার নামও চন্দ্রবদনীই।

সাচ? বড়ি তাজ্জব কি বাত। কওন জানে, উনোনেভি কোঈ দেবীই হোগী।

মানুষী কি করে দেবী হবে?

চারণ অবিশ্বাসের গলাতে বলল।

হবে না কেন? মানুষের চেহারাতে কি দেব-দেবীরা নেই? অবশ্যই আছেন। তুমি শহরে তেমন করে খোঁজোনি তাই তো এতদূরে দেব-দেবী খুঁজতে আসতে হল।

আর আপনি? তাহলে আপনিই বা এখানেই মৌরসী পাট্টা গেড়ে নিয়ে বসে আছেন কেন? দেবদেবীর দর্শনের আকাঙ্ক্ষাতেই তো!

নেহি। উসলিয়ে ম্যায় হিঁয়া পর নেহি আয়ে থে।

তো কিসলিয়ে আয়েঁথে?

উও এক লম্বি কাঁহানী। কিন্তু পূর্বাশ্রমের কথা তো আমি বলব না। আমার সম্বন্ধে বেশি উৎসুক হয়ো না তুমি। নিজের মনকে স্পষ্টভাবে জানো। মনকে জানতেই তো তোমার এখানে আসা। না, কি?

চারণের মনে হল, এই সন্ন্যাসী অন্য দশজনের মতন নন। একেবারেই তাঁর নিজের মতন। তবে ইনি কথা বড় বেশি বলেন। ভাব দেখে মনে হয়, এই সাধু কোনও বাঙালিই হবেন। বাঙালি ছাড়া আর কোনও ভারতীয় নিজের গলার স্বরকে এত ভালবাসে না।

হঠাৎই সন্ন্যাসী চারণকে রীতিমতো ধমক দিয়ে বললেন, এখন যাও। ক্ষিদে পেয়েছে খুব। মুখ দেখেই মনে হচ্ছে।

আপনি বাঙালি?

হ্যাঁ।

চারণ চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই সাধু বললেন, যাওয়া নেই, এসো।

দেবপ্রয়াগে পৌঁছে চন্দ্রবদনীর এই মন্দিরে বোধহয় না উঠে এলেই ভাল করত। ভাবল, চারণ। এই সাধু কে? তা কে জানে! সাধু যিনিই হন না কেন তিনি হয়তো অসাধু নন। চারণের যে কালকে এখানে ফিরে আসতেই হবে সে কথাও ও বেশ বুঝতে পারল। এই রহস্যময়তার শেষ দেখে যেতে চায় ও। তাছাড়া চন্দ্রবদনীর মন্দিরের সঙ্গে মানুষী চন্দ্রবদনী এমন করে জড়িয়ে গেছে যে, এই দুই যেন অবিচ্ছেদ্যই হয়ে গেছে। সেই কারণেই এই মন্দিরকে অন্য যে-কোনও মন্দির বলে আর ভাবতে পারছে না ও কিছুতেই।

ভাবছিল ও, সত্যিই! এই পথ, আর জীবনের পথ মানুষকে যে কোথায় কোথায় নিয়ে যায়। কখন কোন দিকে মোড় ফেরায় তা যদি আগের মুহূর্তেও জানা যেত, এই লোকটা কি বলতে চায়? তা জানতে হবে। তেমন হলে, গলা টিপে মেরে রেখে যাবে চারণ এই সাধুকে তার প্রস্তরাশ্রয়ের ভিতরেই কাল রাতে। সাংঘাতিক সব আজেবাজে কথা বলছে লোকটা।

সাধু পেছন থেকে গলা তুলে বললেন, সব পাট চুকিয়ে এসো। লোটা কম্বল সব নিয়েই এসো। থেকে যেও কদিন। দেবী চন্দ্রবদনীর টানও বড় কম টান নয়।

চারণ উত্তর দিল না সে কথার কিন্তু গভীর চিন্তাতে মগ্ন হয়ে পড়ল।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর দেবপ্রয়াগ থেকে বেরিয়ে চন্দ্রবদনীর মন্দিরের পথে গাড়ি যতখানি আসে ততখানি এসে রওনাককে ছুটি করে দিয়েছে। বলেছে, হৃষীকেশে পৌঁছে, প্রয়োজন হলে আবার তাদের কোম্পানিতে যোগাযোগ করবে।

মোটা বকশিস দিয়ে রওনাককে ছুটি করে দেওয়ার সময়ে চারণের বুকের মধ্যে কিছু একটা বিশেষ অনুভূতি যে হয়নি এমন নয়, কিন্তু রওনাককে দেখে একটুও মনে হয়নি যে তার হৃদয়েও চারণের বা চন্দ্রবদনীর কারণে সামান্যতম আলোড়ন ঘটেছে।

রওনাক-এর কাছে ওরা শুধুমাত্র দুজন প্যাসেঞ্জারই হয়তো ছিল। তার ভাড়া গাড়ির দুজন সওয়ারি মাত্র।

যাবার সময়ে রওনাক শুধুমাত্র তার ডান কানই নয় তার দুহাতে দুকান ধরে বলেছিল, কুছ গলতিঁয়া হুয়া হোগাতো মাফ কর দিজিয়ে গা সাব।

কোঈ গলতিয়া হুয়া নেহি তুমহারা। মগর হৃষীকেশমে পৌঁছকর তুমহারা কান কি ইলাজতো ঠিকসে করো রওনাক।

রওনাক হেসে বলেছিল, করুঙ্গা।

তারপরই আকর্ণ হাসি হেসে বলেছিল,

"গলতিঁয়া করতা হুঁ জী ভর ইস লিয়ে
বকশীসোঁপর তেরে, মুঝকো নাজ হ্যায়।'

চারণ হেসে বলেছিল, বহত খুব।

এই দ্বিপদীটি জানত চারণ। মির্জা গালিবের লেখা। মানে হল, সারাজীবনটা ধরে এই জন্যেই তো শুধু ভুলই করে আসছি বারে বার। আমি যে জানি, তোমার ক্ষমা তো আমি পাবোই।

রওনাক গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেছিল, হাত তুলে 'সেলাম সাব' বলে। চারণও পায়ে হেঁটে চন্দ্রবদনীর মন্দিরের দিকে ওঠা শুরু করেছিল।

এখন সন্ধ্যে নেমে গেছে। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ আগেও যে স্থান নানা দর্শনার্থী, ফুলের ও প্যাঁড়ার দোকানি এবং আরও নানারকম মানুষের গলার স্বরে সরগরম ছিল, অনুরণিত ছিল ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনির শব্দে, সেখানে যেন শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এসেছে। মন্দিরের এবং পাহাড়ের ছায়া চাঁদের আলোতে মাখো-মাখো পুরো এলাকাতে কোনও এক রহস্যময় বাতাবরণের সৃষ্টি করেছে। সমস্ত পরিবেশেই কী এক সুগন্ধ মাখামাখি হয়ে আছে। মিশ্র সুগন্ধ। শেষ চৈত্রর বনপথে যেমন থাকে।

সাধুজির প্রস্তরাশ্রয়ের মুখে ততক্ষণে ধুনি জ্বলে উঠেছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে তা। সেখানে পৌঁছে দেখল, আজ কোথা থেকে যেন একজন চেলা এসে জুটেছে। আগের দিন সন্ন্যাসী একাই ছিলেন। অবশ্য তখন দুপুরবেলা। লোকটার চেহারা-ছবি বিশেষ ভাল নয়। চোখ দুটো জবাফুলের মতন লাল। সেই লালিমার কতটা দিবানিদ্রার কারণে আর কতটা অগ্রিম গঞ্জিকা সেবনের কারণে সেটা বুঝে উঠতে পারল না চারণ। সাধুজি তাঁকে ডাকছিলেন 'তুরতি' নামে। অদ্ভুত নাম। 'তুরতি' কারও নাম যে হতে পারে তা ভাবলেও অবাক লাগে।

সাধুজি মন বুঝে বললেন, ও হল গিয়ে তুরন্তবাবা। তাই শর্ট-এ বলি তুরতি।

তাই ?

ইয়েস।

বলেই, এক হাঁক ছাড়লেন, ব্যোম শংকর।

তুরতিও গলা মেলাল, ব্যোম শংকর।

তারপর চারণের চোখের দিকে চেয়ে তুরতি বলল, চলবে তো ?

কি ?

সিদ্ধি। তা করবেন তো একটু পেসাদ ?

ও আবার কি বলবে র‍্যা ? ও তো আমাদের অতিথি। যে তিথিতে যা দিবি ও তাই খাবে। ও কী শ্বশুরবাড়ি এয়েচে না কি ?

চারণ চুপ করে রইল।

সাধু তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, এই তুরতি। আমার বাঘছালটা ভাল করে ঝেড়ে দে সিদ্ধি বানাবার আগে। শালার ছারপোকার চাষ হয়েছে র‍্যা। ব্যাটা বাঘ বেঁচে থাকলে কী বে-ইজ্জৎটাই না হতো।

তুরতি, তুরন্তই বলল, কী আর এমন হত ! চৌরঙ্গিতে আশু মুকুজ্যের স্ট্যাচুর গোঁফের ওপরে বসে যখন চড়াইপাখি পায়কানা করে তখন বাংলার বাঘের যেমন মনে হয়, ঠিক তেমনই মনে হত আর কী ?

আসলে সব বাঘেরাই জীবদ্দশাতেই ভাল থাকে। মরে গেলে ছুঁচোয় এসে পোঁদে নাতি মেরে যায়।

চারণ ভাবল, ভাল সাধু আর তার সাগরেদ-এর খপ্পরে পড়ল এসে যা হোক !

সাধুর নামটা এখনও জানা হল না। হবে এখন সময় মতন। সাধুর পেছন পেছন হেঁটে মন্দির চত্বর পেরিয়ে পর্বতের উপরের একটি নির্জন জায়গাতে এসে পৌঁছল চারণ। নীচে এক গভীর জঙ্গলে ভরা গিরিখাতের কালো গভীর রেখা দেখা যাচ্ছে। নানারকম রাতচরা পাখি ডাকছে। গাড়োয়ালের রাতের পার্বত্যবনের মিশ্র সুগন্ধ আসছে নাকে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল চারণের।

খাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সাধু বললেন, যে মারা গেছে সে তোমার কে ?

কে ?

চমকে উঠল চারণ।

বলল, আমার কেউ নয়। আমার কেউ নয়।

তোমার খুব আপনজনের কেউ তাহলে।

তাও নয়।

'না' বললে তো হবে না বাবা।

বলেই বললেন, দেখি তোমার হাতটা দেখি।

অন্ধকারে হাত দেখবেন কি করে ?

হাত দেখব না রে ছাগল।

বলেই, চারণের ডান হাতটি নিজের দুহাতে তুলে নিতে তাঁর দুটি হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষতে লাগলেন জোরে জোরে। মিনিট খানেক ঘষার পরে চারণের ডানহাতখানি নিজের নাকের সামনে তুলে ধরে শুঁকলেন দুতিনবার। তারপর বললেন, যে মারা গেছে সে বৌদ্ধ ছিল। তাই নয় ?

জানি না। তার ঠাকুর্দা বৌদ্ধ। তবে তিব্বতী বৌদ্ধ। যে মারা গেছে, সে কোনও ধর্ম মানত বলে জানি না আমি। কিন্তু আশ্চর্য কথা ! আপনি আমার হাত শুঁকেই এতসব বললেন কী করে।

শুধু হাত শুঁকেই কেন ? তোমার মুখ দেখেও বুঝেছিলাম গতকাল।

কী করে ?

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানিস রে তুই শালা ?

ঠিক সেই সময়ে নীচের গিরিখাদ থেকে একটি বড় বাঘের ডাক ভেসে এল। বাঃ বাঃ সে কী ডাক। পর্বত অরণ্য আকাশ সব যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

সাধু, গিরিখাদের অন্ধকারে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বাঘটা আরও কয়েকবার ডাকতে ডাকতে সম্ভবত গিরিখাদের অন্যদিকের পাহাড়ে চড়তে লাগল।

সাধু বললেন দ্যাখ শালা ! এই জন্যেই বলেছিলাম। বেঁচে থাকলে বাঘের গায়ে হেটেরোপটেরাদের জ্ঞাতিগুষ্টি সংসার করার মতো আস্পর্ধা দেখাতে পারত ?

হেটেরোপটেরাটা কি জিনিস ?

ছারপোকার বংশের নাম।

বাঃ বাঃ। আপনি কত কিছু জানেন।

হাঃ। অতই যদি জানতাম, তবে তো দিল্লি গিয়ে কিকব্যাকের ব্যবসা ফাঁদতাম রে। আমি কিছুই জানি না। আজকাল যে জ্ঞান ভাঙিয়ে 'টু পাইস' কামানো না যায়, তাকে জ্ঞানই বলে না।

তা ঠিক।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, চারণ।

অ্যাই দ্যাখসো। এ শালা তো ভণ্ড এক নম্বরের। দীর্ঘশ্বাস ফেললি যে বড়।

লজ্জিত হয়ে চারণ বলল, না। পড়ে গেল আর কী।

তারপর বলল, রাতের বেলা চন্দ্রবদনীর মন্দিরের আশেপাশে তো কেউই থাকে না বলতে গেলে। আপনার ভয় লাগে না এমন নির্জনে থাকতে।

লাগে না যে, তা নয়। এখনও পুরো সন্ন্যাসী তো হতে পারিনি। হাফ-গেরস্তদের যেমন শাড়ি খুললেও লজ্জা জেগে থাকে, হাফ সন্নিসীদেরও তেমনই ছয় রিপু ল্যাঙোটের মধ্যের ছারপোকার মতন কুটুস কুটুস করে কামড়ে দেয়। তাই ভয় এখনও পাই। তবে বাঘটা যেমন জেনেছে, আমিও তেমনই জেনেছি, যে অন্যের মনে ভয় জাগিয়ে না রাখতে পারে, ভয়টা এসে তার নিজের বুকেতেই সেঁধোয়। তাই আমি ভয় জাগিয়ে রাখি, অন্যকে ভয় পাওয়াই। এই তুই যেমন ভয় পেয়েছিস।

ভয় ?

আলবাৎ ! ভয় নয় তো কি রে শালা ! ভয় না পেলে তুই কি আসতিস আমার কাছে ?

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

না, না ঠিক ভয় নয়। ভয় পেয়েছিলাম বলে আসিনি কিন্তু।

তবে ?

কৌতূহল হয়েছিল। হয়তো বলতেও পারেন, ভয়-মিশ্রিত কৌতূহল। অথবা হয়তো সম্ভ্রম। বাংলাটা আমি অত ভাল জানি না।

ইংরেজি ভাল জানিস বলে গুমোর আছে বুঝি ?

চারণ লজ্জা পেয়ে বলল, না না, তাও নয়। ভাল করে কিছুই জানি না। আপনাদের প্রজন্মের মানুষ আর আমাদের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এই তফাৎ। আপনারা যেটুকু জানতেন খুবই ভাল করে জানতেন।

আমাদের আগের প্রজন্মের মানুষেরা আমাদের চেয়েও ভাল জানতেন সব কিছু। আমার বাবা যেমন ইংরেজি লিখতেন, আমার ঠাকুমা যেমন বাংলা জানতেন, তেমন ইংরেজি বা বাংলা-নবীশ আজকাল দশ শহর খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

সাধু বললেন।

তা ঠিক।

চল, ফিরি এবারে।

ফিরে চলতে চলতে বললেন, বাঘকে তো এখানে থাকতেই হবে। চন্দ্রবদনীজি তো মা দুর্গারই আর-এক নাম। আর মা দুর্গার বাহন যে বাঘ তা কি তুই জানিস নে ?

আচ্ছা এসব কি সত্যি ?

চারণ জিগ্যেস করল।

তুই তো আচ্ছা রে। যিশুখৃষ্ট সত্যি, মহম্মদ সত্যি, মহাবীর সত্যি আর আমাদের মা দুগ্গাকে সত্যি বললেই কি তোকে মানুষে অসভ্য বলবে ? বলবে, প্রাকৃত। সবজান্তা নিরীশ্বরবাদীদের ব্যবসাটাই তো এখন রমরমা হয়েছে কি না।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, যত্ত সব বাঁদরামো। তোদের দেশে কি মানুষ নেই র‍্যা আর ? সব বাঞ্চোতই দলে ভিড়ে গেছে। সব বাঞ্চোতই ভিখিরি। ছ্যাঃ ছ্যাঃ। মীর সাহেবের একটা দ্বিপদী পড়েছিলাম। কেবলি সেই কথা মনে হয়। 'হিয়া আদম নেহি হ্যায়, সুরত এ আদম বহৎ হ্যায়।'

মানে ?

মানে, এখানে মানুষ নেই। মানুষের চেহারার জীব আছে অনেকই। সত্যি বলতে কি, এই সব জায়গাতেও যে-সব বাঙালি দলে দলে আসেন তাঁদের দেখে আমি যে বাঙালি এ কথা ভেবে বড়ই লজ্জা পাই। অথচ এই জাতের মধ্যেই কত রিয়্যাল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছিল একদিন।

চারণ বলল, হয়তো আজও আছে। আপনি এত দূরে বসে জানতে পান না।

তা যদি হয়, তবে তো খুশিই হব।

সেই প্রস্তরাশ্রয়ে ফিরে যাবার পরে চারণ দেখল আরও দুজন অল্পবয়সী সাধু তুরতির সঙ্গে জুটেছে। সাধুকে দেখে তাঁরা দাঁড়িয়ে উঠলেন।

সাধু বললেন, বৈঠ বৈঠ। লওটা কব ?

আজহি।

ওঁরা সমস্বরে বললেন।

সেই দুই তরুণ সাধুর চোখগুলি উজ্জ্বল। নিষ্পাপ শিশুদের চোখ যেমন হয়। তাকালে মনে হয়, ও চোখগুলি কোনও নীচতা, তঞ্চকতা, অকৃতজ্ঞতা দেখেনি। এখনও শিকার হয়নি বঞ্চনার। তাঁদের চোখের দৃষ্টিতে একটুও আবিলতা নেই।

খানাপিনা কাঁহা কিয়া ? কিয়া না ?

জি হাঁ। জিষ্ণু মহারাজ।

জিষ্ণু নামটি শুনে চমকে উঠল চারণ। কবি বিষ্ণু দের ছেলের নাম জিষ্ণু। চারণ তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে না কিন্তু তার পরিচিত অনেককেই চেনে। জিষ্ণু শব্দের মানে সঠিক জানে না

চারণ। শিব কি ? ভর্তৃহরি নাকি লিখেছিলেন 'অলিনীং জিষ্ণু কচানাং চয়ঃ'। জিষ্ণু মানে আবার বিষ্ণুও। তা বুঝতে না-পারার মতন মূর্খ চারণ নয়।

জিষ্ণু মহারাজ বললেন, তুরতি সেই গানটা গা তো শুনি।

কোনটা মহারাজ ?

আরে সেই রাম দত্তর গানটা।

ও। কিন্তু সিদ্ধি।

এখনও সরবৎ হয়নি ? করিস কি তুই ? দুধ আর মালাই কি নিজেই সব সাবড়ে দিলি ? থাকগে। শরবৎ হবেখন। আগে গানটা গা।

গানটা ধরে দিল তুরতি হঠাৎ করে, খালি গলায়, এবং গান ধরার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল চারণ।

তুরতি গাইছিল :

> "অকারণ মন আশা কোরো না।
> অনিত্য সুখেতে মন মজোনো, মজোনা।
> যতই করিবে আশা মিটিবে না সে পিপাসা
> দুস্তর সে আশা নদী জেনেও কি তা জানো না।'

কার মধ্যে যে কী থাকে। ভাবছিল চারণ। সুরেলা গান, যার সুরজ্ঞান আছে তাকে যেমন করে বিদ্ধ করে তেমন করে সম্ভবত রাইফেলের বুলেটও বিদ্ধ করতে পারে না। এই ভাবগম্ভীর পরিবেশে, এই চন্দ্রালোকিত সুগন্ধি রাতে, চন্দ্রবদনীর মন্দিরের পরিবেশে সেই গান যে কী মহিমার সঙ্গে স্বরাট হয়ে সমস্ত আকাশ বাতাসের অণু-পরমাণু ভরে দিল তার ব্যাখ্যা চারণের কাছে ছিল না কোনও।

তুরতি গাইছিল :

> 'ভিখারি কামনা করে, হতে চায় লক্ষপতি
> লক্ষপতি হলেও হতে চায় কোটিপতি
> কোটিপতি হলেও পরে হতে চায় শচীপতি
> ইন্দ্রত্ব লভিলেও পুনঃ শিবত্ব করে কামনা।
>
> দীনরাম বলে ওরে, সে নদী অতি ভীষণা
> কামাদি কুম্ভীর তাহে ক্ষুধিত আছে ছয়জনা
> নামিলে গ্রাসিবে তোরে, যেওনা সেথা যেওনা
> হও নিত্যধনে অভিলাষী নিষ্কাম সে বাসনা।
> অকারণ মন আশা কোরো না...'

গান শেষ হলে চারণ জিগ্যেস করল, এই রাম দত্ত কে ?

রাম দত্ত কে, তাও জানিস নি ?

না।

রাম দত্ত ছিলেন, পুরনো কাঁকুড়গাছির একজন কুখ্যাত প্রজাপীড়ক জমিদার। রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে এসে ভক্তিমার্গের পথিক হন। শুনলি না ? গানের বাণীর মধ্যেই রয়েছে "'দীনরাম' বলে ওরে" ?

তাই তো ! তা এই সব গান তুরতি শিখল কোথায় ?

আরে ও মাকড়া বউবাজারের ক্ষেমি বাঈজির বাড়িতে বহুবছর ছেল যে !

করত কি ?

ব্যায়লা বাজাত।

তা চলে এল কেন ?

ক্ষেমির মেয়েকে একদিন বেশি মাল খেয়ে ব্যায়লার মতন বাজাতে গেছিল। না পাইল্যে এলে পরাণটাই যেত। পাইল্যে এইখানে ঠেকেছে এসে। যা কিছু ফুল, পাতা, নিভে-যাওয়া প্রদীপের ভেলা নদী পারে ভেসে আসে, তার সবই কি আর ধোওয়া তুলসী পাতা রে ?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, সে কথা থাকগে। তুরতির দয়ায় বড় ভাল ভাল গান শুনতে পাই।

আবার বললেন, ওরে, শুধু এই অঞ্চলেই কেন, অন্যত্রও যত সাধুসন্নিসী দেখিস তাদের অনেকেরই অতীত খোঁচালে সাপ বেরুবে। তবে অতীতটা অতীতই। তাদের বর্তমানটা কী সেইটিই বিবেচ্য। পূর্বশ্রিম-এর কথা যে তারা কারওকে বলে না, বা আমিও বলি না, তার কারণ হয়তো এই যে, বড়মুখ করে আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই বলার কিছু নেই।

তরুণ সন্ন্যাসীরা, এবং তুরতিও আজ ঘুমিয়ে পড়েছে প্রস্তরাশ্রয়ের মধ্যে, কম্বল গায়ে, গুঁড়িসুঁড়ি মেরে। যদিও রাত বেশি হয়নি। তবে রাত যত বাড়ছে, ঠাণ্ডাও ততই বাড়ছে। বাইরে ধুনিটা জ্বলছে।

গাঁজা খেয়েছে চারণও।

যার নাম চারণ, তার উচিত নয় ভাল মন্দ বা উদাসীন কোনও অভিজ্ঞতা থেকেই নিজেকে বঞ্চিত করা। তাই, জীবনের চলার পথে যে অভিজ্ঞতারই সম্মুখীন সে হয়েছে তাকেই আলিঙ্গন করেছে এ যাবৎ। সেই আবাহন তুলির মতন কোনও নারীর উৎসুক মৃণালভুজই হোক, জয়িতার মতন খেলো আধুনিকতার বঞ্চনার আর স্বার্থপরতার বাঘবন্দি খেলার পাঞ্জাই হোক অথবা চন্দ্রবদনীর মতন আত্মসংযমী সম্ভ্রান্ত নারীর দেওয়া সংযম-বিধুর মধুর সঙ্গই হোক, সবকিছুকেই গ্রহণ করেছে। সমান প্রসন্নতাতে। দীর্ঘ জীবনের যে পথটুকু বাকি আছে, সে পথে কোন অভিজ্ঞতা কখন যে কাজে লাগবে তা আগে থাকতে কে বলতে পারে ! সবই গ্রহণ করেছে বিশেষ কোনও আগ্রহ অথবা অসূয়া ছাড়াই। তাই নির্মোহভাবে তুরতির প্রসারিত হাতের গাঁজার কলকেও গ্রহণ করেছিল চারণ।

যতখানি, মানে যত ছিলিম গাঁজা খেয়েছিল, তাতে তার নেশা হয়েছে কি না তা সে বলতে পারে না। গাঁজার নেশার প্রকৃতি কেমন ? তা এক রাতের অভিজ্ঞতাতেই, বিস্তারিতভাবে অন্যকে তো বটেই, হয়তো নিজেকেও বোঝাতে পারবে না। তবে এটুকু বলতে পারে যে, শরীর মনের আর্দ্রতা যেন অনেকখানি খসে গেছে। বেশ একটা রুখু, চনমনে ভাব। মনোসংযোগ করার ক্ষমতাও যেন বেশ বেড়ে গেছে। কিন্তু মনোসংযোগের কোনও বিশেষ বিষয় না থাকলে মনোসংযোগের ক্ষমতার আধিক্য মনের অধিকারীর পক্ষে আদৌ স্বাস্থ্যকর কি না, তা মনের কারবারীরাই বলতে পারেন শুধু। তবে জিষ্ণু মহারাজের চেহারাটা স্পষ্ট হয়েছে খুব। মুখের হ্রদ এবং পাহাড়-পর্বত। দূরবীণ চোখে লাগিয়ে কিছু দেখলে যেমন দেখায় তেমনই আর কী। সাদা দাড়ি-গোঁফওয়ালা এই শীর্ণ গৌরবর্ণ সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলে তাঁর চোখ দুটি বাঘের চোখেরই মতো জ্বলজ্বল করছে।

চারণের মনে হল একবার, প্রথম রাতে যে বাঘের গর্জন শুনেছিল গভীর জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে, সেই বাঘ এই সন্ন্যাসীরই অন্য সত্তা নয়তো ? দেবী দুর্গারই উপাসক যিনি তাঁর দেবীর বাহন হতেই বা অসুবিধে কিসের ?

বাইরে থমথম করছে নিস্তব্ধতা। ছমছম করছে শিশির ভেজা জ্যোৎস্না। শিশির-ধোওয়া চাঁদের আলো চুঁইয়ে পড়ছে চন্দ্রবদনীর মন্দিরে, মন্দির চত্বরে, জিষ্ণু মহারাজের প্রস্তরাশ্রয়ের সামনে এবং তাঁর মাথার উপরেও। রাত-পাখিরা স্বগতোক্তি করছে মাঝে মাঝে। যামিনীর এই বিশেষ যাম যেন

বিশেষ কোনও ঘটনার সাক্ষী হবে বলে উন্মুখ হয়ে আছে। যে কোনও মুহূর্তেই সেই ঘটনা ঘটতে পারে।

জিষ্ণু মহারাজ আজও আবার চারণের পাণি প্রার্থনা করলেন। চারণ তাঁর কাছেই, সামনে বসে ডানহাতটা এগিয়ে দিতেই মহারাজ হাতটা টেনে নিয়ে তাঁর দুহাতের গাঁজার কলকে-ধরা রুক্ষ বুড়ো আঙুলে নানাভাবে টেপাটেপি করতে লাগলেন চারণের দুহাতের পাতা। আর কিছুক্ষণ বাদে বাদে শুঁকতে লাগলেন।

সেই আশ্চর্য প্রক্রিয়া শেষ হলে বললেন, তুমহারা ওয়াক্ত আয়া হ্যায়।

কিসের ওয়াক্ত ?

যাত্রা শেষের।

কোন যাত্রার ? আমি তো বিশেষ কোনও গন্তব্য নিয়ে যাত্রা করিনি যে, যাত্রা শেষ হবে গন্তব্যে এসে!

তা নয়। এবারে তোমার মন শান্ত হয়ে যাবে। থিতু হয়ে বসবে তুমি। তুম চাপরাশি বনোগে বেটা।

চাপরাশি হতে যাব কোন দুঃখে। আমি কখনওই কারও চাপরাশি হব না।

হব না বললে তো আর হল না। আমরা প্রত্যেক মানুষই তো চাপরাশিই। কারও না কারও চাপরাশ বহন করতেই আমরা আসি এই পৃথিবীতে।

তাই ?

অবশ্যই!

আমরা না হয় গৃহী মানুষ। কারও না কারও আদেশ বা উদ্দেশ্য আমাদের সিদ্ধ করতে হয়ই। কিন্তু আপনিও কারও চাপরাশি হতে যাবেন কোন দুঃখে ?

চারণ বলল।

জিষ্ণু মহারাজ হাসলেন। দুর্জ্ঞেয় এক হাসি। সেই রহস্যময় গভীর রাতের অমথিত নিস্তব্ধতাতে সেই হাসি পঞ্চমীর চাঁদেরই মতন ঝুলে রইল যেন রহস্যময়তর হয়ে।

মহারাজ বললেন, আমি দেবীর চাপরাশি। চন্দ্রবদনীর চাপরাশি। তুমিও এক মানবীর চাপরাশি হবে।

কোন দুঃখে ?

চাপরাশি হওয়ার মধ্যে তো হীনতা নেই। লজ্জাও নেই কোনও। চাপরাশ শব্দটির মানে যে তুমি জানো না শিক্ষিত হয়েও একথা জেনে খারাপ লাগল আমার বেটা। মীরাবাঈ যখন গেয়ে ওঠেন ম্যায়নে চাকর রাখো, চাকর রাখো, চাকর রাখো জী'। তখন কি আক্ষরিক অর্থে চাকর রাখার কথা বলেন ? চাকরেরও তো কত রকম হয়। আর চাপরাশ-এর তো হয়ই।

চারণ চুপ করে রইল অনেকক্ষণ।

ভাবছিল ও যে, শিশুকাল থেকে "চাপরাশি" শব্দটি শুনে আসছে। তকমা আর লাল ফেট্টি বুকে-কাঁধে ঝোলানো চাপরাশিও দেখেছে অনেক। তাদের বাড়ির উলটোদিকেই মিত্তির সাহেব থাকতেন, হাইকোর্টের জজ। তাঁর বাড়ির ভিতর-বাহির চাপরাশিতে ছয়লাপ ছিল। নিজেও তো নানা ট্রাইবুনালে এবং বিভিন্ন হাইকোর্টে সুপ্রিমকোর্টে চাপরাশি কম দেখেনি এত বছর। অথচ শব্দটির মানে যে কি ? সে সম্বন্ধে তার কোনওই ঔৎসুক্য ছিল না। "চাপরাশ" শব্দটাই তার কাছে অপরিচিত ছিল। চাপরাশ বহন করে বলেই যে তারা চাপরাশি এই সরল সত্যটি কখনও মনে উদয় হয়নি। আশ্চর্য। আর সেই শব্দের মানে জানতে হল এই সুদূর চন্দ্রবদনীর মন্দিরের সন্ন্যাসীর কাছে।

জিষ্ণু মহারাজ প্রকৃতই জিষ্ণু।

ভাবল, চারণ।

হঠাৎই মহারাজ বললেন, তুমি যখন গান গাও...

চারণ বলল, আমি তো গান জানি না। চানঘরে গান গাই শুধু।

যেমনই গাও, গাও তো বেটা! এখন যা বলি, মনোযোগ দিয়ে শোনো। তুমি যখন গান গাও, তখন সেই সুরের অনুরণন তোমার মধ্যে কি কোনও ভাবের সঞ্চার করে?

চারণ একটু চুপ করে থেকে বলল, করে।

কেমন সেই ভাব?

মনে হয়, কেউ যেন আমার দুকাঁধে হাত ছুঁইয়ে রেখেছেন। কেউ যেন আমার গলায় এসে বাসা বেঁধেছেন। আমি যেন কোনও মানুষকে শোনাবার জন্যে গাইছি না, অথচ অদৃশ্য অনেকেই যেন আমার চারধারে বসে সেই গান শুনছেন।

জানতাম।

তারপর জিষ্ণু মহারাজ বললেন, তুমি কোথায় গান শিখেছ? তোমার গুরু কে? কী গান শিখেছ?

তেমন করে শিখিনি কোথাওই। নাড়া বেঁধেও শিখিনি। কোনও বিশেষ ধরনের গানে বিশারদও হইনি। তবে এর তার কাছে শিখেছি ভাললাগার গান। গানের ব্যাকরণ বলতে যা বোঝায় আমি তার কিছুই জানি না। কিন্তু কখনও ব্যাকরণ জানার ইচ্ছাই হয়নি। গান শুনতে আর গান গাইতে ভাল লেগেছে, লাগে। ব্যাকরণ জানতে নয়।

ভাষার ব্যাকরণে পণ্ডিত হলে স্কুলের বা টোলের মাস্টারি পেতে। আর গানের ব্যাকরণে প্রগাঢ় পণ্ডিত কিন্তু গিধ্বরের মতন গলার গায়কও বহুত দেখেছি। ব্যাকরণ না জেনেও তো মৈজুদ্দিন হয়। তোমার উপরে গন্ধর্বলোকের অনেক সুরঋদ্ধ ঐশী শক্তির আশীর্বাদ আছে বেটা। তুমি সব ছেড়ে দিয়ে শুধুই গান গাও।

চারণ হেসে বলল, আমার গান কে শুনবে? আপনি পাগল হতে পারেন, আমি তো নই। অন্যেরাও নয়।

তুমিও পাগল। তুমি গান গাইলে সারা জগৎ তোমার গান শুনবে। তোমার জন্যে···

তারপরই বললেন, সংগীত-গবাক্ষ কাকে বলে জানো?

না তো। সেটা কি? এর কথা শুনিনি তো কখনও কারও কাছে এর আগে।

তুমি স্বর্গে গেলে তিনরকম সুর শুনতে পাবে। সংগীত-গবাক্ষর তিনটি গবাক্ষই খুলে যাবে তোমার জন্যে। তিনরকমের পরকলা দিয়ে সুরলহরী এসে পৌঁছবে তোমার কানে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, তাল যে ব্রহ্ম, এ কথা কি জানো তুমি? গ্রহ-নক্ষত্র এবং আমাদের পৃথিবীও যে অভাবনীয় গতিতে ছুটে চলেছে, একে-অন্যেকে নিয়মবদ্ধ হয়ে প্রদক্ষিণ করছে যুগযুগান্ত ধরে, তাও যে সংগীতের মূর্ছনার সঙ্গে, তালবদ্ধ হয়েই, তা কি তুমি জানো? কত স্বর্গীয় জ্যোতি আর দ্যুতির বিচ্ছুরণ হয়ে চলেছে সেই সংগীতের মূর্ছনার সঙ্গে সঙ্গে, তাও কি তুমি জানো?

না।

চারণ বলল।

তারপর বলল, হৃষীকেশ এর এক সন্ন্যাসীর মুখে শুনেছিলাম যে স্বর ঈশ্বর আর তাল ব্রহ্ম।

কী নাম তাঁর?

ধিয়ানগিরি মহারাজ।

ও হ্যাঁ। গান জানতেন বটে ধিয়ানগিরি। কিন্তু তিনি আজই বিকেলে স্বর্লোকে চলে গেলেন। এখন তিনি তিন-তিনটি সংগীত-গবাক্ষ খুলে বসে গান শুনছেন। গানের মতন জিনিস আর আছে কি বাবা?

স্বর্লোকে গেছেন মানে?

হাঁ বেটা। আজই বিকেলে তাঁর দেহান্ত হয়ে গেল।

কে বলল আপনাকে?

বলবে আবার কে? আমি দেখতে পেলাম যে!

আপনি সবই দেখতে পান ?

সব নয়। সব নয়। যতটুকু মা চন্দ্রবদনী দেখান ততটুকুই পাই। আমি কে ? ফুঃ !

তারপর বললেন, সংগীতের ব্যাকরণ তোমার না জানলেও চলবে, রিওয়াজ না করলেও চলবে। তোমার হয়ে অনেক বড় বড় ওস্তাদ বহু বহু বছর ধরে রিওয়াজ করে গেছেন এইখানেই। তাঁদের আশীর্বাদ পড়েছে তোমার ওপরে। তুমি বড় ভাগ্যবান। তুম কোঈ মামুলি ইনসান নেহি হ্যায় বেটা। তুমকো ম্যায় অ্যাইসেহি নেহি বুলায়া থা কাল, তুমকো চবুতরামে চড়কে আতে হুয়েহি দিখকর ম্যায় জানতাথা তুম কওন হো।

কওন হ্যায় ? ম্যায় ?

মতলব, কোঈ খাস আদমী ঔর দেবদেবীকি বারে ম্যায় নেহি কহ রহা হুঁ। তুম মামুলি ইনসান নেহি হ্যায় ই ম্যায় সমঝ পায়া থা। মগর যব লওটেঙ্গে কলকাত্তা, সব কামধান্দা ছোড়কর শ্রিফ গানাহি গাও।

খাব কি ?

এক আদমী কি খানেমে ক্যা লাগতা হ্যায় ? ম্যায় ক্যা ভুখা হুঁ ? থোড়িসি খানাসে মজেমে দিন গুজার যাতি হ্যায়। লালচিকি ভুখ কভভি না মিটতা। কত অল্পেই আমরা সুখি হতে পারি, থাকতে পারি। আশার কি শেষ আছে। এই যে আমাদের তুরতি ! ও একটা গান প্রায়ই গায়। ওঃ সে গান তো তোমাকে সন্ধেরাতে শুনিয়েই দিয়েছে। এই গাঁজায় দম দিলেই আমার বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়।

তারপর বললেন, আরও একটা গান গায় তুরতি সুখ এর বিষয়ে। কার কাছে শিখেছিল জানি না। তবে যেসব মানুষেরা সর্বক্ষণ সুখ সুখ করে, সুখের পিছনে দৌড়ে বেড়ায় তাদের এই গানটা শোনা উচিত।

কোন গান ?

গান তো আমি গাইতে পারি না। কাল সকালে তুরতির কাছে শুনতে চেও, শোনাবে। গানের বাণীটাই তোমাকে বলতে পারি শুধু।

কী বাণী ?

"সুখের কথা বোলো না আর, বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি
দুঃখে আছি ভাল আছি, দুখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যান চোখের দেখা
দুদণ্ডের হাসি হেসে মৌখিক ভদ্রতা রাখি।
দয়া করে মোর ঘরে সুখ, পায়ের ধুলা ঝাড়েন যবে
চোখের বারি লুকিয়ে রেখে, মুখের হাসি হাসতে হবে।
দেখলে পরে চোখের বারি, সুখ চলে যান বিরাগ ভরে
দুঃখ তখন কোলে করে, আদর করে মুছায় আঁখি।
সুখের কথা বোলো না আর বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি।"

বাঃ।

চারণ স্বগতোক্তি করল।

তারপরে বলল, কার লেখা গান এটা ?

তা জানি না। তুরতিকে জিগ্যেস কোরও।

জিষ্ণু মহারাজ বললেন, তুরতি এসে জুটেছে আমার কাছে বছর তিনেক হল। ও একটা মস্ত রিলিফ এই বৈরাগ্যর ভেকধারী জগতে।

ভেকধারী বলছেন কেন ? আপনার তো কোনও ভেক নেই।

সব শালারই ভেক থাকে। যেদিন ভেকহীন হতে পারব, গুমোরহীন হতে পারব, সেদিন তো তরেই যাব।

তারপর বললেন, থাক এসব কথা। এবার আসল কথাতে আসি। বলো তো ? তুমি কি খুঁজতে এসেছ এই দেবভূমিতে ? দেখি ! আমি তোমাকে তোমার এই খোঁজে কিছু সাহায্য করতে পারি কি না !

কিছু খুঁজব বলে মন করে তো আসিনি মহারাজ। মনটা বড়ই উচাটন হয়েছিল। এতগুলো বছর কী করলাম, করে কী হল, মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রার্থনা কি ? সুখ কাকে বলে ? সুখ আর শান্তি, সুখ আর প্রেম কি এক ? সুখ আর অর্থও কি এক ? সুখ আর আরাম ? এই সব নানা প্রশ্নে জরজর হয়েই বেরিয়ে পড়েছিলাম একদিন।

জিষ্ণু মহারাজ হেসে বললেন, সুখের সঙ্গে, প্রেমের বা আরামের সহাবস্থান যে সবসময়ে হবেই এমন বলা যায় না। সেই আমাদের গিরীশ ঘোষের গান ছিল না একটা ? গিরীশ ঘোষের লেখা প্রথম গান।

কোন গান ?

"সুখ কি সতত হয় প্রণয় হলে ?
সুখ অনুগামী দুখ, গোলাপেও কণ্টক মেলে।"

পরের পংক্তিগুলি মনে আছে কি ?

নাঃ। তুরতির মনে থাকলেও থাকতে পারে। কাল ওকে জিগ্যেস করে দেখো।

এবারে আপনি যা বলার বলুন আমাকে মহারাজ। কলকাতা ছেড়ে আসবার সময়ে যেমন উচাটন হয়েছিল মন এখন যেন কলকাতাতে ফেরার জন্যেই মন তেমনই উচাটন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও আমার কোনও প্রশ্নরই উত্তর পাইনি এখনও।

জিষ্ণু মহারাজ হাসলেন। বললেন, যখন উত্তর পাবে বেটা, সব প্রশ্নেরই উত্তর একই সঙ্গে পাবে। ধৈর্য রাখতে হবে। সংসারে অথবা সন্ন্যাসে সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে ধৈর্য। তবে ইনস্ট্যান্ট উত্তর পাও আর না পাও, তুমি যে কদিন এই দেবভূমিতে কাটিয়ে গেলে তা তোমার আত্মাকে, মনকে অবশ্যই পরিশোধন করবে। ফিরে গিয়ে, জীবনের এক নতুন মানে খুঁজে পাবে। নতুন জীবন পাবে। তুমি দ্বিজ হবে। জীবনে যারা অভ্যেসের কাদাতে আর চোরাবালিতে একবার মোষের মতন গেঁথে যায় তাদের আর বাঁচার কোনও উপায়ই নেই। মোষ তবু একসময় কাদা ছেড়ে স্বেচ্ছাতে উঠতে পারে কিন্তু গৃহী মানুষে পারে না। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে জন্মালেই তো আর কেউ Ipso facto মানুষ হয়ে যায় না।

মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল চারণের। ভেবেছিল ধিয়ানগিরি মহারাজের সঙ্গে আবারও অবশ্যই দেখা হবে। আর কোনওদিনও দেখা হবে না জানলে আরও কটা দিন কাটিয়ে আসত হৃষীকেশ-এ। ভীমগিরি মহারাজই বা কেমন আছেন কে জানে। সন্ত তুকারামের জীবনীর পুরোটা যে শোনা হয়নি। তা কি আর শোনা হবে ? চারণ ভাবছিল, যখন পরিবেশ প্রতিবেশ সব স্থির থাকে তখন বিশ্বাসই হয় না যে, একদিন তা অস্থিরও হয়ে উঠতে পারে। যখন অস্থির হয়ে যায় তখন সবই এলোমেলো হয়ে যায়। স্থিরতার স্থিরচিত্রটি আর কল্পনাতেও ফিরিয়ে আনা যায় না। স্থির জলের উপরের প্রতিবিম্ব, জল নড়ে গেলে যেমন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, ঠিক তেমনই। শত চেষ্টাতেও জোড়া লাগানো যায় না।

চারণ বলল, মহারাজ ! আমাকে কি ফিরে যেতেই হবে ? আমিও যদি আপনার চেলা বা চামুণ্ডা হয়ে থেকে যাই এখানে বাকি জীবন ?

খুব জোরে হেসে উঠলেন জিষ্ণু মহারাজ।

হাসি থামলে বললেন, কোন দুঃখে ? তুমি তো আর তুরতি নও যে, ক্ষেমি বাঈজির মেয়েকে "ব্যয়লা বাজিয়ে" ফেরার হতে হবে তোমাকে। তোমার কতকিছু করার আছে এখনও। বনে পাহাড়ে আমাদের মতন যারা সংসার ত্যাগ করে এসে সন্ন্যাসীর ভেক ধরে পড়ে আছে তাদের অধিকাংশরই সংসারকে দেবার মতন তেমন কিছু ছিল না হয়তো। সংসারও কেউ যদি কিছু দিতে চায়ও, তা

সকলের কাছ থেকে নেয় না। তারও কিছু বিশেষ পছন্দ-অপছন্দ আছে। এসব অনেক গভীর তত্ত্বের কথা, অভিজ্ঞতার কথা। এক কথায় বুঝিয়ে বলা যাবে না।

তারপরে বললেন, তোমাকে বোঝানোর দরকারও হয়তো নেই।

চারণ চুপ করে রইল।

জিষ্ণু মহারাজ আবারও গাঁজা সাজলেন। সেজে, নিজে কষে এক টান লাগিয়ে চারণকে এগিয়ে দিলেন কলকেটা। এক টান মারতেই চারণের মধ্যের আগে—সেবিত সুপ্ত সিদ্ধি যেন কেরে ? কেরে ? বলে উঠল। ও, না, সিদ্ধিতে সিদ্ধ ছিল, না, গঞ্জিকাতে সঞ্জীবিত। ও তো এই সব বিদ্যাতেই এতাবৎ "আনপড়ই" ছিল। ওর দুচোখ স্থির হয়ে গেল যেন এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর সেই অস্থায়ী স্থিরতা থেকে স্থায়ী অস্থিরতাতে ফিরে এসে চারণ বলল, বলুন মহারাজ, যা বলছিলেন।

আমি কী বলব ? তুমি আরও কি জানতে চাও বল ? সেই মেয়েটির কথা জানতে চাও কি আরও ? দেবীজির নামেই যে কন্যার নাম সেওতো দেবীরই মতন। খুব ধার্মিক এক প্রকৃত উচ্চশিক্ষিত পরিবারের মেয়ে সে। সে তোমার যোগ্য সহধর্মিণী হবে।

সহধর্মিণী ?

চমকে উঠে বলল, চারণ।

কথাটা যে আদৌ ভাবেনি তা নয়। ভেবেছে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কিন্তু নিজ মুখে কথাটা উচ্চারণ করার সাহস হয়নি।

অবশ্যই ! এবং শুধুমাত্র জীবন-সঙ্গিনীই নয়, যথার্থ সহধর্মিণী, ধর্মপত্নী। রাজযোটক মিল হবে তোমাদের।

জিষ্ণু মহারাজ বললেন।

আপনি কি করে জানলেন ?

খুব খুশি হয়েও উদাসীনতার ভান করে বলল, চারণ।

আমি যে জানি, এইটুকুই জেনে রাখো এখনকার মতন। এর চেয়ে বেশি জেনে কি হবে ?

তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, সেই কন্যার বাড়ি কি বদ্রীবিশালজির মন্দিরে যাবার পথের উপরেই কোনও জায়গাতে ?

হ্যাঁ।

চারণ বলল।

কিন্তু আপনি এসব জানলেন কি করে ? আপনি কি ওঁদের চেনেন ?

আমি যে দেখতে পাচ্ছি সব। দেখতে পাই। যে দেখতে চায় তেমন করে, তাকে দৌড়ে বেড়াতে হয় না পৃথিবীময় রণপায়ে চড়ে। সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত বোধ, সমস্ত জ্ঞান তার ঘরে আসে। পর্বত যেমন মহম্মদের কাছে গেছিল। চাইতে জানা চাই। তেমন করে চাইলে সবই পাওয়া যায়। এই চাওয়া তোমার নিজের জন্যে চাওয়া তো নয়। এ "বোধিরই" জন্যে চাওয়া। শাক্যসিংহ যেমন করে চেয়েছিলেন। তেমন করে চেয়েছিলেন বলেই না "বুদ্ধ" হতে পেরেছিলেন। স্থিতপ্রজ্ঞ।

তারপরই বললেন, চন্দ্রবদনীদের পরিবারে একজন আছেন যিনি বৌদ্ধ। তাই না ?

হ্যাঁ। ওর দাদু, মানে ঠাকুর্দা। ভারী ভাল মানুষ। জ্ঞানী মানুষও। উনি তিব্বতী বৌদ্ধ।

ভাল মানুষ ওঁরা সকলেই। তবে ভেব না যে, শুধুমাত্র দেবভূমিতে বাস করার কারণেই তাঁরা ভাল। এইসব অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে অধিকাংশই অবশ্য ভাল মানুষ কিন্তু আমাদের মতন আগন্তুকদের মধ্যে অধিকাংশই ফেরেববাজ। আরে, যত অন্ধকার সব তো প্রদীপেরই নীচে। তাই না ?

তারপরে বললেন, দাঁড়াও।

বলেই, চোখ বন্ধ করলেন।

নাঃ যা দেখছি তাতে মনে হয় ওঁরা প্রত্যেকেই ভাল। ভাল মানে এমন ভাল যে, যার চেয়ে ভাল আর হয় না।

আপনি দেখতেই যদি পাচ্ছেন তো বলুন তো চন্দ্রবদনী এখন কি করছে এই গভীর রাতে ?

সে পড়ছে। তার ভাইয়ের ঘরে, ভাইয়ের খাটে শুয়ে। তার মুখটা শুধু দেখতে পাচ্ছি। চেকচেক বাসন্তী আর কচিকলাপাতা-সবুজ একটা কম্বলে তার শরীর ঢাকা।

সে কি কাঁদছে ?

কেঁদেছিল। একসময়ে খুবই কেঁদেছে। মনে হচ্ছে। তবে এখন আর কাঁদছে না।

বইটার নাম কি ? মানে, যে বইটা পড়ছে ও ?

তাও বলতে হবে ? দাঁড়াও। চোখ বন্ধ করে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জিষ্ণু মহারাজ বললেন, বইটার নাম The Perils of Terrorism.

কার লেখা ?

চারণ জিষ্ণু মহারাজের পরীক্ষক হয়েই যেন প্রশ্ন করছিল। এঁদের বুজরুকিটা ও ধরে ফেলতে চায়। ও না শিক্ষিত মানুষ! কলকাতা শহরের বাসিন্দা। যা বলবে ও সব সাধু-ফাধু, তার সবই বিনা প্রতিবাদে বিশ্বাস করতে হবে ? ইয়ার্কি না কি ?

দাঁড়াও। তুমি বড় নাছোড়বান্দা হে। বলে আবারও চোখ বন্ধ করলেন জিষ্ণু মহারাজ।

তারপর বললেন, Kirsten Anderson.

তিনি কে ?

আঃ জ্বালালে দেখছি। দাঁড়াও। বলেই আবারও চোখ বুজলেন।

একটু পরে বললেন, একটি স্যুয়েড মেয়ে, মানে সুইডেনের।

তাই ?

হুঁ। আবারও চোখ বন্ধ করে বললেন, লামাদের পোশাকের রঙেরই মতন লাল রঙা জোব্বা পরে আছেন বৃদ্ধ। মানে দাদু।

ওর বাবা কি আছেন সেখানে ?

দেখতে তো পাচ্ছি না।

সে কি ? তাঁর ছেলে মারা গেল গুলি খেয়ে আর তিনি এলেন না।

হাঃ।

হাসলেন জিষ্ণু মহারাজ।

বললেন, গুলিখোরদের মধ্যেই তো বাস তাঁর। মৃত্যু তো মৃত্যুই। গুলি খেয়ে মরাও মরা, আবার তুরতি যে গুলি খায় তা বেশি খেয়ে মরাও মরা। যিনি সেনাপতি তাঁর কাছে গুলি খেয়ে মৃত্যুটাই ন্যাচারাল ডেথ। বোঝ না।

চন্দ্রবদনীর মা নেই ?

চারণ যেন জিষ্ণু মহারাজকে পরীক্ষা করার জন্যেই জিগ্যেস করল।

হাঃ। আছেন। তবে তিনি অন্য পুরুষের কণ্ঠলগ্না। ভারতে নেই এখন।

চারণ স্তব্ধ হয়ে রইল বহুক্ষণ। একবার মনে হল মানুষটা, মানে, জিষ্ণু মহারাজ একটি গ্রেট বুজরুক। তারপর মনে সন্দেহ হল চন্দ্রবদনীদের পুরো পরিবারকেই উনি চেনেন। তা নইলে এ কি সম্ভব ?

হয়। হয়। সবই সম্ভব হয়। হিন্দুধর্ম, দর্শন, হিন্দু ঐতিহ্য, হিন্দু সংস্কৃতি, এই সব কোনও কিছুই মিথ্যে নয়, ছোট নয়। তাচ্ছিল্যের নয়। তাই অনেক কিছুই অভাবনীয় ঘটে ভারতবর্ষে। শুধুমাত্র আমরা আর বৌদ্ধরাই আমাদের ধর্ম কারও ওপরে জোর করে চাপাইনি কোনওদিনও। অন্য সমস্ত ধর্মাবলম্বীরাই কমবেশি তাই করেছে। তবে প্রত্যক্ষভাবে জোর মুসলমানেরা ছাড়া অন্যেরা তেমন কখনওই করেননি। ইতিহাস তাই বলে। যারা ইতিহাস পড়েছে, তারা তাই বলে। অথচ আমাদের ঔদার্য, আমাদের মহত্বর জন্যে আমাদের যুগে যুগে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে যা মূল্য দিতে হয়েছে তা অভাবনীয়।

আপনি যাকে ঔদার্য বলছেন তাকেই অন্য অনেকে ভীরুতা বলেন।

চারণ বলল।

ঔদার্য আর কাপুরুষতা এবং ভীরুতা যে সমার্থক নয়, যত জোরেই অন্যায়কে অ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে প্রচার করা হোক না কেন, অন্যায় যে কখনওই ন্যায়ের সমার্থক হতে পারে না, এই কথা জোর-জবরদস্তিকারীরা কোনওদিনই বোঝেনি। তাই অন্যান্য অনেক ধর্মাবলম্বী ধরেই নিয়েছেন যে, আমাদের বুকে অন্যায়ের প্রতিকার করার মতন সাহস নেই। SPADE-কে SPADE বলাটা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম বৈষ্ণবধর্ম নয়। "মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না" এই শিক্ষা হিন্দুধর্মের শিক্ষা নয়। হিন্দুধর্ম কোনওদিনও ক্লীবত্বকে সমর্থন করেনি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, কথাটা কি জান ? মানুষে বড়ই কম পড়াশুনো করে। পড়াশুনো ছাড়াও, জ্ঞানী আরও অনেক প্রক্রিয়াতে হওয়া যায়, কিন্তু সেই প্রক্রিয়াতেও আগ্রহ নেই বলেই আমাদের মধ্যে অধিকাংশরাই কিছু জানি না। জানে না।

তারপর হেসে বললেন, জ্ঞানের সীমা চিরদিনই ছিল কিন্তু অজ্ঞতার সীমা কোনওদিনও ছিল না।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন জিষ্ণু মহারাজ। তাঁকে কি একটু উত্তেজিত দেখাচ্ছিল ? না। উত্তেজনাও তো ভীরুতারাই লক্ষণ। মহারাজ আর যাই হন, ভীরু আদৌ নন।

মহারাজ বললেন, তোমার আর কীই বা বয়স। তোমার এসব জানবার কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে যারা জানেও, তারাও মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। সত্যি কথা বলাটা, বিশেষ করে ধর্ম ও ধর্মাবলম্বী সম্বন্ধে, অত্যন্ত, "কুরুচিকর" বলে গণ্য হয় এখন সমতল ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই। বলবে কি করে ? প্রত্যেক রাজনৈতিক দল, প্রত্যেক নেতারই যে অনেকই কিছু চাইবার আছে। থাকে। Everyone has an axe to Grind আর the worst of all axes কি বলত ?

কি ?

কি আবার ? ভোট। পাছে ভোট না পায়, পাছে পরের টার্ম-এ নিজের পোঁদের গরমে গরম হয়ে-থাকা গদিটিতে আবারও ভোট পেয়ে এসে না-বসতে পারে, ওই ভয়েই তো শালাদের রাতে ঘুম থাকে না তো। সে শালারা দেশ আর দশের সেবা করবে কি ? কেমন সেবা করেছে এরা গত পঞ্চাশ বছরে তা প্রতি সকালে খবরের কাগজ খুললেই তো দেখতে পাও। কি ? পাওনা ?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, অবশ্য চাইবার কথাতে মনে পড়ে গেল যে, খবরের কাগজওয়ালাদেরও চাওয়ার শেষ নেই। যারা গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রহরী হতে পারত তারাও ভেলিগুড়ের ব্যবসাদার হয়ে গেছে। মিডিয়ারও বিবেক-ফিবেক কিছু নেই। তারাও নিছক টাকা-কামাবার কল। জাস্ট টাকা-কামাবার কল আর ক্ষমতা কুক্ষিগত করবার। নেতারা, কাগজওয়ালারা, সব শালারাই "ধর্মনিরপেক্ষ" হয়ে গেছে। কী ভেক। কী ভেক। ভাবলেও বমি পায়। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটার মানে পর্যন্ত বোঝে না তারা। আর বুঝলেও, তা স্বীকার করাটা ভোটের স্বার্থবিরোধী বলে, স্বীকার করার ধারে কাছেও যায় না।

আপনি এই নির্জন টঙে বসে খবরের কাগজে কি লেখা হয় জানেন কি করে ?

হাঃ। যে করে, কন্যা চন্দ্রবদনীর হাঁড়ির খবর জানলাম, তোমার হাঁড়ির খবর জানলাম, তাই করে।

এও কি সম্ভব ?

সবই সম্ভব। বিশ্বাস চাই। আর সাধনমার্গের এক বিশেষ জায়গাতে পৌঁছনো চাই শুধু।

আপনি কি বলতে চান সকলের ধর্মনিরপেক্ষতাই মিথ্যে বুলি ?

ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটার মানে কজন ভারতীয় বোঝে ? যারা বোঝে, তারা সকলেই ভয়েই চুপ করে থাকে। তারা ইচ্ছে করে ভুল ব্যাখ্যা করে। সংখ্যালঘুদের ভোট চাই যে। বোঝ না ? আরে শালারা এইটাই বোঝে না যে, দেশটাই যদি বেহাত হয়ে যায়, মেয়ে-বৌ যদি ধর্ষিত হয়, বাড়ি-ঘর জ্বলে যায়, এক কাপড়ে নিজের দেশেই সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে আবারও উদ্বাস্তু হয়ে যেতে হয়, তখন কপচানো-বুলি দিয়ে আর কী হবে ! হিন্দুদের মতন নিপীড়িত জাতি এবং অবশ্যই ইহুদিদেরও

মতনও, পৃথিবীতে আর বেশি কি আছে ? তবে নিপীড়নের এখনই কি হয়েছে ? ভবিষ্যতে যদি বেঁচে থাকো বেশিদিন, তো দেখবে। তখন পালাবে কোথায় আঁতেল ভারতীয়রা ? ভারত মহাসাগর আর বঙ্গোপাসাগরে কি ঝাঁপিয়ে পড়বে ? তাছাড়া তো পালাবার আর কোনও জায়গা নেই হিন্দুদের।

কেন ? নেপাল আছে।

হাঃ। নেপালে তো একটি রাজ্যের মানুষই ধরবে না। তাছাড়া, নেপাল কি গোপাল করে রাখবে তোমাদের ভেবেছ ?

এ আপনার ভুল কথা মহারাজ।

ভুল কথা ? কেন ?

শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে...

সারা পৃথিবীতে দিনে দিনে ইসলামি মৌলবাদ কি কমছে না বাড়ছে ? তুমি কি অন্ধ বেটা ? শিক্ষা বলতে তুমি যা বোঝাতে চাইছ সেই শিক্ষার সঙ্গে কি অবাঙালি মুসলিম মৌলবাদীদের কোনও সম্পর্ক আছে ? তবে ? এসব আলোচনার মানে কি ?

তারপর বললেন, আমি অনেকই জানি। সব জানি বলার মতন মূর্খ যেন কখনও না হই। আমার মস্তিষ্ক, মনে করো, একটি স্যাটেলাইট। আমার ধর্মের মাহাত্ম্য, আমার ঐতিহ্য, আমার সাধনাই হয়তো আমাকে এই দান দিয়েছে। সারা পৃথিবীতে বটেই দ্যুলোক ভূলোক স্বর্গলোকে কি ঘটছে কখন তাও আমি বুঝতে দেখতে পাই।

তা বলে, বাবরি মসজিদ ভাঙাটা আপনি সমর্থন করেন কি ?

চারণ বেশ উষ্মার সঙ্গেই বলল।

একেবারেই করি না। নিশ্চয়ই করি না।

তারপরে একটু চুপ করে থেকে বললেন, কিন্তু তুমি কি আমাকে বলতে পারো হিন্দু আর বৌদ্ধরা, এমনকি ক্রিশ্চানেরাও অন্যাদের ধর্মস্থান কতবার ভেঙেছে ? পৃথিবীর ইতিহাস কি বলে ? অতীতে যাবার দরকার নেই। বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রতিক্রিয়া হিসেবে শুধুমাত্র বাংলাদেশেই তো মসজিদ ভাঙার অব্যবহিত পরেই পাঁচশ মন্দির ভাঙা হয়েছে। তসলিমা নাসরিন এই তথ্য তাঁর "লজ্জা" উপন্যাসে লিখেছিলেন বলেই তাঁর স্বদেশে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তাকে মৌলবাদীরা খুন করার হুমকিও দিয়ে রেখেছে। সেটার না হয় তবু একটা ব্যাখ্যা করা যায়। মৌলবাদীরা, কাফিরদের পক্ষ নেওয়ায় তাঁকে দেশদ্রোহী আখ্যাও দিতে পারে। বাংলাদেশের রাজনীতিকদেরও 'ভোট'-এর কথা চিন্তা করতে হয়। তাঁরাও এই উপমহাদেশেরই মানুষ। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় লজ্জার কথা এই যে, আমাদের মহান "ধর্মনিরপেক্ষ" ভারত সরকার পাছে মুসলমান ভোট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চলে যায় এই ভয়ে তসলিমাকে ভারতে ঢোকার ভিসা পর্যন্ত দেননি। মেয়েটি তাঁর স্বদেশ এবং ভারত, এই দুই দেশেই সমান অবাঞ্ছিত, সমান অপমানিত, অবহেলিত। বাংলাদেশের যুক্তি যদিও বা মানতে পারি কিন্তু তসলিমার প্রতি ভারতের এই ব্যবহার নপুংসকতারই নামান্তর। শালার রাজনীতিকরনেওয়ালারা ! ভোটে তোদের এতই আঠা ! বাঘ-সিংহ চোরেরা সব !

দেবেগৌড়া সরকারও তো দেননি। ভিসা।

না। দেননি।

তারপর বললেন, কলকাতার যে-সব বাঙালি কবি-সাহিত্যিক পাদপ্রদীপের আলোতে আসবার জন্যে তসলিমার চারপাশে মাছির মতো ভন ভন করেছেন একসময়ে, তাঁকে এক মুহূর্তও চোখের আড়াল করেননি, বাংলাদেশে গিয়েও তাঁর ছায়া হয়েছেন, তিনি যখনই এখানে এসেছেন তখনই যাঁরা তাঁর "লোকাল গার্জেন" বনে গেছেন, তাঁদের মধ্যে একটা কথাও তো বলেননি একজনও ? তসলিমার প্রতি এই অন্যায়ের প্রতিবাদে ? বলেছেন কি সেই বুদ্ধিজীবীরা ? থুঃ। থুঃ। থুঃ। এ শালারা আবার ইনটেলেকচুয়াল। হাসি পায়।

এটা বলা আপনার অন্যায়।

চারণ বলল।

কেন ? অন্যায় কেন ? কী কারণে অন্যায় ?

কবি-সাহিত্যিকদের তো আর ভোটের দরকার নেই। ওঁদের ভয় কিসের ?

হাঃ তুমি একখানা ছাগল! ভোটের দরকার নেই কিন্তু বাড়ি-গাড়ির দরকার তো আছে। গল্ফ-গ্রিন-এ ফ্ল্যাট, সল্ট লেক-এ জমি, সরকারি দাক্ষিণ্য, পুরস্কার, এ সবেরও দরকার আছে। তাছাড়া বাংলাদেশই এখন বাংলা বইয়ের সবচেয়ে বড় বাজার। এইসব বিস্ফোরক কথা যদি কোনও কবি-সাহিত্যিক বলেন, তাহলে বাংলাদেশ সরকার কখনও যদি মৌলবাদী হয়ে যান তখন তো সেখানে তাঁদের লেখা বই ঢুকতে নাও দিতে পারেন। সেই সব কবি ও লেখক তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার স্বচ্ছ বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে তখন ঝড়-ঝঞ্ঝা পেরোবেন কি করে ? খাবেন কি ? তাহলে তো বড়ই সর্বনাশ হবে। সত্যি! এই সহজ কথাটুকুও তোমার মগজে ঢোকে না। তোমার মতন এমন মূর্খ ভারতবর্ষে তো বটেই বঙ্গভূমেই বা আর কে আছেন ?

তারপর একটু চুপ করে থেকে জিষ্ণু মহারাজ বললেন, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মতন অসৎ, কূপমণ্ডূক এবং নীচ বুদ্ধিজীবী সম্ভবত পৃথিবীতে আর নেই।

সকলেই ? না। একথা মানতে পারলাম না।

চারণ বলল।

হয়তো সকলেই নন। তবে অধিকাংশই।

তবে তাঁরা, মানে সেই সব অসৎ বুদ্ধিজীবীরা জানেন না যে, একদিন জনগণ, প্রকৃত জনগণ, তাঁদের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়ে তাঁদের যা ন্যায্য প্রাপ্য তাই দেবেন। প্রকৃত দেশদ্রোহী যে সেই বুদ্ধিজীবীরাই এই সরল সত্য প্রকৃত জনগণেরা তখন বুঝতে পারবেন।

চারণ বলল, মহারাজ। আপনারা তো অনেক জানেন। আমার ভুল হলে ক্ষমা করবেন। আমার মনে হয়, আমাদের হিন্দুধর্মে ক্লীবত্বর জয়গান গাওয়া হয়ে থাকে। তাই হয়তো যুগে যুগে কালে কালে আমরা অন্যদের অত্যাচার অবিচার এবং পেশী শক্তির আস্ফালন দেখতে দেখতে নিথর হয়ে গেছি। আমাদের ধর্মে কি অন্যায়কারীদের হত্যা করায় কোনও বাধা আছে ? যেসব অন্যায়ের প্রতিকার, শুধুমাত্র অন্যায় দিয়েই করা সম্ভব, সেখানেও কি হিন্দুধর্মে শারীরিক বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে কোনও অনুশাসন আছে ?

একেবারেই নেই। অন্যায়কারীকে দমন করায় কোনওই বাধা নেই। অন্যায়ের প্রতিকার করার বিরুদ্ধে কোনও অনুশাসন নেই। তোমাকে তো বললামই যে, অজ্ঞতার চেয়ে বড় শত্রু মানুষের আর কিছুই নেই।

মহারাজ বললেন।

তারপর বললেন, তোমাকে উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি যে, দেশভাগের কিছু আগে নোয়াখালিতে এবং ত্রিপুরাতে দলবদ্ধ এক বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত গুণ্ডাদের নানাবিধ দানবীয় অত্যাচারের হৃদয়-বিদারক দুঃখকাহিনী নানা খবরের কাগজে পড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ ৭ই কার্তিক ১৩৫৩ সনে একটি আবেদন প্রচার করেছিলেন, মুখ্যত পূর্ব-পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীদের প্রতি, যাতে এই অন্যায়ে তাঁরা প্রকৃত রক্ষাকর্তার ভূমিকা নেন, দর্শকের নয়।

আপনি জানলেন কি করে ?

আমি যে তখন নোয়াখালিতেই। আমার মামাবাড়িতে। এই আবেদন আমি যখন পড়ি তখন আমি সাত বছরের ছেলে। মামাবাড়িতে দুধ-ভাত খেতে গেছিলাম। তার তিনদিন পরে আমার মামা ও মামী দুজনকেই গলা কেটে খুন করে যায় সেই গুণ্ডারা। তার আগে মামীকে ধর্ষণও করে দলবেঁধে আমারই সামনে। সেই প্রথম নগ্নরূপ দেখি কোনও মহিলার। সেই গুণ্ডাদেরও। কিন্তু যা হতে পারত সৌন্দর্যর প্রতীক তাই বীভৎসতার প্রতীক হয়ে রইল আমার চোখে আজীবন। সেই কারণেই আজ অবধি আমি কোনও রমণী শরীরে যেতে পারিনি বেটা। আমার মেজ মামীর কথা মনে পড়ে যায় কেবলই।

তারপর ?

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী মাধবানন্দ সেই অপমানে অপমানিত, অত্যাচারিত, লুণ্ঠিত, ধর্ষিত, বলপূর্বক বিবাহের শিকার হিন্দুদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে,

"আমরা আশা করি যে, তাঁহারা সর্বশক্তি দিয়া নিজেদের ঘরবাড়ি, বিশেষত কুলনারীগণের মর্যাদা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাই তাহাদের শাস্ত্রের আদেশ। সাধারণ লোকের কর্তব্য মহাপুরুষের কর্তব্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নিশ্চেষ্টতাকে যেন সমদর্শিতা বলিয়া ভুল বুঝা না হয়। প্রাচীন ভারতের মহামহিম স্মৃতিকার মনু...."

তারপরই হঠাৎ থেমে বললেন, আমাকেও কেটে ফেলত। একটি দাড়িওয়ালা বুড়োর কী দয়া হয়েছিল। অন্যদের হাত থেকে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল। কিন্তু মামীকে ওরা তারপরও প্রাণে না মারলেও পারত।

বেঁচে যেতেন ?

হাঃ। যে প্রাণ থাকত সে কি প্রাণ।

এই অবধি বলেই, মহারাজ জিগ্যেস করলেন মনুর নাম শুনেছ ? শোনোনি তো ?

তা কেন শুনবে ! তোমরা কার্ল মার্ক্স এর নাম শুনেছ। নীটশে, শোপেনহাওয়ার, মাও জেডং-এর ! মনুর বা বেদ বা উপনিষদের নামই যদি জানতে তবে কি আর আজ হিন্দুধর্মের এমন অবস্থা হয় ! তোমরা জানো না। কিন্তু জার্মানরা জানে। জিগ্যেস করে দেখো, কোনও শিক্ষিত জার্মানকে। তোমরা তো বাবা, শিক্ষা যাকে বলে, তা আদৌ পেলে না। ইংরেজদের ছেড়ে-যাওয়া পেদো-প্যান্টুলনের মতনই ছেড়ে যাওয়া জুডিসিয়াল-সিসটেমের মোক্তার-উকিল-জজ হয়েছ, নয়তো তেল-সাবানের ফিরিওয়ালা হয়েছ। এই তো হল বাঙালি শিক্ষিতদের শিক্ষার পরাকাষ্ঠা ! হাঃ।

তারপর বললেন, মনুর মনুসংহিতার ইংরেজি অনুবাদও পাওয়া যায়। পারলে, পড়ে ফেলো কলকাতাতে ফিরে।

বলুন, যা বলছিলেন।

হ্যাঁ। মনু, আত্মরক্ষার জন্যে আততায়ীকে বধ পর্যন্ত করবার বিধান দিয়েছেন।

বাবাঃ। এতে তো নিজেরও প্রাণহানির আশঙ্কা।

চারণ বলল, স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

বলেই, অবশ্য লজ্জিতও হল।

জিষ্ণু মহারাজ হেসে উঠলেন, জোরে।

বললেন, মরবে তো বেটা মাত্র একবারই। মরতে যারা ভয় পায় তারাই ক্লীব। মরতে যারা ভয় পায় তারা হয় মূর্খ নয়তো বেপথে বহুত পয়সা কামিয়েছে। পয়সা যার যত বেশি মৃত্যু ভয়ও তার তত বেশি।

তারপর বললেন, তোমরা যে স্বামী বিবেকানন্দের লেখাও পড়নি। অথচ দক্ষিণ ভারতে যাও, দেখবে তার কদর। বাঙালির মতন আত্মবিস্মৃত জাত সত্যিই আর নেই ! স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর "মহানির্বাণতন্ত্রে" "গৃহী ব্যক্তি শত্রুর সম্মুখে শূরভাব অবলম্বন করিবে" এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"শত্রুগণকে বীর্য প্রকাশ করিয়া শাসন করিতে হইবে। গৃহস্থের পক্ষে ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিলে আর অহিংসা পরমধর্ম বলিয়া বাজে বকিলে চলিবে না। যদি তিনি শত্রুগণের নিকট শৌর্যপ্রদর্শন না করেন তাহা হইলে তাঁহার কর্তব্যের অবহেলা হইবে।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী মাধবানন্দ সেই আবেদনে আরও একবার বলেছিলেন,

"আমরা নিপীড়িতগণকে জোরের সঙ্গে বলিতেছি যে, মানবজাতির কল্যাণ ভগবানেরই হস্তে, স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের হস্তে নহে, তাহারা আপাতত যতই শক্তিশালী বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন। বিগত মহাযুদ্ধে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। জীবনের এক অমোঘ আধ্যাত্মিক নিয়ম এই যে, পাপ

এমতাবস্থায় যতই প্রভাব বিস্তার করুক না কেন, পরিণামে তাহাকে নির্মূল হইতেই হইবে। শ্রী ভগবান নিপীড়িতগণকে সাহস ও বল এবং অত্যাচারীগণকে বিচারবুদ্ধি ও মৈত্রীভাব প্রদান করুন।"

চারণ বলল, এ তো হাইট অফ উইশফুল থিংকিং। অত্যাচারীগণের "বিচারবুদ্ধির" জন্যে প্রার্থনা তো এমনই ভণ্ডামি যে, কম্যুনিস্টরাও লজ্জা পাবে।

তারপর বলল, পঞ্চাশ বছর আগের রামকৃষ্ণ মিশন আর আজকের মিশনে অনেক তফাত হয়ে গেছে, না ? আপনি কি বলেন ?

হয়তো। এখন রামকৃষ্ণ মিশনের টাকা-পয়সা প্রতিপত্তির অভাব নেই। এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তো মিশন। মিশনও এখন আর হিন্দু নেই, প্রাকৃত নেই, তাও হয়তো দেশের আঁতেলদের মতই হয়ে গেছে। মিশন এখন আন্তর্জাতিক সংস্থা। "সামান্য হিন্দুধর্ম" প্রচার করাটাই মিশনের অভিষ্ট নেই হয়তো আর।

গরীব হতে পারে কিন্তু ভারত সেবাশ্রম কিন্তু পুরোপুরি দিশিই আছে। তাই না ?

চারণ বলল।

তাই। বন্যা বা ভূমিকম্প বা দাঙ্গার পর সবচেয়ে আগে ভারত সেবাশ্রমের সন্ন্যাসীদেরই অবশ্য দৌড়ে যেতে দেখি। গয়াতে পিণ্ডি দিতে গেলেও তারা ছাড়া গতি নেই। ভারত সেবাশ্রম আজও গ্রাম্য, দিশি এবং মূলত হিন্দুই রয়ে গেছে। হয়তো সেই জন্যেই অধুনা ভারতবর্ষে তাই জাতে উঠতে পারেনি। তাই আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার সাধনাও তাদের নয়। পয়সাই তো এখন জাত-বেজাত পৃথকীকরণের একমাত্র উপায়। তবে, সারা পৃথিবীতে হিন্দু ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে রামকৃষ্ণ মিশনের অবদানও অনস্বীকার্য। এ মিশনে কত প্রগাঢ় পণ্ডিত মহারাজ ছিলেন এবং আজও আছেন। কলকাতাতে গেলে গোলপার্কের আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট-এ লোকেশ্বরানন্দ মহারাজের সঙ্গে আলাপ করে এসো। অনেক কিছু শিখতে পারবে। ওঁর একটি বই আছে ইংরেজিতে, স্পিরিচুয়্যালিজম এর উপরে লেখা। স্বামীজীর বক্তব্যই অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন উনি তাতে। বইটির নাম এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। আমাকে তোমারই মতো চন্দ্রবদনীজি দেখতে-আসা এক বাঙালি টুরিস্ট দিয়ে গেছিলেন।

এ বইটি অনেকের কাছে রেকমেন্ডও করেছি। কেনার কথাও বলেছি। রামকৃষ্ণ মিশন থেকেই প্রকাশিত।

কী আছে বইটিতে ?

যেসব পণ্ডিতম্মন্য মহামূর্খ পৌত্তলিকতা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে, তাদের বাকরোধ হয়ে যাবে লোকেশ্বরানন্দজির ঐ বই পড়লে। হয়তো পড়েছেনও অনেকে। কারণ, ইংরেজিতে লেখা যে। হায়রে ভারতবর্ষ! কবে যে এদেশ সত্যি স্বাধীন হবে! যথার্থই ভারতীয়দের হবে! স্বামীজির পাণ্ডিত্য ও যুক্তি যে কী প্রকার ছিল তার আভাস পাবে লোকেশ্বরানন্দজির বইটিতে। চটি একটি বই।

চারণ একটা বড় হাই তুলল।

মহারাজ বললেন, কী হল, এবারে কি শয়নে পদ্মনাভ ?

আপনি যা আজ্ঞা করবেন।

আমি কি তোমাকে এ পর্যন্ত একটিও আজ্ঞা করেছি বেটা ?

না, তা করেননি।

তবে ?

তারপর বললেন, তোমার যখন খুশি তখনই শোবে। চব্বিশ ঘণ্টাতে ঘণ্টা চারেক ঘুমের প্রয়োজন আমাদের। দিনে ঘুমিয়ে নিয়ে সারাটা রাত জেগে থাকাই শ্রেয়। তখন মন মনের ঘরেই থাকে। বিক্ষিপ্ত কম হয়। মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের তফাৎ কি জানো ? মানুষ ভাবে আর জানোয়ার ভাবে না। ভাবনা চিন্তার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে।

খুবই ঘুম পাচ্ছিল চারণের। সিদ্ধি ও গাঁজা খাওয়ার জন্যেই। জিষ্ণু মহারাজের কথাতে নয়। তাঁর কথা শুনতে খুবই ভাল লাগছিল। সত্যিই জ্ঞানী মানুষ।

তার হাতঘড়িকে চারণ হৃষীকেশেই নির্বাসন দিয়েছিল। ব্যাটারি যতদিন না শেষ হয় ততদিন চলতেই থাকবে সে কুঅভ্যেসে। চলার আদৌ কোনও প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক, শহর-নগরের অগণ্য অভ্যাস-তাড়িত মানুষেরই মতন।

জানোয়ারের ভাববার ক্ষমতাই নেই। তোমাকে ধিয়ানগিরি মহারাজ কি সেই শ্লোকটা বলেছিলেন ? উপনিষদের শ্লোক ? তাঁর খুবই প্রিয় শ্লোক ওটি।

জিষ্ণু মহারাজ বললেন।

কোনও শ্লোক ? আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ ভাল করে হতে না হতেই তো চলে এলাম দেবপ্রয়াগে। তারপরে তো উনি সব আলাপই শেষ করে দিলেন।

তাই তো হয়। আলাপ এ সংসারে কার সঙ্গে আর কার হয় ? সংসারে, জীবনে, গানের মতন বিস্তারের সুযোগ তো কমই আসে ! আলাপেই গান শেষ। একদিক দিয়ে ভালই। বিস্তারে এক ঘেয়েমিরও জন্ম হয় অনেক সময়ে।

শ্লোকটা কি ?

হ্যাঁ। বলছি।

'আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনম্

সামান্য মেতাৎ পশুভিরণরানাং।

ধর্মহি তেষাম অধিকো বিশেষেঃ

ধর্মেনাহীনা পশুভিঃ সমানাঃ।'

মানে কি হল ?

মানে হল, আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন এসব পশুরও আছে, মানুষেরও আছে। কিন্তু শুধুমাত্র মানুষরেই ধর্ম আছে। "ধর্মহি তেষাম অধিকো বিশেষোঃ"

এই ধর্ম মানে কি ? চারণ জিগ্যেস করল।

এই ধর্ম মানে, সুযোগসন্ধানী বা অনেক রাজনীতিক ধর্ম বলতে যা বোঝান, তা নয়। এই ধর্ম হিন্দুত্ব, ইসলাম, খ্রিশ্চান বা জৈনও নয়। হিন্দুধর্মর প্রকৃত "ধারণা" এবং "প্রকৃতি" অনেকই বড়। গভীরতার সংজ্ঞা সে। তাকে ছোট করেছে কতগুলো অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত পুরুত আর বামুন। "ব্রাহ্মণত্ব" কাকে বলে তা না জেনেই জানোয়ারের মতন ব্যবহার করে এসেছে অব্রাহ্মণদের সঙ্গে। তাদেরই লাগাতার অত্যাচার এবং স্বার্থান্ধতাতে জর্জরিত হয়ে হিন্দুরা নিজেরাও অনেকই সময়ে ধর্মান্তরিত করেছে নিজেদের। হিন্দুধর্মর নিজস্ব দোষও কিছু কম নয়।

আপনার মতে কোনও ধর্ম সবচেয়ে ভাল ?

সবচেয়ে ভাল কি না জানি না তবে ইসলাম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে সোস্যালিস্ট ধর্ম। অমন "বিরাদরী", অমন সমতা খুব কম ধর্মের মধ্যেই আছে। সে কারণেই কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষ সহজে তার ছত্রছায়ায় গিয়ে জড়ো হয়েছে। যারা আজ "দলিত" তারা আমাদেরই দ্বারা দলিত। আয়নার সামনে দাঁড়ালে এবং এখনও যদি কিছুমাত্র লজ্জাবোধ আমাদের থেকে থাকে, তবে লজ্জিত হয়ে আমাদের যুগযুগান্ত ধরে সঞ্চিত পাপের কিছুটা লাঘব করা উচিত। কত কোটি দলিত যে এই অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে মুসলমান বা ক্রিশ্চান হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। যে ধর্মে পৈতে জড়ালেই অন্য মানুষের চেয়ে বড় হয়ে যায় একদল মানুষ, বিন্দুমাত্র গুণ ব্যতিরেকেই, সেই ধর্মের মারণবীজ হয়ে এসেছে সেইসব উচ্চবংশীয়রাই।

তারপর একটু থেমে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন না ?

"মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে

ভাগ করে খেতে হবে তাহাদের সাথে অন্নপান

হতে হবে সবার সমান।"

একটু চুপ করে থেকে স্বগতোক্তিরই মতন বললেন জিষ্ণু মহারাজ, এই ভাঙচুর, আসলে শুরু হয়েছে অনেকদিনই হল। দোষটা কোনওওদিনও ধর্মের মধ্যে ছিল না। "যাহা ধারণ করে তাহাই

ধর্ম" এই সংজ্ঞাতে বিচার করলে হিন্দুধর্ম নিশ্চয়ই এক মহান ধর্ম। এই ধর্মর পরম দুর্ভাগ্য যে অগণ্য শূন্যকুম্ভ স্বার্থন্বেষী বুজরুকেরা এই ধর্মকে কামধেনুর মতন দোহন করেছে, সাধারণ, ধর্মবিশ্বাসী সরল দেশবাসীদেরও যেমন দোহন করেছে। এই অপরাধে অনেক ভণ্ড গেরুয়াধারীরা যেমন অপরাধী তেমনই অপরাধী "ধর্ম যারা মানে তারা পাগল" একথা যারা বলে, সেই—মান-যশসম্পন্ন ধান্দাবাজ অপার অশিক্ষিতরাও।

চারণ উঠে দাঁড়াল।

বলল, আমি এবার গিয়ে শুই।

যাও বেটা। ভিতরের দিকে চলে যাও। ঠাণ্ডা কম লাগবে। শেষ রাতে নারীর শরীর যদিও সবচেয়ে গরম হয়ে ওঠে, ধরিত্রীর শরীর সবচেয়ে ঠাণ্ডা হয়। যাও, রাতের পথ ফুরিয়ে এল। একটু পরেই আকাশে অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করবে। যাও। তুমি যাও।

কিন্তু "যাও" বললেই তো যাওয়া যায় না। এতক্ষণে পায়ের নীচে আঠার এক পুরু আস্তরণ জমেছে তা তো বুঝতে পারেনি। এই আঠার রকম অন্য। ও দাঁড়িয়ে উঠতেই ব্রহ্মাণ্ড টলতে লাগল। সিদ্ধি এবং গাঁজার যুগপৎ প্রভাবে তার মধ্যে এমন এক অদ্ভুত ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলতে লাগল যে, সে অনুভূতি ও ব্যাখ্যা করতে পারবে না। আশ্চর্য এক ভারশূন্যতার পর মুহূর্তেই অসীম ভার। তারপর মুহূর্তেই আবারও ভারশূন্যতা। একবার শরীর ও মস্তিষ্ককে পাখির মতন হালকা মনে হচ্ছে আবার পরমুহূর্তেই পাথরের মতন ভারী।

কোনওরকমে এক কোণে গিয়ে তার ঝোলাটি যেখানে রাখা ছিল, সেখান থেকে বাঁদুরে টুপি এবং কম্বলটিকে বের করে নিয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল চারণ।

কোথায় যেন ভোর হচ্ছিল।

পাখি ডাকছে নানারকম।

চারণ তার মা আর দাদুর সঙ্গে হাজারিবাগে গেছে। গয়া রোডের সেই সুন্দর ছবির মতন বাড়িটি। সামনে মোরব্বা ক্ষেত, গড়িয়ে গেছে হাজারিবাগ লেক অবধি। রিফরমেটরির লাল ধুলোর রাস্তা চলে গেছে। দূরে উলটোদিকে খোয়াই-এর পর খোয়াই পেরিয়ে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সেদিকে ক্যানারি হিল রোডের দুপাশের বড়লোকের বাড়ির কম্পাউন্ডে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ইউক্যাপিলটাসের সারি। ছবির মতন।

চারণের মা ইউক্যালিপটাস গাছ দেখলেই বলতেন, আড়ি। আড়ি। আড়ি।

কেন যে ঝগড়া ছিল মায়ের ইউক্যাপিলটাস গাছেদের সঙ্গে চারণ জানে না। একদিন জিগ্যেস করেছিল। মা বলেছিলেন, এসব বড়দের কথা। তুমি বড় হলে বলব কখনও।

কবে যে বড় হবে। ভাবত চারণ। ও বড় হওয়ার আগেই ইউক্যালিপটাস গাছেদের সঙ্গে ঝগড়া এবং চাপা অভিমান নিয়ে মা চলে গেছিলেন যেখানে সকলকেই যেতে হয় একদিন।

মা ডাকলেন, খোকা! খোকা! ওঠ। আর ঘুমোয় না। আমরা মর্নিং-ওয়াক-এ যাব। কোররার মোড়ে গিয়ে গরম গরম জিলিপি আর সিঙ্গাড়া খাব। ওঠ।

কোররার মোড়ের দিকে লাল ধুলো গায়ে-মাখা পথটি চলে গেছে সার্কিট-হাউসের উলটোদিকে তারপর পুলিশ সাহেবের বাংলোর কাছে গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। তারও পরে কালো পাথরে তৈরি "THE GIBRALTER" নামের একটি অতিকায় বিশাল ভুতুড়ে দুর্গের মতন বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়ে পৌঁছেছে পথ ক্যানারি পাহাড়ের গায়ের কাছে। পৌঁছে, ডানদিকে বাঁক নিয়ে

কচি-কলাপাতা সবুজ শালবনের মধ্যে দিয়ে আবীর-লাল সেই পথ পৌঁছে গেছে কোররা। কচি-কলাপাতা-রঙা, টিয়াপাখির ঝাঁক পাইলট-কারের মতন যে পথে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় পথিককে।

মায়ের সঙ্গে হাঁটছে চারণ। চৈত্রর শেষ। পেছনে পেছনে হাজারিবাগের সেই বাড়ির বহু পুরনো বিশ্বস্ত দারোয়ান, চমনলাল। যার বাঁ কানটা ডান কান থেকে ছোট এবং যে তার ইচ্ছে হলে শোনে এবং ইচ্ছে না হলে শোনে না।

বসন্তর ভোরে এখানে এখনও শীত-শীত করে। মায়ের গায়ে সেই হালকা মেরুন রঙা হালকা পশমিনা শালটি। সাদা-সিল্কের শাড়ি। মেরুন-রঙা ব্লাউজ সিল্কের। চারণের গায়ে পোলো-নেক সোয়েটার। ঘন সবুজ রঙা। মেজমামীমা বুনে দিয়েছিলেন আগের বছরের শীতে।

পুলিশ সাহেবের বাংলো ছাড়িয়ে ওরা ক্যানারি রোডে পড়ে, ক্যানারি পাহাড়ের দিকে চলেছে।

মা বললেন, বড় হয়ে তুই কি হবি রে খোকা ?

কী হব ?

তোর কি হতে ইচ্ছে করে ?

অনেক কিছু। অনেক কিছু মা !

যথা ?

এয়ারফোর্সের ফাইটার পাইলট।

যাঃ। আর ?

আর্মির জেনারাল।

আর ?

এঞ্জিনিয়ার।

আর ?

ডাক্তার।

আর কিছু ?

পিটু মামার মতো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

আরও কিছু ?

আর আর আর...মদন মেসোমশাই-এর মতো প্রফেসর।

অন্য আর কিছু ?

তাহলে আমাদের পাড়ার সান্যাল সাহেবের মতন ব্যারিস্টার ?

ব্যারিস্টার ছাড়া ?

তাহলে জীবনানন্দ দাসের মতন কবি। তুমি সেদিন "রূপসী বাংলা" পড়ে শোনাচ্ছিলে আমাকে। আঃ মা। কী সুন্দর।

হুঁ।

মা বললে।

ছোট্ট চারণ বলল, আমি কী হলে তুমি খুশি হও মা ? তবে কি কবি হব ?

সবচেয়ে বেশি খুশি ? হ্যাঁরে খোকা ?

মা বলেছিলেন।

হ্যাঁ।

খোকা, বাবা, তুই এসবের একটিও নাহলেও আমার একটুও দুঃখ হবে না। কিন্তু আমি সবচেয়ে খুশি হব যদি তুই মানুষ হোস।

মানুষ !

চারণ অবাক হয়ে তার মায়ের হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আমি তো মানুষই। আমি কি খরগোস, না বাঁদর ?

তোর চেহারাটাই মানুষের মতন। নাক, চোখ, চিবুক, নানান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কিন্তু তুই যে মানুষই একথা এখনই বলা যাচ্ছে না। চেহারাতেই মানুষের মতন হোস না কেবল, তুই মানুষের মতন মানুষ হোসরে খোকা। তুই যে প্রকৃত মানুষ এই সত্য তোকে প্রমাণ করতে হবে বড় হয়ে।

"মানুষের মতন মানুষ হওয়া" কাকে বলে তা চারণ জীবনের পথে এতদূর হেঁটে এসে একটু একটু বুঝতে পারে কিন্তু পুরো যে বুঝেছে সে কথা বলতে পারে না।

মানুষের মতন মানুষ হয়ে ওঠা অত সহজ নয়।

ঘুম ভেঙে গেল নদীস্রোতের শব্দের মতন দূরের চবুতরার কোলাহলে। আজ অনেক যাত্রী এসেছেন মনে হয় চন্দ্রবদনীর মন্দিরে। আজ কি ছুটির দিন ? তীর্থক্ষেত্রে অবশ্য ছুটির দিন বলে কিছু নেই। তবে এখন শীত পড়ে গেছে তাই বদ্রীবিশাল আর কেদারনাথে বহিরাগত "প্যাকেজ-পুণ্যার্থী"দের ভিড় কম। তখনও অবশ্য হৃষীকেশের কাছের কুঞ্জাপুরী বা দেবপ্রয়াগের কাছের এই চন্দ্রবদনীতে তাঁরা কেউই যান না। তাঁরা রণপাতে চড়ে মূল গন্তব্যে চলে যান। এবং ঝড়ের বেগে ফিরেও যান। "সময় কোথায় সময় নষ্ট করবার।"

এখন সেই প্রস্তারাশ্রয়ে কেউই নেই। ধুনিটা তবু জ্বলছে ধিকিধিকি, পুরনো প্রেমের মতন। চিতাশান্তি করার মতন করে কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে তাকে নিভিয়ে দিল চারণ। তারপর সেই কমণ্ডলু নিয়েই মুখ-চোখ ধোবার জন্যে পেছনের অরণ্যাবৃত পাহাড়ে গেল। কার কমণ্ডলু কে জানে ! এখানে "হিজ হিজ হুজ হুজ" সংস্কৃতি এখনও পুরোপুরি শিকড় গাড়েনি।

সকালে পরপর দুকাপ গরম চা না খেয়ে বিছানা ছাড়তে পারত না চারণ কলকাতাতে। এখন সেসব অভ্যেস চলে গেছে। সারা দিনেও এক কাপ চা না খেলেও চলে যায়। পেলে ভাল, না পেলেও হয়। তার বদলে গাঁজা, গুলি খায় বটে, কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেসবেও এখনও পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়নি। সবরকম অভ্যাসই দাসত্ব যে, একথাও এইসব সাধুসন্তদের সঙ্গে মিশেই জেনেছে। জেনেছে তো অনেকেই কিছু কিন্তু তার কতটুকুই বা গ্রহণ করতে পেরেছে।

কে জানে ! আজ শেষ রাতে বহুবছর আগের হাজারিবাগের সকালের সেই স্মৃতি স্বপ্ন হয়ে কেন ফিরে এল। এই স্বপ্নের কি মানে আছে কোনও ? ও যে "মানুষ" হতে পারেনি এখনও তাই কি ওরে চলে-যাওয়া মা স্বপ্নে দেখা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন ?

হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে আসতেই দেখল, তুরতি একটা বড় গ্লাসে করে চা নিয়ে তা থেকে ছোট মাটির ভাঁড়ে একটু একটু করে ঢেলে ঢেলে খাচ্ছেন। তা, কেন করছেন তা বোধগম্য হল না। চারণ কাছে আসতেই বললেন, নিন দাদা খান। এই যে কুলহার।

বলেই, পাশে রাখা আরেকটা ছোট মাটির ভাঁড় বের করে তাতে ঢেলে চারণকে এগিয়ে দিলেন। এখানে ভাঁড়কে "কুলহার" বলে।

জিষ্ণু মহারাজ কোথায় ?

চারণ শুধোল।

উনি তো সারা রাত ধ্যানে থাকেন। এখন ঘুমোচ্ছেন। উঠে আসবেন অবশ্য এখুনি। ঘণ্টা চারেক ঘুমোন।

কোথায় ঘুমোন ?

একটি পাথরের চাতাল আছে। খাদের পাশে। শীত, গ্রীষ্ম ওইখানেই কাটে সকালবেলায়। বর্ষাতে অবশ্য এই ডেরারই এক কোণে শুয়ে পড়েন। তবে ঘুমটি ওঁর, আমার আপনার মতন নিত্যদিনের অভ্যাস নয়। কখনও সপ্তাহ বা মাসও ঘুমোন না। একই আসনে বসে থাকেন চোখ বুঁজে। চারপাশে আমরা খাই, ঘুমাই, হাসি। সূর্য ওঠে সূর্য ডোবে। চাঁদ ফোটে চাঁদ বোজে। তাঁর চারধারে এই পৃথিবী ও পৃথিবীর সবকিছুই আবর্তিত হয় কিন্তু তিনিই স্থবির থাকেন। গোলমালে ওঁর ধ্যানের কোনও বিঘ্ন ঘটে না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলেন, আপনি-আমি এঁদের কাছে থাকতে পারি মাস-বছর কিন্তু

এঁদের মতন হতে দু-এক জনম পার করে দিতে হবে। কে জানে ! এঁরা হয়তো অনেক জন্ম ধরেই এইরকম জীবনযাপন করছেন, তাই আজ এই সিদ্ধি।

তারপরে নিজেই বলল, মারুন গুলি। ওঁদের সিদ্ধি ওঁদেরই থাক। আর আমাদের সিদ্ধি থাক আমাদের।

একটু চুপ করে থেকে তুরতি বলল, শান্তিনিকেতনী কায়দাতে যেমন করে বলে, "কাল লাগল কেমন" ? এবং উত্তর হয় "ভাল-ও-ও-ও"।

তারপর বললেন, আজ আরেকটা গুলি বেশি দেব।

তারপর আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, বুঝলেন দাদা, সব নেশাই করে দেখলাম। সোনাগাছিতে থাকাকালীন নানারকম বাবু দেখেছি তো ! স্কচ-খানেওয়ালা যেমন দেখেছি আবার চুল্লু-পিনেওয়ালাও দেখেছি। সব বাবুর সঙ্গেই সঙ্গ করেছি। কালো-ফর্সা রোগা-মোটা বাঙালি-মাড়োয়ারি-বিহারি-ইউপিওয়ালি-নেপালি ইত্যাদি সবরকম মেয়েছেলের সঙ্গেও ও কম্মো করেছি। ফুর্তি যতরকম হতে পারে, করে নিয়েছি। কিন্তু সিদ্ধির মতন নেশা নেই। বুয়েচেন দাদা। সাধে কি মহাদেব ওই নেশা করেন ! ভাল করে সিদ্ধি খান, দেখবেন, আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর আপনার নেই। হাপিস হয়ে গেছে। আপনি পায়ের বুড়ো আঙুল দেখতে পাচ্ছেন। অথচ সে বলছে সে আপনার নয়। ইয়েস স্যার। সে আপনার নয় !

ফ্যাক্ট ! এমনকি, কী আর বলব, আপনার সাধের ধনও আপনার নয়।

এমন কথা শুনেছেন কখনও ?

কিন্তু কথাটা সত্যি। ভাল করে খেয়ে দেখবেন আপনি, পেরকিতই "অধন" হয়ে যাবেন।

তারপরই, কী যেন মনে পড়ে যাওয়াতে বললেন, সেই রবিঠাকুরের একটা গানের লাইন ছেল না ? "অধনেরও হও ধন" ?

হ্যাঁ।

চারণ বলল।

তুরতি বললেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধির নেশা কীরকম ডেঞ্জারাস হতে পারে তা বিলক্ষণ জানতেন। ছেলেবেলাতে কুস্তি-মুস্তি লড়তেন তো ! হয়তো তখন চাকর-বাকরে খাইয়ে দিয়ে থাকবে কখনও তেনাকে। আর হয়তো জানতেন বলেই ওই কলিটি লিখেছিলেন। আপনার কি মনে হয় ? মানে, কী বলেন ?

আমি আর কী বলব ?

চারণ স্তম্ভিত হয়ে বলল। একবার ভাবল, তর্ক করে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ইয়ার্কি অসহ্য লাগে। তারপরই ভাবল, কি লাভ ? তুরতি হচ্ছে প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, সর্বার্থেই সিদ্ধ-বাবা। তাকে জ্ঞান দেয় অমন জ্ঞান চারণের কোথায় ?

একটু চুপ করে থেকে তুরতি বললেন, তবে একটা কথা বলব, নিজের সম্বন্ধে প্রশংসার কথা, তাই বলতে একটু লজ্জা করছে, কিন্তু কথাটা সত্যি।

কি কথা ?

এই যে সব পুণ্যার্থীরা আসে, এত পুজোপাঠ করে, তাদের তো বটেই, অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর জ্ঞানও আমার চেয়ে অনেক কম।

কি ব্যাপার ? মানে, কোনও বিষয়ে ?

কোনও বিষয়ে নয় ! তাই বলুন ? ধরুন এই যে দুব্বো ঘাস দিয়ে দুটি ঘাসের মধ্যে ছোট ঘাসটি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সকলেই পুজো করে, তা কেন করে বলতে পারেন ?

চারণ অবাক হল। বলল, তাই করে বুঝি ?

করে না ? পুজো মণ্ডপে দেখেননি যে, মা লক্ষ্মীরা সব চান করে উঠে নতুন শাড়ি পরে এসে সাতসকালে ফল কাটে আর দুর্বো ছেঁড়ে বসে বসে, পুজোর আয়োজন সম্পন্ন করতে ?

ও হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখেছি তো !

চারণ বলল।

তা দেখেছেনই যদি, কখনও কি মনে এ প্রশ্ন আপনার জেগেছে যে, কেন দুব্বোর মধ্যিখানটার ছোট ঘাসটি ছিঁড়ে ফেলে দিতে হয় দেব-দেবীর পুজোর যোগ্য করে তুলতে ?

না, তা জাগেনি।

জানার ইচ্ছার, অর্থাৎ জিগীষার আরেক নামই তো শিক্ষা। বুঝেছেন স্যার ? যার জিগীষা মরে গেছে, সে মালকে আমি অন্তত শিক্ষিত বলে মানি না।

মানা উচিতও নয়। তাহলে আপনিই বলুন, কেন দুব্বোর মধ্যিখানের ছোট ঘাসটি ছিঁড়ে তারপর পুজোতে দেওয়া হয় ?

চারণ বলল।

শুনুন স্যার। এবারে আমি যে গুপ্ত কথাটি বলটি আপনাকে, সেটি যেন আবার কারওকে বলে দেবেন না। আর যদি কখনও বলে দেনও এই তুরতি বাবার নাম না করে বলবেন না যেন। কোনওদিন দেখব এই, ফোরটোয়েন্টি দুনিয়াতে আমারই জ্ঞান অন্যের জ্ঞান হয়ে আমার কাছে বেয়ারিং চিঠির মতন ফিরে এল।

না, বলব না। মানে, বললেও আপনার নামোল্লেখ করেই বলব।

কথা দিচ্ছেন তো ?

দিচ্ছি।

তারপরই বললেন, খিদে পেয়েছে নাকি ?

তা একটু পেয়েছে বৈ কি। কাল রাতেও সিদ্ধি আর গাঁজা ছাড়া কিছু খাওয়া হয়নি।

তবে চলুন গরম গরম পুরী-কচৌরি খেয়ে আসি। জিলিপিও খাবেন। তবে আমাদের হাতিবাগানের বেকা খচ্চরের দোকানের মতন জিলিপি ভূ-ভারতে আর কোথাও খেলাম না। দাদ চুলকে ঘেমো গামছা চিপে যে কী কায়দাতে বানাত তা সেই জানত ! তার জুড়ি নেই।

তাই ?

নয়তো কি ?

এবারে বলুন।

আমাদের তো আর "সিদ্ধি" হয়নি যে খিদের সময়ে না খেয়ে থাকলে চলবে ? কী বলব দাদা ! কাম বলে একটা সুন্দর, মনোরম ধনারাম ব্যাপার ছেল, সে তো ভুলেই গেছি। তাবলে ক্ষুধা-তৃষ্ণাও ভুলতে যাব কোনও দুক্কে ? গুরু কি আমাকে তরিয়ে দেবেন ? নিজে তরে যাবেন তো ঠিকই। সঙ্গে থোড়িই নেবেন ! তবে আর অত ইয়ে কিসের !

মন্দির থেকে যে সিঁড়িগুলো নীচের দিকে নেবে গেছে সেই সিঁড়িরই পাশে ছোট্ট দোকান হালুইকরের। এখানে কোথা থেকে দুধ আসে, কে ঘি ময়দা চিনি বয়ে নিয়ে আসে, কে জানে। কিন্তু আসে। সবই আসে। এই পৃথিবীতে কে যে কী, কেমন করে কোথায় জোগায় তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। তবে এ দোকানে বেশি খদ্দের হয় না। খাওয়া-দাওয়া যাদের করবার আছে তারা নীচ থেকেই করে আসে। চন্দ্রবদনীজির কাছে কজন সাধু আর থাকেন। লোকে বলে, রাতে এখানে থাকলে মানুষ মরে যায়। প্রকৃত সাধু আর আমার মতো প্রকৃত অসাধু ছাড়া এখানে তিষ্টোয় এমন সাধ্য কার ?

চারণ হাসল, তুরতির কথা শুনে। ও ভাবছিল, তুরতি সত্যিই ক্ষেমি-বাঈজির মেয়েকে নিয়ে ব্যয়লা বাজিয়েছিল কি না জানে না তবে মানুষটি খুবই ইন্টারেস্টিং। চারণের সন্দেহ হয় যে, তুরতির অজ্ঞতা অশিক্ষা এসবই হয়তো একটা ভেক। সংসারে অধিকাংশ মানুষই পাণ্ডিত্যের ভেক ধরে বিজ্ঞের ভেক ধরে। কিন্তু অবহেলে যারা অশিক্ষিত ও মূর্খর ভেক ধরতে পারে তাদের শিক্ষা এবং জ্ঞানের হয়তো সীমা নেই।

সিঁড়ি নামতে নামতে ভাবছিল চারণ যে, সংসারে কোথায় যে কার জন্য কে লুকিয়ে থাকে, গর্তের মধ্যের সাপের মতন, পোকার মতন, দুই পাথরের মধ্যের ছত্রাকের মতন, পাহাড়তলির উপত্যকার

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

ফিকে বেগনি ফুলের মতন, "ফরগেট মি নট" এর মতন, তা আগে থাকতে কে বলতে পারে! ভাগ্যিস বেরিয়ে পড়েছিল ঘর ছেড়ে। তা নইলে কি ভীমগিরি, ধিয়ানগিরি, নবীকৃত শুদ্ধ পাটন, দেবপ্রয়াগের উচ্চকোটির সব সাধু-সন্তেরা, চন্দ্রবদনী, তার পরিবারের সকলে, রওনাক সিং, চুকার, এই চন্দ্রবদনীজির মন্দির সংলগ্ন জিষ্ণু মহারাজ আর তাঁর এই ওরিজিনাল চেলা তুরতির সঙ্গে দেখা হত! বেরিয়ে পড়াটাই হচ্ছে আসল। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লে আর চোখ কান খোলা রাখতে পারলে বোধহয় পৃথিবীর সমস্ত অধীত জ্ঞানবিদ্যাই অপ্রত্যক্ষভাবে আয়ত্তে আসে।

বসুন।

তুরতি আজ্ঞা করলেন।

তারপর নিজের খুশি মতন খাবার অর্ডার করে বললেন, গুরুর জন্য এক কেজি রাবড়ি নিয়ে যাব। রাবড়ি নিয়ে গেলে আনন্দ করে খান। তবে লোভ নেই কোনও জিনিসেরই উপরে।

বলেই বললেন, আমার সঙ্গে পয়সা-টয়সা নেই কিন্তু। ওসব আমি রাখি না। টাকা-মাটি মাটি-টাকা। রামকৃষ্ণদেব পড়েছেন? হাতের কাছে মেড-ইজি থাকতে কী করতে যে আপনারা এতদূর ঠেঙ্গিয়ে আসেন, কে জানে তা! উনি বেঁচে থাকলে তো আমি ওখানেই ফিট হয়ে যেতাম। এতদূরে থোড়াই আসি!

একটু চুপ করে থেকে তুরতি বললেন, অন্য কথাতে যাবার আগে খোলসা করে বলে দিই দাদা যে, দামটা কিন্তু আপনিই দেবেন। নগদ না থাকলে দোকানি ধারেও দেবে। আমার অ্যাকাউন্ট আছে এ দোকানে।

আপনার সঙ্গে টাকা পয়সাই নেই তাহলে অ্যাকাউন্ট কিসের?

বাঃ। অ্যাকাউন্ট না থাকলে হিসেব থাকবে কি করে? যখন বেশি টাকা হয়ে যায় তখন আপনার মতন মালদার কারওকে ঠাকুর পাঠিয়ে দেন। তিনিই অ্যাকাউন্টটা ক্লিয়ার করে দেন। তারপর দিন থেকে আমার জমা শুরু হয়।

ঠাকুর মানে?

ঠাকুর মানে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নন। ক্ষেমি বাঈজির বাড়িতে যে রান্না করত সেই শত্রুঘ্ন ঠাকুর। ওড়িশার ঢেনকানলে বাড়ি।

সে পাঠিয়ে দেয় মানে?

আরে তার মতো মহাত্মা আমি আর দুটি দেখিনি। মহাত্মা হতে হলেই কি আর গঙ্গার পাড়ে বা হিমালয়ে এসে থাকতে হয় সংসার ছেড়ে? অমন ঠাকুর আর দেখিনি। আহা! আমার প্রাণের ঠাকুর! জিষ্ণু মহারাজ-ফহারাজের কোনও তুলনাই হয় না তাঁর সঙ্গে। তাঁকে নিয়ে আমি একটি বই লিখে তাঁকেও ওয়ার্ল্ড-ফেমাস করে দেব।

তাঁর কথা বলুন না, শুনি।

দু-এক কথাতে তাঁর কথা বলা তো যাবে না স্যার। মাস-বছর লেগে যাবে। সত্যিই বলছি, অমন মহাত্মা বড় একটা দেখা যায় না। উনিই তো আমাকে মাঝরাতে ঘুম থেকে তুলে পালিয়ে যেতে বললেন, নইলে, সেইদিন সকালেই কাল্লু মিঞাকে দিয়ে ক্ষেমি আমাকে কোতল করাত।

পুরী-কচৌরি খেতে খেতে চারণ বলল, সেই দুব্বো ঘাসের রহস্যটার কি হল?

বলব, বলব। খেয়ে নিই আগে। গত দুদিন শুধু গুরুর বাক্যি শুনেছি আর খালি-পেটে সিদ্ধি খেয়েছি। পেটে আগুন জ্বলছে। অম্বলের ঢেকুরে জেরবার হয়ে গেলাম। এইসব দেবস্থানে কোনও অ্যান্টাসিডের এজেন্সি নিলে লালে লাল হয়ে যাওয়া যেত। আমার নেহাৎ পয়সার দরকার নেই বলেই নিই না।

কেন?

পয়সার দরকার নেই কেন?

কী দরকার?

আপনারাই তো আমরা পয়সা! কোনও মূর্খ নিজে হাতে টাকা ধরে হাত নোংরা করে? কত

রোগের বীজাণু আছে এক একটি নোট-এ তা কে জানে !

চারণ চুপ করে ছিল ।

ওর মধ্যে কলকাতায় ফেরার ইচ্ছাটা কেবলই তীব্র হচ্ছিল । কিছুদিন থেকেই ইচ্ছাটা জাগরূক হয়েছে । ক্রমশই তা গতিজাড্য পাচ্ছে । ওর এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল ও এই গাড়োয়াল হিমালয়ের এই চন্দ্রবদনীর মন্দিরের পদতলের হালুইকরের দোকানে তুরতি নামক এক ঘোর সন্দেহজনক চরিত্রের মানুষের সঙ্গে বসে আছে কিসের জন্যে ?

কী হল ? চুপ করে গেলেন যে !

তুরতি বলল ।

নাঃ । এমনি । আচ্ছা আপনি এইখানে এসে জুটলেন কেন বলতে পারেন ? নিজের কাছ থেকে পালাবার জন্যে কি কলকাতা ছেড়ে এই এত দূরের চন্দ্রবদনীতে আসা খুবই জরুরি ছিল ?

দূরত্বটা তো মনের ! পথের দূরত্বটা কোনও ব্যাপারই নয় । শেওড়াফুলিতে থেকেও এর চেয়ে দূরে যাওয়া যেত ।

চারণ একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলল ।

আপনিই বা এলেন কেন ?

এই বুড়োকে দুরস্ত করতেই এসেছিলাম ।

কোনও বুড়ো ?

এই মিস্টার জিষ্ণুকে ।

সে কী ! দুরস্ত করতে মানে ?

হ্যাঁ । মানে যা, তাই ।

উনি আমাকে চিনতে পারেননি । কিন্তু উনি আমার চেয়েও আরও বড় পাপী । তবে সাধু-সাধু খেলা করতে করতে সে সত্যিই সন্ত বনে গেছে । কী কেলো । কে কেলো । সেই ব্যাধের গল্পের মতন । অনেক সন্ত-এর চেয়ে বড় সন্ত । সে কারণেই ওঁকে দুরস্ত করতে এসে আমিও ওঁর চেলা বনে গেছি । নইলে আমি কম্যুনিস্ট, আমি এখানে থাকতে যাব কেন মৌরসী পাট্টা গেড়ে ?

তারপর বলল, জানেন কি ? আপনাদের এই জিষ্ণু মহারাজও একসময়ে কট্টর কম্যুনিস্ট ছিলেন । আর আজ কম্যুনিস্টদের নাম সহ্য করতে পারেন না । আমার সঙ্গে জিষ্ণু মহারাজের লড়াইটা ওই সমতলের । আমি জানতে চাই, জানাতেও চাই । আমাকে বোঝাতে না পারলে, আমি ফিরতে রাজি নই ।

চারণ অবাক যত না হল তার চেয়ে বেশি বিরক্ত হল । ভাবল, সকলেই মনে করে যে সে কম্যুনিস্ট, কারণ সেটা "ফ্যাশনেবল" তাই । কম্যুনিজম-এর মানে বোঝে কজন ? তাছাড়া কম্যুনিস্ট হওয়াতে দোষের কি আছে ? গণতন্ত্রে প্রত্যেক মানুষেরই পূর্ণ অধিকার আছে তার নিজ মত ও পথে চলার, তার পছন্দমতো দলকে সমর্থন করার । এতে দোষের বা গুণের তো কিছু নেই ।

তুরতি হঠাৎ বললেন আপনি মার্কস পড়েছেন ?

কার্ল মার্কস ?

অবাক হয়ে বলল, চারণ ।

হ্যাঁ হ্যাঁ । আবার কটা মার্কস আছে রে বাবা !

পড়েছিলাম, ছাত্রাবস্থাতে । আপনি পড়েছেন ? মার্কস কি বলেছিলেন, জানেন ?

চারণ, একটু বিদ্রূপের গলাতেই বলল ।

এত লোকে জানে আর আমি জানব না ?

তুরতি বলল, কচৌরি চিবোতে চিবোতে ।

তারপরই কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখে, জটাধারী, গেরুয়া-পরা জিষ্ণু মহারাজকে গাঁজা সেজে-দেওয়া তুরতি হঠাৎই চারণের দিকে ফিরে বলল, "Communism is the positive abolition of private property, of human self-alienation and thus the real

appropriation of human nature, through and for man. It is therefore, the return of man himself as a social, that is real human being, a complete and conscious return which asimilate all the wealth of previous development.''

কার্ল মার্কস্ আঠারশ চুয়াল্লিশে লিখেছিলেন।

বলল, তুরতি।

চারণ একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, আপনি নিজের পরিচয় ভাঁড়ান কেন ? আপনার ইংরেজি উচ্চারণ তো চমৎকার।

বাঃ। শুধু আপনারটাই চমৎকার হবে ?

উলটে বলল তুরতি।

তারপরই বলল, আরে আমি কি একা নাকি ? ভাঁড়ামিতে ? এই সাধু-সন্ন্যাসীদের সকলেই তো পরিচয় ভাঁড়িয়েছেন। সকলেই চক্ষু নিমীলিত করে মুখে বলেন, "পূর্বাশ্রমের কথা জিগ্যেস করবেন না।" আমি অসাধু বলেই বা আমার পূর্বাশ্রমের কথা বলতেই হবে কেন আমার ? যাক গে। এসব কথা।

হ্যাঁ।

যাক গে এবার শুনুন দুব্বো ঘাসের রহস্য।

বলুন শুনি।

সমুদ্রমন্থন হচ্ছে, বুঝলেন। হিন্দু দেবতারা চিরদিনের খচ্চর। তারা মৈনাক পর্বত বেষ্টন করা নাগ বাসুকির ন্যাজ এর দিকে ধরেছে আর দানোদের দিয়েছে বাসুকির মুখের দিকে। মন্থন যতই এগোয় ততই বাসুকির মুখ থেকে বিষ, অর্থাৎ হলাহল বেরোতে লাগল। তাই দেখে তো দেবতাদের অবস্থা কাহিল। মন্থন বন্ধ হয়ে যায় আর কী। একজন তখন বললে, আরে, বাঁচতে চাস তো ডাক ডাক মহাদেবকে ডাক। সে ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। মোটাসোটা মহাদেব লুঙ্গি টিলে দিয়ে বসে গাঁজাতে দম দিচ্ছিলেন এমন সময়ে দেবতাদের ভগ্নদূত গিয়ে বলল, স্যার বাঁচান। আপনি ছাড়া উপায় নেই।

মহাদেব তখন লুঙ্গির কষি টাইট করে নেমে এসে চোঁ-চোঁ করে হলাহল পান করে নীলকণ্ঠ হলেন। তারপর আবার চলে গেলেন কৈলাসে।

কিছুক্ষণ পরে মহাদেবের এক চামচে, নন্দী-ভৃঙ্গীদের মধ্যেই কেউ হবে, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, গুরু ! বিষ খাবার সময়ে তুমি আর ভাল ভাল যা মাল বেরোল সে সব অন্য দেবতারা সব ঝেঁপে দিলে ! তুমি চলো। এতক্ষণে মণি-মাণিক্য ধন-রত্ন এমনকি অমৃত পর্যন্ত নিশ্চয়ই সবই শেষ হয়ে গেছে। এটা কি পৃথিবী হয়ে গেল।

তারপর ?

চারণ বলল, তুরতির গল্প বলার আকর্ষণীয় ঢঙে মুগ্ধ হয়ে।

তারপর আর কি ? সমুদ্রতটে মহাদেব পৌঁছে দেখলেন সত্যিই তো তাই। সী-বীচ একেবারে সুনশান। শুধু দূরে একটি সুন্দরী মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চামচে বলল, গুরু, আর যখন কিছুই নেই তখন ওই সাটুলিকেই ধরো।

ঠিক বলিচিস, ঠিক বলিচিস। বলে, মহাদেব তো তাকে ধরার জন্য দৌড়তে লাগলেন। কিন্তু মোটা-সোটা হাবলু-গুবলু দেবতা তন্বী-তরুণীর সঙ্গে দৌড়ে পারবেন কেন ? এদিকে লুঙ্গিও খুলে যায় আর কী। দেবতারা তো আর ব্রিফ পরেন না। হাইলি কেলো ঘটঘট, এমন সময়ে মহাদেব দাঁড়িয়ে পড়ে, দাঁড়িয়ে পড়ে, দাঁড়িয়ে পড়ে...

কি হল ?

নাঃ আর বলা যাবে না।

কেন ?

নাঃ। অশ্লীলতার দায়ে পড়তে হবে। এর পরে অনেকখানি আছে গল্পের। কিন্তু বলা যাবে

না।

এ আবার কি কথা ?

না সত্যি বলছি। বলা যাবে না।

কোথায় দুব্বো ঘাসের রহস্য আর কোথায় সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে থাকা মহাদেব আর তন্বী তরুণী...

আরে দাদা ! সে কি অর্ডিনারী তরুণী নাকি ? নারায়ণ তখনও মোহিনী বেশ ছাড়েননি যে। আসলে তরুণীরূপী নারায়ণ। তারও হাতে তো সুদর্শন চক্র। মহাদেবের যে কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খচাখচ করে তিনিও কেটে দিতে পারেন যে !

তা তো বুঝলাম। কিন্তু দুব্বো ঘাসের সঙ্গে এসবের কি সম্পর্ক ?

বললাম না। আর বলা যাবে না। ইমপসিবল। আপনার সঙ্গে আলাপ যদি আরও অনেক ঘনিষ্ঠ হয় তখনই শুধু বলা যেতে পারে। এখন থাক।

বলুনই না। প্লিজ বলুন। সত্যিই তো ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি দুব্বো ঘাস ছিঁড়ে পুজো করতে। কিন্তু কেন ? তা তো সত্যিই কখনই মনে হয়নি।

শুনবেন ? কলজের জোর আছে ? আছে। আছে।

ঠিক আছে। কিন্তু আরও সরে আসুন কাছে। অন্য কেউই যেন না শুনে ফেলে।

এই এলাম। এবারে বলুন।

তুরন্তি বললেন, না। বললাম না আর এগোনো যাবে না। সত্যিই।

চারণ ভাবছিল, হিন্দুধর্মের এই মুক্তির দিকটা নিয়ে কখনওই ভাবেনি আগে। আমেরিকান ডেমোক্রাসির মতন। ফ্রিডম অফ স্পিচ নিয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। অন্য খুব কম ধর্মাবলম্বীরাই হয়তো এমন স্বাধীনতার দাবি করতে পারেন। তাঁদের উপাস্যদের তারা সম্মানিত করতেই শিখেছেন, আপন করে উঠতে পারেননি। হয়তো কখনও পারবেনও না।

নবীন সন্ন্যাসীরা চলে গেছেন। তাঁরা নাকি বদ্রীবিশালে যাবেন। সেখানে হরিদ্বার থেকে কোন সাধু গিয়ে নাকি "কায়কল্প" করছেন। নবীন সন্ন্যাসীদের গুরুজির গুরু সেখানে যাবেন। এমনিতেই সারা শীতকালই নাকি বরফের মধ্যে সমাধিস্থ থাকেন সেই সাধু। তাঁর বয়স হয়েছে একশ দশ। কায়াকল্প করে তিনি পুনর্জীবন লাভ করবেন। আবার নাকি যুবাপুরুষ হয়ে উঠবেন। এই পুরনো জীবনকে সাপের খোলসের মতন ছেড়ে দিয়ে "ফিন্‌সে শুরু" করবেন বাঁচা।

কলকাতা ছেড়ে এই দেবভূমিতে আসার পরে এতজনের মুখে এতরকম উদ্ভট উদ্ভট সব কথা শুনছে যে মস্তিষ্কই বিকৃত না হয়ে যায় চারণের।

জিষ্ণু মহারাজ চন্দ্রবদনীজির মন্দিরের কাছের প্রস্তরাশ্রয়ে বসে চোখ বুঁজেই চন্দ্রবদনী কী রঙের কম্বলের তলাতে শুয়ে কোন বই পড়ছে, তা অবলীলায় বলে দিতে পারেন। ওঁরা হয়তো সবাই বুজরুক, নয়তো চারণকে "বাংলা পড়াচ্ছেন"। অথচ এঁদের কারওই চারণের কাছ থেকে কিছুমাত্রই চাইবার নেই। নেই বলেই, ওঁদের অবিশ্বাস করতে, উড়িয়ে দিতে, মন সায় দেয় না।

সকালবেলায় তুরন্তি যে হালুয়া-কচৌরি খেয়েছেন তার দামের যা অর্থমূল্য তা চারণের কাছে কতটুকু ! কলকাতাতে 'ওবেরয় গ্রান্ড' বা 'তাজ বেঙ্গল' বা 'জারাং' ও বা 'সিভিল'-এ খেয়ে ওয়েটারদের একদিনেই যা বকশিস দিতে হয় তা দিয়ে তুরন্তিকে মাসভর নাস্তা করানো যায় প্রতিদিনই পেট পুরে। তাই কোনও অঙ্কতেই এই সবের ব্যাখ্যা সে খুঁজে পাচ্ছে না। বুজরুকি করে বা কারওকে ঠকিয়ে যদি কোনও লাভই না থাকে, তাহলে এঁরা মিছিমিছি মিথ্যে বলতেই বা যাবেন

কেন ? এই সরল প্রশ্নটিই বারেবারে তাকে বিদ্ধ করছে। অথচ চারণ আধুনিক এবং ইংরেজি শিক্ষাতে শিক্ষিত। ওর পক্ষে এসব মেনে নেওয়াও সহজ নয়। ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে ওর যা গুমোর ছিল তাও তুরতিই ভেঙে দিলেন আজ সকালেই। তুরতির ক্ষেমি বাঈজির মেয়েকে ব্যায়লা বাজানোর গল্পও বানানো বলেই এখন মনে হয় এবং সেই গল্পের গরুকে গাছে ওঠাতে জিষ্ণু মহারাজও যে সাহায্য করেছেন তাতেও সন্দেহ নেই। তুরতি চারণের চেয়ে একটুও খারাপ ইংরেজি জানেন না এবং একুটও কম শিক্ষিতও নয় কিন্তু সেটা সযতনে লুকিয়ে রেখেছিলেন এতদিন ! আশ্চর্য !

কিন্তু কেন ?

নবীন সন্ন্যাসীরা সকালেই চলে গেছেন কিন্তু তার বদলে তিনজন প্রবীণ সন্ন্যাসী এসে হাজির দুপুরবেলাতে। তাঁরা নাকি মায়াবতী থেকে আসছেন। এই মায়াবতীতে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমও আছে বলে শুনেছে চারণ। কিন্তু মায়াবতী তো কুঁমায়ু হিমালয়ে। এই নবীন-প্রবীণ সাধু সন্ন্যাসীরা কি অদৃশ্য হেলিকপ্টার বা পুষ্পক রথে চলা-ফেরা করেন ? কুঁমায়ু হিমালয়ের আলমোড়া থেকে মায়াবতী যেতেই বেশ ঝক্কি পোয়াতে হয় সে কথা চারণ জানে। কুঁমায়ু হিমালয়ের অত্যন্ত গভীরে সে জায়গা অবস্থিত। আর ওঁরা কোন কৌশলে কুঁমায়ু হিমালয়ের গভীর থেকে গাড়োয়াল হিমালয়ের চন্দ্রবদনীতে চলে এলেন কে জানে। বাসে এলেও তো বেশ সময় লাগার কথা। কিসে এসেছেন তা জিজ্ঞেস করেনি অবশ্য চারণ তাঁদের। তাঁদের মুখে দীর্ঘ পথভ্রমণের কোনওরকম ক্লান্তির চিহ্ন নেই। বড় আনন্দময় তাঁদের মুখমণ্ডল।

সেই পক্ককেশ সন্ন্যাসীরাও নাকি জিষ্ণু মহারাজের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছেন। তারপর ওঁরাও চলে যাবেন গুপ্তকাশী। সেখানে কিসের এক সম্মেলন আছে সন্ন্যাসীদের। তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের ওপরে অথরিটি একজন বৌদ্ধ লামা আসছেন সেখানে। সাতদিন বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের মিল-অমিল নিয়ে নাকি আলোচনা হবে। চারণেরা যাকে বলে সেমিনার। এয়ার-কন্ডিশানড কনফারেন্স রুম থাকবে না, স্যুইমিং পুল-এর পাশে দুপুরে ককটেইলস অ্যান্ড লাঞ্চ থাকবে না। ভজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে।

চারণ ভাবছিল, এ যেন কোনও সামিট-মিটিং। সেমিনার করে ফিরিওয়ালারা।

বিষ্ণু মহারাজের এই প্রস্তরাশ্রয়ে সঙ্গে দেবপ্রয়াগের পাটনের গুরুর আশ্রমের বিশেষ কোনও তফাৎ নেই। পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকেই মানুষ আসছেনই অনবরত। এ যেন কোনও রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। আসে অনেকে, কিছু সময় থাকেও অনেকে, কিন্তু এই স্থানের ওপরে কারওরই দাবি নেই। পাঁচ-দশ বছর এক জায়গাতে বাস করেও কোনও অধিকার জন্মায় না কারোরই কোনও বিশেষ স্থান বা বাসস্থানের উপরে। না থিতু হয়ে-বসা সন্ন্যাসীর কোনও দাবি জন্মায় তার স্বত্বে, না আগন্তুকের। এ ভারী এক আশ্চর্য পত্তন ব্যবস্থা। সারা পৃথিবীর সব বাড়ি-জমির ব্যাপারেই এই পাট্টা চালু থাকলে জমি নিয়ে এত মারামারিই থাকত না। সারা পৃথিবীই প্রকৃতার্থে কম্যুনিস্ট হয়ে যেত।

এখানে সাধু-অসাধু সবরকম মানুষই আসছে। অসাধু ছিলেন তাই সাধু হতে চান কেউ, আবার সাধুত্বে ইস্তাফা দিয়ে অসাধু জীবনে চলে যেতে চান কেউ। কেউ বা চারণের মতনই জীবনকে শুধুমাত্র চেখে দেখতে, জীবনের গন্তব্য শুধরাতে এখানে আসে, জীবনকে Sampling করতে।

একদিন চারণও ফিরে যাবে বেগবতী নদীতে অনেক দূর বেগে গড়িয়ে গিয়ে ঘর্ষণে ঘর্ষণে নিজের জ্ঞানবুদ্ধির শুকনো ধারণাকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিয়ে, ঝাঁকিয়ে নিয়ে, অনেকদিন ব্যবহার না করা চানাচুরের বয়ামের মতন। ফিরে গিয়ে, গৃহী হবে। কিন্তু অন্ধ-গৃহী নয়। চোখ-খোলা গৃহী। "অকারণ মন আশা কোরো না, অনিত্য সুখেতে মন মজো না" তুরতির এই চমৎকার গানের বাণী সেই গৃহীর মাথার মধ্যে গুণগুণ করবে অবিরত।

সন্ধ্যের পরে পরেই তুরতি সিদ্ধির সরবত বানাতে লেগে গেলেন। কে সিদ্ধি যোগায়, কে মালাই, কেই বা চিনি ? তা কে জানে !

আজ আলোচনা হচ্ছিল "ধর্মনিরপেক্ষতা" বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে।

জিষ্ণু মহারাজ বললেন, শব্দটার প্রকৃত মানে বোঝেন আমাদের দেশের কম মানুষই। আর রাজনীতিকরা বুঝেও সেই মানেকে বিকৃত করেন।

প্রবীণদের মধ্যে যিনি কালো ও মোটা তিনি বললেন, কথাটা ঠিক। সাধারণ মানুষ তো বটেই অনেক সাধু-সন্ন্যাসীরাও বোঝেন না।

মোটা ও কালো অথবা ফর্সা-রোগা প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কারওরই নাম জানার কোনও আগ্রহই ছিল না চারণের। সেকালের কুলীন জামাই-এর স্ত্রীসঙ্গ করারই মতন ওঁরাও ওই সৎসঙ্গে থাকবেন মাত্র একরাত। তারপরেই বিদায় হবেন। মিছিমিছি নাম জেনে লাভই বা কি ?

দু-তিন পাত্তর করে সিদ্ধি খাওয়ার পরে নানা উচ্চমানের আলোচনা শুরু হল। তবে আজ আর চারণের পেট খালি নেই। নবীন সন্ন্যাসীরা এবং তুরতি মিলে দারুণ একচড়া রেঁধেছিলেন দুপুরে। সুগন্ধি আতপ চাল, তার মধ্যে আলু, কাঁচালঙ্কা আর সঙ্গে খাঁটি গাওয়া ঘি। এমন ঘি বহুকাল পরে খেল ও। কতদিন আগে সেই হাজারিবাগে খেয়েছিল। চমনলাল বলত, তুড়ি মারো না দাদাবাবু, মারো, দেখবে, পারবে না। আঙুল পিছলে যাবে। সত্যিই আঙুল পিছলেই যেত। সেই ঘি-এ তৈরি হালুয়া বা খিচুড়ি খাওয়ার বেশ কয়েকদিন পর পর্যন্ত তর্জনী বুড়ো আঙুলের সঙ্গে অসহযোগিতা করত।

জিষ্ণু মহারাজের উল্লিখিত প্রসঙ্গে ফিরে এসে রোগা ও ফর্সা সন্ন্যাসী মুখ খুললেন। দুজনের মধ্যে ইনিই বয়োজ্যেষ্ঠ। সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুর মানুষ। ওর হিন্দিতে তামিল ভাষার প্রভাব পরিষ্কার বোঝা যায়। ইংরেজিতেও বোঝা যায়ই। মনে হল, ইংরেজিতে কথা বলতেই উনি হিন্দির চেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ। যদিও Not-কে "নাট", Good-কে "গুড্ডা" উচ্চারণ করেন। উনি বললেন, ধর্মনিরপেক্ষ দেশ পৃথিবীতে অনেকই আছে। যেমন ইউনাইটেড কিংডম, যেমন ইউনাইটেড স্টেটস, কানাডা। সে সব দেশে সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষই যার যার নিজের ধর্মাচরণ করতে পারে বিনা বাধায়। নির্দ্বিধায় করতে পারে, নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার নিজেদের চেষ্টাতে। রাষ্ট্র তাতে বাধা তো দেয়ই না বরং পারলে সাহায্যই করে।

তুরতি বললেন, বাধা দেওয়ার প্রশ্নটা আসছে কেন ? ভারতবর্ষতেও কি কেউ বাধা দেয় ? তবে এটাও তো দেখতে হবে যে, একের ধর্মাচরণ বা ধর্মের প্রতি আনুগত্যর আধিক্য যেন অন্যের পক্ষে পীড়াদায়ক না হয়ে ওঠে।

জিষ্ণু মহারাজ বললেন, আমাদের দেশের ব্যাপারটা আলাদা। কারণ, স্বাধীনতার প্রাক্কালে জিন্নাসাহেবরাই জিগির তুলেছিলেন "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান"-এর। তাঁদের দাবি মেনে নিয়ে ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষকে তাঁদের কুখ্যাত Divide and Rule Policy-র পরাকাষ্ঠা করে ধর্মের ভিত্তিতে কেটে দুভাগ করলেন—"ধর্ম" শব্দটা এই উপমহাদেশে এক নতুন অর্থ এবং প্রাধান্য পেল। ধর্ম যেন আর নিভৃতে পালন করার বৃত্তি রইল না। অন্তরের সম্পদ রইল না আর তা। বহির্জগতের হাটে-বাজারের লেনদেন বা বিনিময়ের বা ক্ষমতার যুদ্ধের হাতিয়ার হল। এই ধর্মভিত্তিক দেশভাগের কারণে লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ এবং অনিচ্ছুক হিন্দু ও মুসলমানকেও নিজের নিজের ভিটেমাটি ছাড়তে হল চরম অপমান ও অসম্মানের সঙ্গে। তাই চল্লিশের দশক থেকেই এই উপমহাদেশে "ধর্ম" শব্দটি ভীতির উদ্রেক করল মানুষের মনে।

চারণ বলল, আচ্ছা, এসব আলোচনা তো আমরা শহরে সবসময়েই করে থাকি। বিশেষ করে, কলকাতাতে। কিন্তু আপনারাও করেন ? রাজনীতি/দেশনীতি এইসব নিয়ে আলোচনা করলে আপনাদের মনের স্থিতি, ধ্যান, এসব বিঘ্নিত হয় না ? চিন্তা করেন কি করে আপনারা এসব জিনিসে মন কলুষিত হয়ে গেলে ?

মোটা ও কালো নবীন সন্ন্যাসী বললেন, দেশমাতাও কি মাতা নয় ? স্বদেশ, স্বভূমি না থাকলে আমরা কোথায় বসে ঈশ্বরচিন্তা করব ? আপনি বাঙালি হয়েও, বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" পড়েও কি করে এ কথা বলছেন ? আমরা তো ক্ষমতা চাই না। কখনওই চাইব না ইরানের খোমেইনির মতন, রাশিয়ার রাসপ্যুটিনের বা আধুনিক লেনিন-স্তালিনের মতন, চায়নার মাও জেডং-এর মতনও।

আমাদের প্রতিক্রিয়ার শুধুমাত্র সাধারণের নৈতিক, ধার্মিক এবং পারমার্থিক বিষয়েই সীমিত। এসবই ব্যক্তিগত প্রেক্ষিতের ব্যাপার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরাও ভারতবাসী নই, এই দেশ আমাদের স্বদেশ নয়, এর ভাল-মন্দ নিয়ে আমাদের কোনওই মাথা ব্যথা নেই। এই দেশকে আমাদের চোখের সামনে বরবাদ করার অধিকার কারওই নেই। সে অধিকারকে মেনে নেওয়া কাপুরুষতারই নামান্তর, বীর্যহীনতার নামান্তর।

হচ্ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির প্রকৃত ব্যাখ্যা নিয়ে কথা। তাই না ? আমরা কি তা থেকে অনেক দূরে সরে আসিনি ?

জিষ্ণু মহারাজ বললেন।

—অনেক না হলেও, কিছুটা হয়তো এসেছি।

তামিল সন্ন্যাসী বললেন, সেকুলারিজম-এর ব্যাখ্যা সম্ভবত ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের চেয়ে ভাল আর কেউই দেননি। একে তো উনি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রগাঢ় পণ্ডিত দার্শনিক, দ্বিতীয়ত উনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি এবং যদি আপনারা কেউ কিছু মনে না করেন তো বলব, সবচেয়ে পণ্ডিত রাষ্ট্রপতি এবং সজ্জনও বটেন।

জিষ্ণু মহারাজ বললেন, যা সর্বতোভাবে সত্যি, সেই কথাতে মনে করার তো কারওই কিছু থাকার নেই।

তাহলে বলি, ড. আবিদ হুসেন-এর একটি বই এর সমালোচনা করতে বসে উনি লিখেছিলেন :

"It may appear somewhat strange that the government should be a secular one while our culture is rooted in spiritual values. Secularism here does not mean irreligion or atheism or even stress on material comforts. It claims that it lays stress on the unversatility of spiritual values which may be attainted by a variety of ways.

There is a difference between contact with reality and opinion about it. Between mystery of God and belief of God. This is the meaning of secular conception of the state though it is not generally understood."

তারপরে আরেকবার উনিশ-শ বাহাত্তরের ডিসেম্বরে মুসলমানদের শিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে উনিই বলেছিলেন, "The ideal of secularism means that we abandon the inhumanity of fanaticism and give up the futile hatred of others."

তার মানে এই যে, ভারতবর্ষে ধর্মান্ধতা, কোনও ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্ধতাই, কোনওক্রমেই বরদাস্ত করার নয়। সে ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগুরুই হন, বা সংখ্যালঘু। পাকিস্তান তো ইসলামিক রাষ্ট্র। ভারত তো তা নয়। ভারত হিন্দু রাষ্ট্রও নয়। তার নিজস্ব ইচ্ছাতেই নয়। ইচ্ছা করলেই যদিও হতে পারত। ভারত ঔদার্যর চরম করে অন্যসব ধর্মাবলম্বীদেরও সমান মর্যাদা, সমান সুযোগ দিয়েছে। আমি তো এও বলব যে, রাজনীতিকেরা, যা সংবিধানে দেয় ছিল না, তাও তাঁদের দিয়েছেন। —এখন সংখ্যালঘুদের ভয়ে কেন্দ্র এবং অধিকাংশ রাজ্য সরকারই সদাই কম্পমান। কারণ সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যা যে ক্রমশই বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভোটও তো বাড়ছে। সংখ্যালঘুদের প্রত্যেকেই যে নিরপেক্ষ, অন্ধ নন, মৌলবাদী নন, তার স্পষ্ট এবং অবিসংবাদী প্রমাণ এবারে সংখ্যালঘুদেরও দেবার সময় এসেছে।

—মুশকিল হল এই যে, সংখ্যালঘুরা এখনও ভারতীয় Mainstream-এ এসে মেলেননি। তবে এ কথা অবশ্যই বাঙালি মুসলমানদের বেলাতে প্রযোজ্য নয়। বাঙালির নিজ স্বার্থেই, দুই বাংলার বাঙালির স্বার্থেই সাম্প্রদায়িকতাকে পুরোপুরি বর্জন করা উচিত। এমনিতেই বাঙালির অস্তিত্ব এখন সংকটের মুখে। ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে Parallel economy-এর মত রাজনীতিক ক্ষেত্রেও Parallel politics চলছে। মূল ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে অন্য ইচ্ছা, অন্য ধ্যান-ধারণা, অন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা শুধু রোপিতই হয়নি, দিনে দিনে তা ক্রমশই মহীরূহর আকার ধারণ করেছে যা ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক।

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানই উনিশ-শ তেপান্নর ডিসেম্বর মাসে মীরাট কলেজের হীরকজয়ন্তী উৎসবে বলেছিলেন, "When it is said that we are a secular state it does not mean that we have an indifference to tradition or treverence to religion." ধর্মনিরপেক্ষতা আর ধর্মহীনতা, ধর্মবিদ্বেষ বা ঈশ্বরে অবিশ্বাস কোনওদিনও সমার্থক ছিল না। পরম মূর্খরাই এমন ভাবতে পারেন।

মোটা ও কালো নবীন সন্ন্যাসী বললেন।

তুরতি বললেন, কে জানে! স্বাধীনতার পরেপরেই বারেবারে রাধাকৃষ্ণান সাহেবের "ধর্মনিরপেক্ষতা" শব্দটিকে ব্যাখ্যা করার এমন প্রবণতা দেখা গেছিল কেন? উনি হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে, "ধর্মনিরপেক্ষতা" শব্দটি নিয়ে পরে অনেক জল ঘোলা হবে, এর কদর্থ করা হবে। এবং অসৎ মানুষেরা সেই ঘোলা জলে ছিপ ফেলবেন।

—হতে পারে।

তুরতি বললেন, শিক্ষিত হিন্দু এবং বিশেষ করে ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুদের অধিকাংশেরই কাছে ধর্মপালন ব্যাপারটা এখন খুবই লজ্জাকর হয়ে গেছে। বাঙালিদের মধ্যে তো গেছেই। "আমি ধর্ম মানি" বা "আমি ঈশ্বর মানি" এই কথা বলতে শিক্ষিতদের রীতিমতন লজ্জা পেতে দেখি। অথচ ঠিক তখনই অন্য অনেক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মর জিগির প্রবলতর হয়েছে।

চারণ বলল, উর্দু কবি সাহির লুধিয়ানবীর একটি শের পড়েছিলাম

"ন তু হিন্দু বনে গা,
ন মুসলমান,
ইনসানকি অওলাদ হো,
তু ইনসানহি বনে গা"।

বাঃ।

বলে উঠলেন সকলে।

জিষ্ণু মহারাজ বললেন, এই তো কবির মতন কথা। কবির জাত নেই। কোনওকালেই ছিল না।

"ন তু হিন্দু বনেগা, ন মুসলমান,
তু ইনসানকি আওলাদ হ্যায়,
তু ইনসানহি বনে গা।"

বাঃ! বাঃ। বাঃ।

দেখতে দেখতে এই চন্দ্রবদনীতেও প্রায় দশদিন হয়ে গেল। সময় ভারী হালকা হয়ে গেছে। ফুলের গন্ধের মতন, পাখির ডাকের মতন।

সেদিন খুব ভোরে উঠেছিল চারণ। প্রত্যেকটি ভোরই, যে কোনও জায়গার ভোরই, অনেক কিছু বয়ে আনে। রাতে যা কিছুই অদৃশ্য বা অস্পষ্ট থাকে তাই নতুন করে প্রভাতী আলোতে দৃশ্যমান হয়। মানুষের মস্তিষ্কও যেন রাতে অন্যরকম হয়ে যায়। নানা আজগুবি ভাবনা জাগে। অসংলগ্ন হয়ে পড়ে, ভয়ার্ত, কামার্ত, উদ্বিগ্ন। একটু উষ্ণতার কাঙাল। কেন যে এমন হয়, কে জানে।

ঝকঝক করছে শীত-সকালের রোদ। তখনও গাছগাছালি, পর্বত, নুড়ি পাথর সব শিশির-ভেজা। শিশিরে ভেজা পাখিদের পালক, ফুলের পাপড়ি। ঘাসফুল। তারই মধ্যে ধীরে

ধীরে পথ বেয়ে কিছুটা হেঁটে গিয়ে তুরতির সেই চায়ের দোকানে পৌঁছল চারণ।

তুরতি আজ এখনও ঘুমোচ্ছেন। গত রাতে এক "কেলো" করেছিলেন তিনি। জিষ্ণু মহারাজের প্রস্তরাশ্রয় থেকে চারণের সঙ্গে বেরিয়ে একটু খোলা জায়গাতে দাঁড়িয়ে চাঁদিতে হিম লাগিয়ে, গঞ্জিকা এবং সিদ্ধির যুগপৎ 'সিদ্ধি' থেকে একটু আলগা হবেন এমনই অভিপ্রায়ে। কিন্তু সিঁড়ি নেমে কিছুটা গিয়েই চাতালের ওপরে দুম করে গাছের ডালে-বসা গুলি-লাগা পাখিরই মতন পড়ে গেছিলেন।

কী হল ? কী হল ? বলতেই, তিনি অস্ফুটে বললেন, হাওয়া মেলেনি।

কী ?

চারণ বলেছিল অবাক হয়ে।

চার হাতে-পায়ে ভর দিয়ে তুরতি উঠে বসেই বলেছিলেন, কোনওদিন গাড়ির এঞ্জিন টিউনিং করেছেন ?

নিজে হাতে ? না।

চারণ বলেছিল।

আমি করেছি। একসময়ে গাড়ির বড় সখ ছিল আমার। নিজে হাতে সব গাড়ির এঞ্জিনই টিউনিং করতাম।

এত গাড়িই যদি ছিল তবে ক্ষেমি বাঈজির বাড়ি বেহালা বাজাতেন কেন ?

বেহালা নয়। বেহালা নয়। জিষ্ণু মহারাজ ব্যায়লা বললে কি হবে ? আসলে সারেঙ্গি। বাঈজিরা কি ব্যায়লার সঙ্গে গান করেন নাকি ? তাঁরা করেন গান সারেঙ্গিরই সঙ্গে। সব বাঈজিই।

ঠিক। চারণ বলল।

হচ্ছিল তো গাড়ির এঞ্জিন টিউনিং-এর কথা।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। গাড়ির এঞ্জিনের টিউনিং কখনও নিজের হাতে করলে জানতেন যে, খপাখপ করে চোত-বোশেখের জল-শুকিয়ে-যাওয়া পুকুরে পোলো ফেলে মাগুর মাছ ধরার মতনই হাওয়াও ধরতে হয়। হাওয়ার সঙ্গে এঞ্জিনের কমবাস্সন মিলোতে পারলেই ধ্বজভঙ্গ কিন্তু কামাক্রান্ত আঁতেল পুরুষের ধ্বজার মতন এঞ্জিন ধ্বকধ্বক করতে থাকে। ফুস ফুস শব্দ করতে করতে হাওয়া লিক করে যায়।

ওই সাংঘাতিক উপমা শুনে চারণের বাকরোধ হবার উপক্রম হল।

কিন্তু তবু মুখে বলল, এ কথার মানে ঠিক বুঝলাম না।

দোষ আপনার নয় চারণবাবু। দোষ আমারই। আমিই বোঝাতে পারিনি। আসলে সিদ্ধি আর গাঁজার নেশাটা ঠিকমতন মেলাতে পারিনি। Combustion আর Fuel supply-এর মধ্যে সাযুজ্য ছিল না। তাই পড়ে গেলাম।

বাবাঃ। 'সাযুজ্য'-'টাযুজ্য' বলছেন দেখি। আপনি তো ইংরেজির মতন বাংলাটাও অত্যন্ত ভালই জানেন দেখছি।

না বলার কি আছে ? তবে বঙ্গভূমে যে যত বড় 'খসসর' তার ভাষাজ্ঞানও তত প্রখর। এই জন্যেই ওই জাতের কিস্সু হল না। বক্তব্যই যদি না থাকে কিছু, তবে শুধুমাত্র ভাষাজ্ঞান বা ব্যাকরণের জ্ঞান দিয়ে যে কিছুমাত্রই লাভ হয় না তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বাংলা সাহিত্য। তাই।... যা বললাম একটু আগে।

কি ?

চারণ শুধোল।

হাওয়া মেলেনি। মেলে না। আমার মতন মুখ্যুর গাঁজা আর সিদ্ধির নেশারই মতন হাওয়া মেলেনি বাঙালির।

এই মানুষটাও পাটনের মতন বা জিষ্ণু মহারাজেরই মতন গভীর রহস্যময়।

ভাবছিল, চারণ।

এই পুরো দেবভূমিই যেন এক গোলকধাঁধা। কত আকাট যে এখানে মহাপণ্ডিত সেজে বসে

অর্ধনগ্ন হয়ে আছে আর কত মহাপণ্ডিত যে মহামূর্খ সেজে, তা বোঝা ভারী মুশকিল। উপরের ছাই সরিয়ে দেখতে গেলেই কোথাও হীরে বেরোবে আর কোথাও কয়লা। সত্যিই এই দেবধাম এক গোলকধাঁধা।

এই তুরতি মানুষটি অকারণে এমন খারাপ খারাপ কথা, খারাপ ভাষা যে কেন ব্যবহার করেন, তা ভেবে পায় না চারণ। নিজেকে অকারণে এমন degrade করার মধ্যে কোন বাহাদুরী যে উনি দেখেন তা বোঝে না চারণ সত্যিই। এও হয়তো একটি ভেক। পাছে অন্যে তাঁকে বোঝার কাছাকাছি আসে তাই হয়তো তাঁর চারদিকে অকথ্য-ভাষার এই দেওয়াল তুলে রাখা। এত এবং এতরকম ভেক ভেদ করে এঁদের কারও প্রকৃত সত্তাকে বোঝার মতো কঠিন কর্ম আর বুঝি বেশি নেই।

চা খেয়ে, তুরতির জন্যেও চা এবং কটি মাটির কুলহার নিয়ে উঠে আসার সময়ে চারণের গত রাতে দেখা স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। এই স্বপ্নও গত তিরচারদিন ধরেই দেখছে। আশ্চর্য স্বপ্ন। অথচ এমনিতে কোনও স্বপ্নই ঘুম ভেঙে যাবার পরে স্পষ্ট মনে থাকে না। যা মনে থাকে, তা কিছু অসংলগ্ন কথা, অস্পষ্ট স্মৃতি। কিন্তু চন্দ্রবদনী যখন স্বপ্নে আসে, তখন চারণের সঙ্গে তার যা কথোপকথন হয় সে সব স্পষ্ট মনে থাকে চারণের। কিন্তু মনে থাকে, বেলা দশটা-এগারোটা অবধি। তারপরই ইচ্ছে করলেও আর মনে করতে পারে না।

স্বপ্নে চন্দ্রবদনী কোনওদিন আসে শাড়ি পরে। কোনওদিন সালোয়ার-কামিজ। কোনওদিন বা নাইটিতে, লেসের ফ্রিল-লাগানো। কোনওদিন তাদের দেখা হয় শান্তিনিকেতনের ঘণ্টা তলাতে, কোনওদিন রুদ্রপ্রয়াগে, কোনওদিন বা দেবপ্রয়াগে। গতরাতে দেখা হয়েছিল এক অচেনা জায়গাতে। চারণের অচেনা। হয়তো চন্দ্রবদনীর চেনা। একটি অতি নির্জন স্থানের তুষারাবৃত মন্দিরের সামনে। সেই জায়গাতে একটিও পর্ণমোচী গাছ নেই। সবই চিরহরিৎ। সাদা বরফের জটাজুট নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেইসব জলপাই-সবুজ গাছেরা। মৌনী সন্ন্যাসীদের মতন। কোন মন্দির তা কে জানে! তার বর্ণনা দিলে হয়তো জিষ্ণু মহারাজ বলতে পারবেন কোন তীর্থক্ষেত্র তা।

গতরাতের স্বপ্নে চারণের সঙ্গে চন্দ্রবদনী কথা বলতে বলতে কেবলই পেছন ফিরে দেখছিল আর হাত দিয়ে অদৃশ্য কাকে বা কাদের যেন ইসারা করছিল কিছু। হয়তো চুপ করতে বলছিল। অথবা হয়তো অনুরোধ করছিল একটু অপেক্ষা করতে। যদিও সেই অদৃশ্য এক বা একাধিক জনের গলার স্বর চারণ শুনতে পাচ্ছিল না। দেখতে তো পাচ্ছিল নাইই।

আগের দুরাতে হঠাৎই মুছে গেছিল সে। কিন্তু গত রাতেই প্রথমবার চন্দ্রবদনী চারণের স্বপ্নে অতি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। ফিল্মের নায়ক-নায়িকারা যেমন ছবিতে Fade-out করে যায়। আর Fade out করে যেতেই, যেখানে চন্দ্রবদনী দাঁড়িয়েছিল সেখানে পার্বত্য, ঝোড়ো শীতার্ত হাওয়া এসে বরফ কুচি নিয়ে খেলা করতে লাগল। যেমন করে সমতলের পর্ণমোচী বনে বসন্তের বা গ্রীষ্মের হাওয়া এসে ঝরাপাতা নিয়ে খেলা করে।

গত রাতে চন্দ্রবদনী অমন করে ফেড-আউট করে যাওয়াতে এবং তার আগে হাত তুলে অদৃশ্য সঙ্গী বা সঙ্গীদের কিছু বলাতে চারণের মনে বড়ই দুশ্চিন্তা হয়েছে। কারণ, ওর এক বাল্যবন্ধু বাচ্চু যখন মারা যায় তখন ঠিক অমনি করে খোলা জানালার দিকে চাইছিল। ঘরে, ঘর ভর্তি মানুষ ছিলেন, বাচ্চুর দাদারা, বৌদিরা, অবিবাহিত ওর বন্ধু-বান্ধবেরা। খোলা জানালাতে চারণেরা কারওকেই দেখতে পায়নি কিন্তু বারেবারেই ও বলছিল হাত তুলে, যাচ্ছি। যাচ্ছি। একটু দাঁড়াও ভাই, একটু দাঁড়াও।

এই দৃশ্যর কথা এর আগেও চারণের মনে এসেছে ফিরে ফিরে। হয়তো ওর নিজের মৃত্যু পর্যন্ত সেই দৃশ্যর কথা থাকবে ওর মনে।

বাচ্চুর ক্যানসার হয়েছিল। কেমোথেরাপি চলেছিল অনেকদিন। এক ডাক্তারের চেম্বার থেকে অন্য ডাক্তারের চেম্বারে পিং-পং বল-এরই মতন যাওয়া আসা করেছিলেন ওঁর আত্মীয়েরা পরম ধৈর্য সহকারে। কেমোথেরাপি করার জন্যে বীভৎস চেহারা হয়ে গেছিল বাচ্চুর। মাথাভর্তি কালো চুলের

একটি চুলও অবশিষ্ট ছিল না। শীর্ণ, ক্লিষ্ট, একটি করুণ মলিন কাঠামোর মধ্যে এককালীন পরম রূপবান সুপুরুষ যেন নির্বাসিত হয়েছিল। বড় বড় অ্যালোপ্যাথিক ক্যানসার-স্পেশালিস্ট 'না' করে দেওয়ার পরে ওর দাদারা হেকিম, বদ্যি, ওঝা, তারপর অমুক বাবা, তমুক মায়ের দোরে দোরে ঘুরেছিলেন অসহায়ের অপার উচ্চাশা নিয়ে। অর্থব্যয় হয়েছিল জলের মতন। আংটি, তাবিজ, মাদুলি কিছুরই কমতি ছিল না। ডাক্তারে আর ঈশ্বরে বিশ্বাসের ভাঁড়ার ক্রমাগত শূন্য থেকে শূন্যতর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাচ্চুকে ফেরানো যায়নি।

শহুরে ওঁদের সকলকে কাছ থেকে দেখে চারণের তখন মনে হয়েছিল যে, মানুষের ঈশ্বর বিশ্বাসটা শুধুই পাওয়া-নির্ভর। যে-বাবা যে-মা প্রার্থিত বস্তু, তা চাকরির উন্নতিই হোক, কী শত্রুর বিনাশই হোক, কী রোগের নিরাময়, তা পাইয়ে না দিতে পারেন তাঁরই কোনও প্রয়োজন নেই। 'বেকার' দেবতা তিনি। এই দেবধামে এসেই প্রথম একদল গৃহত্যাগী মানুষদের দেখল চারণ, যারা ঈশ্বরকে নিজেদের আনন্দর জন্যেই ভজনা করেন। তাদের কাছ থেকে কিছু চাইবার জন্য নয়।

বাচ্চুর চলে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে যারা জানালার পাশে ভিড় করেছিল তারা কারা ? যমদূত কি ? যমরাজ বলে কি সত্যিই কেউ আছেন ? তিনি কি সত্যিই দূত পাঠান মানুষকে নিয়ে যাবার আগে ? হিন্দু ও মুসলমানদের এত বিভিন্নরকম স্বর্গ ও নরকও কি সত্যিই আছে ? মানুষ মরে যাবার পরে কি সত্যিই তার আত্মার বিনাশ হয় না ?

এই সব জানতেই তো এসেছিল চারণ এখানে। কিন্তু জানা তো হল না। জানার আভাস মাত্র পেয়েছে। তাতে সম্ভবত তার অজ্ঞানবস্থা আরও 'ঘোরা' হয়েছে।

চন্দ্রবদনী যে কেন অমন Fade-out করে গেল সেদিন এবং কে বা কাদের যে সে দাঁড়াতে বলছিল, অপেক্ষা করতে বলছিল, তা বুঝতে না-পেরেই চারণের দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। মনে এইসব ভাবনা ভিড় করছে এসে। তাই সকালে ঘুম ভাঙার পরমুহূর্ত থেকেই ওর মন বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে আছে। সোনা রোদে ঝলমল করে-ওঠা এই সকালও তার বিষণ্ণতা একটুও কাটাতে পারেনি।

চারধারে কী অনাবিল, অপার্থিব নিস্তব্ধতা। এই নিস্তব্ধতা এক গভীর সমর্পণ-তন্ময়তা জন্মিয়ে দেয় বুকের মধ্যে। মন প্রাণ কাকে সমর্পণ করবে সেটা অবান্তর কিন্তু নিজেকে, নিজের শরীর-মনকে, নিবেদিত, সমর্পিত করার মধ্যেই যে এক গভীর গহন সুখানুভূতি, তার স্বাদের রকমটা সমর্পণ না-করেও যেন বুঝতে পারছে ও। এই জন্যেই হয়তো যুগ-যুগান্ত থেকে উচ্চকোটির মানুষেরা-মহৎ প্রাণেরা এমন নির্জনতার কোরকের মধ্যে এসে বাস করতে ভালবাসেন।

জিষ্ণু মহারাজ একদিন 'চাপরাশ' এর কথা বলেছিলেন। মনে আছে, চারণের। উনি হয়তো ঠিকই বলেছিলেন। একজন চাপরাশিই শুধু জানে চাপরাশ বইবার আনন্দ। সেই চাপরাশ ঈশ্বরেরই হোক, কী কোনও নারীর। অথবা কোনও গভীর বিশ্বাসের।

নেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ থাকে সে আনন্দ সস্তা আনন্দ। দেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ, সবকিছু থেকেও তা ছেড়ে দেওয়ার, ছেড়ে আসার যে কী আনন্দ, তা এই দেবভূমিতে এসে ভীমগিরি মহারাজ, ধিয়ানগিরি মহারাজ, দেবপ্রয়াগের মহারাজেরা এবং সবশেষে এই জিষ্ণু মহারাজ এবং তুরতির মতো অনেককে দেখেই বুঝেছে চারণ। বুঝে, নিজের এবং শহুরে নিজেদের নিজস্বার্থমগ্ন অশেষ সংকীর্ণতা এবং কূপমণ্ডুকতাকে ঘৃণা করতেও শিখেছে।

প্রস্তরাশ্রয়ে পৌঁছেই দেখল চারণ যে, ঘুম ভেঙে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে তুরতি পদ্মাসনে ধ্যানে বসেছেন। তাঁর ধ্যানভঙ্গ না করে তাঁর সামনে জোড়াসনে বসল চারণ।

কলকাতাতে আসন করে বসতেই পারত না পাঁচ মিনিটের বেশি। অথচ এই ক-মাসে সে এখন দিব্যি ঘণ্টার পর ঘণ্টা জোড়াসনে বসে থাকতে পারে।

চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ভেবে কাল রাতের ধুনির ধিকি-ধিকি আগুনের ওপরে কমণ্ডুলুটা বসিয়ে রাখল।

একটু পরেই চোখ খুললেন তুরতি।

শরীর ভাল তো ? কাল রাতে কোথাও লাগে-টাগে নি তো ? পাথরের ওপরে পড়ে যাওয়াতে ?

চারণ শুধোল।

শরীরের কথা শরীরই জানে।

ভীমগিরি মহারাজের মুখে শোনা সেই মারাঠী সন্ত তুকারামের গল্প মনে পড়ে গেল চারণের। তুরতিও সন্তই। তুরতি মহারাজ। মাত্রার ভেদ আছে শুধু সন্ত তুকারামের সঙ্গে।

চারণ ভেবেছিল ওর স্বপ্নের কথাটা জিষ্ণু মহারাজকেই বলবে। কারণ, মানবী চন্দ্রবদনীর কথা উনি জানেন। কিন্তু ওঁকে দেখতে পেল না। গত রাতে তো উনি বেশ ভাল ঘুমিয়েছিলেন প্রস্তরাশ্রয়েরই মধ্যে। তাই পাথরের চাতালে গিয়ে সকালে শুয়ে থাকার প্রয়োজন ছিল না কোনও। ওঁর কথা তুরতিকে জিগ্যেস করতেই তুরতি বললেন, উনি তো চলে গেলেন।

কোথায় ?

তা বলে যাননি। তবে উত্তরে গেছেন।

কখন ?

এই তো একটু আগে।

কোন পথ দিয়ে গেলেন ? আমি তো চায়ের দোকানে চা খেয়ে আপনার জন্যে চা নিয়ে উঠে আসছি। কই ? ওঁকে তো দেখলাম না।

হাঃ।

হাসলেন তুরতি।

তারপর বললেন, ওঁর পথ আর আমাদের পথ কি এক নাকি ? তাহলে তো আমিও জিষ্ণু মহারাজ হয়ে যেতাম। উনি কোথা দিয়ে কোথায় যান, কী করতে যান, আবার কোন পথে ফিরে আসেন কখন তা কি আমি জানি ? আপনিও যেমন জানেন না, আমিও জানি না।

কি হেঁয়ালি করছেন আপনি ?

হেঁয়ালি করছি না। বিশ্বাস করা-না-করা আপনারই ইচ্ছা। উনি যেখানে যাবার মন করেন সেখানেই চলে যান।

এসব বুজরুকি।

কে জানে ! শুধু বুজরুকরাই বুজরুকির কথা জানে। আমি বুজরুক নই, অবিশ্বাসীও নই। আমি বিশ্বাসী, তাই বিশ্বাস করি। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

বলেই বললেন, দিন, চা খাই।

তুরতি মহারাজের দিকে চায়ের কমণ্ডুলু আর মাটির কুলহার এগিয়ে দিতে দিতে চারণ বলল, আপনি ঈশ্বরে একশভাগ বিশ্বাস করেন। তাই না ?

হাসতে হাসতে তুরতি বললেন, না।

তার মানে ? ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তো কি জিষ্ণু মহারাজে বিশ্বাস করেন ?

গুরু তো ঈশ্বরেরই অবতার, আধার। তবে 'না' বললাম এই জন্যে যে আমি ঈশ্বরে একশভাগ বিশ্বাস করি না, দুশো ভাগ করি। ঈশ্বর সবসময়ে আমার হাতে হাত রেখে চলেন। ওঁর হাতের পাতার উষ্ণতা আমি অনুভব করতে পারি।

সত্যি ?

অবাক এবং অবিশ্বাসী গলাতে বলল চারণ।

সত্যি।

কেমন সে পরশ ?

প্রেমিকার হাতের পাতার মতন। উষ্ণ, নরম, সামান্য কুয়াশার মতন কামজনিত ঘামে ভেজা।

ঈশ্বরের পরশেও কাম ?

থাকে বইকি। কামের কত্ত রকম হয়। কামই তো মানুষের, সব প্রাণীর জীবনের Driving force। সৃষ্টির উন্মেষকারী। সৃষ্টি রক্ষাকারী আদিমতম অনুভূতি। কাম মাত্রই খারাপ হতে যাবে

কেন ?

তাই ?

তাই তো।

হঠাৎই তুরতি বললেন, কি ভাবছেন ?

নাঃ।

তবে হঠাৎ চুপ করে গেলেন যে।

আপনারা দিনের পর দিন মাসের পর মাস চুপ করে থাকেন। চুপ করেই থাকবেন সারাটা শীতকাল। বাচাল আমি একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেই কি দোষ ?

হুঁ।

তারপরেই তুরতি বললেন, আপনি ওয়াল্ট হুইটম্যান পড়েছেন ?

চারণ চমকে উঠে বলল, আপনি হুইটম্যানও পড়েছেন নাকি ?

তুরতি হেসে উঠলেন জোরে।

বললেন, আমাকে আপনি কি ভাবেন বলুন তো ?

আমি ক্ষেমি বাঈজির ব্যায়লা বাদক বলে কি হুইটম্যানে আমার অধিকার থাকতে পারে না ?

একটু চুপ করে থেকে তুরতি বললেন, বুঝলেন মশাই, জীবিকাটা জীবনের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। জীবিকা দিয়ে মানুষকে চিহ্নিত করা, বিভাজন করাটা জঘন্য অপরাধ। এই অপরাধেই হিন্দুধর্মাবলম্বী বহু মানুষ অন্য ধর্মাবলম্বী হয়ে গেছে। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড় দোষই এই। তা বলে, আপনার মতন উচ্চশিক্ষিত মানুষও এখন অশিক্ষিতর মতন কথা বলবেন এটা প্রত্যাশার ছিল না।

হুইটম্যান-এর কথা শুধোলেন কেন ? হঠাৎ ?

আপনার কথার প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল, তাই। হঠাৎ বলে কোনও শব্দ নেই প্রকৃতিতে। হঠাৎ ভাবলেই হঠাৎ। বলেই, সুললিত কণ্ঠে চমৎকার ইংরেজিতে আবৃত্তি করলেন তুরতি।

"I hear and behold God in every object. Yet understand God not in the least.
Nor do I understand who there can be more wonderful than myself.
Why should I wish to see God better than this day?"

বলেই, তুরতি সামনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল পাথরের চাতাল এবং চন্দ্রবদনীজির রৌদ্রস্নাত মন্দিরের দিকে তাকালেন।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,

"I see something of God each hour in the twenty-four and each moment then,
In the faces of men and women I see God and in my own face in the glass.
I find the letters from God dropt in the street, and eyeryone is sign'd in God's name.
And I leave them where they are, for I know that wherever I go.
Others will punctually come for ever and ever."

বাঃ।

চারণ বলল।

চমৎকার নয় ? হুইটম্যান, হুইটম্যান। রাশ্যার টলস্টয়, আমাদের রবীন্দ্রনাথ আর উত্তর আমেরিকার হুইটম্যান। এঁদের কোনও বিকল্প নেই।

এত মনে রাখেন কি করে ?

মনে রাখার মতো হলে মনে থাকেই। আর মনে না-থাকার হলে চেষ্টা করলেও থাকে না।

পরক্ষণেই বললেন, জানেন মশাই এ জীবনে খুব বেশি পড়ার প্রয়োজন বোধহয় নেই। ভাল

কিছু বইপড়া এবং ভাল করে পড়াটা জরুরি। তাই যথেষ্ট। পেপারব্যাক বইয়ের Blurb পড়েই যাঁরা নিজেদের পণ্ডিত বলে জাহির করেন তেমন পণ্ডিতেই দেশ ছেয়ে গেছে।

চারণ বলল, রবীন্দ্রনাথও এই জন্যেই বলতেন, 'যাঁহারা সমস্তই পণ্ড করেন তাঁহারাই পণ্ডিত।'

হুইটম্যান থেকে একবার আবৃত্তি করতে শুরু করলে আর থামতে ইচ্ছা করে না। হুড়হুড় করে বানের জলের মতন মাথা থেকে সব বেরিয়ে আসে।

তুরতি বললেন।

আমি যে ঈশ্বরে টু হান্ড্রেড বিশ্বাস করি বলছিলাম না...

হ্যাঁ। বলছিলেনই তো।

সেই প্রসঙ্গে বলি, আপনি কি তলস্তয়ের "WHAT MEN LIVE BY' গল্পটি পড়েছেন ?

না।

চারণ বলল।

আমিও পড়িনি। আমার মা যখন চলে গেলেন তখন বাবার এক বন্ধু, যাঁর সঙ্গে আমার মায়ের একটি মাখো-মাখো সম্বন্ধ ছিল, এই বইটি বাবাকে পড়তে দেন।

নিজের মায়ের সম্বন্ধে এই রকম করে কথা বলা কি উচিত ?

চারণ বলল, কিন্ডারগার্টেন স্কুলের দিদিমণি শিশুদের যেমন করে বলেন, তেমন করে।

তুরতি বললেন, আপনি মশাই একটি রিয়্যাল বোকা—ড্যাশ।

ঠিক আছে। বলুন, যা বলছিলেন।

শুনুন তবে। তুরতি বললেন।

Zar-এর রাশ্যাতে এক প্রত্যন্ত প্রদেশের ছোট্ট গ্রামে একজন ভারী গরিব মুচি ছিল। সাইমন তার নাম।

তারপর ?

সাইমন আর তার স্ত্রী অতি কষ্টে সংসার চালায়। একটিই মাত্র ওভারকোট। ঝরনা থেকে জল আনতে যাবার সময়ে সাইমনের স্ত্রী সেই কোটটি পরে যায় আবার সাইমন যখন তাগাদাতে যায় বাকি পয়সা আদায় করতে, তখন সাইমনও সেই কোটটিই পরে যায় এ গ্রামে সে গ্রামে। এতই গরিব ছিল তারা।

একদিন ঘরে কিছুই নেই বলে সাইমনের স্ত্রী প্রায় জোর করেই সাইমনকে তাগাদাতে পাঠাল। অনেক রুবল পাওনা আছে। ধারে জুতো বানাবার সময়ে বানাবে আর টাকা দেওয়ার সময়ে মনে থাকে না মানুষের। যত রুবল পাওনা আদায় হবে তা থেকে কত রুবল-এর ময়দা কিনবে, কতর সবজি, এবং আরও কি কি সে সবেরই ফর্দ করে দিল সাইমনের বউ। বাড়িতে ময়দা নেইই বলতে গেলে। যাওয়ার সময়ে বউ বলে দিল 'বেলা বেলি বাড়ি ফিরে আসবে।'

সকাল সকাল বেরিয়ে তো পড়ল সাইমন।

তারপর ?

তারপরে যা হয়। টাকা প্রাপ্য থাকলে কী হয়, পুরোটা আর কে দেয় একসঙ্গে ? যে যত টাকার মালিক সেই তত বেশি ঘোরায়।

সারাদিন ঘুরে-ঘুরে যা প্রাপ্য তার অতি সামান্যই আদায় করতে পারল সে। মনের দুঃখে তাই শুঁড়িখানাতে গিয়ে ভদকা খেয়ে মাতাল হয়ে গেল। সব দেশের গরীবদেরই একই হাল। এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে, বরফ পড়তে শুরু করেছে। ওভারকোটের কলারটা দিয়ে ঘাড় ঢেকে সেটা কান অবধি তুলে দিয়ে সাইমন টলতে টলতে তার গ্রামের দিকে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। সামনে মৃত্যু শীতল ঘোর রাত্রি।

তারপর ?

চারণ বলল।

সাইমন দেখল সামনেই পথে একটি বাঁক। সেই বাঁক ঘুরেই অবাক হয়ে গেল সে। দেখল যে

পথের ওপরে এক সুন্দর যুবক সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে ওই আসন্ন সন্ধ্যাতে, তুষারপাতের মধ্যে।

তাকে দেখেই তো সাইমনের বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। কে বা কারা কাকে খুন করে ফেলে রেখে গেছে কে জানে তা! ঝামেলাতে জড়িয়ে পড়তে হবে হয়তো তাকেই। সব দেশের পুলিশই তো সমান।

ওই ভেবে চলেই যাচ্ছিল সে। পরমুহূর্তেই ভাবল যে, মানুষটি যদি মৃত না হয়, তবে এই ভাবে তুষারপাতের মধ্যে নগ্নাবস্থাতে পড়ে থাকলে তো এমনিতেই মরে যাবে ঠাণ্ডাতে। তারপর ভাবল, দেখাই যাক, মরে গেছে কি বেঁচে আছে! কাছে গিয়ে নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখল উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ছে এবং আশ্চর্য মানুষটির শরীর তখনও গরমই আছে। তার মানে, সে অতি স্বল্পক্ষণ হয় এখানে এসেছে বা কেউ তাকে ফেলে গেছে। তার শরীরে কোনও ক্ষত চিহ্নও নেই। কোথাওই নেই। আশ্চর্য ব্যাপার!

সাইমন আবারও চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল কিন্তু ওর বিবেক বলল, ও যদি মানুষটাকে পথে ফেলে যায় তবে তো সে ঠাণ্ডাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে যাবে। অথচ সে খালি হাতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরছে। বাড়িতে নিজেদের খাবার মতনও কিছু নেই। তার উপরে বাড়তি বোঝা এই উলঙ্গ অপরিচিতকে নিয়ে বাড়ি ঢুকলে তার স্ত্রী তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে। কিন্তু সব ভেবেও সাইমন মানুষটিকে ফেলে রেখে যেতে পারল না। তাকে হাত ধরে টেনে তুলল। তুলতেই লোকটি সাইমন-এর মুখে চেয়ে এক অদ্ভুত হাসি হাসল।

তারপর?

তার দুচোখে ঘোলা দৃষ্টি। যেন কিসের ঘোর কাটেনি তখনও। কোথা থেকে এসেছে জানে না সে, কোথায় যাবে জানে না।

সাইমন নিজের ওভারকোটটা তার গায়ে পরিয়ে দিল। নিজের গায়ে তাও তো একটি শতচ্ছিন্ন কোট ছিল। তারপর লোকটির হাত ধরে গ্রামের দিকে এগোল।

তোমার নাম কি?

মানুষটি চুপ করে রইল।

তোমার বাড়ি কোথায়?

তবুও সে নিরুত্তর।

তুমি কি কর? তোমার পেশা কি?

তাও কোনও জবাব নেই।

লোকটা বোবা না কি!

ভাবল, সাইমন।

ভারী বিপদেই পড়ল যা হোক।

বাড়িতে আসতেই বাইরের তুষার ঝড় যেন বাড়ির মধ্যেই ঢুকে পড়ল। অত গঞ্জনা-লাঞ্ছনা সত্ত্বেও লোকটি কিন্তু বসার আর খাবার ঘরের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে মাটিতে বসে রইল লজ্জায় ও অপমানে দুহাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে।

বাড়িতে ময়দা যতটুকু ছিল, না থাকারই মতন, তা দিয়ে রুটি আর বাঁধাকপি দিয়ে একটি স্যুপ মতন বানিয়ে, খাবার টেবল-এ লাগিয়ে যখন সাইমনের স্ত্রী তার স্বামী ও ছেলেমেয়েদের খেতে ডাকল তখন সেই আগন্তুককেও কিন্তু ডাকল।

সেই প্রথমবার লোকটি দুহাঁটুর মধ্যে থেকে মাথাটি তুলে সাইমনের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একবার হাসল। তারপর খেতে এল।

পরদিন, সাইমন কোনও কাজই না-জানা সেই লোকটিকে জুতো সেলাই করতে শিখিয়ে দিল এবং আশ্চর্য হয়ে দেখল যে একবার দেখাতেই সে পাকা মুচির মতো জুতো সেলাই করে ফেলল। তখন সাইমন ভাবল এই লোকটি ঈশ্বর প্রেরিত। ও বাড়িতে থেকে জুতো সেলাই করবে আর সাইমন ঘুরে ঘুরে কাজ জোগাড় করে আনবে এবং টাকা আদায় করবে। চমৎকার হবে।

দেখতে দেখতে সাইমনের অবস্থা ফিরে গেল। তার নামডাকও দেখতে দেখতে বহুগুণ বেড়ে গেল। মানুষটির হাতের কাজের গুণে। খুবই সচ্ছল অবস্থা এখন সাইমনের।

কিন্তু আশ্চর্য ! মানুষটি কোনও কথাই বলে না কারও সঙ্গে একটিও সারাদিনে। শুধু ঘাড় গুঁজে কাজ করে যায়। খাওয়ার সময়ে ডাকলে উঠে খেতে আসে দুবেলা আর খাওয়া হয়ে গেলেই আবারও কাজ করে। কাজের ঘরেই শুয়ে থাকে রাতে।

একদিন সকাল বেলা হঠাৎই অনেক ঘোড়ায় টানা এক ঝুমঝুমি-বাজানো গাড়িতে ZAR পরিবারের একজন রাজপুরুষ এলেন সাইমনের দোকানে। দুষ্প্রাপ্য একটি হরিণের চামড়া দিয়ে বলে গেলেন শিকারের একটি বুট তৈরি করতে।

এও বলে গেলেন যে "যদি বুটটি ঠিকমতন না হয় তবে আমার হাতের হান্টার পড়বে তোমার মুখে।"

বলে আবার ঝুমঝুমি বাজিয়ে তিনি চলে গেলেন।

যখন রাজপরিবারের, মানুষটি কথা বলছিলেন সাইমনের সঙ্গে তখনই সেই লোকটি একবার মুখ তুলে হাসল।

যেদিন সেই বুট ডেলিভারি দেবার কথা সেদিনই সকালে আতঙ্কিত চোখে সাইমন দেখল যে, সেই হরিণের চামড়াটিকে বুট-এর মাপে না কেটে চটির মাপে কেটে ফেলেছে লোকটি।

তারপর ? তারপর আর কি ? হায় ! হায় ! করে উঠল সাইমন। লোকটিকে গালমন্দ করতে লাগল। এখন কী বিপদ ঘনিয়ে আসবে কে জানে ! যখন তার বিপদের কথা আলোচনা করছে সাইমন এবং লোকটিকে তিরস্কার করছে এমন সময়ে বাইরে সেই বহু ঘোড়ায় টানা ঝুমঝুমি বাজাল গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। গাড়ি এসে থামল সাইমনের বাড়ির দোরগোড়াতে। গাড়ি থেকে সেই রাজপুরুষের ভ্যালে নেমে দৌড়ে এসে বলল, মাই মাস্টার ইজ ডেড। বুট লাগবে না। একটি চটি বানিয়ে দিতে হবে। কফিনে পরে শোবার জন্যে।

সাইমন বলল, তাই হবে। বিকেলে এসে নিয়ে যেও চটিজোড়া। তারপর আশ্চর্য চোখে চেয়ে রইল সেই লোকটির দিকে নির্বাকে। কিন্তু সেই মানুষটির মুখে তখনও কোনও কথা নেই। সে মুখ নিচু করে তার কাজ করে যাচ্ছিল মনোযোগ সহকারে।

এই অবধি বলে, থামলেন তুরতি।

চারণ বলল, তারপর ? এ সবের মানে কি ?

শুনুন বলছি। অত অধৈর্য হন কেন ?

আরও অনেকদিন চলে গেল। এখন সাইমন রীতিমতন কেউকেটা হয়ে উঠেছে। বড়লোক। দেমাকে তার স্ত্রীর পা পড়ে না মাটিতে।

এমনই সময়ে একদিন একজন অত্যন্ত ধনী মহিলা তাঁর ফুটফুটে দুটি ছোট সুবেশা মেয়েকে নিয়ে এলেন জুতোর মাপ দিতে সাইমনের দোকানে। দুটি মেয়ের মধ্যে একটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। সাইমনের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, ওর পায়ে কি হয়েছে ? মহিলা বললেন, ও জন্মাবার সময়ই একটি পা ভেঙে গেছিল। ওরা যমজ। ওর জন্মদাত্রী মা ওর পায়ের ওপরে গড়িয়ে গেছিলেন।

সে কী ! আপনি ওদের নিজের মা নন ?

না। তবে এখন নিজের মা-ই হয়ে গেছি। ওরাই আমার সব।

কীরকম ! কী ব্যাপার বলুন তো শুনি।

আমরা খুবই গরিব ছিলাম। আমাদের গ্রামে আমাদের চেয়েও গরিব এক কাঠুরে থাকত। প্রচণ্ড এক দুর্যোগের রাতে সেই কাঠুরে গাছ কাটতে গিয়ে তার নিজেরই কাটা গাছে চাপা পড়ে মারা গেল। আর সেই রাতেই তার আসন্নপ্রসবা স্ত্রী যমজ মেয়ে প্রসব করল। প্রসবকালে প্রসব বেদনাতে ছটফট করতে করতে সে একটি নব জাতিকার উপরে উঠে যাওয়াতে তার পাটি খোঁড়া হয়ে গেল। সেই যমজ কন্যা প্রসব করার পরই সেই কাঠুরের স্ত্রীও সেই রাতেই মারা গেল।

তারপর ?

মহিলা বলল।

তারপর আর কি ? মেয়েদুটি তো মারাই যেত কিন্তু আমার কদিন আগেই একটি কন্যা সন্তান জন্মেছিল, তাই আমার স্তনে দুধ ছিল। গ্রামের সবাই সালিশী করে সাব্যস্ত করল যে আমারই স্তন্যপান করিয়ে আমার মেয়ের সঙ্গে ওদের আমি বড় করে তুলতে পারি। এবং তাই করতে হবে। তাই হল। কিন্তু কিছুদিন বাদে আমার নিজের মেয়েটা মারা গেল। তখন এই মাতৃপিতৃহীন এরা দুজন আমার কন্যাসম হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে আমার স্বামী ব্যবসাতে খুব উন্নতি করেছেন। দেখতে দেখতে আমাদের অবস্থা ফিরল এবং পড়শির এই যমজ কন্যাও বড়লোকের মেয়েদেরই মতন স্বচ্ছলতার মধ্যে বড় হয়ে উঠতে লাগল। আজকে আমাদের যেমন কোনও অভাব নেই ঈশ্বরের দয়াতে এদেরও নেই। আমরা খুব খুশি। আমার মেয়েরাও খুব খুশি। অভাব কাকে বলে তা আমরা জানিই না।

ভদ্রমহিলা যখন এই গল্প বলছিলেন তখন সাইমন যাকে হাত ধরে নিয়ে এসেছিল একদিন, সেই লোকটি মুখ তুলে হাসল আর একবার।

এবারে সে হাসল ঐ ভদ্রমহিলার কথা শুনে।

ভদ্রমহিলা এবং তাঁর মেয়েরা জুতোর মাপ দিয়ে সাইমন-এর স্ত্রীর সঙ্গে গল্পগুজব করে চলে যেতেই সাইমন তাকে চেপে ধরল। বলল আজ তোমাকে বলতেই হবে তুমি কে ? কি তোমার পরিচয় ?

লোকটি এই প্রথম মাথা উঁচু করে তাকাল সাইমন-এর দিকে। তার মুখমণ্ডল এক আশ্চর্য হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। সে যখন কথা বলতে শুরু করল তখন মনে হল সে এই ইহজগতের কেউ নয়। দেবলোকেরই কেউ।

সে বলল, আজ বলব, সবই বলব, কারণ আমি আজ ফিরে যাব আমি যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানেই। আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে।

কি শিক্ষা ?

সাইমন এবং তার স্ত্রী সমস্বরে শুধোল।

সে আত্মস্থ হয়ে স্থির নিষ্কম্প গলাতে বলে চলল, আমি ছিলাম একজন যমদূত। ঈশ্বর আমাকে একদিন একটি আত্মা আনতে পৃথিবীতে পাঠালেন। সেদিন বড়ই দুর্যোগ পৃথিবীতে। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি ও বজ্র-বিদ্যুৎ। যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়েছে। একজন নারীর প্রাণ আনতে এসেছিলাম আমি। তার কাঠুরে স্বামীর আত্মা সেদিনই সকালে আমারই এক সহকর্মী নিয়ে যে এসেছে, তা আমি জানতাম। সেই দুর্যোগের মধ্যে উপস্থিত হয়ে আমি দেখলাম যে, সেই নারী সদ্য দুটি যমজ সন্তান প্রসব করেছে। ভগ্নপ্রায় কুটিরে সে একা। বললামই তো যে তার স্বামীর প্রাণ সেই সকালেই নিয়ে এসেছে আমারই এক সহকর্মী। আমি ভাবলাম, আমি যদি এখন সেই নারীর প্রাণটিও নিয়ে যাই তবে সদ্যোজাত শিশু দুটির কি হবে ? তাদের মৃত্যুও তো অনিবার্য। আমার মন বিদ্রোহ করে উঠল। ঠিক করলাম যে আমার দ্বারা অমন নিষ্ঠুর কাজ করা সম্ভব নয়। সব জেনে শুনেও সেই মায়ের প্রাণ আমি আনতে পারব না। তাই আমি স্বর্গে ফিরে গেলাম।

ঈশ্বর বললেন, এনেছ প্রাণ ?

আমি বললাম, না। পারিনি। ও প্রাণ আনলে সদ্যজাত শিশুদুটির কি হবে ?

ঈশ্বর বললেন, তুমি একটু বেশি বুঝেছ। তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি এখনও। বলেই উনি আমার ডানা দুটি কেটে দিলেন।

সাইমন বলল তারপর ?

তারপর সেই ডানাকাটা অবস্থাতে পৃথিবীতে যেখানে এসে পড়লাম আমি তখনই আপনি আমাকে দেখতে পান পথে। তখন তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেছিল। আপনি যদি সেই মুহূর্তে না আসতেন তবে আমিও তো নগ্নাবস্থাতে পথেই শীতে মরে থাকতাম মরা পাখিরই মতো। আমি ভেবেছিলাম, ঈশ্বর বোধহয় তাঁর কথা অমান্য করার জন্যে আমাকে মৃত্যুদণ্ডই দিলেন। কিন্তু আপনার নিজের

তেমন গরম পোশাক না থাকা সত্ত্বেও, আপনি অত্যন্তই গরিব তা সত্ত্বেও আপনি চলে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালেন।

আমাকে হাত ধরে টেনে তুললেন।

তখন আপনি হাসলেন কেন?

সাইমন সেই যমদূতকে প্রশ্ন করল।

হাসলাম, এ কথা বুঝে যে, ঈশ্বর মানুষকে অন্য মানুষের জন্যে সহমর্মিতা দিয়েছেন। সে হাসি আবিষ্কারের হাসি। ঈশ্বরের ক্রিয়াকাণ্ড বোঝার ক্ষমতা যে আমার নেই সে কথা হৃদয়ঙ্গম করা হাসি।

আমার স্ত্রী যখন তোমাকে খেতে ডাকলেন তখন তুমি দ্বিতীয়বার হেসেছিলে। কেন?

তখনও দারুণ অভাবী সংসারে ন্যায্য কারণেই অত্যন্ত বিরক্ত আপনার স্ত্রী সব অভাব ও বিরক্তি সত্ত্বেও আমাকে ডেকে খেতে বসিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে আবারও বুঝেছিলাম যে, সহমর্মিতা দিয়েছেন ঈশ্বর মানুষকে।

ZAR পরিবারের রাজপুরুষ যখন আমার সঙ্গে হাতের হান্টার নেড়ে নেড়ে কথা বলছিলেন তখন তুমি হেসেছিলে কেন?

সাইমন আবার জিজ্ঞেস করল।

হেসেছিলাম, কারণ, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে তার পেছনে আমার সহকর্মীরা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে নিয়ে যেতে এসেছে তারা। সে জানত না যে, ওই চামড়াতে বানানো শিকারের জুতো আর তার পায়ে উঠবে না। তার যা প্রয়োজন তা কফিনে শোওয়ার জন্যে একজোড়া চটি।

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সেই মানুষটি বলল, সেই মুহূর্তেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ঈশ্বর মানুষকে অনেক কিছুই দিয়েছেন কিন্তু জানতে দেননি পরমুহূর্তে কি ঘটবে। জানতে দেননি, তার মৃত্যু কোনক্ষণে এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষের সব জ্ঞানবুদ্ধিই এই ক্ষেত্রে বিফল। তাই সেই মূর্খ রাজপুরুষের ঔদ্ধত্য দেখে হেসেছিলাম। বুঝেছিলাম যে, ঈশ্বর কখন কি করেন, কেন করেন, সে সব শুধু তিনিই জানেন। আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল।

তারপর তুরতি বললেন, ওই সব কথা যখন সেই অনামা আগন্তুক সাইমনকে বলছিল তখন হঠাৎই তার ঘরের ছাদ সরে গেল। সাইমন, তার স্ত্রী এবং তার সন্তানেরা স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখল যে, সেই সরে-যাওয়া ছাদের গহ্বর দিয়ে সেই আগন্তুক ঊর্ধ্বলোকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চারণ বলল, এত গোঁজাখুরি গল্প বলে মনে হচ্ছে।

হয়।

হাসলেন তুরতি।

বললেন, গাঁজা তো খাই আমরা। সাহেবরাই তো আমাদের ভগবান। সাদা চামড়া যাদের, যারা "আর্য", "সভ্য", "শিক্ষিত" তাদের দেশের এক সত্যদ্রষ্টা ঋষিতুল্য মানুষ, আমাদের রবীন্দ্রনাথেরই মতন, তিনিও গাঁজাখুরি গল্প লিখবেন? ডসটয়েভস্কি, চেখভ, তুর্গেনিভ এমন কি মায়াকোভস্কি লিখলেও না হয় অবিশ্বাস করা যেত। তা বলে, টলস্টয়? না। গাঁজাখুরি নয়। ভুলে যাবেন না যিনি War and peace লিখেছিলেন তিনিই What men live by লিখেছিলেন। মানুষ কিসে বাঁচে, কি নিয়ে বাঁচে? তা বলতে চেয়েছিলেন। যে সব মহামূর্খ মানুষ মনে করে যে, তারাই তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ এর নিয়ন্তা, তাদের অঙ্গুলি হেলনেই এই পৃথিবী নিয়ন্ত্রিত হয়, তাদের জানা উচিত ঈশ্বরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা। তারা প্রকৃতার্থে কার দয়াতে, কার করুণাতে এখানে আসে এবং বাঁচে। ঈশ্বরবোধ ব্যাপারটা ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস নয়, কমপিউটারে ডাটা ফিড করলেই ঈশ্বরের চেহারা ফুটে ওঠে না। এটা বিশ্বাসের ব্যাপার। এই বিশ্বাস জানাতেও মানুষ হিসেবে উচ্চকোটীর হতে হয়। যারা তেলাপোকা বা ব্যাঙের জন্মের পরে মনুষ্যজন্ম পায় ঈশ্বরবোধ তাদের জন্যে নয়। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

চারণ বলল, টলস্টয়ের এই লেখার কথা, আশ্চর্য! শুনিনি কখনও।

অনেকেই শোনেননি।

নামটা যেন কি বললেন ?

What men live by

তুরতি বললেন।

তুরতির গল্প শুনতে শুনতে বেলা গড়িয়ে যেল। মন্দিরের ছায়া পড়েছে চাতালে। বেলা প্রায় দশটা-টশটা হবে।

জিষ্ণু মহারাজ নেই তাই আজ যেন তুরতির কোনও তাড়াও নেই। দু-একজন সাধু-সন্ন্যাসী আসছেন এদিকে। তীর্থযাত্রী এখন খুবই কম। ঘুরেঘুরে দেখছেন। প্রস্তরাশ্রয়ের পাশে দাঁড়ালে তুষারাবৃত একাধিক শৃঙ্গ দেখা যায়।

তুরতি বললেন, গ্রীষ্মকালে আমি ওই চাতালেই ধ্যানে বসি।

তাই ?

চারণ বলল।

তা ধ্যানে বসে কি ধ্যান করেন আপনি ?

সে কি বলা যায় ?

হেসে বললেন, তুরতি।

একজনের ভাবনা কি অন্যকে দেখানো যায় ? আপনি নিজে যদি ধ্যানে বসেন তবে নিজেই জানবেন। ধ্যান এর গোড়ার কথা হচ্ছে মনকে শান্ত, সমাহিত করা। এই যুগে মনকে শান্ত করাটাই সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। জানেন, আমার মনে হয়, এই আধুনিক যুগে কম্যুনিকেশনানের যতই উন্নতি ঘটেছে, মানুষের মনের শান্তি ততই বিঘ্নিত হয়েছে। মানুষ যা কিছুকেই আজ “উন্নতি” বলে জানছে একদিন তার সবকিছুকেই আত্মঘাতী অবনতি বলেই জানবে। কিন্তু ততদিনে খুবই দেরি হয়ে যাবে। তখন মানুষকে, মানে, এই প্রজাতিকেই আর বাঁচানো যাবে না।

আপনার কথার মানে বুঝলাম না।

বুঝলেন না ? তাহলে কী করে বোঝাই বলুন ?

কম্যুনিকেশন বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন ?

সব কিছুই। পথঘাট, ফোন, টেলেক্স, টেলিফ্যাক্স, ই-মেইল, সেলুলার ফোন, টিভি, ভিসি আর, টিভি-টেলিফোন, এরোপ্লেন। এবং মিডিয়া। কাল সকালের খবর কাগজ খুললে, যদি এখানে কাগজ পেতেন, তাহলে দেখতেন হয়তো কামাচকাটকাতে বিধ্বংসী আগুন লেগেছে। অথবা আফগানিস্তানের তালিবানরা বোরখার নীচে মেয়েদের গোড়ালি দেখা গেছে বলে তাদের বেধড়ক চাবকেছে, অথবা ভি পি সিং বা নরসিংহ রাও-এর গুহ্যপ্রদেশে কর্কট রোগ হয়েছে, অথবা নিমপাতা সেন নামের এক বাঙালি মেয়ে মিস জায়রে হয়েছে, অথবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কোনও খাতা নর্দমাতে পাওয়া গেছে, অথবা জ্যোতি বসু বা শারদ পাওয়ার বা লালুপ্রসাদ যাদব (যবতক সামোসামে আলু রহেগা, তবতক বিহার মে লাল্লু রহেগা) কোনও অনুষ্ঠানে ফিতে কাটছেন এবং তেড়ে বক্তৃতা করছেন।

তাতে কি হয়েছে ? এগুলো কি খবর নয় ?

না, তা নয়। খবর অবশ্যই। কিন্তু এইসবের কোনও একটা খবরেও কি আপনার নিজের সত্যিই কোনও প্রয়োজন ছিল ? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতার ওই হাল তো বহুদিন থেকেই অমনই। এই সব না জানলে, এই সব ছবি না দেখলে, আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং প্রকৃত জ্ঞানের কি কিছুমাত্রই ঘাটতি বা অবনতি ঘটত ? তবে এটা ঠিক যে, আপনার আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট মূল্যবান সময়ই নষ্ট হত। টেনশান বাড়ত। মনোসংযোগের ক্ষমতা কমত। এই ধরাধামে আপনি কোন কাজ নিয়ে এসেছেন, জীবনে আপনার ব্রত কিছু ছিল কি, আপনি দিনের পর দিন এই অকারণ Exsercise in futility-তে তাই ভুলে যেতেন। যদি কোনও বিশেষ কাজ নিয়ে নাও এসে থাকেন (সকলেরই যে তা আসতে হবে এখন ভাবনা পাগলেই ভাবে) তবেও আপনি ঠ্যাং-এর ওপরে ঠ্যাং

তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে কাকেদের ঝগড়া বা চড়াই পাখির আদর দেখার নিখরচার এবং অনাবিল আনন্দে বুঁদ হয়ে যেতে পারতেন। নিজের পছন্দর বই পড়তে পারতেন। প্রিয় গান শুনতে পারতেন। আপনি কোন প্রয়োজনে কষ্টার্জিত গ্যাঁটের কড়ি করচ করে দুনিয়ার এই আবর্জনাকে নিজের মাথায় ঢোকাবেন তা, বলতে পারেন ?

তা ঠিক।

চারণ বলে।

টিভির সামনে যাঁরা বসে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁদের হাতে যে অঢেল সময় এমনও তো নয়। করার মতো অনেক কিছুই তাঁদের আছে। অথচ তবু নিছকই অভ্যাসের বশেই যে সব আনন্দের তাঁরা কখনও শরিক হতে পারবেন না, যেসব শোকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন না, যে সব ভোগে বা ত্যাগে কোনওদিনও সামিল হতেও পারবেন না সেই সবেরই মধ্যে সেঁটে যাবেন তাঁরা। তাতে কোন উপকার হয় ? চোখ খারাপ হওয়া ছাড়া ? খবরের কাগজ আর টিভি না দেখে, বই পড়া ভাল। বই পড়লে, মনোসংযোগ কমে না, উলটে মনোসংযোগ বাড়ে। বই আপনি আপনার ইচ্ছেমতন রুচিমতন নির্বাচনও করে পড়তে পারেন। তা করে আপনার ইন্টারেস্টের কোনও বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান গভীরতর করতে পারেন। অন্যে যা গেলাবে তাই গিলতে হবে না আপনাকে।

তারপরে একটু থেমে বললেন, চারণবাবু, আচ্ছা, আপনি একটা কথা আমাকে বলুন তো ? এখন তো প্লেনের দৌলতে আট দশ ঘণ্টাতেই পশ্চিমী দেশে পৌঁছে যাচ্ছেন যে কেউই। কিন্তু বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মুখাগ্নি করতে কতজন ছেলে দেশে আসছে ? আপনার জানাশোনা আত্মীয়পরিজনেরা বা বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয়ই বিদেশে আছে। তাঁরা আসছেন কি ?

ঠিক বলতে পারব না।

আদৌ নয়। ফোন করে তাঁর সদ্য-বিধবা মাকে বলছেন, মা। গিয়ে আর কী করব ? পাঁচুকে বোলো, মুখে আগুন দিতে। আমার বড্ড কাজ।

মা জীবিত না থাকলে ভাইকে বলছেন : "ও সব 'ঘাস্টলি রিচুয়ালস'-এ বিশ্বাস করি না আমি। বাবা চলেই যখন গেছেন তখন গিয়ে আর কি করব ? সিলি সেন্টিমেন্টস যত্তসব। মানুষ জন্মালেই তো মরেই একদিন। আমার অ্যানুয়াল ভেকেশান বুক করা হয়ে গেছে। বারমুডাতে স্কুবা-ডাইভিং করতে যাব। আই অ্যাম ডাইং ফর আ হলিডে। পঞ্চাশ ডলার পাঠিয়ে দিচ্ছি। শ্রাদ্ধর খরচ হিসেবে।"

একটু থেমে তুরতি বললেন, তাহলেই দেখুন। কম্যুনিকেশানস-এর উন্নতির নিট ফল তো এই। মানুষ স্বার্থপর হয়েছে। চক্ষুলজ্জাহীন হয়েছে। আত্মমগ্ন। তার সার্বিক আত্মিক অবনতি হয়েছে। লোভী হয়েছে। টাকা চিনেছে। শুধুই টাকা। মা মৃত্যুশয্যায় থাকলে জেট প্লেন যদি ছেলেকে কাছেই আনতে না পারে, বাবার শ্রাদ্ধতেও যদি সেই ছেলে না আসতে পারে, তবে এই দ্রুতগামী যানবাহনের প্রয়োজন কি ছিল ? টাকা আরও টাকা রোজগার করার জন্যেই কি শুধু ? এক জায়গার থেকে আরেক জায়গার দূরত্ব নস্যাৎ যেমন করেছে শব্দর চেয়েও দ্রুতগামী যানবাহন, তেমনই নস্যাৎ করেছে মানুষের সঙ্গে মানুষের চিরন্তন সম্পর্ককে। প্রেম, দাম্পত্য, অপত্যকে। দ্রুত ছুটে চলেছে মানুষ। কিন্তু কোথায় যে চলেছে, তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথাই নেই। এই ছোটাছুটি মানুষকে মনুষ্যেতর জীবে পর্যবসিত করেছে। তবে কেন এই ছোটাছুটি ? আর্থিক সাচ্ছল্য আর আত্মিক দীনতারই জন্যে ? মনুষ্যত্বই যদি বিকৃত হয়ে যায় তবে কত দূরের পথ কত কম সময়ে অতিক্রম করা যায় তা দিয়ে মানুষের কি হবে ? সেলুলার ফোন দিয়ে কি হবে ?

চারণ একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি হয়তো একটু বাড়িয়ে বলছেন। তবে আপনার কথাটা যে পুরোপুরি মিথ্যা এখনও বলতে পারি না।

তুরতি আবারও বললেন কি না ? ভেবে দেখুন আপনি চারণবাবু, কোটি কোটি মাইল সড়ক পৃথিবীর সব জায়গার শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে কিনা। আমাদের এই জীবনে, এই পৃথিবীতে রহস্য বলে কিছু ছিল, আব্রু ছিল, কল্পনার অবকাশ ছিল, এখন আর নেই। মুজাফফরপুরের মানুষ এখন

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

লিচু খেতে পান না, বাংলাদেশের মানুষ ইলিশ মাছ খেতে পান না, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙার মানুষে কুমড়ো কিনতে পারেন না। এত দাম! বহরমপুরেও পাঁঠা নেই, মানুষের মধ্যে হয়তো কিছু আছে, কিন্তু অজগোষ্ঠীর মধ্যে নেই। মেদিনীপুরের সমুদ্রপোকুলে বাগদা চিংড়ি নেই। মালদাতে আম নেই। সুন্দরবনের বাদার মানুষ কাঁকড়া খেতে পায় না, সব রপ্তানি হয়ে যায় দেশে কী বিদেশে।

একটু থেমে তুরতি বললেন, রপ্তানি যে হয়, আমদানি কারা করে? যাদের অনেক টাকা আছে শুধুমাত্র তারাই। রপ্তানি কারা করে? পয়সাওয়ালা মানুষেরা। ফড়েরা, এক্সপোর্টাররা। আরও টাকার রোজগারের জন্যে। তাতে স্থানীয় জিনিস স্থানীয় মানুষেই পান না। কম্যুনিকেশনস-এর উন্নতির একমাত্র উদ্দেশ্য যদি হয় বড়লোকদের আরও বড়লোক করা, তাহলে আমার কিছুই বলার নেই। আমাদের দেশে, বিশেষ করে এই সব আধুনিক উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি, দেশের সাধারণ মানুষের অপকার ছাড়া উপকার করেনি কোনও। সিনেমা, টিভি-র জন্যে আর ভিডিও পার্লারের জন্যে দেশের মানুষের স্বভাব, চরিত্র, মানসিকতা সবই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে পুরোপুরি। যে-দেশের আমজনতা আজও রামায়ণ মহাভারত আর কোরাণের শিক্ষাতে শিক্ষিত সেই দেশে এই সব অন্যারোপিত "উন্নতি" এই দেশের সাধারণের আত্মিক, এবং পারমার্থিক সর্বনাশকে সুনিশ্চিত করেছে।...

আপনি খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। সাধুসন্তদের এমন উত্তেজনা মানায় না।

চারণ বলল, তুরতিকে।

সন্ত তো হতে পারিনি এখনও। হলে, উত্তেজিত হতাম না। কঠিন বাস্তবের এই সব কথাই তাহলে মহারাজেরই মতো হাসতে হাসতেই বলতে পারতাম।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমার জন্যে প্রার্থনা করুন চারণবাবু একদিন যেন "সন্ত" হয়ে উঠতে পারি। সন্ত যদি হয়ে উঠতে পারি আমার জীবদ্দশায়, তবে যে-দেশের মানুষেরা আমাদের এবং শুধু আমাদেরই নয়, সারা পৃথিবীরই এমন ক্ষতি করে যাচ্ছে, সর্বনাশ করে যাচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই, সেই আমেরিকানদের আমার পায়ের কাছে বসিয়ে শেখাতাম "বড়লোক" শব্দটার মানে। অর্থ, কোনওদিনই কোনও মানুষের মতন মানুষকে প্রকৃতার্থে "বড়লোক" করতে পারেনি। ডলার-সর্বস্ব ওরা, এ সব কথার অর্থ কী বুঝবে?

আজ যে বহু আমেরিকান এই দেবভূমির পাহাড়ে-কন্দরে ন্যাংটো ও আধন্যাংটো সাধু-সন্ন্যাসীদের পায়ের কাছে এসে বসেছেন তাতে আপনার খুব আনন্দ হয়, না?

না। হয় না। কারণ, যাঁরা আসেন তাঁরা সকলেই উচ্চমার্গের মানুষ। তাঁরা এমনিতেই আসতেন। এঁরা নয়, কবে নিম্নবর্ণের মানুষও আসবেন তাই ভাবি আমি।

আচ্ছা! বলুন তো জিষ্ণু মহারাজ আমাকে এমন করে ডেকে নিলেন কেন? আমি তো কেউই নই। কী উদ্দেশ্য ওঁর?

ভয় নেই আপনার। উনি ডেকেছেন বটে, তবে বেঁধে রাখার জন্যে ডাকেননি। উনি মানুষকে চেনেন বলেই ডেকেছেন।

আমাকেও কি আপনারই মতো চেলা বানাবেন? আপনি তো প্রগাঢ় পণ্ডিত। আমার কোন যোগ্যতা আছে? আমি তো আপনার পায়ের নখের যোগ্যও নই।

কার কী যোগ্যতা, তা সে নিজে কি কখনও জানে? তা ছাড়া কথায় বলে না? "গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা মিলে এক।" তবে এ কথা ঠিক যে, আমি মুখখিস্তানন্দ বাবা। আমার ধারে কাছে আপনি তো দূরস্থান, এই দেবভূমির আর কেউই আসতে পারবে না এই গুণপণাতে।

চারণ হাসল, তুরতির কথা শুনে।

তুরতি বললেন, আপনার ভোগ কি শেষ হয়েছে?

মানে?

মানে, কামনা-বাসনার নিরসন কি হয়েছে?

জানি না। বোধহয় নয়।

আমারও তাই মনে হয়।

কী করে মনে হল ?

বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু হয়। Its a matter of feeling.

আপনার ?

চারণ উলটে প্রশ্ন করল।

দুটি হাত দুদিকে প্রসারিত করে তুরতি বললেন, বিলকুল। ভোগের নিবৃত্তি না হলে এই অমৃতর স্বাদ তো পাওয়া যায় না। মনটা আর শরীরটা কেবলই পড়শির বেড়ালেরই মতন ছুঁক ছুঁক করে, কেবলই জানালার গরাদ গলে এসে মাছটা-দুধটা খেয়ে যেতে চায়।

আপনি কি গৃহী ছিলেন ?

চারণ শুধোল তুরতিকে।

গৃহে বাস করতাম ঠিকই। গৃহ না বলে তাকে প্রাসাদ বলাই ভাল। এসব পূর্বাশ্রমের কথা। আমি তো এখনও সন্ত হইনি, তাই বলছি। তবে গৃহী বলতে যদি সংসারী বোঝান তা হলে বলতে হয়, সংসার আমি করিনি। কখনওই নয়।

আশ্চর্য। সংসার করলেন না আর ভোগের নিবৃত্তি হল কি করে ?

চারণের এই কথাতে খুব জোরে হেসে উঠলেন তুরতি।

বললেন, সংসারীরা তো একই জায়ার সঙ্গে সংসার করে। যে সুদর্শন বুদ্ধিমান যুবকের পকেট-ভর্তি টাকা থাকে, শিক্ষাও থাকে, বংশমর্যাদা থাকে, তার জায়ার অভাব কি ?

মানে ?

আমার ভোগের নিবৃত্তি অবশ্যই হয়েছে। জনপদবধূরা যেমন করে পুরুষের কামের নিবৃত্তি ঘটাতে জানেন তেমন করে হয়তো কম জায়ারাই পারেন। এই সত্য যদিও খুবই দুঃখের।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, শরীরটা যে ওঁদের কাছে মন্দির। মনোমন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই, তা জানেন বলেই ওঁরা শরীরকেই মন্দির করে তুলে পরম শুচিতার সঙ্গে পুণ্যার্থীকে গ্রহণ করেন। অনেকই শিখেছি চারণবাবু ওঁদের কাছে। শুধু শরীরের ভালবাসাই যে পেয়েছি তাই নয়। মিথ্যে বলব না, মনের ভালবাসাও পেয়েছি। শ্রীকান্ত যেমন পেয়েছিলেন তাঁর রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে। ওঁরা যখন ভালবাসেন তখন...কী বলব কী করে বোঝাব জানি না, যেন, যেন, কুকুরীর মতন নিঃস্বার্থভাবে, আন্তরিকভাবে, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই ভালবাসেন। একজন কুকুরী মনিবকে ঠিক যে রকমের ভালবাসা বাসে তেমন ভালবাসা কি কোনও স্ত্রী কোনওদিনও কোনও স্বামীকে ভালবাসতে পারেন ?

চারণ, তুরতির এই অভাবনীয় এবং ধাক্কা-দেওয়া কথাতে অবাক হয়ে বলল, কী জানি। আমার তো স্ত্রী হয়নি। বলতে পারব না তাই।

বিবাহিতা স্ত্রী তো আমারও ছিল না তা বলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হতে পারে, তা না বোঝার কি আছে ? আমি তো আর এঁড়ে গরু নই।

তুরতি বললেন।

এই আরম্ভ হল বোধহয়।

মনে মনে ভয় পেয়ে গেল চারণ।

ও ভাবছিল, তুরতি বোধহয় সব জানেন না। একটি দাম্পত্যর মধ্যে যে কি থাকে তা দম্পতিরাই শুধু জানেন। বড় গূঢ় রহস্য। বাইরে থেকে জানা অত সহজ নয়। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

পরক্ষণেই তুরতি বললেন, আপনি বিবাহ তো করেননি, কিন্তু নারী-সংসর্গও কি করেননি কখনও ? Orgasm শব্দটার মানে জানেন কি ? বইপড়া বা শোনা বিদ্যা নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতায় ?

বলেই বললেন, মিথ্যে বলবেন না কিন্তু। আমাকে মিথ্যে বলবেন না।

জানি।

অবিবাহিতর নারী-সংসর্গ কি উপায়ে হয়েছিল ? পরকীয়া ? না জনপদবধূ ?

পরকীয়া।

এক ? না একাধিক ?

এক। সম্পর্ক একই মাত্র।

কতবার সঙ্গম করেছেন ?

বার কয়েক মাত্র। একই রমণীর সঙ্গে। বললামই তো।

লজ্জিত এবং বিব্রত চারণ মুখ নামিয়ে বলল।

তবে তো জানেনই Orgasm-এর মানে। নিঃশেষে জরায়ুতে বীর্যপাতের পরে যেমন ভারশূন্য মনে হয় পুরুষের নিজেকে, (হয়তো নারীরও হয়, নারী নই বলেই বলতে পারব না তাঁদের কথা), যেমন অপার আনন্দ আসে মনে, যেমন সেই চরম পুলকের মুহূর্তে সব পাজি, ক্ষতিকারক, ঈর্ষাকাতর, নীচ মানুষের সমস্ত অপরাধই ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে যায়, ঠিক তেমন...

তেমন কি ?

আমি শারীরিক অবস্থার বা অবস্থানের বর্ণনাই দিলাম মাত্র। শরীরেরই মতন আপনার মনের অবস্থাও যেদিন চরমপুলকের পরের অমন আনন্দময়, ভারশূন্য, ক্ষমাময়, গান গাইবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠবে সেদিনই শুধু "তৈরি" হবেন আপনি। সেদিনই শুধু এই সাধনমার্গে সাধনা শুরু করার যোগ্যতার উন্মেষ হবে আপনার মধ্যে।

কামই কি একমাত্র রিপু নাকি ? আপনার দেখছি কামময় জগৎ।

চারণ একটু শ্লেষের সঙ্গেই বলল।

মোটেই নয়। রিপু তো অনেকই। কে না জানে ? কামের চেয়েও বড় রিপু ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য, ভয়। সব রিপুকেই জয় করতে হবে। একটাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পারলেই অন্যরাও আস্তে আস্তে তার অনুগামী হবে। আমার মতো হাড়ে-হারামজাদা, লক্কাপায়রা, মাগিবাজ হোপলেস কেস যদি পায়ে পায়ে এতদূরে এসে এই চন্দ্রবদনীর মন্দিরে পৌঁছে জিষ্ণু মহারাজের চরণে ঠাঁই পেতে পারেন তাহলে আপনিও বা পাবেন না কেন ? তাছাড়া, সকলকেই যে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হতেই হবে তারই বা কি মানে আছে ? সংসারে থেকেও যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁরাই তো সবচেয়ে বড়মাপের সন্ন্যাসী। মহারাজকে জিগ্যেস করবেন। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়।

বিশ্বাস না হওয়ার কি আছে।

চারণ বলল।

আপনি বিয়ে করুন ফিরে গিয়ে।

তুরতি বললেন,

কাকে ?

আরে ! এত মহা ন্যাকাখোকা দেখছি।

চারণ জোরে হেসে উঠল। না-হেসে পারল না বলে।

বলল, সত্যি। আপনি incorrigible।

তুরতি বললেন, সম্পত্তির মধ্যে তো এখন শুধু মুখটিই আছে। আর সবই তো গেছে। সেটুকু নিয়ে একটু খেলা করব, তাতেও আপত্তি ? How mean are you!

তারপর বললেন, যাকে খুশি তাকেই বিয়ে করুন। বিয়ে করুন, আর নাই করুন, জীবনকে ভোগ করুন। উ্যলিসীসের মতন বলুন "I will drink life to the Lees"। আর শুধু বলেই ক্ষান্ত হবেন না। Please do it! ত্যাগেরই মতন ভোগও মহান। দুইই সমান পুণ্যের। দুইই কষ্ট করে শিখতে হয়। তবে ভোগ করবেন কিন্তু কই-মাগুরের মতন জীবন যাপন করে ভোগ করবেন না। জলে থেকেও, কাদা-দলদলি থেকে সবকিছু নিয়েও, জলজ কুমুদিনী যেমন করে জলের ওপরে মাথা উঁচিয়ে হাসে, চাঁদকে, পাখিকে ভালবাসে, তেমন করেই ভোগ করবেন। ভোগের মধ্যে আবিলতা আনবেন না কখনও।

বাঃ।

চারণ বলল, আপনি যেমন বাংলা বলেন, আপনি তো লেখকও হতে পারতেন স্বচ্ছন্দে।

কোন দুঃখে মহায় ? বেশ আছি। খাসা আছি।

তা ঠিক। তবে আপনি হয়তো পারতেন ইচ্ছে করলেই, লেখক হতে।

চারণ বলল।

ইচ্ছে করলে ! ইচ্ছে করলে তো নিত্যভামা অপেরার 'কচু খেকো' যাত্রার "বিবেকও" হতে পারতাম। অথবা রাজ্য সরকারের কোনও মন্ত্রী-টন্ত্রী। যে নিজে রাজা, সে মন্ত্রী হতে যাবে কোন দুঃখে ? আপনিই বলুন।

বলেই বললেন, খাবেন তো একচড়া ? নাকি নীচের দোকানে যাবেন ?

রোজ রোজ দোকানের খাবার না খাওয়াই ভাল। কী তেল-ঘি দিয়ে রাঁধে কে জানে ! আজ আমিই রাঁধি।

চারণ বলল।

"একচড়া" আবার রাঁধবেন কি ?

তবু।

প্রবল আপত্তি তুলে তুরতি বললেন বউ কেমন রান্না করবে তার কোনও গ্যারান্টি নেই বলে এ শর্মা জীবনে বিয়ে পর্যন্ত করল না, আর শেষে আপনার মতন পুংলিঙ্গর হাতের রান্না খেয়ে নরকে যাবার মধ্যে আমি একেবারেই নেই। স্ত্রীলিঙ্গ ছাড়া অন্য কারও হাতের রান্না আমি খাই না। যাই উঠি। যোগাড় যন্তর করি গিয়ে।

আপনি একজন মেল-শভিনিস্ট।

চারণ বলল।

অনেকই তো বেলা হল জিষ্ণু মহারাজ এখনও ফিরলেন না।

কী হল বলুন তো তাঁর ?

চারণ, জিগ্যেস করল তুরতিকে, শীতে জবুথবু হয়ে আগুনের পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে।

এখন সকাল এগারোটা, কিন্তু চারধার আঁধার করে আছে। কাল সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি এখন নেই কিন্তু একটা ঝোড়ো হাওয়া আছে। হিমশীতল এবং আর্দ্র। বরফের কুঁচি উড়ছে যেন হাওয়াতে।

তুরতি বলছিলেন, প্রতিবছরই ডিসেম্বরের শেষে এমন বৃষ্টি হয় আর ঝাঁপ দেয় নীচে। দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করে অথচ এরই মধ্যে শুধু চন্দ্রবদনীতেই বা কেন কেদারনাথ বদ্রীবিশাল এবং চীনের সীমান্ত অবধি কত গুহাতে-কন্দরে-প্রস্তরাশ্রয়ে কত নগ্ন অর্ধনগ্ন সাধু-সন্ত নির্বিকার থাকেন তা বলার নয়। "এহ বাহ্য আগে কহ আর"। বাইরের সুখ দুঃখ আরাম কষ্ট কিছু নয়, কিছু নয়।

তুরতি বললেন, যখন খুশি হবে ফিরে আসবেন। এই হঠাৎ অন্তর্ধানের পেছনে কোনও গূঢ় রহস্য আছে বলে মনে হয়। এ বছরে এমন কিন্তু কখনওই হয়নি যে, আমাকেও না বলে তিনি চলে গেছেন। জানি না কি তাঁর উদ্দেশ্য।

যদি ফিরে না আসেন ?

উদ্বিগ্ন গলাতে চারণ বলল।

যদি উনি ফিরে না আসতে চান, তবে আমাদের কোন শক্তি আছে যে তাঁকে ফিরিয়ে আনব ? তা ছাড়া তা চাইবই বা কেন ? তাই যদি চাইব তবে এত বছর তাঁর পায়ের কাছে বসে শিখলাম কি ?

সত্যি ! আশ্চর্য মানুষ সব আপনারা !

স্বগতোক্তি করল চারণ।

হ্যাঁ। আরও আশ্চর্য আপনি।

কেন ?

এই আশ্চর্য, দুর্বোধ্য মানুষদের সান্নিধ্যেই কাটিয়ে দিলেন কতকগুলো মাস। অথচ নোঙর বেঁধে

এসেছেন কুটিল কলকাতাতে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, ফেরার পথ তো প্রথম ক্ষণ থেকেই খোলা রেখেছেন আপনি। কিন্তু আমরা কোথাও ফেরার কথা বা ফেরা-না-ফেরা নিয়ে ভাবাভাবিই করি না। যে যার মনে যায়, যার মনে ফিরে আসে, অথবা আসে না। তার খোঁজে ঘন ঘন ফোনের ঘণ্টা বাজে না, যায় না ফ্যাক্স মেসেজ, তাকে হন্যে হয়ে খুঁজি না আমরা সেলুলার ফোনেও। তিনিও যদি হারাতে চান তবে নিঃশেষেই হারিয়ে যাবেন। কোনও রেশ রেখে যাবেন না। রেশ রেখে যিনি বা যাঁরাই যান তাঁরাই আসলে সত্যি সত্যি হারাতে চান না।

হয়তো তাই।

চারণ বলল। আমি কী করব তাই ভাবছি। ফিরেই কি যাব ? ধিয়ানগিরি মহারাজও তো দেহ রেখেছেন শুনলাম। ভীমগিরি মহারাজও কি আর বসে আছেন আমার জন্যে ?

মহারাজের অভাব কি ? মহারাজ, সাধু-সন্তরা আসেন যান। হৃষীকেশ-এর গঙ্গার ঘাট, বা কোনও তীর্থস্থানই তো আর ফাঁকা থাকে না। যে ফাঁক, যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা অচিরেই পূরিত হয়ে ওঠে।

আমাকে রেশ রেখে যেতে বলছেন কেন তবে ?

বলছি এই জন্যে, যাতে ইচ্ছে করলেই আবার ফিরে আসতে পারেন। আমরা তো বনবাসে নেই। বিয়ে করলে, সস্ত্রীকও আসতে পারেন। সব তীর্থ ঘুরিয়ে নিয়ে যাবেন। ট্রাভেলিং ইজ এডুকেশন।

যদি তাঁর আপনাদের কারওকে পছন্দ না হয় ?

তবে পত্রপাঠ বিদায় নেবেন। তাঁকে নিয়ে তো আর আমাদের সঙ্গে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। আপনি কোথায়, কাদের সঙ্গে কাটিয়ে গেলেন অনেকগুলি দিন, সেই সব জায়গা, সেই সব মানুষদের দেখাতে আনবেন। বিবাহিত মানুষদের তো কোনও স্বাধীনতা থাকে না। তার নিজের একার ইচ্ছাতে কোনও কিছুই ঘটে না এ সংসারে। ঘটাতে গেলেই সম্পর্কের ছন্দটা নড়ে যায়। এই কারণেই তো বিয়ের কথা আমি ভাবিনি পর্যন্ত। তাছাড়া...

তাছাড়া কি ?

চারণ শুধোল।

বিয়ে ব্যাপারটা, মানে এই বন্দোবস্তটা তো এখনও তেমন দানাও বাধে নি।

তুরতি বললেন।

সে কি ? কি বলতে চান আপনি ?

উদ্দালকের নাম শুনেছেন ? ঋষি উদ্দালক ?

না তো।

উদ্দালক একজন বিখ্যাত ঋষি।

তাই ?

হ্যাঁ। ওর আসল নাম ছিল আরুণি। কিন্তু ওঁর গুরু আয়োদধৌম-এর বরে উনি উদ্দালক বলে পরিচিত হন। উদ্দালকের ছেলের নাম ছিল শ্বেতকেতু। একদিন শ্বেতকেতু যখন তাঁর বাবার কাছে বসেছিলেন, তখন তাঁর উপস্থিতিতেই এক ব্রাহ্মণ পুরুষ এসে তাঁর মা এবং উদ্দালকের স্ত্রীকে সম্ভোগ করার বাসনা প্রকাশ করেন এবং শ্বেতকেতুর মাকে তাঁর হাত ধরে গায়ের জোরেই নিয়ে যান। তা দেখে, স্বাভাবিক কারণেই শ্বেতকেতু প্রচণ্ড রেগে তাঁর বাবাকে বলেন, এ কী ব্যাপার ? আপনি প্রতিবাদ করলেন না ?

উদ্দালক পুত্রকে শান্ত করে বলেন, পুত্র, তুমি রাগ কোরো না। এটাই সনাতন ধর্ম। গাভীদেরই মতন স্ত্রীরাও অরক্ষিতা। গাভী এবং স্ত্রীলোককে ভোগ করার অধিকার সকলেরই আছে।

শ্বেতকেতু এ কথা শুনে অত্যন্তই বিচলিত হন এবং তিনিই স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে এই নিয়মের প্রবর্তন করেন যে, একজন পুরুষ একজন রমণীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবে এবং পতি

ছাড়া যে বিবাহিত রমণী অন্য পুরুষের সংসর্গ করবে এবং যে পুরুষ পতিব্রতা স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হবে, তারা উভয়েই ভ্রূণহত্যার পাপে বিদ্ধ হবে। সেই থেকেই আমাদের সমাজে বিবাহ প্রথা প্রথম চালু হল।

তাই ?

হ্যাঁ। তবে সর্ষের মধ্যেই ভূত ঢুকে রইল।

তার মানে ?

মানে, পরবর্তীকালে, বিবাহপ্রথা পত্তনকারী এই শ্বেতকেতুই নন্দীর হাজার অধ্যায়ের কামশাস্ত্রকে ছোট করে পাঁচশ অধ্যায়ের কামশাস্ত্র রচনা করেন।

তাই ?

অবশ্যই।

এই শ্বেতকেতু কিন্তু আদৌ কাল্পনিক চরিত্র নয়। তৈত্তিরীয়সংহিতা, ছান্দোগ্যোপনিষৎ এবং বৃহদারণ্যকোপনিষৎ-এ শ্বেতকেতু সম্বন্ধে আরও অনেক কাহিনী আছে। কিন্তু সবচেয়ে মজারই বলুন বা দুঃখেরই বলুন কথা হচ্ছে এই যে, বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার সুব্যবস্থা করার পরও এদেশে যত কামশাস্ত্র রচিত হল তার প্রায় সমস্ত শাস্ত্রেই একটা করে অধ্যায় থাকলো, যার নাম "পারদারিক"।

তার মানে ?

চারণ শুধোল।

তার মানে, অন্যের স্ত্রীকে কী করে বশ করতে হয় এবং পরস্ত্রীকে কী করে অধিকার করা যায় তার সম্যকজ্ঞানের শাস্ত্র তা।

সত্যি ?

বিস্মিত হয়ে চারণ বলল।

অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রেও একটি বিশেষ অধ্যায় আছে, যার নাম, 'পারদারিকাধিকরণস্য'। পরস্ত্রীকে কি ভাবে অধিকার করা যায় সেই বিদ্যার শাস্ত্র।

বলেন কি আপনি ? অবাক হওয়ার কিছু নেই এতে ?

নেই।

শুধু বিবাহই নয়, মানুষ-মানুষীর কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্কই Water tight নয়। সব সম্পর্কই নড়বড়ে। তবে আমার একটা কথা প্রায়ই মনে হয়।

কি কথা ?

দাম্পত্যর ঘর অটুট থাকতে পারে চিরদিনই যদি তা দমবন্ধ করা না হয়, যদি তাতে আলো বাতাস খেলে। যদি ঘরের লাগোয়া একটা বারান্দা থাকে। কাহলিল জিব্রান তাঁর Couples-এ যাকে Space বলে চিহ্নিত করেছিলেন। মাঝে মাঝে এই বারান্দাতে এসে স্ত্রীরা দাঁড়াতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গর কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেন, পেতে পারেন, শুনতে পারেন পাখির ডাক, পেতে পারেন ফুলের গন্ধ, দেখতে পারেন নীলাকাশ। এই বারান্দা থাকাটা সব দাম্পত্যেই খুবই জরুরি।

চারণ বলল, সত্যি ! আপনি যে কেন লেখেন না জানি না। আপনার মতন সুন্দর করে কথা বলতে খুব কম মানুষই পারেন।

হাঃ !

চারণ বাইরে চেয়ে বলল, দুর্যোগ কাটছে। বিকেলের দিকে রোদ উঠতেও পারে।

উঠবে না। এমনই চলবে তিনদিন। শীত আরও বাড়বে। দুপুর-দুপুরই ধুনির জন্যে কাঠ জোগাড় করে আনতে হবে।

ঠিক আছে। আমিও যাব আপনার সঙ্গে।

তারপর বলল, একটা কথা জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করছে আপনাকে।

কি কথা ?

আপনি যে সেদিন কার্ল মার্কস-এর লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলেন সেটি আমার দারুণ লেগেছিল। আপনি কি দর্শনের ছাত্র ছিলেন, না অর্থনীতির ? না রাজনীতির ?

আমি দর্শনেরই ছাত্র ছিলাম বরাবর।

মানে ?

মানে, কোনও রমণীকে নববর্ষে বা পুজোতে শাড়ি উপহার দিয়ে আমি কখনও বলিনি যে "একদিন পরে দেখিও।" বলেছি, "একদিন না-পরে দেখিও।"

খুব জোরে হেসে উঠল চারণ।

বলল, সত্যিই আপনি Incorrigibility-র সংজ্ঞা। এমন মানুষ সত্যিই আর দেখিনি। আপনি একটি paradox!

তুরতিও হাসছিলেন।

চারণ বলল, বলুনই না।

বলব কি ? আমি তো কলেজেই যাইনি কখনও।

তুরতি বললেন, মার্কস তো এখন পুরোনো হয়ে গেছেন। Wolf-Callari-Roberts (WCR) ফর্মুলেশন মার্কস-এর তত্ত্বকে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছে।

চারণ একটু চুপ করে থেকে বলল, জাক দেরিদা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ? তিনি নাকি কলকাতার বইমেলাতে আসবেন পরের বছর ?

তাই ? তা আমার ধারণা দিয়ে কি হবে ?

আমি জানতে চাই।

দেরিদা তো Hegel আর Althusser-এর অনুগামী। দেরিদার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার মতো পাণ্ডিত্য বা ইচ্ছা আমার নেই তবে তাঁকে একবার শুনেছিলাম প্যারিসে। ভদ্রলোককে বড় বাগাড়ম্বর-প্রিয় বলে মনে হয়েছিল। উনি ইংরেজি ভাষাতে বলেন ভালই তবে সেই সওয়াল বটতলার উকিলের মতন। কথার খেলা খেলেন তিনি। ইচ্ছে করলে নতুন ইংরেজি Theasurus সংকলন করতে পারতেন Roget-এর পরে। তবে কম্যুনিস্টদের অধিকাংশদেরই যা দোষ, তাঁরও সেই দোষ। বক্তব্যের চেয়ে ভাষার বিন্যাসই তাঁকে আকৃষ্ট করে বেশি।

তাই ?

তাই তো মনে হয়েছিল আমার। আমি আর কতটুকু বুঝি ?

চারণ চুপ করে এই তুরতি নামক "ক্ষেমি বাঈজির বাড়ি ব্যায়লা বাজানো" মানুষটিকে বোঝার চেষ্টা করছিল।

পরনে একটি মোটা কাপড়ের গেরুয়া লুঙ্গি। হাতে বোনা, মোটা গরম কাপড়ের পাঞ্জাবি। গেরুয়া রঙা। তার ওপর কালোর উপরে সাদা চেকচেক একটি খুব মোটা দেহাতি কম্বল। কাঁচাপাকা গোঁফ দাড়ি। কিন্তু মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। রং একসময়ে অত্যন্তই ফর্সা ছিল। এখন তামাটে দেখায়। নাকটা একটু চাপা কিন্তু মুখমণ্ডলে এমনই এক আভিজাত্য আছে যে হাজার মানুষের মধ্যে সেই মুখে চোখ পড়লেও বোঝা যাবে যে তিনি অন্যদের মতন নন। একেবারে আলাদা। সব মিলিয়ে দারুণ এক ধাঁধা। এমন কত Quiz যে ছড়িয়ে আছে এই দেবভূমিতে তা কে জানে!

খুবই শীত করছিল চারণের। ও উঠে গেল ভিতরে, একটি ফুল-হাতা পোলো-নেক সোয়েটার ছিল তার থলেতে, সেটি চাপিয়ে আসতে। আরও একটা বাঁদুরে টুপি আছে।

ভাবছে সেটিকেও, যেটি পরে আছে তার ওপরে চাপিয়ে আসবে।

ভিতর থেকে যখন বাইরে এল, মানে, প্রস্তরাশ্রয়ের বাইরের অংশটিতে তখন হঠাৎই চোখ পড়ল পাটন আসছে। তার পরনে জিনস, ট্রাউজার এবং জামা। তার ওপরে একটা ঢোলা সোয়েটার। না টুপি আছে, না মাফলার। পায়ে একজোড়া রাবারের হাওয়াই চটি।

কাছে এসে পৌঁছলে, চারণ বলল, হঠাৎ। তুমি! কোত্থেকে ?

বলেই তুরতির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে গেল। দিতে গিয়েই বুঝল, ওরা পরস্পরকে চেনে।

চারণ শুধোল, জিষ্ণু মহারাজকে কি দেখেছ?

দেখেছি।

উনি ফিরে আসছেন?

না।

তারপরেই বলল, না মানে, আসবেন। তবে ফেব্রুয়ারি-মার্চ-এর আগে নয়।

গেছেন কোথায়?

উত্তরে।

মানে?

উত্তরে।

তুমি রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আসছ?

না।

ওদের সব খবর ভাল?

ওদের মানে?

মানে, চন্দ্রবদনীদের।

কী করে বলব। যাইনি তো।

কোথায় ছিলে এতদিন? আন্দোলন কি এখনও চলছে?

জানি না।

কেন? তোমার বন্ধু পুলিশের গুলিতে মারা যাওয়ার পরেই কি উদাসীন হয়ে গেলে এই ক-সপ্তাহেই।

না, তা নয়। সব আন্দোলনের চালই বিষাক্ত সাপেরই মতন। এঁকেবেঁকে চলে। কখনও দেখা যায়, কখনও বা গহ্বরবাসী হয়ে যায়। তাছাড়া আমাকে ওরা Disown করেছে।

কেন?

হয়তো আমি সমতলবাসী বলেই।

এখন তো তুমি পাহাড়িই।

ওরকমই হয়।

যাকগে এক কথা থেকে অন্য কথাতে এসে গেলাম। আমি আজ বিকেলেই হৃষীকেশ-এ নেমে যাব। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে চারণদা? তুমি কলকাতাতে ফিরবে না? হাইকোর্ট যে তোমার জন্যে কাঁদছে, কাঁদছে তোমার মক্কেল-বিক্কেলরাও। তোমার সখের Wanderings কি এখনও শেষ হয়নি? অনেকদিন তো হল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী খেলার।

তারপরই বলল, চলুন, তুরতি বাবা, গরম গরম পুরী-হালুয়া আর আলুর তরকারি আর পর পর কয়েক ভাঁড় চা খেয়ে আসি। ভাল শীত পড়েছে আজ।

তুমি তো ন্যাংটো হয়েই আছ প্রায়। তোমার শীত করবে না তো কার করবে? চলো, সকলেই যাই। তবে এই আবহাওয়াতে হৃষীকেশে আজ নাই বা গেলে! রাতটা থেকে, তোমার চারণদাকে নিয়ে নেমে যেও। অধঃপতনে যখন যাবেই তখন তোমাকে ঠেকাবে কে?

তুরতি বললেন।

পাটন হাসল।

বলল, পতন তো চিরকাল অধঃলোকেই হয় তুরতি কাকা। কে আর কবে ঊর্ধ্বলোকেই পড়েছে বলো?

চারণ বলল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষে'র ডায়ালগ চুরি করলে তো?

ইয়েস।

বলল, পাটন।

চারণ বাসের জানালার পাশে বসেছিল। ওর পাশে পাটন। ভিতরের দিকে। এখন তীর্থযাত্রীরা না থাকলে কী হয়, বাসে ভিড় কিছু কম নেই। সব সিটই ভর্তি। দু-একজন দাঁড়িয়েও আছেন।

তীর্থযাত্রীরা যখন আসেন তখন বাসের সংখ্যা বেড়ে যায় প্রচুর। এই সময়ে বাস কম কিন্তু পথের গাড়োয়াল হিমালয়ের পরতের পর পরতের কোরকে যে স্থানীয় মানুষের অগণ্য বসতি আছে পাহাড়ের গায়ে, মালভূমিতে, উপত্যকাতে, সেই সব বসতির মানুষজনেরাই যাত্রী।

বাসের ভিতরটা গরম। মানুষের গায়ের গরমে গরম, গরম জামার গরম, মাথার টুপির গরমে গরম। তার সঙ্গে বিড়ির এবং চুট্টার গন্ধ।

কারা যে বলেন, বিড়ি খেলে ক্যানসার হয়! যুগযুগান্ত থেকে গরিব ভারতীয়রা বিড়ি খেয়ে আসছেন এমন করেই। আর ক্যানসার ধরা পড়লেই বা কী হয়। ডাক্তারদের পিং-পং বল হয়ে এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে, সর্বস্বান্ত, ক্লান্ত এবং বিরক্ত হয়ে তারপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওর সেই বন্ধু বাচ্চুরই মতন কেমোথেরাপির শিকার হয়ে মৃত্যুর আগেই মৃততর হয়ে যায় মানুষে। মৃত্যুর মতন অবিসংবাদী সত্য তো আর কিছুই নেই। প্রত্যেক মানুষের জন্ম-মুহূর্তেই তো মৃত্যু দাঁড়িয়ে থাকে আঁতুড় ঘরের দরজায়, রান্নাঘরের সামনে বেড়ালনির মতন। তবুও মরতে যে মানুষের এত ভয় কেন, কে জানে!

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে একজনকে বলেছিলেন যে, "The fear of life increases in direct proportion with the money one possesses." এই জন্যেই বোধহয় অর্থসর্বস্ব বলেই অ্যামেরিকানদের আর মাড়োয়ারিদের এত মৃত্যুভয়! সেদিন ওই কথাই বলছিলেন তুরতি মহারাজ।

গরিবদের অত মৃত্যুভয় নেই।

জানলার কাঁচ দিয়ে বাইরের শীতার্ত সিক্ত পার্বত্য-প্রকৃতির দিকে চেয়ে চারণের রবীন্দ্রনাথের সেই গানটির কথা মনে পড়ল। আজকাল বড় কম শুনতে পায় এই গান।

"কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়, জয় অজানার জয়।
দু দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে/তাইতে যদি এতই ধরে
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময়?
জয়! অজানার জয়!"

চারণ ভাবছিল যে ও সত্যি সত্যিই এবারে এই দেবভূমি থেকে বিদায় নিচ্ছে। তুরতির কথাতে বললে বলতে হয় হয়তো অধঃপাতেই যাচ্ছে। কলকাতাতেও ফিরে যাবে দু-একদিনের মধ্যেই। সেই দম-বন্ধ কলুষিত নগরে, ঈশ্বরচিন্তাবিহীন খাই-খাই, চাই-চাই-এর জঘন্য প্রতিবেশে। মনটা খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। অথচ ওর 'আপন জন' বলতে কলকাতাতে যেমন কেউই নেই, এখানেও অবশ্য ছিল না।

জিষ্ণু মহারাজের সঙ্গে ফিরে যাবার আগে দেখা হল না। পাটন আসার পর আরও একদিন অপেক্ষা করেছিল। পাটন বাজে কথা বলবে না। চন্দ্রবদনীর সঙ্গে দেখা করে যাওয়া হল না বলেও মনটা খুব খারাপ লাগছে। অথচ তাঁরাও চারণের কেউই নন। 'আপনজন', প্রকৃতার্থে আপনজন, একজনের জীবনে কজন মানুষই বা হয়ে ওঠেন।

'Out of sight out of mind' বলে একটা কথা আছে। চন্দ্রবদনী কি তাকে ভুলে যাবে? না কি ইতিমধ্যেই ভুলে গেছে? চন্দ্রবদনীর ভাবনা তাকে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে রুদ্রপ্রয়াগ ছেড়ে

আসার পর থেকেই অথচ তার সঙ্গে তার পরিচিতি কদিনেরই বা ! এই সাধু সন্ন্যাসীরা যেমন করে বলেন, পূর্বজন্মে কি কোনও সম্পর্ক ছিল তার সঙ্গে চন্দ্রবদনীর ? না কি পরজন্মে হবে ? না হলে, মন এত উদ্বেল হয় কী করে !

বাসের মধ্যে চারণের এই বিরাট, স্বরাট, বৈচিত্র্যে ভরা নানা ভাষা, নানা মত নানা পরিধানের ভারতবর্ষের নানা মানুষ কথা কইতে কইতে চলেছে। একটা ঘোর লাগে এমন মাটির কাছের, পর্বতের কাছের, নদীর কাছের দেশজ স্বার্থগন্ধহীন মানুষদের গাঢ় প্রতিবেশে। ইদানীং প্রায়ই চারণের খুব গর্ব হয় ও ভারতীয় বলে। এই গরিমার অনুভূতি হুগলির দ্বিতীয় সেতু বা মেট্রো-রেল দেখে কখনওই হয় না, হত না। এমন সেতু, অগণ্য ফ্লাইওভার বা মেট্রো রেল তো পৃথিবীর সব বড় শহরেই আছে। কিন্তু এইরকম দেবভূমি, হিন্দু এই জিষ্ণু মহারাজ, তুরতি মহারাজ, ধিয়ানগিরি মহারাজ, দেবপ্রয়াগের সন্ন্যাসীরা, তিব্বতী-বৌদ্ধ চন্দ্রবদনীর ঠাকুর্দা, চন্দ্রবদনীর মতো আধুনিকা অথচ বহু হাজার বছর পুরোনো হিন্দুত্ব ও বৌদ্ধত্বে সমাহিত যুবতী, হৃষীকেশ-এর মাদ্রীর মতো নিবেদিত প্রাণ যুবতী, রওনাক সিং-এর মতন দার্শনিক কর্মী, পৃথিবীর অন্য কোথাওই আছে বলে জানে না চারণ।

ও আর কিছুদিনের মধ্যেই ভারতদর্শনে বেরোবে। তার স্বদেশ, স্বজনকে জানতে বুঝতে বেরিয়ে পড়বে, কলকাতা ছেড়ে আসমুদ্র-হিমাচল-এর উদ্দেশ্যে। ঘুরে ঘুরে দেখবে, মিশবে, জানবে তার এই সুন্দর, বৈচিত্র্যময়, পরস্পরবিরোধী সত্তার দেশ, দেশের সুন্দর সাধারণ ভাল মানুষদের, গ্রামীণ মানুষদের।

পাশে-বসা পাটন স্বগতোক্তির মতন হঠাৎই বলল, মানুষটা মহা গোলমেলে আছে।

কে ?

ওই তুরতি বাবা।

কেন ? গোলমেলে কেন ?

ওঁর মধ্যে অতি ডেঞ্জারাস এক চৌম্বকত্ব আছে। মানুষটাকে জানার চেষ্টা করেছি অনেক। আমি তো এখানেই প্রথমে উঠেছিলাম স্টেটস থেকে এসে। দেড়বছর ছিলাম জিষ্ণু মহারাজেরই কাছে। সত্যিই মহাপুরুষ। তুরতি বাবার জ্ঞান দেখেই হয়তো তুমি অজ্ঞান হয়ে গেছ। এত স্বল্পপরিচিতদের কাছে স্বমহিমায় স্বল্পদিনে প্রকাশিত হন না জিষ্ণু মহারাজ। অতি সাধারণ হয়ে মেশেন তোমার আমার মতন সাধারণের সঙ্গে। ওঁদের চিনতে হলে, লাথি-ঝাঁটা, সবরকম শীতল উপেক্ষা সয়েও ওঁদের পায়ের কাছে পড়ে থাকতে হয়। জিষ্ণু মহারাজ সম্ভবত কখনই নিজের সস্তা গোলকটি থেকে বাইরে আসেন না। তাঁর জ্ঞান তো নয়, কচ্ছপের গলা। নিজের ইচ্ছাতে বার না করলে কারওরই সাধ্য নেই যে তাকে টেনে বার করেন। এঁদের দেখে আমার মনে হয়েছে যে, মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি যখন একটা সীমা অতিক্রম করে যায় তখনই সেই মানুষকে সম্ভবত অজ্ঞ বলে মনে হয় আমাদের মতন সাধারণ জ্ঞানহীনদের চোখে। এই জিষ্ণু মহারাজকে, তুরতি বাবাকে দেখেই আমি এ কথা জেনেছি। এই অঞ্চলে কম সাধু সন্ন্যাসীদের তো দেখলাম না। দেবপ্রয়াগের ওঁদের কথাও বলতে হয় অবশ্যই।

তা ঠিক।

অন্যমনস্ক গলাতে বলল, চারণ।

তারপর বলল, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে তুমি প্রথমেই আমাকে এখানে নিয়ে এলে না কেন ? দেবপ্রয়াগে নিয়ে গেলে কেন ?

পাটন বলল, সাধনমার্গের যেমন বিভিন্ন ধাপ আছে, তেমনই সাধুসঙ্গেরও বিভিন্ন ধাপ আছে। তাই। তাছাড়া দেবপ্রয়াগে না আনলে তো চন্দ্রবদনীর সঙ্গে দেখা হত না। সে যে তোমার প্রেমে, এখানে তোমার খুব কাছে আসার অনেক আগে থাকতেই ডুবে ছিল। আমি কী আর জানিনি তা ! সত্যি ! চন্দ্রবদনীর মতন সম্ভ্রান্ত যুবতী দেশে-বিদেশে আমি কোথাওই দেখিনি। সম্ভ্রান্ততার সংজ্ঞাই যেন ছিল সে। চারণ ভাবছিল, ভালবাসা সোজা কিন্তু একজন আধুনিক মানুষ বা মানুষীর পক্ষে

'আমি তোমাকে ভালবাসি' এই কথাকটি মুখ ফুটে বলা ভারী মুশকিল। গুমোরে জিভ বুঝি ভারী হয়ে থাকে। আগে যদি জানত চারণ।

এই 'ছিল' শব্দটি খট করে কানে লাগল চারণের। কিন্তু এই খটকাটা সম্বন্ধে কিছু জিগ্যেস করার আগেই পাটন বলল, চলো, আমাকেও একবার কলকাতাতে যেতে হবে।

তাই ?

হুঁ।

আর এখানে ফিরে আসবে না ?

নিশ্চয়ই আসব।

তাহলে যাবে কেন ?

মানুষটার সম্পত্তির সব বিলিবন্দোবস্ত করেই ফিরে আসব। দেখি, উইল করে মরল, না intestate মরল ? কোথায় কত ইল্লেজিটিমেট ছেলে পয়দা করে গেছে কে জানে।

মানুষটা মানে ?

মানে আমার জন্মদাতা সেই বাস্টার্ডটা।

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে চারণ বলল, সে সব নেই। থাকলে বুঝতাম তোমার বাবা জীবনকে ভালবাসতেন। তাঁর অর্জিত অর্থ ভোগ করতে জানতেন। ত্যাগ করার চেয়ে ভোগ করা বিন্দুমাত্র কম কঠিন কাজ বলে ভেবো না। নাঃ ! আমি তো তাঁকে ভাল করেই জেনেছি। টাকাকে ছাড়া আর কিছুকেই, কারওকেই ভালবাসার ক্ষমতাই ছিল না তোমার বাবার।

তারপরই, হঠাৎ বলল, তাছাড়া উইলের কথা উঠছে কেন ? তিনি তো আর দেহ রাখেননি।

হাঃ। এমন করে বলছ যেন সে কোনও মহাপুরুষ। সে তো টেঁসে গেছে। টেঁসে গেছে বলেই তো ক'দিনের জন্যে আমাকে কলকাতাতে যেতে হচ্ছে।

সে কী ? কবে ?

খবর পেলাম গতরাতে। গেছে বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মীর অতবড় উপাসক। যাবার দিনটাতেও দেখেশুনেই গেছে, লক্ষ্মীবারে।

অমন করে কথা বলছ কেন ? আফটার অল উনি তো তোমার বাবাই ছিলেন। তাছাড়া, চলেই যখন গেছেন তখন আর রেগে কি করবে বলো ? কিন্তু হয়েছিলটা কি ?

বড়লোকদের যা হয়।

কি ?

আসলে কিছুই হয় না। কিন্তু সব সময়েই মনে হয় কী যেন হয়েছে ! কী যেন হয়েছে। কী যেন হল। বুকে একটু মাসল্ পেন হল তো ছুটল ভ্যাবল সেনের কাছে।

তিনি কে ? ভ্যাবল সেন ?

তিনি এক বিরাট ডাক্তার। বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা না-জানা বাংলাদেশী পেশেন্টদের সঙ্গেও তিনি ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষাতে কথা বলেন না। নিজেই নানারকম হ্যাঙ্গ-আপস-এর রোগী বলেই হয়তো। খ্যাঁচা কল স্পেশালিস্ট। তাঁর নার্সিংহোম-এ একজন রোগীর বেড খালি হলেই তিনি রোগী খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন। আর তাঁর ওখানে বেড শুধু খালি হয় রোগীর পর রোগী টেঁসে গিয়েই। এই সব ডাক্তারদের যোগ্য পেশেন্ট আমার জন্মদাতার মতো মানুষেরাই। রতনে রতন চেনে। যাই বলো আর তাই বলো, কলকাতার অনেক ডাক্তারেরাই কসাই। নানারকম র‍্যাকেট চালনা করেন তাঁরা। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। নকশাল ছেলেগুলো যে কোথায় গেল ? তাদের আবার ফিরে আসা দরকার। অনেক কারণেই দরকার।

তা, কী রোগে তিনি গেলেন আলটিমেটলি ?

তা জানি না।

নিজের বাবা কিসে মারা গেলেন তাও জানো না ?

বাবা ছিল না সে লোকটা। জন্মদাতা আর বাবা কি এক ? অনেক দিন আগে একটা ছোট গল্প

পড়েছিলাম কোনও পুজোবার্ষিকীতে। গল্পটার নাম ছিল "বাবা হওয়া"।

কার লেখা ?

অত মনে নেই। গল্পটা মনে আছে। পারলে যোগাড় করে পড়ে দেখো। তুমিও যদি কিছু হতে, মানে আমার মায়ের সঙ্গের অ্যাফেয়ারে, তবে জন্মদাতাই হতে। মদ্দা কুকুর থেকে ষাঁড় সকলেই জন্মদাতা হতে পারে কিন্তু "বাবা" হওয়া অত সোজা নয়।

চারণ চুপ করে রইল। পাটনের সঙ্গর অভিঘাতও বড় সহজ অভিঘাত নয়। ওর ব্যক্তিত্ব বড়ই ডিস্টার্ব করে, পারটার্ব করে অন্য মানুষকে। বিশেষ করে চারণকে। তুলির সঙ্গে সম্পর্কটার জন্যেই হয়তো…।

পথপাশের গঙ্গা ঝরঝর শব্দে বয়ে চলেছে। এই দুদিনেই বৃষ্টিপাত (এবং তুষারপাতও অবশ্য হয়েছে ওপরে)। নদীর জলে তোড় বেড়েছে। আধো-অন্ধকার হয়ে আছে চারদিক। যদিও এখন দুপুর। চুপ করেই ছিল চারণ। চুপ যদিও করে ছিল কিন্তু খুব ইচ্ছে করছিল যে, পাটনকে জিগ্যেস করে চন্দ্রবদনীর কোনও খোঁজ সে জানে কি না ?

তারপর, সাত-পাঁচ ভেবে বলল, চুকারদের বাড়ি কি গেছিলে শিগগির ?

নাঃ।

সংক্ষিপ্ত এবং রুক্ষ উত্তর দিল পাটন।

চারণ চুপ করেই রইল।

বেশ কিছুক্ষণ পর বাসটা যখন ভিয়াসির কাছাকাছি এসেছে, পাটন বলল, কী শিখলে চারণদা এই কমাসে ?

শেখার মতো শিখিনি কিছুই। তবে শিখব হয়তো। ফিরে আসি।

আর ফিরেছ। একবার কলকাতার গোলকধাঁধাতে পড়লে কেউ কি আর ফিরে আসতে পারে ? আমি লিখে দিতে পারি যে, তুমি পারবে না ?

তুমি যদি পারো তবে আমিই বা পারব না কেন ?

চারণ বলল।

আমি আর তুমি কি এক চারণদা ? কেউই কি অন্য কারও মতন এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ? এই তো সৃষ্টিকর্তার বাহাদুরী। তাছাড়া, আমার যা বয়স, এই বয়সে নিজের জন্মদাতার রেখে-যাওয়া চার কোটি টাকার সম্পত্তি কি তুমি দান করে দিতে পারতে ?

চার কোটি টাকা ? নাঃ। হয়তো পারতাম না।

স্বোপার্জিত সম্পত্তি দান করা সহজ কিন্তু পরার্জিত সম্পত্তিতে বড়ই আঠা থাকে। বিনা পরিশ্রমে পায়ের উপরে পা তুলে সারাজীবন মহানন্দে, বিনা-চিন্তাতে কাটানোর লোভ কি সবাই সামলাতে পারে ?

পরার্জিত বলছ কেন ? তোমার বাবা কি তোমার পর ?

আবার বললে বাবা। বাবা হলে, ভেবে দেখতাম। মানুষটা যে নিছকই জন্মদাতা।

সম্পত্তি মানেই বিপত্তি পাটন। সারাজীবন পয়সাওয়ালা মানুষ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি বলেই ও কথা জানি। তবে, তুমি যদি এখানে ফিরে আসতে পারো তো আমিও পারব।

দেখা যাবে।

পাটন অবিশ্বাসী গলাতে বলল।

তারপর বলল, বেস্ট অফ লাক। মে গড ব্লেস উ্যু টু বী হিজ সার্ভেন্ট।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে পাটন বলল, তোমাকে একটা কথা বলার ছিল চারণদা। ভেবেছিলাম, কোনও নির্জন স্থানে বসে তোমাকে কথাটা বলব। অন্তত এমন কোনও জায়গাতে, যেখানে আমার তোমার পরিচিত জন কেউ নেই। সেই জন্যেই তো তোমাকে চন্দ্রবদনীর মন্দিরের কাছের ঐ প্রস্তরাশ্রয় থেকে নামিয়ে চায়ের দোকানে নিয়ে আসছিলাম। তা, তুরতি-বাবা পিছু নিল। তবে আমি বলি আর নাই বলি তুরতি বাবা সবই বুঝেছেন।

কি ? কি বুঝেছেন ?

হঠাৎ মনের মধ্যে 'কু' ডাকছিল চারণের। বুকের মধ্যেখানটাতে কে যেন চেপে বসল। একেবারেই চুপ করে গেল চারণ।

পাটন বলল, এই ভিড়ের মধ্যে নির্জনতা না থাকলেও, আড়াল থাকে, প্রাইভেসি থাকে একধরনের, এর মধ্যেও যে কথা বলার, তা বলা যায়।

কথাটা বলোই না। চারণ অধৈর্য গলাতে বলল।

কথাটা, পরে বললেও চলবে। হৃষীকেশের ঘাটে ধুনির পাশে বসেও বলতে পারি। তুমি অধৈর্য হলে কি হবে ? যে কথাটা বলব, তার নিজের তো তাড়া নেই কোনও।

মানে ? কেন ?

সে যে অতীত কাল হয়ে গেছে। পাস্ট-টেন্স-এর তাড়া থাকে না কখনই। তাড়া থাকে, শুধু বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এরই।

চারণ বিরক্ত হয়ে চুপ করে রইল জানালার দিকে চেয়ে। এত কথা যেন ভাল লাগছিল না ওর।

পাটন বলল, তুমি চুকারের বাড়ির খবরের খোঁজ করছিলে না ?

হুঁ। হুঁ-টা স্বগতোক্তির মতন শোনাল চারণের নিজেরই কানে।

আসলে চন্দ্রবদনীর খোঁজ করছিলে তো ?

হুঁ। ভনিতা না করেই চারণ বলল, পাটনের দিকে মুখ ফিরিয়ে।

গতকাল ভোর পাঁচটাতে চন্দ্রবদনী চলে গেছে তার প্রিয় ভাই চুকারের কাছে।

বোমা ফাটানোরই মতন খবরটা ফাটাল পাটন চারণের কানের কাছে।

স্তব্ধ হয়ে গেল চারণ কথাটা শুনে। বাসের মধ্যের অত মানুষের নানা উঁচু-নিচু গ্রামে বলা কথাবার্তাও যেন ওর কানের মধ্যে ফ্রিজ করে গেল। চলমান বাসে বসে চারণ সেদিন শেষরাতে দেখা স্বপ্নটিকে মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। ফেড-আউট হয়ে যাওয়া চন্দ্রবদনীকে স্মৃতির ফ্রেমে আবারও ধরার চেষ্টা করতে লাগল খুবই। কিন্তু পারল না।

জিষ্ণু মহারাজ পৌঁছেছিলেন তার আগের রাতে। ওঁকে চুকারদের বাড়ির কেউই চিনতেন না। আমিই একমাত্র চিনলাম। গেছিলেন কিন্তু মাত্র ঘণ্টাখানেক ছিলেন। ওই ঠাণ্ডাতে বাইরে বসে নানা গান গাইলেন। তারপর চন্দ্রবদনীকে একবার দেখতে চাইলেন। আমিই ওর দাদুর অনুমতি নিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম ঘরে। জিষ্ণু মহারাজ চন্দ্রবদনীর কপালে হাত ছোঁয়ালেন। ফিরে যাবার সময়ে ওর ঠাকুর্দাকে ডেকে বাইরে দাঁড়িয়ে কী সব কথাবার্তা বললেন।

উনি চলে গেলে, চন্দ্রবদনীর ঠাকুর্দা ফিরে এসে উপাসনাতে বসলেন। আমি ঠাকুর্দার কথা মতন ভোরে উঠে প্রথম বাস ধরে বুয়াজিকে খবর দিয়ে নিয়ে আসার জন্যে যখন বেরবো রুদ্রপ্রয়াগ বাজারের দিকে ঠিক তখনই চন্দ্রবদনী চলে গেল। তোমাকে কী বলব চারণদা, যাবার আগে আমার হাতটা এমন করে দুহাতের পাতাতে আঁকড়ে ধরল। মনে হল, ও যেন খুবই ভয় পেয়েছে। বিশ্বাস করবে কি না জানি না তুমি, একবার তোমার নামোচ্চারণও করল। অস্ফুটে। তারপরেই মাথাটা বালিশে ঢলে পড়ল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে চারণ বলল, কী হয়েছিল ?

জ্বর। অল্প জ্বর। কিন্তু খুবই মাথাব্যথা ছিল। আমি বদ্রীবিশাল থেকে যেদিন রুদ্রপ্রয়াগে ফিরি, ফিরেই ওদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলাম যে, গত তিনদিন ধরেই জ্বর। তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না, ওখানেই চুকারের মৃত্যু সংবাদের কথা জানি। যদিও যাবার আগে জানতাম যে, অমন অঘটন ঘটতে পারে।

বদ্রীবিশালেও খবরটা পাওনি ?

না। আমার প্রতিবেশে শুধু ঈশ্বর আর তাঁর সেবকদেরই বাস। রাজনীতি অর্থনীতির সেবকদের কোনও প্রভাব পড়ে না আমার উপরে।

ডাক্তার দেখায় নি ?

দেখিয়েছিল বইকি। মিলিটারি হাসপাতাল থেকে ডাক্তার এসে দেখে গেছিলেন। বললেন, ভাইরাল ফিভার। ভোগ আছে দিন সাতেক। জ্বর বাড়লে কি কি ওষুধ দিতে হবে তাও বলে গেলেন। আর বলে গেলেন, চিন্তার কিছু নেই। তারপর রাত আটটাতে আমরা যখন খেতে বসেছি তখনই হঠাৎ ছটফটানি শুরু হল। আয়া এসে আমাদের খবর দিল।

পাটন চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। বাসটা ভিয়াসি পেরিয়ে গেল। একটু পরেই হৃষীকেশে পৌঁছবে। দিনের বেলাতেই অন্ধকার নেমেছে তখন চারদিকে।

চারণ বলল, হাসপাতালে নিয়ে গেলে না কেন ?

যখন জিষ্ণু মহারাজ এসে পৌঁছলেন অপরিচিত ওঁদের কাছে তখনই বুঝেছিলাম যে সময় হয়েছে। যাকে উপরওয়ালা ডাকেন, তাকে আটকাবে কোন নীচওয়ালা। জন্ম-মৃত্যু সবই প্রি-ডেস্টিনড চারণদা।

পাটনের মতন অল্পবয়সী যুবকের মনে এসব কথা অল্পবয়সী কম্যুনিস্টের মুখের গালভারী তত্ত্ব আউড়ানোর মতন মনে হল। দুইই পরম পাকামি।

মুখে কিছুই না বলে চুপ করেই ছিল ও।

একসময়ে চারণ বলল, দাহ কোথায় করলে ?

সবাই যেখানে করে। হিন্দুরা। ওঁর ঠাকুর্দা তাঁর ধর্ম জোর করে চাপাননি কারো উপরেই। অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গমের কাছে দাহ করা হল। একটা চাঁপা-রঙা বেনারসী পরেছিল আর কী সুন্দর করে যে সাজিয়ে দিয়েছিল ওকে প্রতিবেশীরা, কী বলব চারণদা তোমাকে। যেন বিয়ের সাজ পরেছিল সে।

চারণ ভাবছিল, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল বুঝি দেবী চন্দ্রবদনী, যেন রক্তমাংসের চেহারা নিয়ে তার ভোরের স্বপ্নে। আবার স্বপ্নেরই মধ্যেই স্বর্গে চলে গেল সে। বড় কষ্ট পেয়ে গেল অত ছোট্ট জীবনে। মা, স্বামী, ভাই একে একে সবাই ছেড়ে চলে গেল। এক-এক জনের যাওয়াটা এক-একরকম যদিও। তারপর নিজেও গেল। কষ্ট কি সত্যিই পেল ? না কি সুখ ? সেই সুখ-অসুখের স্বরূপ চারণ জানে না। তাই এমন ভাবছে। কে জানে।

ভাবছিল, কুঞ্জাপুরীর মন্দিরে কুঁবারসিংজীর সঙ্গে দেখা না হলে তো চন্দ্রবদনীর মন্দির এবং শৃঙ্গর কথা ও জানতেও পেত না। হৃষীকেশে ভীমগিরি মহারাজ এবং কৃষ্ণার কাছ থেকে মানুষী চন্দ্রবদনীর কথা শোনার পর থেকেই তাকে সশরীরে দেখার এক তীব্র বাসনা জন্মেছিল চারণের মধ্যে। তারই পরিণতি দেবপ্রয়াগে গঙ্গা আর অলকানন্দার শারীরিক মিলনেরই মতন তাদের মনোমিলন।

তার কিছুদিন পরেই তো মাত্র দুটি দিন এবং একটি রাতের সান্নিধ্য। তারই মধ্যে, মনের মধ্যে, শুধু কি তারই একার মনের মধ্যে ? হয়তো চন্দ্রবদনীর মনের মধ্যেও কত কী নিঃশব্দ বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

একজন মানুষ যখন অন্য মানুষের মনের খুব কাছে আসে তখন নিঃশব্দেই আসে। ঘোড়ার গাড়িতে জরির পোশাকে সেজে, গ্যাসের বাতি জ্বেলে, ড্রাম বাজিয়ে সেই আসা ঘোষিত হয় না। শিউলি ফুল ঝরে পড়ার মতন নিঃশব্দে মন ঝরে অন্য মনের মধ্যে। বড় আশ্চর্য এই মনের জগৎ। গোপনে এবং নিঃশব্দে এর যাওয়া আসা।

কত কীই না কল্পনা করেছিল চারণ চন্দ্রবদনীকে ঘিরে, মনে মনে। স্বপ্নের পোলাউ রাঁধতে বসে ঘি ঢালতে কঞ্জুষী করেনি কিছুমাত্র। কী ভেবেছিল। আর কী হল।

Man proposes God disposes! এই জন্যেই বলে!

প্রিয়জন চলে গেলে তখনই মনে প্রশ্ন জাগে, পরজন্ম আছে কি নেই ? যে গেল, সে কোথায় গেল ? আত্মা বলে কি সত্যিই কিছু আছে ? সত্যিই আছে কি স্বর্গ বা নরক ? বেহেস্ত বা দোজখ্ ? তুরতি বাবা একদিন বলেছিলেন, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।' সুরের গবাক্ষও কি আছে ? জিষ্ণু মহারাজ বলেছিলেন। ও কি সত্যিই সব ছেড়ে দিয়ে গান গাইবে ?

আমি জানি, তোমার মনে এখন কি হচ্ছে চারণদা। তুমি যে তাকে ভালবেসেছিলে। তুমি আমার

মা, তুলিকেও ভালবেসেছিলে। সেটা কোনও বড় কথা নয়। অনেকেই অনেককে ভালবাসে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই যে, চন্দ্রবদনীও তোমাকে আমার মায়েরই মতন ভালবেসেছিল। কথাটা বোধহয় ঠিক বললাম না। কারও ভালবাসাই অন্য কারও ভালবাসার মতন নয়। প্রত্যেকটি ভালবাসার রকমই আলাদা। অথচ কত সামান্য তোমাদের দুজনের পরিচয়।

একটু চুপ করে থেকে বলল পাটন, তোমার নাম যখন যাবার আগে অস্ফুটে উচ্চারণ করল ও, তখন আমি কিন্তু অবাক হইনি একটুও। তোমাদের দুজনের সঙ্গে দুজনের প্রথম দেখা হওয়ার দিনই সে কথা বুঝতে পেরেছিলাম। পচাগলা মৃতদেহের গন্ধ যেমন লুকোনো যায় না, তেমন ভালবাসার গন্ধও নয়। প্রকাশ হয়ে পড়েই! তারপর পাটন বলল, মুখে তোমাকে বললাম বটে যে, তুমি এখানে আর ফিরে আসবে না, মানে আসতে পারবে না, কিন্তু মানুষী চন্দ্রবদনীকেও ভালবেসেছিলে বলেই হয়তো দেবী চন্দ্রবদনীর কাছে তোমাকে বারেবারেই ফিরে আসতে হবে। এলে তো ভালই! কলকাতাতে তুমি আমার মতন মানুষ, চ্যাংড়া-ছোঁড়া অনেকই পাবে কিংবা আমার জন্মদাতার মতন 'সাকসেসফুল' মানুষ, 'কেলকাটা' ক্লাবের মেম্বারও। আমার অশিক্ষিত জন্মদাতা "ক্যালকাটা" উচ্চারণ করতে পারত না, বলত "কেলকাটা"। অনেকই পাবে কিন্তু এই তুরতি বাবার মতন ছুপা-পণ্ডিত, জিষ্ণু মহারাজের মত সন্ত কোথায় পাবে?

তারপর বলল, এখানে এসে চিরদিন থাকতে বলছি না তোমাকে। সংসারে থেকে সন্ন্যাসী হও। যদি তা হতে পারো তাহলে তো কথাই নেই। আর যদি না পারো, তবে বছরে অন্তত একবার করে এসো। চন্দ্রবদনী যে তোমাকে ভালবেসেছিল। সে তো যেমন তেমন মেয়ে নয়। তার স্মৃতি মনে রেখেই না হয় এসো।

চারণ পাটনকে মুখে কিছুই বলল না। ভাবছিল, ওকে যে মেয়েই ভালবাসে, তুলিরই মতন, সেই মরে যায়। সে কি অভিশপ্ত? তারপরই মনে হল ওর, চন্দ্রবদনী তো মানুষী ছিল না। দেবীরাও কি মানুষীর রূপ ধরে সত্যি সত্যিই আসেন এখানে? মানুষী আর দেবী কি একই মানুষকে ভালবাসতে পারেন?

বাসটা আর কিছুক্ষণ পরেই হৃষীকেশে পৌঁছে যাবে। বাস থেকে নেমেই ঘাটে যাবে একবার। ত্রিবেণী ঘাট, বাসটা ভিয়াসির কাছে আসার পর থেকেই ডাকছে তাকে।

কিন্তু কার কাছে যাবে ঘাটে? ধিয়ানগিরি মহারাজ তো চলেই গেছেন। ভীমগিরি মহারাজের সঙ্গে দেখা হবে কি না তাও বা কে বলতে পারে? তিনিও হয়তো নেই। অথবা অন্যত্র চলে গেছেন। মাদ্রীর সঙ্গে কি দেখা হবে? এই অন্ধকার দুর্যোগের দিন এখুনি মিশে যাবে হয়তো অন্ধকার রাতের সঙ্গে। তবুও দু-একজন পুণ্যার্থী নিশ্চয়ই প্রিয়জনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাতে তাড় পাতার দোনাতে বসিয়ে প্রদীপ ভাসাবে পুণ্যতোয়া গঙ্গার জলে।

ভাবছিল চারণ, যে বেনারসের দশাশ্বমেধঘাটে, হৃষীকেশের ত্রিবেণী ঘাটে কত শত মানুষকেই না এমন করে প্রদীপ ভাসাতে দেখেছে। চারণের "প্রিয়জন" বলতে তেমন কেউই ছিল না, যার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সে প্রদীপ ভাসায়। আজও নেই। কিন্তু তবুও মনে মনে ঠিক করল যে, আজকে চন্দ্রবদনীর আত্মার মঙ্গলকামনাতেই প্রদীপ ভাসাবে চারণ একটি। মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি হবে। ভজন শোনা যাবে তিনদিক থেকে। ধূপ, ধুনোর গন্ধ উঠবে। আর ফুলের গন্ধ। ত্রিবেণীঘাটের শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ভগীরথ-আনীত এই গঙ্গার হিমশীতল জলে পা ডুবিয়ে চারণ নিচু হয়ে প্রদীপ জ্বলা দোনাটি ফুল-সাজিয়ে ভাসিয়ে দেবে। পাটনকে বলবে, তার চলে যাওয়া মা তুলির আত্মার উদ্দেশ্যেও একটি প্রদীপ ভাসাতে।

তখন অদৃশ্য থেকে ধিয়ানগিরি মহারাজের গাওয়া গান ভেসে আসবে। আর তাঁর বর্ণিত "কালান্দার" এই পৃথিবীকে বাঁদরের মতন নাচিয়ে বেড়াবেন। সেই নাচ দেখার ক্ষমতা কোনও নশ্বরেরই নেই। স্বর ঈশ্বর, তাল ব্রহ্ম আর লয় কি? লয়? জিগ্যেস করা হয়নি ধিয়ানগিরি মহারাজকে।

দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল বাস হৃষীকেশের বাজারে। আজ বাজার জনবিরল। বাস থেকে

নেমে সত্যি সত্যিই ত্রিবেণীঘাটের দিকে পটিনের পাশে পাশে পায়ে হেঁটে প্রায় জনহীন পথে যেতে যেতে চারণ ভাবছিল, উদ্ধত সবজান্তা, সচ্ছল এবং হয়তো সামান্য দাম্ভিক যে ব্যারিস্টারটি আজ থেকে কয়েক মাস আগে হৃষীকেশের এই ত্রিবেণীঘাটে প্রথমবার এসে দাঁড়িয়েছিল 'কাড়োয়া চওথ'-এর আলোকোজ্জ্বল সন্ধেতে, তার সঙ্গে আজকের এই মানুষটির, অনেকই পার্থক্য রচিত হয়ে গেছে।

সেদিন সে হুকুম দেনেওয়ালা ছিল। আজ সে হুকুম-পালনকারী হয়েছে। 'চাপরাশী' হয়েছে।

বহুদিন আগেই জবাহরলাল নেহরুর 'The Discovery of India' পড়েছিল কিন্তু আজ চারণের মনে হচ্ছে, ও ওর এই শাশ্বত, মহান, হিন্দুপ্রধান অথচ ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষকে পুনরাবিষ্কার করেছে। ধর্ম কাকে বলে? পূজা-পার্বণের মাহাত্ম্য কি? তার নিজের মা-বাবার যে ধর্ম, সেই ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হওয়া যে নীচতাই শুধু নয়, কাপুরুষতাও, তা সে আজ হৃদয়ে বুঝেছে।

A. L. Basham সাহেব যেমন করে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করে তাঁর অসামান্য গ্রন্থটি লিখেছিলেন, 'The Wonder, That was India' এই ক-মাস উদ্দেশ্যহীনভাবে এই দেবভূমিতে ঘুরে বেড়ানোতে তার ভিতরেও যেন তেমন এক নতুন বোধের জন্ম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এই দেশের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে নতুন করে অবহিত হয়েছে।

আরও বহুবার এই দেবভূমিতে এসে, আরও অনেক জানাশোনার পরে, নির্জনে অনেক একা ভাবনাচিন্তার পরে ও হয়তো কোনওদিন তার আবিষ্কারকে তার দেশবাসীর সামনে আনতে পারবে। নেহরু সাহেবের মতন, ব্যাশাম সাহেবের মতনই। তবে সময় লাগবে। অনেকই সময়। সেও লেখক হবে। একদিন। সময়কে তার প্রাপ্য সময় তো দিতে হবেই।

নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে এ জীবনে চারণ আর কখনওই লজ্জিত হবে না। যার "ধর্ম" নেই সে তো মনুষ্যেতর জীব। "ধর্মো হি তেষাম অধিকোবিশেষোঃ/ধর্মে না হীণা পশুভিসমানাঃ"।

বাস থেকে নেমে, পটিনের সঙ্গে পায়ে পায়ে হেঁটে একসময়ে ত্রিবেণীঘাটে এসে দাঁড়াল। কালিকমলিওয়ালার আশ্রমের দিক থেকে নারী-কণ্ঠে কে যেন ভজন গাইছিলেন মীরাবাঈ-এর 'ম্যায়নে চাকর রাখখো, চাকর রাখখো, চাকর রাখখো জি'। জিষ্ণু মহারাজের কথা মনে পড়ে গেল চারণের।

তাড়পাতার দোনাতে বসানো ওদের দুজনের প্রদীপ সেই অন্ধকার দুর্যোগময় রাতে গঙ্গার বুক বেয়ে টলতে টলতে ক্রমশ দূরে চলে যেতে লাগল অন্ধকারতর দিগন্তের দিকে। তারপরে একসময়ে হারিয়েও গেল। যেমন, সব প্রদীপই হারায়।

হঠাৎই চারণের বুকটা পাথরের মতন ভারী হয়ে এল। তারপর অব্যক্ত যন্ত্রণার মতন "চ-ন্দ্র-ব-দ-নী" এই পাঁচটি অক্ষর তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। এবং পরক্ষণেই বড় হালকা লাগতে লাগল ওর। কে যেন পাশ থেকে ওর কানের পাশে চন্দ্রবদনীরই গলাতে বলে উঠল,

"প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।"

পাশে তাকিয়ে দেখল, একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে, ঘাঘরা পরা, নাকে পেতলের নোলক, মাথায় ঘোমটা দেওয়া, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মায়ের প্রদীপ ভাসানো দেখছে।

পটিন বলল, চলো চারণদা।

সিঁড়ি চড়তে লাগল ওরা দুজনে।

পটিন বলল, তুমি কি কাল আমার সঙ্গেই যাবে?

হ্যাঁ। দিল্লি অবধি। একটি গাড়ি নিয়ে যাব সোজা এয়ারপোর্ট। ক্রেডিট কার্ড সঙ্গে আছে। তুমিও আমার সঙ্গে চল পটিন।

পটিন বলল, পরের বারে যদি আসো এখানে, তবে আর ক্রেডিট কার্ড-টার্ড এনো না। এ এন জেড, প্রিভলেজ, সিটি ব্যাঙ্ক, ডাইনার্স সিলভার-কার্ড, গোল্ড-কার্ড। এখানে অন্য ক্রেডিট-এর

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

দরকার। ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স-এর নয়। ওই সবরকম ক্রেডিটই এখানে ডিসক্রেডিট।

ঠিকই বলেছ। ফেলেই দেব গিয়ে।

কয়েকটা সিঁড়ি উঠে, পাটন দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, কিছু কি পেলে এখানে এসে চারণদা ? শিখলে কি কিছু ?

নিশ্চয়ই ! সিঁড়ি উঠতে উঠতে বলল, চারণ।

কি ?

তোমাকে পেলাম, এই পাটনকে। পেলাম, চন্দ্রবদনীকে, আর শিখলাম "চাপরাশ" শব্দটির মানে। এই বা কম পাওয়া কি ? কম শেখা কি ?

তারপর একটু ভেবে বলল, বড় এক আনন্দমিশ্রিত দুঃখ বুকে করে নিয়ে ফিরে যাচ্ছি পাটন। কত কী জানলাম, কত মানুষকে চিনলাম কাছ থেকে, মানুষের মতন সব মানুষ। এত অল্প দিনে এ-কী কম পাওয়া ! আবারও আসব আমি। বারে বারেই আসব।

দ্যাখো, দ্যাখো, বলে, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাটন আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

আশ্চর্য ! এই অন্ধকার আর দুর্যোগের রাতেও জ্বলজ্বল করছে একটি তারা। দিগন্তে। সন্ধ্যাতারা কি ?

তীব্র, স্নিগ্ধ দ্যুতিতে দীপিত জ্বলজ্বল করছে তারাটি।

তাকিয়ে রইল চারণ সেই দিকে অনেকক্ষণ। একটি দীর্ঘশ্বাস উঠল তার বুকের ভিতর থেকে।

অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গমে দাহ করা চন্দ্রবদনীর শরীরের ভস্ম কি এখনও ভেসে চলেছে এই পতিতপাবনী গঙ্গা দিয়ে ? সেই তারাটির ছায়াটি কি কাঁপছে নির্জন নদীর সুদূর জলেও ? পরক্ষণেই হঠাৎই চারণের মনে হল যে, ওই তারাটি চেয়ে আছে তার আর চন্দ্রবদনীর অপূর্ণ সব ইচ্ছেগুলিরই দিকে।

ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! একজন সাধু বললেন পাশ থেকে, জল ছিটোতে ছিটোতে।

চারণের মনে পড়ল, এই দেবভূমিতে এসে ও এই ত্রিবেণীঘাটেই প্রথম সন্ধেতে দাঁড়িয়ে ছিল। "কাড়োয়া চওথ" ছিল সেদিন। দেওয়ালির আগের কৃষ্ণা-চতুর্থী। কত সুন্দরী সুবেশা সালংকারা সব নারীরা তাঁদের স্বামীদের মঙ্গলকামনা করে প্রদীপ ভাসাচ্ছিলেন জলে। আর আজ চারণ সেই দেবভূমি ছেড়ে চলে যাবার আগের সন্ধের এই ঘোর ক্রন্দনরতা বিধুর প্রকৃতির মধ্যে সেই ঘাটেই দাঁড়িয়ে আছে। তার জীবনের একটি বিশেষ পর্বের পবিত্র ফুল ও ধূপ-গন্ধময় এই গানখানি যেন 'সম'-এ এসে দাঁড়াল, অয়ন সম্পূর্ণ করে। সেই ত্রিবেণীঘাটেই।

একটু আগেই যখন ঘাটে নেমে এসেছিল তখন চন্দ্রবদনীর কারণে মনটা বড়ই বিষাদমগ্ন হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য। এখন ঘাটের চাতাল বেয়ে ফিরে যাবার সময়ে এক ব্যাখ্যাহীন আনন্দে ওর মন ভরে উঠল কানায় কানায়। চারণের দুটি চোখ আনন্দ ও বেদনার এক অভূতপূর্ব, অভাবনীয় মিশ্রণে জলে ভরে উঠল। একটি একটি করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে, ও নিরুচ্চারে গাইতে লাগল সেই গানটি, যে গানটি সে বহু বছর আগে কুমায়ুঁ পাহাড়ের আলমোড়ার এক আশ্রমে অন্ধ গায়ক সদুনবাবুর গলাতে শুনেছিল আর যার ভুলে-যাওয়া বাণী পূরিত করেছিলেন ধিয়ানগিরি মহারাজ এই ত্রিবেণী ঘাটেই, এক রাতে।

"খোঁজে খোঁজে তুমহে কনহাইয়া
মুঝে নায়না ধারে।
মোরে মন্দির অবলোঁ নেহি আয়ে
কওনসি ভুলভঁয়ি মেয়ো আলি
প্রেম পিয়া বিনা আঁখিয়া তরস রহি
উনবিনে জিয়া ভরমায়ে।

খোঁজে খোঁজে তুমহে কনহাইয়া
মুঝে নায়না ধারে।"

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com